জয়ঢাক

শারদ সংখ্যা-১৪২০

অর্ধশততম সংখ্যা। ২৭ তম ইন্টারনেট সংখ্যা

সূচিপত্র

নির্দিষ্ট লেখাটিতে পৌঁছোতে লেখার নামে ক্লিক করুন

বিষয়	লেখা	লেখক
সম্পাদকীয়	জয়ঢাকি বোল	আশুতোষ ভট্টাচার্য
কমিক্স	হরিহরের হিরে হরণ	শ্রী শাম্ব
	বৈঁচিগ্রাম বিশ্বকাপ	দেবজ্যোতি
	খাঁচার সারসছানা (রাশিয়ান কমিকস)	আলেনা চেবোতার, ইরিনা অসিপোভা,
পুজো স্পেশাল	ঐশীর স্বপ্ন	অভীক দত্ত
	কুমোরটুলি	বাসন্তিকা সেনরায়
	ভিনদেশের ভারতীয় রানি	রাকা দাশগুপ্ত
গল্প	ও	অচিন্ত্য সুরাল
	আজব	অদিতি ভট্টাচার্য
	ডাকাত—ডাকাত--	অলকানন্দা রায়
	তেঁতুলে শ্রীমধুসূদন	অমর মিত্র
	ওই বাড়িটা	যশোধরা রায়চৌধুরী
	শুভ জন্মদিন । মেনি হ্যাপি রিটার্ন্স অবলম্বনে	জাস্টিন কেস। অনুবাদ অমিত দেবনাথ
	হেমকান্ত মীন	কিশোর ঘোষাল
	হাইলাকান্দির হুডিনি	মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য
	নৌকা- ভাসা নদী	রতনতনু ঘাটী
	উল্টোপাল্টা	শিবশংকর ভট্টাচার্য
	রাজপ্রহরী	শিশির বিশ্বাস
	ওপরের দিদা	শুভশ্রী ভট্টাচার্য
	চোর ধরার গল্প	সোনালী ঘোষাল
	কন্যাকুমারীর শংখ	তাপস মৌলিক
ভ্রমণ	পাহাড়ি গ্রামের গপ্পো- খাতি	ইন্দ্রনাথ
ভূতের আড্ডা	ভূতের গল্প- শলকেনের ছবি শেষ পর্ব	মহাশ্বেতা
	দেশবিদেশের ভূতেরা- নিশি, লেমুরে	সংহিতা
	ভূতুরে বাড়ি- সাউথ পার্ক স্ট্রিট সিমেটারি	পিকলু
বিচিত্র দুনিয়া	আকাশের ডাক	অরিন্দম দেবনাথ
বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	অংকের বিচিত্র জগত	বৈজ্ঞানিক
	মাথে মে ট্রিকস- প্রফেসর ট্যানজেন্টের গল্প—অংক না ম্যাজিক	সূর্যনাথ ভট্টাচার্য
	বিজ্ঞানের ছড়া—রসায়ন	অমিতাভ প্রামাণিক
	টেকনো টুকটাক- আকাশছোঁয়া বাড়ি	কিশোর ঘোষাল
	ভারতের বৈজ্ঞানিকঃ প্রমথনাথ বোস	সংহিতা
	বিচিত্র জীবজগত- বোট্টম গাছ	বৈজ্ঞানিক
	চেনা পাখির অচেনা পরিচয়- দোয়েল	কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়
	প্রতিবেশী গাছ- লাল জামরুল	অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়
জাতক কথা	মহাশ্বরোহ জাতক	নন্দিনী চট্টোপাধ্যায়
বনের ডায়েরি	আমি আর অজগর	স্বপ্না লাহিড়ী
	ভারতের মানুষ ও না মানুষদের গল্প (বিস্ট অ্যান্ড মেন ইন ইন্ডিয়া)- র বঙ্গানুবাদ	পিয়ালী চক্রবর্তী, (মূল লেখাঃ জন লকউড কিপলিং)
	ভারতের বনাঞ্চল- নাগাল্যান্ড	সংহিতা

ছড়ার পাতা	স্পুকবুক	আবু হোসেন
	দুগ্‌গা মাগো সত্যি বলো	অচিন্ত্য সুরাল
	গুগলি	আশুতোষ ভট্টাচার্য
	পুজোর ছুটি	প্রকল্প ভট্টাচার্য
	আকাশ	রুচিস্মিতা ঘোষ
	আইন জারি	তরুণ সরখেল
	আদর পেয়ে	তোফায়েল তোফাজ্জল
	সোনামোতি মেয়ে	ইন্দ্রাণী সরকার
	সোনামণির দুর্গা দেখা	তাপস শংকর ব্রহ্মচারী
	রাতের ঘোরা	মনসুর আজিজ
ধাঁধা মজা রহস্য	ধাঁধা	জয় মুস্তাফী
	কুইজ	ইন্দ্রশেখর
	জানো কি	ইন্দ্রশেখর
	ড্রুড্‌ল	ইন্দ্রশেখর
	কীসের ফটো	ইন্দ্রশেখর
	শব্দখেলা	ইন্দ্রশেখর
	আশ্চর্য উলকি	ইন্দ্রশেখর
	অবিশ্বাস্য	ইন্দ্রশেখর
	গত সংখ্যার উত্তর	ইন্দ্রশেখর
ধারাবাহিক উপন্যাস	অন্তিম অভিযান	পিটার বিশ্বাস
	পঞ্চা নামে ভালুকটি	চিত্ত ঘোষাল
	অলোকপর্ণার বিড়াল	রোহণ কুদ্দুস
কাতুকুতু	দুঃখের গল্প ইত্যাদি	রসিকলাল দাস
লিখিব খেলিব আঁকিব সুখে	কে ফিসফিস করছে	ঋত্বিক
	শমীকের গল্প তানুষ্কার ছবি	শমীক, তানুষ্কা
	মন্দারমণি ভ্রমণ	অনন্যা বসু
	ঋকের সমুদ্র	ঋক
পুরাণ কথা	শিশুপাল বধ	সংহিতা
জাপানের গল্প	ইয়েডর ওটোকোডেটের গল্প প্রথম পর্ব	বার্ট্রাম ফ্রিম্যান মিটফোর্ড অনুঃ সংহিতা
রাশিয়ান গল্প	লাল ফুলের গল্প	প্রচলিত গল্প
পুরাতনী	আপনজন	শিবশংকর ভট্টাচার্য
স্মরণীয় যাঁরা	কাঙাল হরিনাথ	উমা ভট্টাচার্য
সুরঢাক	এসো গান শুনি	প্রদীপ মুখোপাধ্যায়
টাইম মেশিন	ভারতভ্রমণ	দীন মহম্মদ (অনুঃ শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়)
	ঠগির আত্মকথা	অলবিরুণী
বই পড়া	ইচ্ছেডানা	ইন্দ্রশেখর
লোককথা	কাওয়াইয়া হা- ও (হাওয়াইয়ের গল্প)	ইন্দ্রশেখর
বিশ্বের জানালা	ক্যামেরুন ও তার বামিলেকি উপজাতি	উমা ভট্টাচার্য
সেই মেয়েরা	হটু বিদ্যালংকার	উমা ভট্টাচার্য
আমার শহর	ফেলে আসা কলকাতা	সুজয় রায়
জয়ঢাকের কিচেন	ঋকবাবুর রান্নাখেলা—ফ্রিটাটা	তনুশ্রী মুস্তাফী
দেশ ও মানুষ	শ্রীনিবাস রামানুজন	উমা ভট্টাচার্য
সিনেমা হল	প্যারানর্মান	মহাশ্বেতা
খেলার পাতা	অন্নপূর্ণা	মরিস হারজগ অনুঃ তাপস মৌলিক
	এভারেস্ট	এরিক শিপটন। অনুঃ বাসব চট্টোপাধ্যায়
ক্যামেরার পেছনে	ওয়ান টু থ্রি ক্লিক	শম্পা গুহমজুমদার

জয়ঢাকের এই সংখ্যার দলবল

সহ-সম্পাদকমন্ডলী

উমাদি

বিশ্বের জানালা, সেই মেয়েরা, দেশ ও মানুষ, স্মরণীয় যাঁরা

সংহিতা

ভারতের বৈজ্ঞানিক, পুরাণ, ভারতের বনাঞ্চল, জাপানের গল্প , দেশবিদেশের ভূত

মহাশ্বেতা

বইপড়া, লোককথা, সিনেমা হল ভূতের আড্ডা'র গল্প

তুলিতে, মাউসে, কি বোর্ডে, ক্যামেরায়

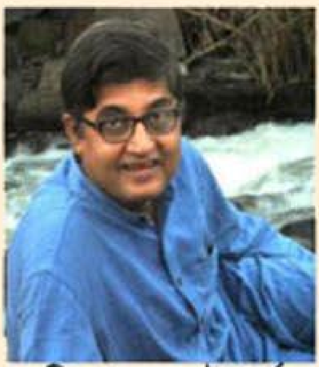

শিবশংকর ভট্টাচার্য

মলয়চন্দন সাহা

মৌসুমী

মহুল

তাপস মৌলিক

অনুপম

অন্তরা

মুকুট

অর্ণব

শিমুল

দীপংকর

হাজারো কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও সময় বের করে তোমাদের জন্য কি বোর্ডে, মাউসে, তুলিতে কি ক্যামেরায়, লেখা কম্পোজ করে, ছবি গড়ে জয়ঢাককে সাজিয়ে তুলেছেন এই বন্ধুরা।

পিকল

জয়ঢাকি বোল

কেউ বলেছিল বড্ড বেড়েছে বাড়
হিন্দুধর্ম রসাতলে গেল বলে
টিটকিরি ছি ছি চোখ রাঙানি তো ছিলই
শাস্ত্রবিরোধী বলেছিল সক্কলে

শাস্ত্রবিরোধী মেয়েদের লেখাপড়া
পণ্ডিতজনে বিধান দিয়েছে শোনো
ঘর,সংসার,সন্তান, সন্ততি
অক্ষরজ্ঞানে প্রয়োজন নেই কোন

ফিরিঙ্গিটাও* লোকটার সাথে আছে
সহজ সরল বাংলা বর্ণমালা
শ্রীরামকৃষ্ণ ডেকেছে ম্লেচ্ছটাকে
নবজাগরণ নতুন যাত্রাপালা

এসব তুচ্ছ বিপদ ঝঞ্ঝা বাধা
কঠিন কোমল বাহিরে ও অন্তরে
এসো একবার , কত পথ চলা বাকি
বিদ্যাসাগর বাংলার ঘরে ঘরে।

সেপ্টেম্বর পবিত্র মাস, কারণ ১৮২০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জন্মেছিলেন আমাদের বাংলায়। মেয়েদের পড়াশোনা শেখানো, বিধবাবিবাহ থেকে শুরু করে বাংলা ভাষাটাকে শক্তপোক্তভাবে গড়ে তোলা এমন হাজারো কাজ করে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন তিনি। এই সংখ্যার জয়ঢাকি বোল- এ তাই তাঁকে প্রণাম জানালেন তোমাদের আশুতোষ ভট্টাচার্য দাদা।

পুজো ভালো কাটুক সবার। আনন্দে থেকো।

ভালোবাসায় ,

তোমাদের জয়ঢাকি দাদারা

হরিহরের

হিরে হরণ

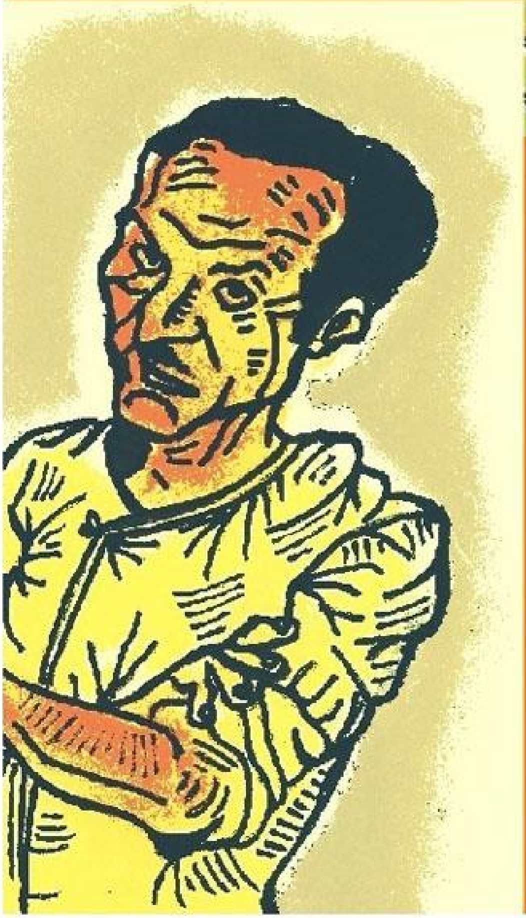

লেখায় রেখায়

শ্রী শাম্ব

হরিহরবাবু রাত করেই বাড়ি ফেরেন...
ভজহরিবাবু কেমন আছেন?
আমার নাম ভজহরি নয় !
তাহলে নিশ্চয় নরহরি ?

আপনার চেহারা দেখলেই কেমন একটা ভক্তিভাব আসে৷ তাই মনে হল...আপনার নামের সাথে 'হরি' কথাটা যুক্ত ...
.আমার নাম হরিহর হাজরা
ঠিক ধরেছি !!!!!!!!!
কী?
আপনার কি মনে হয়না ... আমরা বড্ড বেশি আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছি৷ খালি রচনার খাতায় লিখি... ' প্রত্যেকে আমরা পরের তরে' ... চলুন গল্প করি

রাগ করছেন কেন? এটা হাই-প্রেশারের লক্ষণ
চললেন কোথায়? সবে আলাপ হল !
উফ!! নাছোড়বান্দা
সোডার মত ভসভসিয়ে হাসুন, শরীর ভাল থাকবে। ... আচ্ছা, সুন্দর কিছু ভাবা যাক। ধরুন, এখন খুব বৃষ্টি হচ্ছে। আপনি ভিজে কাক হয়ে বাড়ি ফিরলেন... আপনি চুল মুছছেন, এমন সময় গরম ভাত আর ইলিশ ভাজা নিয়ে আপনার মা হাজির
এবার চোখ বুজে অনুভব করুন... 'গার ফিরদাউস রোই ই জামিন আস্ত... হামিন আস্ত, ও হামিন আস্ত...' ... কেউ যদি প্রশ্ন করে স্বর্গ কোথায়, আমি বলব এখানেই স্বর্গ... স্বর্গ এখানেই...

ইলিশ মাছ আর তাজমহল এক জিনিস?
অনুভূতিটা এক। ... যাইহোক, গন্ধ পাচ্ছেন? ইলিশ মাছের?
আমার অসময়ে কবিত্ব আসে না। যতসব পাগল !!!
দারুণ!!!
আপনাকে আর গন্ধচুরি'র মামলায় জড়াতে হবে না। শিব্রাম চক্কোত্তি'র 'গন্ধচুরি' গল্পটা পড়েছেন? সময় পেলে পড়ে নেবেন...
নির্জন রাস্তা...

তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম !
আপনার মতলবটা কী?
হিরের আংটিটা দে! ... চিৎকার করলেই চিচিংফাঁক
একমাস ধরে তোকে ফলো করছি। ফ্রি তে একটা উপদেশ দিচ্ছি- ' রত্ন পরিধান করিয়া পথে বাহির হইবেন না' ... ফলাফল দেখিলেন। গুড নাইট
সব নিয়ে নিন। প্রাণে মারবেন না...প্লিজ

হরিহর বাবুর বড্ড হাসি পাচ্ছে... সোডার মত ভসভসিয়ে উঠছে সফেন হাসির বুদবুদ। তিন বছর আগের একটা ঘটনা মনে পড়ে যাচ্ছে...

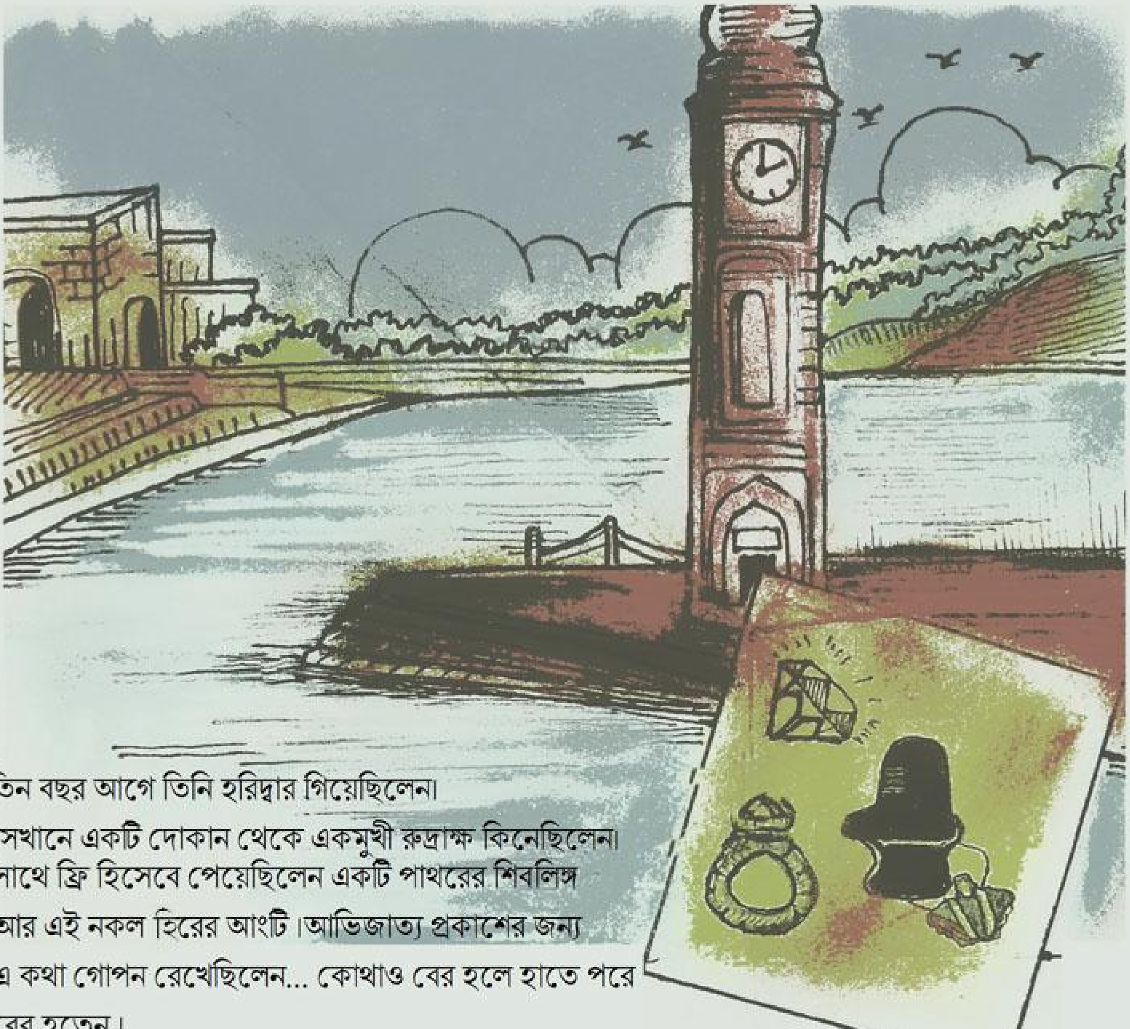

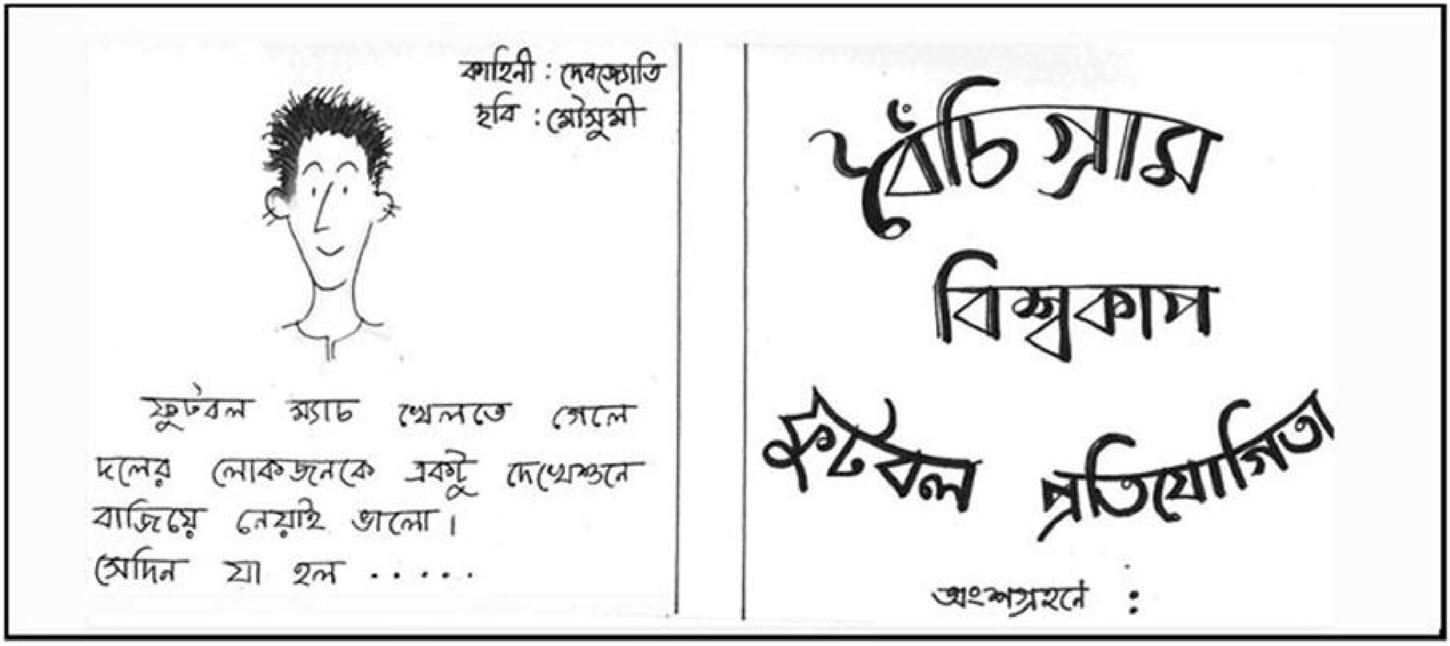
কাহিনী : দেবজ্যোতি
ছবি : মৌসুমী
ফুটবল ম্যাচ খেলতে গেলে দলের লোকজনকে একটু দেখেশুনে বাছিয়ে নেয়াই ভালো।
সেদিন যা হল .....
বৈঁচি গ্রাম বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা
অংশগ্রহণে :

ফুঁ-সিঁ-য়ে-যা-ও
যুবক সংঘ (স্পেন)
বনাম
বৈঁচি বয়েজ পুরাতন ছাত্রসংঘ (ব্রাজিল)
পাড়ার ফুটবল টুর্নামেন্ট হচ্ছিল—

বৌঁচি রেলযাত্রী ক্লাব (আর্জেন্টিনা)
বনাম
হেমগঞ্জ ইয়ং (কাতার)
গো-ও-ও-ল

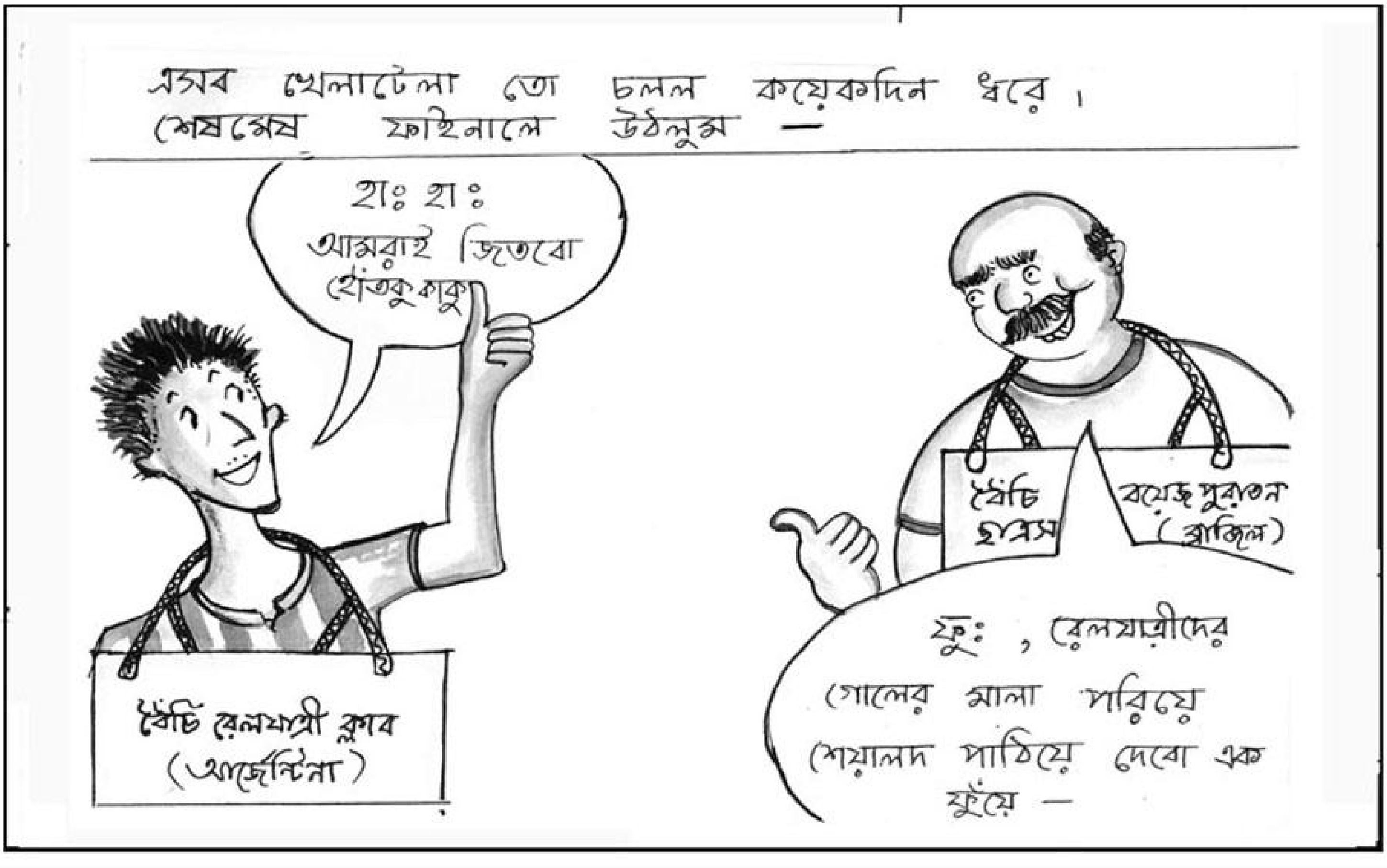
এসব খেলাটেলা তো চলল কয়েকদিন ধরে। শেষমেষ ফাইনালে উঠলুম —
হাঃ হাঃ আমরাই জিতবো হোঁতকু কাকু
বৌঁচি রেলযাত্রী ক্লাব (আর্জেন্টিনা)
বৌঁচি ইএস
কয়েদ্ধ পুরাতন (ব্রাজিল)
ফুঃ, রেলযাত্রীদের গোলের মালা পরিয়ে শেয়ালদ পাঠিয়ে দেবো এক ফুঁয়ে —

হোঁতকু কাকু টিম মিটিং করছে —
গাবুদের দলটা বেশ ভালো ...
গাবুটা বেজায় ভালো খেলে। ওদের গোলকিপারটাও বেজায় ষন্ডা ....
আমাদের একটা ভালো গোলকিপার আর একটা ভালো ফরোয়ার্ড লাগবে।
হঠাৎ
— আমাদের নিবি? আমরাও বেঁচি বয়েজে পড়তাম —
কে রে তোরা?
আরে, দুশমন আর আলু তো? তোরা তো সেই ম্যাট্রিকের পরে জাহাজে করে ব্রাজিলের জঙ্গলে চলে গেলি অ্যাডভেঞ্চার করতে? তোরা তো মোটেই খেলতে পারতিস না!!
নিয়ে দেখ্ না। আমি ফরোয়ার্ড খেলব। দশ গোল দেব।
আর আমি গোলকিপার খেলব ...

পালা এখান থেকে ! সেই সেবার ক্লাস এইটের ম্যাচে দশ গোল খেয়েছিলি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তুই আলু !
নে না !! নে না !!
আর তুই দুশমন ? ক্লাস নাইনের ম্যাচে চারটে পেনাল্টি বাইরে মারলি? তুই দিবি দশ গোল ?
হাঃ হাঃ হাঃ
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ

এই কুতু, আমাদের গোলি !
দ্যাখ, এই হল ঘ্যাঁঘ্যা, আমাদের ফরোয়ার্ড !
জোর কদমে প্র্যাকটিস চলছে । ঘ্যাঁঘ্যা চারজনকে ছিটকে ফেলে গোলে গোলার মত শট করছে । .... আর কুতু তিনখানা ভল্ট খেয়ে বলটাকে ধরে ফেলেছে —
আহা আহা ! যেন নেইমার আর মুসলেরা খেলছে । গাবুর দলকে এবারে দশ গোল দিয়েছি তো কী?

ঘ্যাঘ্যা প্র্যাকটিস সেরে ফিরছে…
ঘ্যাঁঘ্যা, সাবধানে থাকিস। চোটফোট লাগাস না। কাল ফাইনাল।
কিচ্ছু ভেবো না খোঁতকুদা
সব খেলার সেরা ফুটবল
উঃ, আম বাগানে কি অন্ধকার! একটু গান গাই।
ও কী? কুতু যে! তুই আবার কোথা থেকে এলি? হনহনিয়ে কোথায় যাচ্ছিস? ..শুনছিস না?
বলতেই কুতু মুখ ঘুরিয়েছে। আকাশে মাথা ঠেকেছে…
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ
উঁ-উঁ-উঁ-
ঘ্যাঘ্যা অজ্ঞান হয়ে গেল।
ওদিকে কুতু আসলে —
জয় বাবা ভূতেশ্বর। কালকের ম্যাচে দয়া কোরো বাবা। শ্মশানের মাটি এনে পুজো দেবো … জয় বাবা ভূতেশ্বর …
একি — একি — বাবা আবির্ভূত হয়েছেন !!
মুখ তুলতেই দেখে —
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ
আয়, তোর গোলকিপারের গোল মাথাটা চিবিয়ে খাই —
উঁ-উঁ-উঁ-উঁ
ইক

আজ ফাইনাল ম্যাচ –
হোঁতকু কাকুর বৈঁচি বয়েজ টীমের সব খেলোয়াড় জার্সি পরে দাঁড়িয়ে আছে
সবাইকে দেখলাম! আজ সেরা খেলাটা খেলিস সবাই! জয় হিন্দ!
কুতু, ঘ্যাঘ্যা, আজ তোরাই ভরসা ...
দুজনেই মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়লো

ম্যাচ শুরু –
নাড়ু, বল ধর –
গাবুকে পাস দে –
গাবু, গোলে মার –
হোঁতকু ছিটকে গেল –
কুতু, গোলে বল ঢুকছে – ধর –
এইরে, পিছলে যাচ্ছি ..
গোল – গোল
কুতু এক লাফে গোলপোস্টের মাথা ছাড়িয়ে উঠে যাচ্ছে। পায়ের নিচে বল গড়িয়ে জালে –

গাবু রে, কুতুদা তো একদম আনাড়ি — হি হি!
বলতে বলতে কুতু গোলার মত শট মেরেছে — মাঠ পেরিয়ে বল উড়ে যাচ্ছে উল্টোদিকে —
হাঃ, এই নাকি ওদের সেরা গোলকিপার!
ঘ্যাঁঘ্যা, ছোট্ ছোট্ -
মাঠের এপাশ থেকে একটা ঝড়ের মতন দৌড়ে গেল ঘ্যাঁঘ্যা।
সবাইকে পেছনে ফেলে ঘ্যাঁঘ্যা বলটা ধরে পৌঁছে গেছে প্রায় গোলের সামনে —
তারপর বলটাকে নিয়ে গোলের সামনে এসে বেজায় জোরে একটা লাথি কষাল। বলটা উড়তে উড়তে ছোট হয়ে আকাশে মিলিয়ে গেল —
হায়! হায়!
এযে গোল কানা!
যেমন ফরোয়ার্ড, তেমনিই গোলি... চল নাড়ু, এইবারে খেল দেখাই —

বৈঁচি রেলযাত্রী ক্লাব (আর্জেন্টিনা) — ৫
বৈঁচি বয়েজ পুরাতন ছাত্রসংঘ (ব্রাজিল) — ০
উফ্, জোর লেগেছে পড়ে গিয়ে। আমি আর নামছি না!
আর — ওই তোরা, ঘ্যাঁঘ্যা আর কুতু! এই নাকি খেলা? ছ্যা ছ্যা! কী খেলছিস আজ?
কী? কী?
দাঁড়াও দেখাচ্ছি ... খেলা কাকে বলে?
সেকেন্ড হাফ শুরু হতেই — গাবু বল ধরে এক দৌড়ে গোলের সামনে গিয়ে একখানা দুরন্ত উড়ন্ত শট নিয়েছে। বল গোলে ঢুকছে —
গোলকিপার কুতু একটা দশ হাত লম্বা হাত বের করে বলটাকে ধরছে—
!
গো-ও-ও- এ কী!!
এ কী?

হোঁতকুদা, আ-আ-আমার কাল রাত্তির থেকে জ্বর। যা দেখলুম! ওরে বাবা —
হোঁতকুদা, আমি কুতু — আমারও —
ঘ্যাঘ্যা, কুতু, একী তোরা এখানে? তাহলে মাঠে ওদুটো কে???
এই নে দুশমন! দশটা দিবি, আর একখানা ফাউ ....
কী ভয়ানক!
ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্
অ্যাই অ্যাই গোলকিপার, পালাচ্ছো কোথায়? গোল খাবি না, তাই না? আর্জেন্টীনা হয়েছো? এই নে, খা-খা—
এই নে —এক—দুই—তিন কত গোল খাবি—খা!!

চার — পাঁচ — ছয় — সাত — নয় — দশ —
— আর এই একটা ফাউ — এগারো
বাঁ-চা-ও
গোটা মাঠের লোকজন প্রানভয়ে পালাচ্ছে —
খেলোয়াড়রা দাঁতকপাটি লেগে পড়ে আছে —
তাই বলি —
সমাপ্ত

খাঁচার সারস-ছানা

'ক্লোরিচিকা' স্টুডিওর কাজের পরিচয় নিন পাঠকেরা। এতে অংশ নিয়েছেন আলেনা চেবোতার, ইরেনা অসিপভা, এলিনা বলগারিনা, ভ্লাদেন বারবে, ইরিনা ল্যবনেভস্কায়া

১) মোলদাভিয়ায় এল লাইলাক ফুলের উষ্ণ বসন্ত। লম্বা শীতকালে বোনা গালিচা টাঙিয়ে রাখল মেয়েরা। কী আর চাই?

২) বসন্তের জন্যে তৈরি হতে বড়োদের সাহায্য করে ছোটোরা। গাছপালার গুঁড়ি তারা শাদা রঙে রাঙায়, এটা তাদের কাজ।

৩) সজ্জনেরা পাখি উড়ে আসার পথ চেয়ে থাকে, বানায় সারস ছানার জন্যে বাসা।

৪) সারসদের প্রথম দেখে শিশুরা। বলে 'নমস্কার' 'বিনেয়াৎস ভেনিৎ!' — মোলদাভীয় ভাষায় তার মানে 'স্বাগতম্।'

৫) গ্রামে নামল সারসেরা, শুরু হল বসন্ত। আর শিগগিরই লোকজন, পাখ-পাখালির মনে আনন্দ: প্রতিটি বাসাতেই হলদেটে ছানা।

৬) শুধু একটা বাসার ওপর মন ভার করে ঘুরছিল একজোড়া পাখি। বাসাটা তাদের শূন্য, ঠোঁট বার করে সারস-ছানা নেই সেখানে।

৭) ছেলেমেয়েদের মায়া হল ওদের জন্যে। বুড়ো বাবলা গাছটার কিছু দূরে তারা কীসব ঠুক-ঠাক করতে বসল।

৪) সারসদের প্রথম দেখে শিশুরা। বলে 'নমস্কার' 'বিনেয়াৎস ভেনিৎ!' — মোলদাভীয় ভাষায় তার মানে 'স্বাগতম্।'

৯) আর অলপক্ষণের জন্যে ঘর ছেড়ে যাওয়া সারস অপেক্ষায় থেকে লেন্‌ৎসা সন্তর্পণে রাখল তার কাগ শাবকটিকে।

১০) অন্যান্য সারস-শাবক ইতিমধ্যে উড়তে শিখেছে। কাগজে ছানাটিকে মা সন্তর্পণে বাসা থেকে ঠেলে দিত, কিন্তু সে পড়ত একেবারে মাটিতে।

১১) কিন্তু ছোটো ছোটো সহৃদয় হাত সর্বদাই ওটি ধরে ফেলে আবার উড়িয়ে দিত আকাশে।

১২) সারস-ছানা রইল খাঁচায়, ডানা মেলে সে আগলে থাকতে মা-বাপেদের। ছেলেমেয়েরা তাকে দিত লজেন্স, মিষ্টিরুটি।

১৩) যখন টিলাগুলোর চূড়ায় নামল হৈমন্তী কুয়াশা, তখন বাসা ছেড়ে যাবার সময় হল সারসদের।

১৪) বিষণ্ণ মনে তাদের উড়াল দেখল ছেলেমেয়েরা: তাদের ঠিক মাঝখানে, মা-বাপের পক্ষপুটে যে উড়ে যাচ্ছে তাদেরই বানানো কাগজের সারস-ছানা।

১৫) লেনুৎসা চেঁচিয়ে উঠল: 'ফিরে আসিস বসন্তে!'

১৬) আর হঠাৎ, স্কুলের খাতার রুল-টানা পাতায় বানানো পাখা নেড়ে সারস-ছানা কী যেন বললে সারসী ভাষায়। লেনুৎসার কানে এল: 'অপেক্ষায় থেকো আমাদের!'

ভাসানের গল্প

ঐশীর স্বপ্ন

অভীক দত্ত

পলাশ স্যার যতক্ষণ পড়াচ্ছিলেন ঐশীর মন কিছুতেই বসছিল না পড়ায়। একে রবিবার, তার ওপর তাদের বসার ঘরে বিরাট পারিবারিক মিটিং হচ্ছে আর সে কিনা পড়ছে! মেসো এসেছেন পাশের শহর থেকে, কলকাতা থেকে তিন পিসি, বাড়ি একদম জমজমাট। কিছুতেই ইউরোপের শিল্প বিপ্লব তার মাথায় ঢুকছিল না। কোনমতে নোটটা নিয়ে মুখটা কাঁচুমাচু করে বলল “স্যার আজকে একটু তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবেন?”

স্যার মনে হয় বুঝলেন ব্যাপারটা। দুটো বড়ো প্রশ্ন লিখিয়েই ছেড়ে দিলেন তাকে। আর সে- ও বড়োদের মত গম্ভীর হয়ে মিটিংয়ে গিয়ে বসল।

তাদের বাড়িটা ঠাকুরদা করেছেন। বেশ বড়ো বড়ো ঘর। ওপার বাংলা থেকে আসার দশ বছর পরে একটা একটা ঘর করে করা হয়েছে। এখন বেশ বড়ো বাড়ি তাদের। বসার ঘরটাই তাদের বাড়ির সব থেকে বড়ো ঘর। অনেক লোক ধরে। বাড়ির সদস্যরা সবাই গোল হয়ে বসেছেন। শিঙাড়া এসেছে বাজার থেকে। সবার হাতে মুড়ি শিঙাড়ার বাটি। পেঁয়াজ, লঙ্কা দিয়ে মাখোমাখো করে মাখা মুড়ি।

ছোটোপিসি তার সব থেকে প্রিয়। থাকেন বিরাটিতে। আজকে এসেছেন। দুদিন থাকবেন। পিকলু তার মেজোপিসির ছেলে। সিক্সে পড়ে। ও বসেছে বড়োপিসির কাছে। সে চুপচাপ ছোটোপিসির গা ঘেঁষে বসল।

মিটিংটা অনেকক্ষণ ধরেই চলছে। সে পৌঁছেছে মাঝামাঝি সময়ে। শুনতে পেল জেঠু উত্তেজিত হয়ে বলছেন, “তুই বুঝছিস না পিতু, হারু পুরোহিতের বয়স হয়েছে। কী বলতে কী মন্ত্র বলবেন। সত্যজিৎ চাটুজ্জেই সেরা যাচ্ছে এখন। তাছাড়া প্রথম পুজো সবসময় তাজা রক্ত দিয়ে করতে হয়।”

ঐশী নড়ে চড়ে বসল। তাহলে কি সিদ্ধান্তটা হয়ে গেছে? সে ছোটোপিসির কানে কানে বলল "হচ্ছে তাহলে?"

পিসি ঠোঁটে আঙুল দিল।

পিতু তার বাবার নাম। বাবা জেঠুর কথা শুনে উত্তেজিত ভাবে বলল, "তাজা রক্ত আবার কী? নরবলি হবে নাকি? তাছাড়া যাই বল, এক্সপেরিয়েন্সের একটা ভ্যালু আছে তো?"

"না রে বাবা, সত্যজিতেরও এক্সপেরিয়েন্স ভালই আছে, ও- ই এখন বিরাট কোহলি বুঝলি?"

ঐশী পরিষ্কার বুঝতে পারছিল এবার যেটা ভেবেছিল সেটাই হচ্ছে। বাড়ির প্রথম দুর্গাপুজো। সে গম্ভীর হয়ে মিটিং শুনতে লাগল। তাদের বাড়িতে এরকম মিটিং প্রায়ই হয়, ছোটোখাটো ব্যাপার নিয়েও হয়। এইসব মিটিংগুলির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সবাই এখানে গুরুত্বপূর্ণ। তাদের বাড়ির রাঁধুনি পিসি থেকে শুরু করে ড্রাইভার বিশুদা সবাই এই মিটিংয়ের সময় গম্ভীর মুখ করে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। প্রতি বছরই তারা পুজোর সময় দল বেঁধে কলকাতায় ঠাকুর দেখতে যায় কিন্তু এবছর জেঠুর মাথায় এসেছে, বাড়িতেই দুর্গাপুজো করতে হবে। আজকে প্রস্তাব পাশের মিটিং ছিল। সে পাশের জায়গাটা মিস করে গেছে পরিষ্কার বুঝতে পারছিল, এখন বিতর্ক জমেছে কোন পুরোহিতকে দিয়ে পুজো করানো হবে সেটা নিয়ে।

বিশুদা জেঠুকে গম্ভীর মুখে সমর্থন জানাল, "আমার মনে হয় বড়দা ঠিকই কইসেন। হারু পুরুতরে আমি দেকসি পূজা দিতে দিতে ঘুমাইয়া পড়েন। তাতে অমঙ্গল হইব কিন্তু ছোড়দা।"

বিশুদার কথায় জেঠু উৎসাহ পেলেন, "তবেই বল, ঘুমিয়ে পড়লে হবে?"

বাবা গম্ভীর মুখে কথা ঘোরালেন, "আচ্ছা তাই হবে, আর ভোগের কী করবে?"

কথা ধীরে ধীরে এগোতে লাগল, আর ঐশীর উত্তেজনাও বাড়তে লাগল। বাড়িতে পুজো? বা ড়ি তে? এ তো বিরাট ব্যাপার হতে চলেছে!

।২।

মা প্রথমে চোখ বড়ো বড়ো করে তার স্বপ্নের কথাটা শুনল। তারপর বলল, "এরকম হয় রে, তোর মনে সারাক্ষণ এটাই চলছে। উত্তেজনাটা বেশি হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এখন এটা নিয়ে বেশি ভাবিস না, সেকেন্ড টার্মের রেজাল্ট খারাপ হয়ে যাবে।"

জেঠু শুনে গম্ভীর মুখে বলল "পেট গরম হচ্ছে, কতবার করে বলি অত ফুলুরি খাস না, তা শুনলি না, এবার দেখ।"

বাবা তো হেসেই উড়িয়ে দিল।

একমাত্র তার বেস্ট ফ্রেন্ড সম্প্রীতি শুনে বলল "ওয়াও"।

।৩।

ঐশীর ভীষণ মন খারাপ আজ। কিছুতেই বারান্দায় যাচ্ছে না মায়ের কাছে। সেই পঞ্চমীর রাতে এল মা তাদের বাড়ি। জমজমাট বাড়ি এক্কেবারে। ঢাকের বাদ্যি, ধুনুচি নাচ, ভোগের লাইন কী ছিল না। আর আজ কিনা মা চলে যাবে! পিকলু ওর খেলনা পিস্তলটা দিতে এসেছিল যেটা নিয়ে সপ্তমীর দিন থেকে তাদের ঝগড়া চলছে। ঐশী ফিরেও তাকায় নি।

এ'কদিন বাড়ি ভর্তি লোক ছিল। সবাই আজ দশমীতে ভাসানের পরে সবাই বাড়ি চলে যাবে। যদিও দ্বাদশীর দিন তাদের গ্যাংটক যাবার কথা তবু তার কিছুই ভাল লাগছিল না।

সিঁদুর খেলার সময়েও সে থাকল না। বাড়ির সবাই তাকে কত সাধ্যসাধনা করল সে কিছুই শুনল না। অবশেষে ছোটোপিসি জোর করে বাইরে নিয়ে গেল। আর মা দুর্গার চোখের দিকে তাকিয়ে সে অবাক হয়ে গেল। সে রোজ ঠাকুরের চোখের দিকে তাকিয়েছে। সপ্তমী থেকে মা যেন হাসছিলেন। আর আজ সেই চোখে বিষাদের ছোঁয়া। যে কোন মুহূর্তে কেঁদে ফেলবেন। রাঁধুনি পিসি বলল, "মায়ের বিসর্জন হয়ে গেছে রে। এখন খালি মূর্তিটা আছে। এই মূর্তির আর প্রাণ নেই।" শুনে সে কেঁদে ফেলল। মায়ের অস্ত্রগুলিকে সবার মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হল। কেউ পেল লক্ষীর ঝাঁপি, কেউ পেল খড়্গ।

বরণ, বিসর্জন সব একে একে হয়ে যাবার পরে বাবা, জেঠু, বিশুদারা সবাই মিলে মার মূর্তি বের করে ভ্যানে তুলল। তারপর একটা ধুতি নিয়ে মায়ের মূর্তির পিছন দিকে মা পিসিরা

সবাই দাঁড়াল। জেঠু খই দিয়ে মূর্তির ওপার থেকে ধুতিতে ফেলতে লাগল। তারপর মায়ের কানে কানে বলল, "আবার এসো মা"।

তারপর পাড়ার সবাই মিলে পুকুরের দিকে গেল। ধীর পায়ে পায়ে ঐশীও গেল। পটলাদা ঢাকটা কাঁধে করে নিয়ে চলল। গোটা এলাকা সরগরম হয়ে উঠল কিছুক্ষণের মধ্যে। যদিও তার আর কিছুই ভাল লাগছিল না। কিন্তু কান্ডটা ঘটল একদম ভাসানের সময়ে।

ভাসান হবে পাড়ার পুকুরের একটা কোণায় যেখানে পাড়টা একটু নিচু হয়ে গেছে। এখানেই এলাকার সব ঠাকুরের ভাসান হয়। রোদ এমন কিছু নেই এই বিকেলটায়। এখন শেষ বিকেল বলা চলে। পুকুরে ভাসানের সময়ে যেই মায়ের মূর্তি জলে ফেলা হল অমনি

বিশুদা জলে ঝাঁপ দিল। চারদিকে হইচই পড়ে গেল। বিশুদা ভ্যানের ওপরে ছিল। এতক্ষণ মাকে আগলে রাখছিল গোটা রাস্তায়। আর বিসর্জনের সাথে সাথে জলে ঝাঁপ দিয়েছে। বিশুদা ঠাকুর আনা থেকে শুরু করে সব একা হাতে করেছে। শেষমুহূর্তে মায়ের চলে যাওয়া সহ্য করতে পারে নি। ঘোরের মাথায় তাই লাফিয়ে পড়েছে জলে।

সবাই হই হই করে উঠল। বাবা, জেঠু সহ পাড়ার সবাই জলে ঝাঁপ দিল। বেশ কিছুক্ষণ পরে বিশুদাকে জল থেকে তোলা হল। উঠে বিশুদার সে কি কান্না। আর মা তখন ঐশীর কাঁধটা উত্তেজনায় চেপে ধরেছে। তার কানে কানে বলল, "তুই এই স্বপ্নটাই দেখেছিলি না যে বিশু ভাসানের সময় জলে ঝাঁপ দেবে?"

ঐশীও ভীষণ অবাক হয়ে গেছিল। সে ভুলেই গেছিল এই স্বপ্নটার কথা। মার কথায় মনে পড়ল। সে ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। তার মানে দুর্গা মা তাকে আগে থেকেই বলে দিয়েছিলেন ভাসানের দিন কি হতে চলেছে। বিস্ময়ে সে বাকরুদ্ধ হয়ে গেল।

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে)

ক্যামেরাঃ দেবজ্যোতি, উমা

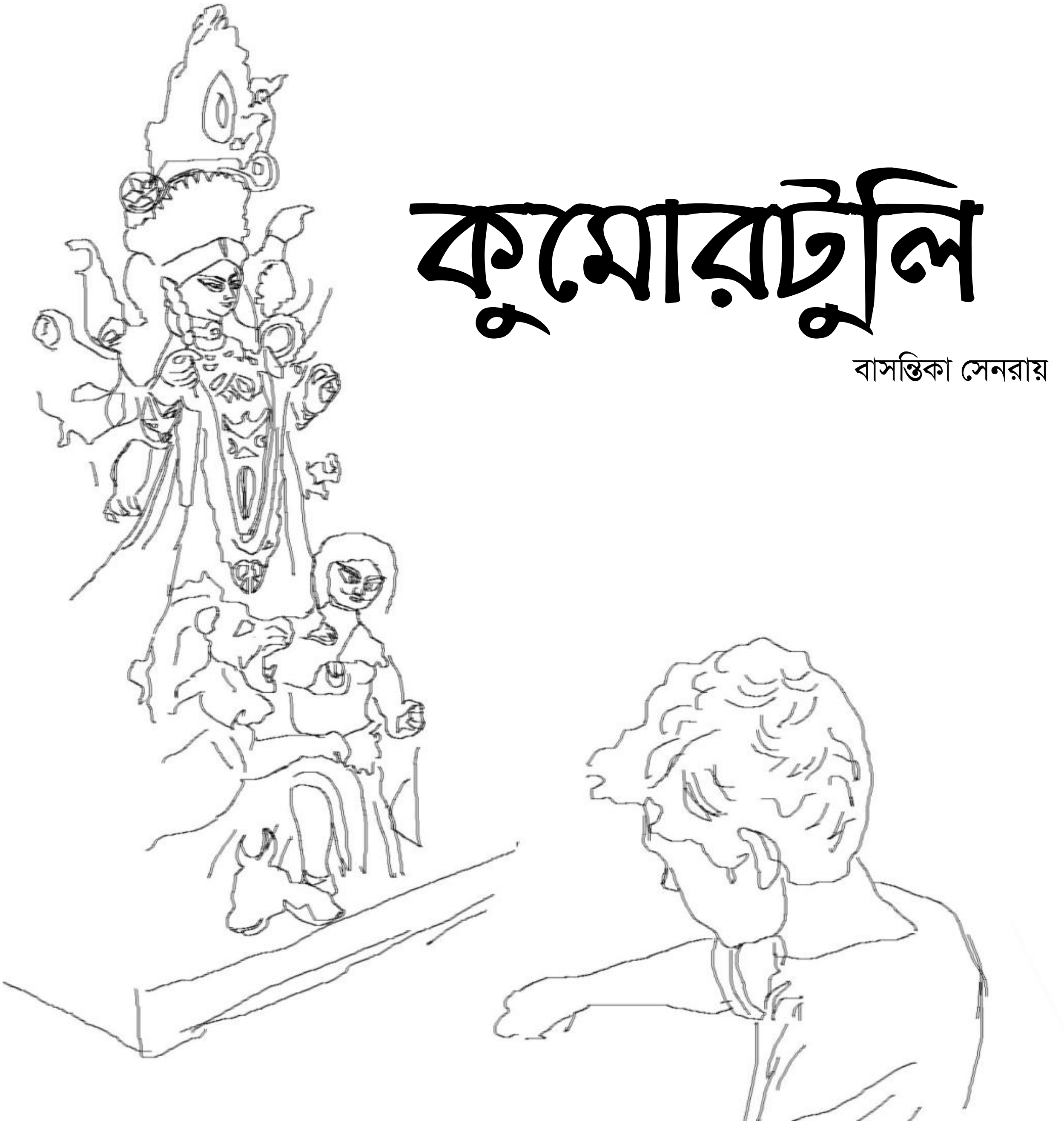

কুমোরটুলি

বাসন্তিকা সেনরায়

কার্নিশের পাশ দিয়ে ঠাকুরদালানে তেরছা ভাবে এসে পড়েছে গলানো কাঁচা সোনা। শরতের আকাশ রোদে-মেঘে মাখামাখি। সকাল প্রায় আটটা। স্বপন পাল, কুমোরটুলির নামী শিল্পী, একমনে কাজ করে চলেছেন রঙ-তুলি নিয়ে। আর পাশে ড্রইং খাতা আর পেনসিল নিয়ে বসে গেছে বছরদশেকের আগ্নিক। সামনে এক চালচিত্রে দেবীমূর্তি।

জায়গাটা চাইবাসা। আগে ছিল বিহারে। এখন ঝাড়খন্ডে। সেনটোলার সেনেদের বাড়ির দুর্গাপুজো অনেক দিনের। আর উত্তর কোলকাতার কুমোরটুলি থেকে স্বপন পালের পরিবারের শিল্পীরা আসেন অনেককাল ধরে। বেশ কিছুকাল আসছেন স্বপন পাল।

‘কাকু তুমি কিন্তু কালকে বলেছিলে আজকে বাকিটা বলবে,’ খাতায় কেবল দুর্গার ছবি শেষ হয়েছে, আগ্নিক মুখ তোলে। গণেশের পায়ের আঙুলে নিপুণ হাতে তুলির টান দিতে দিতে স্বপনকাকু বললেন ‘কতোটা বলেছি বলোতো?’

'জায়গাটা ছিলো জঙ্গল-জঙ্গল, পাশ দিয়ে বয়ে গেছে গঙ্গা। ওখানে তখন তোমরা কেউ থাকতে না আর......'

'মানে কোন মৃৎশিল্পী থাকত না, কেননা আমাদের জাত ব্যবসার আসল জায়গা হলো অন্য অন্য শহরে। আমরা যেমন নবদ্বীপের, কেউ আছেন কৃষ্ণনগরের। কিন্তু কোলকাতা আর তার আশপাশের কিছু জমিদারেরা আমার দাদুর দাদু, তাঁর দাদু,তাঁর দাদুকে ডাকতেন দুর্গাপ্রতিমা তৈরি করে দেবার জন্য। অন্য শিল্পীদেরও তাই। সব শিল্পীরা এসে জড়ো হতেন এই গঙ্গার ধারে। এখানে সুবিধেটা হচ্ছে জায়গা অনেক। আর মাটি, খড় সব আসতো নৌকো করে, ফলে নিতে সুবিধে, দামও একটু কম হতো।'

'তুমি যে বলেছিলে তখন অনেক কম পুজো হতো, কিন্তু কেন?'

'জমিদারেরা ছাড়া আর বড়ো একটা কেউ দুর্গাপুজো করতেন না, আর বারোয়ারি পুজোর কোন ধারণাই তখন ছিলো না।'

'কেন?'

'খরচ আছে না! আর চাঁদা তুলে যে সবাই মিলে পুজো করা যায়, এ কথাটা আমাদের দাদুর দাদুরা যখন মূর্তি তৈরি করতেন তখন কেউ তেমনভাবে ভেবে দেখেন নি। কিন্তু হয়, একসময় বারোয়ারি পুজোও শুরু হয়-'

এই সময় রান্নার ঠাকুর জগন্নাথ, ফুলকো লুচি আর তরকারি- মিষ্টির থালা দুটো দুজনের সামনে রেখে বলে, 'তোমাদের ডেকে ডেকে আর পারছি না। নাও, এখানে বসেই খেয়ে নাও তো । লাগলে বোলো।'

জগন্নাথ চলে যায়। দুজনে হাত ধুয়ে, থালা হাতে দুটো মোটা থামে হেলান দেন। স্বপন পাল বলতে থাকেন, 'বাড়ির ঠাকুর আর বারোয়ারি ঠাকুরের মূর্তির মধ্যে তফাৎ আছে। এখানে, তোদের বাড়িতে যেমন এক চালচিত্রে পাঁচজন দেবদেবী, সিংহ একটু রোগা পাতলা, দেখতে ড্রাগনের মতো, অসুরের গায়ের রঙ সবুজ- এই রকমই সব বাড়িতে ঠাকুর হয়। আর চালচিত্রতে কতগুলো পুতুলের ছবি হবে তা প্রত্যেক বাড়ির এক এক রকম নিয়ম থাকে, বাহান্নও হতে পারে আবার ছাব্বিশও হয়।'

'কিন্তু বারোয়ারি ঠাকুর তো এ রকম দেখতে হয় না, অন্য রকম হয়! '

'না, হয় না তো। জি. পাল বলে একজন শিল্পী ছিলেন। তিনিই প্রথম বলেন যে বারোয়ারি ঠাকুর আলাদা করা হবে বাড়ির ঠাকুরের থেকে। কুমোরটুলিতে যে পুজো হয়, সেখানে প্রথম সিংহ আর ড্রাগনের মতো থাকে না। একেবারে আসল সিংহের মতো দেখতে করা

হয়। অসুরের গায়ের রং, রোদে পোড়া মানুষের মতো হতে থাকল। এক চালচিত্র ছাড়াও আলাদা আলাদা চালচিত্রে পাঁচজন দেবতার মূর্তিও হতে থাকলো।'

খাওয়া প্রায় শেষের দিকে, এমন সময় দেখা গেল বন্ধুর দল ঢুকছে গেট ঠেলে। কোনরকমে খাবার মুখে গুঁজে, 'পরে শুনবো' বলে আগ্নিক লাফিয়ে পড়লো মাঠে, শুরু হয়ে গেলো বল পেটানো। ওদের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে স্বপন পাল উঠে পড়লেন। আবার শুরু হয়ে গেলো দেবীমূর্তি নিয়ে ব্যস্ততা।

দুদিন পরে শেষ হলো দেবীমূর্তির কাজ। এবার স্বপন পাল ফিরবেন কলকাতায়। সেখানে আরও মূর্তি তৈরি করা আছে, ফিরে গিয়ে সেগুলো একটু আধটু ঠিকঠাক করতে হবে, পুজো তো আর দিন দশেকের মতো বাকি।

গাড়ি তৈরি। বাড়ির বড়রা দুজন যাচ্ছেন স্বপন পালকে তুলে দিতে চক্রধরপুর স্টেশনে। আগ্নিক কাউকে কিছু না বলে আগেই চেপে বসেছে গাড়িতে।

'তুইও যাবি?' কে যেন বললেন।

'হ্যাঁ, আমি তুলতে যাব।'

সবাই হেসে উঠে পড়লেন গাড়িতে।

ট্রেনটা ছাড়ার মুহূর্তে, স্বপন পাল বললেন আগ্নিকের দিকে তাকিয়ে, 'যেমন বলেছি, মনে আছে তো?'

হাত নাড়তে নাড়তে আগ্নিক বলে,'হ্যাঁ, কলকাতায় গিয়েই আমি কুমোরটুলি যাব, তুমি আমাকে সব ঘুরিয়ে দেখাবে।'

ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে বেরিয়ে যায়। আগ্নিকরা ফিরে আসে গাড়ির দিকে।

****

একসময় পুজো কেটে যায়। খুব আনন্দ আর মজা করে আগ্নিকরা ফিরে আসে কলকাতায়। এর মধ্যে ফোন হয়েছে স্বপনকাকুর সঙ্গে। মাসখানেক পরে শনিবারের এক ছুটির দিনে ময়ূখদাদা, ওর আঁকার মাষ্টারমশাই-এর সঙ্গে আগ্নিক যায় কুমোরটুলি। স্বপনকাকু সেদিন ঘুরিয়ে দেখাবেন ওকে। পুরোনো নাম চিৎপুর, কিন্তু এখন রবীন্দ্র সরণী। ট্রামলাইন পেরিয়ে একটা ছোট্ট গলিতে ঢুকে যায় আগ্নিকরা। এটাই কুমোরটুলিতে ঢোকার প্রধান রাস্তা, যদিও আরও দু-একটা মুখ আছে, কিন্তু এটাই সবচেয়ে ব্যস্ত।

গলির দুপাশে ছোট ছোট চালা ঘর। বেশির ভাগই সরু লম্বাটে ধরণের। আর তারই মধ্যে অর্ধেক গড়া, একদম তৈরি নানান ঠাকুরের মূর্তি।

আগ্নিক কী একটা জিজ্ঞেস করবে বলে সবে মুখ খুলেছে, এমন সময়, 'কি রে তোরা এসে গেছিস?' বলে এগিয়ে এলেন স্বপনকাকু।

আগ্নিক এবার প্রশ্নটা করে ফেলে স্বপনকাকুকে, 'আচ্ছা কাকু, এখানে তো সব ঠাকুরই দেখছি, খালি তো দুর্গা নয় ?'

'হ্যাঁ, সবই তো দেখবি। এটাই তো কলকাতায় মূর্তি তৈরির একমাত্র জায়গা ছিলো। এখন এদিক ওদিক ছোট ছোট জায়গা দেখবি। আসলে লোক বেড়েছে, পুজো বেড়েছে। সবাই তো এদিকে আসতে পারে না, তাই আর কি। কিন্তু কুমোরটুলি, কুমোরটুলিই। চল তোদের ঘুরে দেখাই।'

আগ্নিকরা ঘুরছে, গলির মধ্যে গলি, তার মধ্যে গলি আর ওই রকম চালাঘর। তখন দুপুর। এখুনি কোন বড় পুজো নেই সামনে,কিন্তু প্রত্যেক ঘরেই শিল্পীরা মাটির মূর্তি গড়ে চলেছেন বা রং করছেন। সে সব রং গোলা আছে মাটির ভাঁড়ে কিংবা গেলাসে। কেউ তৈরি মূর্তিতে কাপড় অথবা গয়না পরাচ্ছেন।

‘আচ্ছা কাকু, এই মূর্তিগুলো কি- মানে সবই তো ঠাকুর লাগছে না, এমনি পুতুলও মনে হচ্ছে- আর ঠাকুরই বা কেন, মানে পুজো তো নেই-’

স্বপন পাল বললেন, ‘কাজ এখানে সারা বছরই হয়, অনেক ধরণের, অনেক কারণে এখানে মূর্তি হয়। বাড়িতে নানান পুজো হয়, কেউ বাড়িতে রাখার জন্য অর্ডার দেন। আর পুতুল যা দেখছিস, সে সব, ছোট-বড় মন্দিরে সাজানোর জন্যেও বা বাড়িতে রাখার জন্যেও নেন।’

‘তাই জন্যে, ওই - ওই- ’ বলে আঙুল দিয়ে পেরিয়ে আসা একটা ঘরের দিকে দেখিয়ে আগ্নিক বলে ওঠে, ‘ওখানে দেখলাম পুঁচকে দুর্গাঠাকুর, এক চালচিত্তিরে, তুমি যেমন আমাদের বাড়ি করেছিলে।’

ময়ূখদাদা ওদের সঙ্গেই ঘুরছে, কিন্তু একটু দলছাড়া। ও তুলে চলেছে ছবির পর ছবি। আগ্নিক একসময় বলে ওঠে,‘আমিও তুলবো-’

দু একটা তোলার পর ক্যামেরা আবার চলে যায় ময়ূখের হাতে কেননা আগ্নিকের মনে পড়ে গেছে কথাটা। ও এগিয়ে যায় স্বপনকাকুর পাশে, ‘তোমাকে জিজ্ঞেস করবো বলে ভেবে রেখেছিলাম, ডাকের সাজ বলে কেন?’

‘ভালো বলেছিস তো! এটা অনেকেই জানেন না। ‘ডাক’ মানে পোস্ট অফিসের মাধ্যমে জেলাগুলো থেকে দুর্গা ঠাকুরের সাজ আসতো, মানে যাকে পার্সেল বলি আমরা, আর সেই থেকে ঠাকুরের এক বিশেষ সাজের নাম হয়ে গেছে ডাকের সাজ।’

ওরা ঘুরতে থাকে- বেলা বাড়ে, ছোট্ট ঘরগুলোর মধ্যে, একপাশে কোথাও কুটনো কোটা, কোথাও বাটনা বাটা শুরু হয়, কোথাও বা চড়ে রান্না।

স্বপনকাকু নিজের মনে বলতে থাকেন, ‘হারিয়ে যাচ্ছে একটা শিল্প শুধু একটু ভালোবাসা আর দেখার অভাবে।’

'মানে এই জেনারেশান আর সর-' ময়ূখকে শেষ করতে না দিয়ে স্বপন পাল বলে ওঠেন, 'আমাদের ছেলেদের বুঝিয়ে পারা যায় না কত বড় এই শিল্প! আসলে কাদা, মাটি খড়কুটো নিয়ে তো কাজ, মানে যাকে বলে গ্ল্যামার নেই, তা আজকালকার ছেলেদের ভালো লাগার কথা নয়। ওদের দোষই বা কোথায়, ওরা তো দেখছে আমাদেরই অনেকে তো শহরের নানা দিকে স্টুডিও করেছেন। তবে তা হাতে গোনা। আমরা যাই কোথায়,' কেমন যেন ভেঙে যায় ওনার গলার স্বর।

ময়ূখ বলে, 'কুমোরটুলির নাম তো দেশের বাইরেরও লোকে জানে- মানে আমি বলছিলাম, তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সরকারী চেষ্টা থাকা উচিত।'

'জানে মানে ! আমেরিকা, ইউরোপের নানা শহরে ঠাকুর যায় এখান থেকে।'

'কীভাবে নিয়ে যায়? প্লেনেই তো?'

'হ্যাঁ, আগে তো মাটিরই ছিলো, এখন ফাইবার গ্লাসেরও হয়েছে। কেসের মধ্যে থাকে।'

'ফাইবার গ্লাস কেন?'

'খরচ তো প্রচুর, সবাই প্রত্যেক বছর নতুন মূর্তি নিয়ে যেতে পারে না, আগেরটাই রেখে দেয়, তাই। এই দেখো না প্লেনে বুকিংই তো হাজার পঞ্চাশেকের ওপর, তারপর নেওয়ার অন্য খরচও তো আছে- এরপর ঠাকুর, ঠাকুরের সাজ- আরও নানান খুঁটিনাটি।'

'তোমরা সরকারি কোন সাহায্য--'

'বাদ দাও, বাদ দাও- আমরা বলেছি, ওরা শুনেছে- কথায় কথা বেড়েছে, মেলাই কথা- বাদ দাও, বাদ দাও,' স্বপন পাল এগিয়ে যান।

কথাগুলো ঠিক বোঝে না আগ্নিক , তাই ওঁদের কথায় মন না দিয়ে নিজের মনে ঘুরতে থাকে কুমোরটুলির অলিতে গলিতে ।

ছবি ও ফটোগ্রাফঃ দেবজ্যোতি

ভিনদেশের ভারতীয় রানি

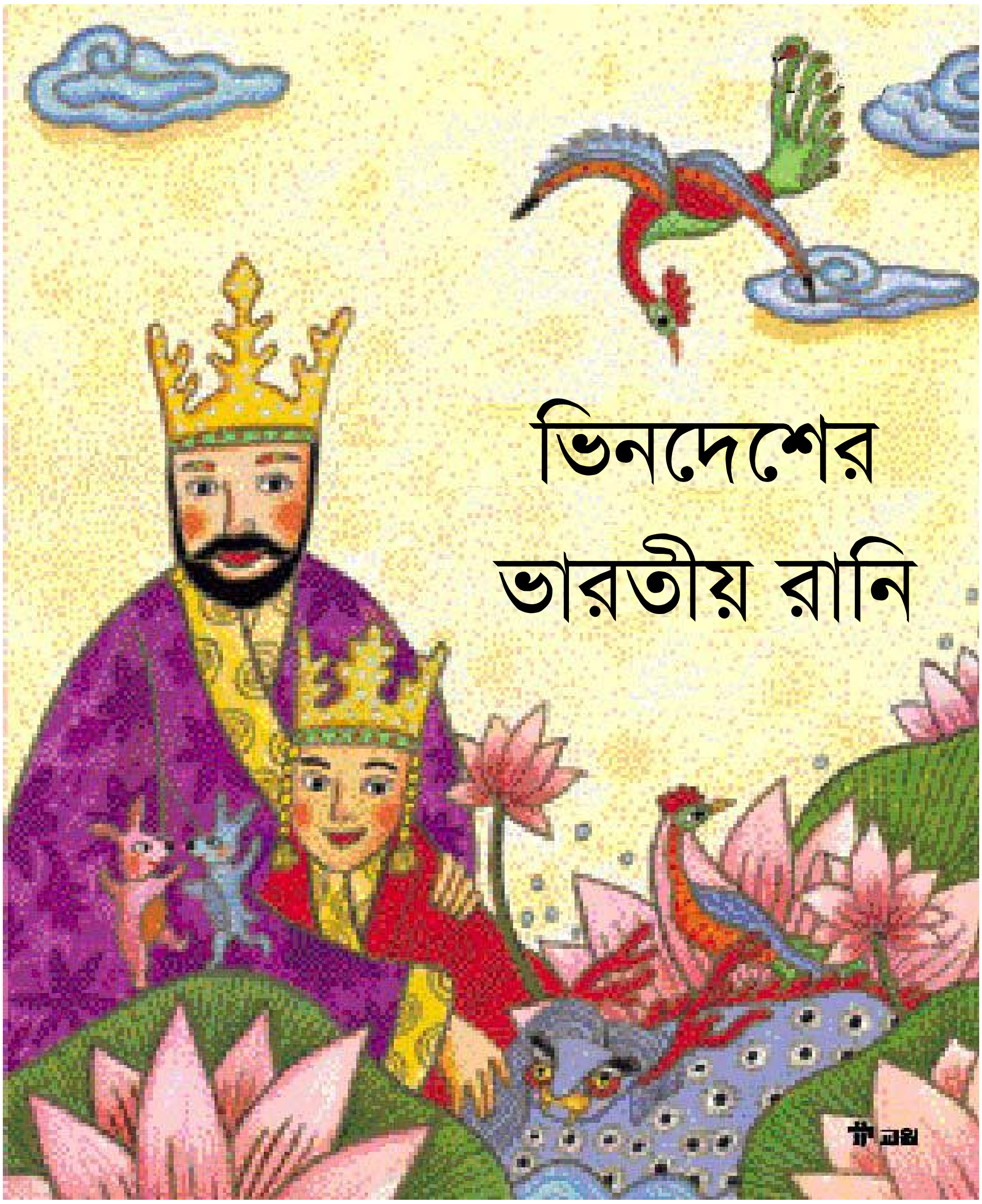

রাকা দাশগুপ্ত

সে অনেককাল আগের কথা। মস্ত এক রাজ্য, ধনদৌলত উপচে পড়ছে। ঘরে ঘরে সুখ সমৃদ্ধি। শুধু রাজামশাই- এর মনে সুখ নেই। রানিমার ঘুম নেই। কারণ ভারি আদরের এক মেয়ে আছে তাঁদের, রূপে গুণে অনন্যা। কিন্তু তার যোগ্য পাত্র যে সারাদেশে চোখে পড়ে না কোথাও। কি হবে তাহলে? রাজকন্যার কি বিয়েই হবে না? নাকি ভিনদেশে দূত পাঠাতে হবে, পাত্র খোঁজার জন্য?

তারপর একদিন তাঁদের স্বপ্নে দেখা দিলেন এক দেবতা। তিনি বললেন –সমুদ্রপারের দূর দেশে সুরো নামে এক রাজা আছেন, এখনও তাঁর বিয়ে হয়নি। তিনি খুব ধার্মিক আর সৎ। তোমাদের মেয়ের উপযুক্ত পাত্র তিনিই। তোমরা অবিলম্বে রাজকন্যাকে ওখানে পাঠিয়ে দাও।

রাজা রানি পরের দিন মেয়েকে ডেকে বললেন স্বপ্নের কথা। তারপর অগাধ সোনারূপো সঙ্গে দিয়ে, কয়েকজন সঙ্গীসাথী দাসদাসী সঙ্গে দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে রওনা করে দিলেন মেয়েকে। রাজকন্যার নৌকো ভেসে চলল মাঝদরিয়ায়।

কাহিনির এই আরম্ভটুকু যেকোনো রূপকথার গল্পের মতই। এমন কত রাজারানি রাজপুত্র রাজকন্যার গল্প আমরা পড়েছি ছোটবেলায়। এ গল্পটাও তেমনই। শুধু, এটা কিন্তু নিছক গল্প নয়। রূপকথা আর কিংবদন্তী মেশানো জলজ্যান্ত ইতিহাস।

যে দেশে রাজকন্যা এসে পৌঁছেছিলেন শেষ পর্যন্ত, সেটা বর্তমান কোরিয়া। আর যেই রাজ্য থেকে এসেছিলেন? সেটা আমাদের ভারতবর্ষ। অযোধ্যা। কিংবদন্তী অনুযায়ী, তিনি সত্যি সত্যি সাতসমুদ্র তেরোনদী পেরিয়ে এসে নেমেছিলেন কোরিয়ার উপকূলে, আর তাঁকে সাদরে নিয়ে গিয়ে রানি করেছিলেন সেদেশের রাজা।

কাজের সূত্রে গত এক বছর ধরে কোরিয়ায় আছি। তাই প্রথম যখন কোরিয়ার এই ভারতীয় রানির গল্প শুনলাম, ভারি চমৎকার লাগল। একটু খোঁজ নিয়ে যা জানলাম, রাজা সুরো আর তাঁর রানি, দুজনেই কিন্তু রীতিমত ঐতিহাসিক চরিত্র। বর্তমান দক্ষিণ কোরিয়ার বুসান নগরের কাছে গিমহে বলে একটা ছোট শহরে তাঁদের দুজনেরই সমাধি আছে। ঠিক করলাম, কখনও একবার গিয়ে সেই সমাধি দুটো দেখে আসতে হবে। কিন্তু মনে হল, তার আগে একটু পড়াশোনাও তো করে নিলে হয় কোরিয়ার এই ভারতীয় রানিমাকে নিয়ে।
বইপত্র আর ইন্টারনেট ঘেঁটে জানলাম, রাজা সুরো ছিলেন কোরিয়ায় গেউমগোয়ান গায়া নামে এক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। মোটামুটিভাবে প্রথম শতাব্দীতে(পরবর্তীকালে লিখিত রেকর্ড অনুযায়ী, ৪২ খ্রীষ্টাব্দ) তাঁর জন্ম। কিন্তু এই রাজা আর তাঁর ভারতীয় রানির গল্প লিপিবদ্ধ হয়েছে অনেককাল পরে। ত্রয়োদশ শতকে ইরিয়োন নামে এক কোরিয়ার এক বৌদ্ধ শ্রমণ প্রাচীন কোরিয়ার রাজ্যগুলোর ইতিহাস, কিংবদন্তী, উপকথা সব কিছু একসঙ্গে সংকলিত করার চেষ্টা করেন ‘সামগুক য়ুসা’ নামের একটা বইতে। তার মধ্যেই আছে রাজা সুরো আর রানি হিয়ো- হোয়াং- ওক- এর কথা।

কিন্তু হিয়ো- হোয়াং- ওক কি আসল নাম? সামগুক য়ুসাতে বলা আছে, রানির ভারতীয় নাম ছিল সুরিতানা। সন্দেহ হয়, সেটা নির্ঘাৎ সুরত্না নামটার অপভ্রংশ। এদিকে কোরিয়াতে হোয়াং- ওক মানেও কিন্তু হলুদ জেড পাথর, যেটা খুব দামী রত্ন। কাজেই হোয়াং ওক আদতে সুরত্না ছিলেন, এমনটা হতেই পারে।

রাজা সুরোকে নিয়েও বিস্তর কিংবদন্তী। আসলে সেকালে যেকোনো শক্তিশালী রাজা, বা কোনও সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতাকে নিয়েই সাধারণ মানুষ ভয়ে- ভক্তিতে- ভালবাসায় নানা গল্প বানিয়ে ফেলত। তারপর ইতিহাস আস্তে আস্তে হারিয়ে যেত, বেঁচে থাকত ওই মিথগুলোই। আমাদের দেশেও তো এমন কত গল্প আছে... রাজা বিক্রমাদিত্য আর বেতালের কাহিনীর মত!

ত্রয়োদশ শতকের ওই বইটাতে রাজা সুরোর গল্পটাও সবিস্তারে আছে। তখন দেশে অরাজক অবস্থা, সুশাসনের খুব প্রয়োজন। এমন সময়ে হঠাৎ একদিন গ্রামবাসীরা শুনতে পেল, আকাশ থেকে একটা অদ্ভুত শব্দ আসছে। তাকিয়ে দেখে, আকাশটা ফাঁক হয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে, আর সেখান থেকে নেমে আসছে একটা বেগুনি দড়ি, তার সঙ্গে একটা সোনার বাটি বাঁধা। বাটিটা যখন মাটিতে নেমে এল, দেখা গেল তাতে রয়েছে ছ খানা সোনালি ডিম। সেই ডিম ফুটে তারপর ভারি সুদর্শন ছজন রাজকুমার বেরিয়ে এলেন। তাদের মধ্যে একজনকে ‘সুরো’ নাম দিয়ে রাজসিংহাসনে বসানো হল। বাকিরাও আশেপাশের অন্য জাতিগোষ্ঠীদের নেতা হয়ে দিন কাটাতে লাগলেন।

রাজা সুরো ভারি দয়ালু, মহৎ। যত্নের সঙ্গে প্রজাপালন করেন। কিন্তু রাজ্যে শুধু রাজা থাকলে তো চলে না, রানিও চাই। রাজার সভাসদরা তাঁকে বলল ‘আমরা দেশের সবচেয়ে রূপবতী গুণবতী মেয়েদের নিয়ে আসি এখানে, আপনি তারপর বেছে নিন কাকে আপনার পছন্দ’। কিন্তু রাজা তাতে রাজি হলেন না, বললেন দেখো, আমাকে যেমন স্বর্গের দেবতারা এখানে পাঠিয়েছেন, তেমনি আমার রানিকেও তাঁরাই পাঠিয়ে দেবেন। তোমরা বরং এক কাজ কর। দক্ষিণে যে পাহাড়ি দ্বীপ আছে, সেখানে গিয়ে অপেক্ষা কর। দেখো কী হয়।’

রাজার অনুচররা সেখানে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল তাঁর নির্দেশমত। হঠাৎ একদিন দেখা গেল, দিগন্তে একটা জাহাজ দেখা যাচ্ছে। তার লালরঙের পাল, একটা লাল পতাকাও পতপত করে উড়ছে। জাহাজ যখন আরও সামনে এল, দেখা গেল, তার ওপরে রয়েছেন এক পরমাসুন্দরী রাজকন্যা।

জাহাজ নোঙর করল, রাজকন্যা পা রাখলেন কোরিয়ার মাটিতে। কী করে পাড়ি দিয়েছিলেন এত বিশাল সমুদ্র? ভারত আর কোরিয়া - সে যুগের পক্ষে এ তো প্রায় অলঙ্ঘ্য দূরত্ব! উপকথা অবশ্য বলছে, রাজকন্যার সঙ্গে ছিল একটা মায়া পাথর, যা দিয়ে সমুদ্রকে শান্ত রাখা যেত, ঝড়কে ঠেকিয়ে রাখা যেত। আর খাবার হিসেবে ছিল ফলমূল, খেজুর আর পিচ। তাতেই নাকি দিব্যি কুলিয়ে গেছিল রাজকন্যা আর তাঁর সঙ্গীদের।

রাজা তাঁর ভৃত্যদের পাঠালেন, ‘যাও, ওঁকে সঙ্গে করে রাজবাড়িতে নিয়ে এসো।’

বেঁকে বসলেন রাজকন্যা। রাজার লোকলশকরদের বললেন, ‘তোমরা আমার অপরিচিত। তোমাদের সঙ্গে আমি কেন যাব, বলো! তাছাড়া, কোনও উৎসব নেই, আয়োজন নেই, এই অবস্থায় কি আমি অনাহূতর মত প্রাসাদে যেতে পারি? ও আমায় মানায় না।’

রাজা সুরো যখন শুনলেন সে কথা, রাজকন্যার আত্মমর্যাদাজ্ঞান দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। বুঝলেন, এই মেয়েই তাঁর উপযুক্ত মহিষী। প্রাসাদের বাইরে একটা মস্ত অস্থায়ী ছাউনি বানানো হল তাঁর নির্দেশে, সেখানে তিনি সাড়ম্বরে বরণ করে নিলেন তাঁর ভাবী বধূকে। রাজকন্যার সঙ্গে যারা এসেছিল, তাদেরও সমাদর করে নিয়ে যাওয়া হল রাজপুরীতে।

রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার পর রাজকন্যা আত্মপরিচয় দিলেন। রাজাকে বললেন তাঁর বাবা মায়ের স্বপ্নের কথা, এও বললেন যে তিনি ‘আয়ুত্যা’ রাজ্যের রাজকন্যা (গল্পটার অন্য একটা ভার্শনও পেয়েছি, যেখানে রাজকন্যার বাবা মা নন, রাজকুমারী নিজেই স্বপ্ন দেখেছিলেন এমন, আর তারপর বাবা মায়ের অনুমতি নিয়ে সাগর পাড়ি দিয়েছিলেন।)। দেখা

গেল রাজা সুরো আর রাজকন্যা সুরত্না দুজনেই দুজনের রূপেগুণে মুগ্ধ। বিয়ের উৎসব শুরু হতে দেরি হল না আর।

৩

কিন্তু 'আয়ুত্যা'ই কি অযোধ্যা? দীর্ঘদিন কোরিয়াবাসীদের জানা ছিল না, কোথায় এই আয়ুত্যা। শুধু এটুকুই তাঁরা জানতেন যে তাঁদের এক রানি এসেছিলেন ভারতবর্ষ থেকে। অনেককাল পরে যখন অযোধ্যা নামটার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ঘটে, তাঁরা আয়ুত্যার সঙ্গে অযোধ্যাকে মিলিয়ে নেন। সত্যিই কি অযোধ্যা থেকে এসেছিলেন এই মেয়েটি? পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা কেউ কেউ দ্বিমত পোষণ করেন। তাঁদের মত, প্রথমত অযোধ্যা সমুদ্র তীরবর্তী শহর নয়। তাই ওখান থেকে জলপথে পাড়ি দেওয়া অত সোজা নয়। তাছাড়া, থাইল্যান্ডেও তো আয়ুথ্যায়া নামে একটা শহর আছে। সেটা যদি আয়ুত্যা হয়, ব্যাপারটা আরেকটু সহজ হয়, কারণ থাইল্যান্ড থেকে কোরিয়ার দূরত্ব তো তুলনায় কম।

আয়ুত্যা=অযোধ্যা, এই তত্ত্বে বিশ্বাসীরাই এখনও দলে ভারি। কারণ সেই ত্রয়োদশ শতকের বইটিতেও স্পষ্টই বলা ছিল যে রাজকন্যা ছিলেন ভারতীয়। আর তার চেয়েও বড় কথা, থাইল্যান্ডের আয়ুথ্যায়া নগরটা তৈরিই হয়েছিল ত্রয়োদশ শতকে। আর রাজা সুরো আর তাঁর রানি ছিলেন প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের কিছু অংশ জুড়ে। অর্থাৎ, রানির আয়ুত্যা নিঃসন্দেহে আয়ুথ্যায়ার চেয়ে অনেক প্রাচীন।

৪

দক্ষিণ কোরিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহরের নাম বুসান। সেখানে একটা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরও আছে, কিন্তু সেটা মূল শহর ছাড়িয়ে অনেকটা দূরে, শহরতলিতে। আরেকটা আলাদা শহরও বলা যায় জায়গাটাকে। নাম গিমহে। সেখান থেকে মেট্রোরেলে করে বারো-তেরোটা স্টপেজ। স্টেশনের নামই 'রাজা সুরোর সমাধি'।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে বোঝা গেল, জায়গাটা খুব নির্জন, একটা ছোট্ট মফস্বল শহর যেমন হয়। দূরে পাহাড়, সামনে পরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট, একটু পর পর তীরচিহ্ন দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া আছে রাজসমাধি কোন দিকে। একদিন একটা পড়ন্ত বিকেলবেলায় সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম। আশেপাশে ভিড় নেই, বোঝা গেল টুরিস্ট খুব বেশি আসে না এখানে।

রাজা সুরোর সমাধির দরজায় পাথরের প্যাগোডা আর জোড়া মাছের প্রতীক

রাজা সুরোর সমাধি বেশ বড় একটা চত্বর জুড়ে। কাঠের মস্ত গেট, তাতে চীন দেশীয় ‘ইন’ ও ‘ইয়াং’ চিহ্ন আঁকা, যেটা কোরিয়ার সংস্কৃতিতে, মায় কোরিয়ার জাতীয় পতাকাতেও জায়গা করে নিয়েছে। গেটের বাইরে একটা টুরিস্ট ইনফর্মেশন সেন্টার। সেখানে ঢুকতেই হাসিখুশি এক দিদিমনি কিছু কাগজপত্র লিফলেট দিয়ে দিলেন। কিন্তু শুধু তো রাজার সমাধি দেখতে আসিনি। রানির সমাধি কই? তাঁকে বলতে ম্যাপ খুলে তিনিই দেখালেন, আরও মিনিট পনেরো কুড়ির দূরত্বে আছে সুরো রাজার রানির সমাধি । আরও কিছু তথ্য জেনে নিয়ে তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে রাজামশাই- এর সমাধিতে ঢুকলাম।

প্রাচীন কোরিয়াতে রাজাদের সমাধি দেওয়া হত কৃত্রিমভাবে মাটি আর পাথর দিয়ে তৈরি উঁচু গোলাকৃতি টিলার মত জায়গায়। যেন ছোট্ট পিরামিড, শুধু মাথাটা গোল। তেমনই এক সমাধির তলায় শুয়ে আছেন রাজা সুরো। চারপাশ রেলিং দিয়ে ঘেরা। সামনে দাঁড়িয়ে আছে উঁচু সব প্রস্তরমূর্তি, তারা রাজাকে পাহারা দিচ্ছে। বেশ কিছু শিলালিপি ছড়িয়ে আছে এদিকে সেদিকে।

সেখান থেকে বেরিয়ে রওনা হলাম রানির সমাধি খুঁজতে। ম্যাপ দেখে দেখে কিছুদূর এগোচ্ছিলাম, তারপর বেশ কিছুটা হাঁটার পর দেখলাম আর বুঝতে পারছি না কোনদিকে যেতে হবে। ওদিকে সন্ধে হবার মুখে, রাস্তাঘাট আস্তে আস্তে আরও নির্জন হচ্ছে। বেশ কিছুক্ষণ পর একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেল। চালককে ম্যাপ খুলে রানির সমাধির ছবিটা দেখাতেই তিনি মহানন্দে যেতে রাজি হয়ে গেলেন। তারপর যেখানে গিয়ে নামাচ্ছেন, দেখি এ বাবা, এ তো রাজার সমাধিতেই নিয়ে এসেছেন আবার। আসলে সমাধিদুটো দেখতে তো একই রকম, তাই বুঝতে পারেননি যে অন্যটায় যেতে চাইছি। আর এখানে টুরিস্ট আসেই খুব কম, যারা আসে, রাজা সুরোর সমাধি দেখেই ফিরে যায়, রানির সমাধি অবধি আর যায় না বোধহয় বিশেষ কেউ। ইনিও তাই ভেবেছেন রাজার সমাধিটাই খুঁজছি।

এবার ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখে আবার টুরিস্ট ইনফরমেশন কাউন্টারের মেয়েটির শরণাপন্ন হতে হল। তিনি বেরিয়ে এসে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বুঝিয়ে দিলেন, কোন দিকে যেতে হবে রানির সমাধিতে যেতে হলে। এবার আর ভুল হল না, ঠিকঠাক পৌঁছে দিলেন।

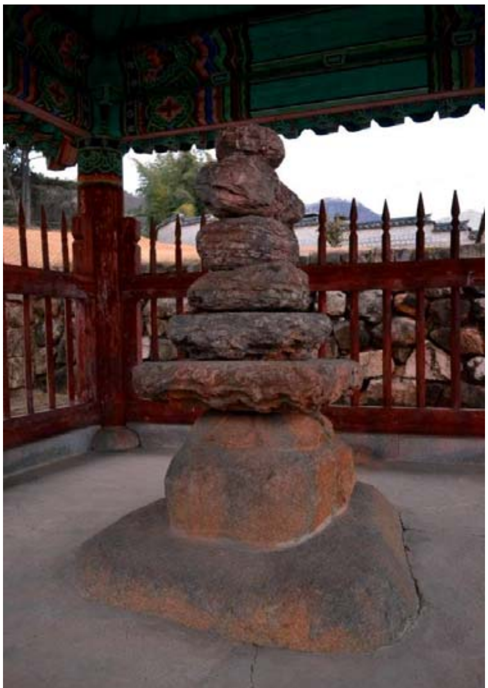

দেখলাম, জায়গাটা একেবারেই জনমানবশূন্য। গেটের বাইরে একটা বড় সাইনবোর্ডে রানি হিও-হোয়াং- ওকের সংক্ষিপ্ত জীবনী। সেখানেও বলা আছে রানির জীবন নিয়ে কিংবদন্তীর কথা, তাঁর ভারত থেকে আসার গল্প। তারপর নকশা করা কাঠের গেট দিয়ে ঢুকে টানটান সোজা রাস্তা। রাস্তা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে কয়েকটা সিঁড়ির ধাপ, তারপরেই রানির সমাধি। শান্ত, নিরাভরণ। রাজার সমাধি ঘিরে যেমন বেশ কিছু পাথরের মূর্তি ছিল, এখানে তেমন কিছু নেই।

কিন্তু একদম কিছু নেই, তাও নয়। সমাধির কাছেই একটা রঙচঙে কাঠের প্যাগোডা। তার ভেতরে আরেকটা ছোট প্যাগোডা, প্রাচীন বৌদ্ধ স্তূপের মত আদল, কয়েকটা পাথর দিয়ে তৈরি। নাম ‘পাসা প্যাগোডা’। বলা হয় এই পাথরই নাকি রাজকন্যা নিয়ে এসেছিলেন সমুদ্রযাত্রার সময়ে। আজও নাকি

পাথরগুলোর ম্যাজিক ফুরিয়ে যায়নি, এখনও উত্তাল সমুদ্রকে নিমেষে শান্ত করে দিতে পারে তারা। মজা হল, সত্যি সত্যিই নাকি ভূতাত্ত্বিকরা পরীক্ষা করে দেখেছেন , এটা বেশ অন্যজাতের পাথর, কোরিয়াতে এই পাথর পাওয়া যায় না!

উল্লেখ করার মত আরেকটা ব্যাপার বলে রাখি, এর আগে রাজার সমাধিতে যে গিয়েছিলাম, সেখানেও কাঠের দরজার ওপরে পাথরের তৈরি এই বিশেষ প্যাগোডাটি আঁকা আছে । রানির নিয়ে আসা পাথরের ছবি । তার দুপাশে দুটো মাছ আঁকা। এই মাছ নিয়েও নাকি অনেক গবেষণা হয়েছে। শেষে জানা গেছে, অযোধ্যায় একসময়ে রাজত্ব করেছেন, মিশ্র- উপাধিধারী এমন এক প্রাচীন রাজবংশের সত্যিই প্রতীক ছিল এই জোড়া মাছ।

ততক্ষণে সন্ধে নেমে গেছে। সমাধিক্ষেত্রের মধ্যেও আলো জ্বলে উঠেছে। এবার ফেরা দরকার।

গেট দিয়ে বেরিয়ে যাবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত বার বার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছিলাম রানির সমাধিকে। আমার দেশেরই একটি মেয়ে... দুহাজার বছর আগে সত্যি এসেছিলেন এতদূরে, সমুদ্র উজিয়ে? আর এখানেই তিনি ঘুমিয়ে আছেন আজ?

৫

রাজকন্যা সুরত্না বা রানি হিও হোয়াং- ওকের বাকি জীবন কেমন কেটেছিল? রূপকথায় যেমন হয়, তেমনি সুখে শান্তিতে?

খানিকটা তেমনই। রাজা রানি দুজনেই পরস্পরকে ভারি ভালবাসতেন, আর প্রজারাও ভালবাসত তাঁদের। দশজন ছেলেমেয়ে হয় তাঁদের, তাদের মধ্যে আটজন নেন বাবার উপাধি ‘কিম’, আর দুজন মায়ের নামে ‘হিও’ বা ‘হো’। এই কিম রা এখনও কোরিয়ার জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ, আর হো দের সংখ্যাও ফেলনা নয়। সেইভাবে মোট হিসেব করলে দেখা যায় বর্তমানে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া মিলিয়ে ষাট লাখেরও বেশি মানুষ এই রাজারানির বংশধর।

সুখে স্বাচ্ছন্দে সারাজীবন রাজত্ব করার পর রানি মারা যান। উপকথা অনুযায়ী, তখন নাকি তাঁর বয়েস ছিল একশ সাতান্ন বছর! রাজা সুরো সাংঘাতিক ভেঙে পড়েন, প্রজাদেরও

খুব মন খারাপ। ঘটা করে তাঁকে সমাধি দেওয়া হল। তাছাড়া যেখানে রানি সমুদ্রতীরে প্রথম পা রেখেছিলেন, যেখানে রাজার সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল, সেই সব জায়গাগুলোকে আলাদা আলাদা নাম দিয়ে স্মরণীয় করে রাখল দেশের মানুষজন। রাজা সুরো আরও বছর দশেক বেঁচেছিলেন তারপর।

৬

ইন্টারনেটে বিবিসি নিউজ-এর একটা পুরনো পৃষ্ঠা থেকে জানতে পারলাম, কয়েকবছর আগে কোরিয়া থেকে আসা এক প্রতিনিধিদল অযোধ্যায় এসে সরযূ নদীর ধারে তাঁদের পূর্বনারী এই রানির স্মৃতিতে একটা স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করে গেছেন। রানিমার জন্মস্থান হিসেবে অযোধ্যা তাঁদের কাছে খুবই আদরের। রানির সমাধি যেখানে আছে, সেই গিমহে শহরের 'সিস্টার সিটি'র মর্যাদাও দেওয়া হয়েছে অযোধ্যাকে ।

এই ভারতীয় রানিকে নিয়ে কোরিয়ানদের আগ্রহ আর গবেষণা এখনও চলছে পুরোদমে। কিম বিউং মো নামে এক কোরিয়ান প্রত্নতত্ত্ববিদ এই নিয়ে অনেক কাজ করেছেন। এমন কথাও উঠে এসেছে যে রানি নাকি সরাসরি ভারত থেকে আসেননি, কুষাণ আক্রমণে তাঁর পরিবার ক্ষমতাচ্যুত হয়ে চীনদেশে পালিয়ে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে তিনি আসেন কোরিয়াতে। আবার কোরিয়ায় বৌদ্ধধর্ম প্রথম এই রানির হাত ধরেই এসেছিল, এমন দাবিও করেছেন কেউ কেউ।

আসলে তখনকার দিনে তো কোনও কিছুরই তেমন লিখিত প্রমাণ থাকত না। পরে ইতিহাস আর উপকথা এমন ভাবে মিলেমিশে গেছে যে একটা থেকে আরেকটা আলাদা করা খুব শক্ত।

তবে অযোধ্যা থেকেই যে তাঁদের এই প্রাচীন রানি এসেছিলেন, একথা কোরিয়ানরা ভাবতে ভালোবাসেন। এ ব্যাপারে অন্তত উত্তর আর দক্ষিণ কোরিয়ার দ্বিমত নেই। মুশকিল হল, ভারতের ইতিহাসে এই রাজকন্যার কোনই উল্লেখ নেই। তবে সেটাও হয়তো স্বাভাবিক... যে দেশ থেকে এসেছেন, তার চাইতে যে দেশে তিনি রাজত্ব করেছেন সেই দেশই তো তাঁকে বেশি মনে রাখবে! বছর দশেক আগে একটা খবর প্রকাশিত হয়- - গিমহে অঞ্চলে প্রাচীন কোরিয়ান সমাধি থেকে পাওয়া কিছু ডি এন এ স্যাম্পেলে নাকি ভারতীয় জিনগত মিল পাওয়া গেছে। কাজেই কোরিয়াতে একজন প্রাচীন ভারতীয় রানির অস্তিত্ব হয়তো খুব আকাশকুসুম কল্পনা নয়।

ইতিহাসের পাতায় কি আর শুধুই নীরস সাল- তারিখের হিসেব থাকে? মণিমুক্তোর মত এক এক টুকরো রূপকথাও থাকে যে!

ফটোগ্রাফ - সায়ন কুমার দে

তথ্যঋণ –

১) টুরিস্ট ইনফর্মেশন সেন্টার, রয়্যাল টুম অফ কিং সুরো, গিমহে, সাউথ কোরিয়া

২) চুং সুন কিম, 'ভয়েসেস অফ ফরেন ব্রাইডস – রুটস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ মাল্টিকালচারিসম ইন কোরিয়া', আলতামিরা প্রেস, ইউনাইটেড কিংডম

৩) হোয়াং পাএ- গাং, কোরিয়ান মিথস অ্যান্ড ফোক লেজেন্ডস (হান- ইয়ং- হি দ্বারা ইংরেজিতে অনুদিত) জৈন পাবলিশিং কম্পানি, ক্যালিফর্নিয়া, ইউ এস এ

৪)উইকিপিডিয়া

৫) ইন্টারনেটে প্রাপ্ত অন্যান্য নিবন্ধ ও সংবাদপত্র

ও

অচিন্ত্য সুরাল

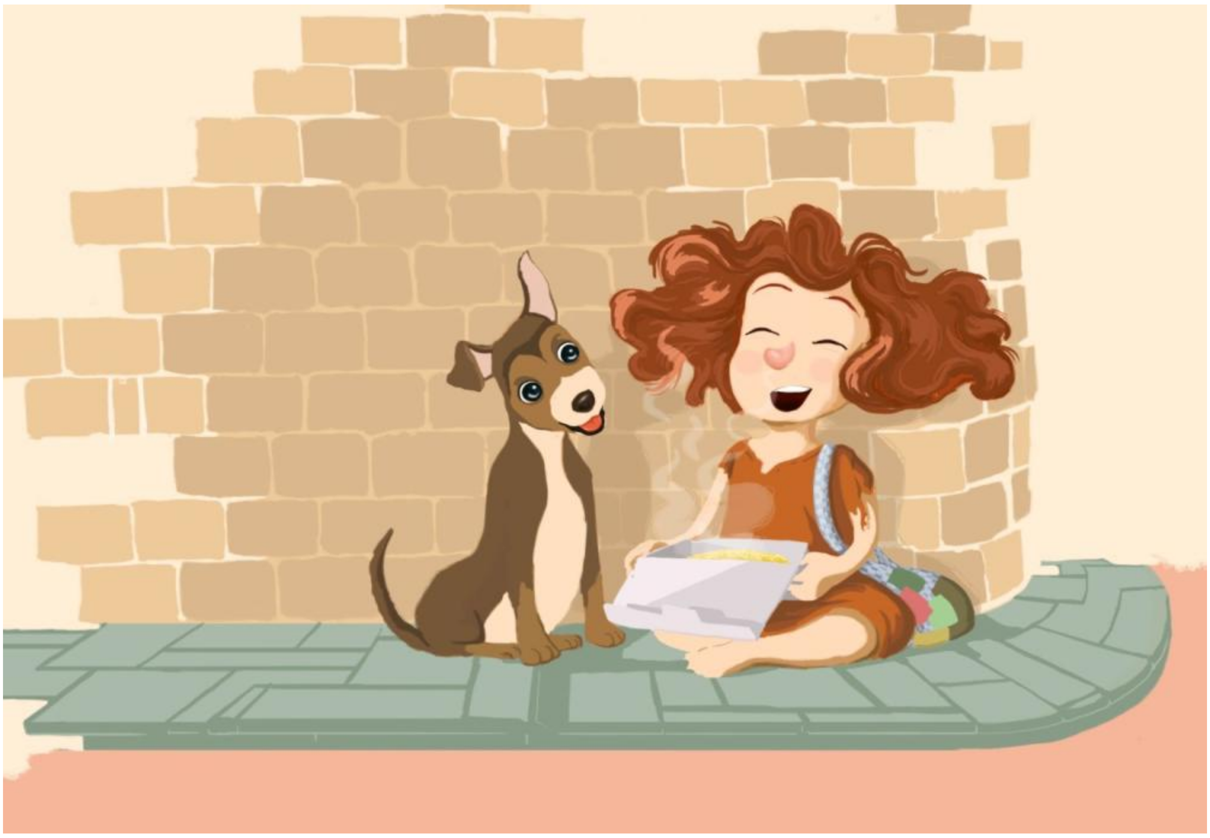

এই নিয়ে তিনবার হল। দুবারের বেলায় তো আর একটু হলেই শেষ হয়ে গিয়েছিল আর কি। সবে পিছনের পায়ে ভর দিয়ে লাফ দিয়েছে কি দেয়নি, একটা খালি ট্রাক এমন পাগলার মত এসে পড়ল যে সে যদি ঠিক সময়ে উল্টোদিকে পাঁই করে ঘুরতে না পারত তাহলেই হয়ে যেত দফারফা। যেমনটা তার সেই ভাইটা, যাকে সবাই কেলো বলে ডাকত, তার হয়েছিল। বেচারা মুখ দিয়ে একটু আওয়াজ করার সময়ও পায়নি। আর কেলোর কথা না হয় ছেড়ে দেওয়া গেল, তার নিজেরও তো সেই যে গেল বছর বিষ্টির সময় কি কান্ডটাই না হয়েছিল। একটা ট্রেকার না কী যেন বলে, তাতে বাইরে অনেক লোক ঝুলছিল, তাদেরই একজনের হাঁটুটা এসে তার মাথায় এমন ঠোকা দিল যে সাত- আটদিন মাথার ঝনঝনানি যায়নি । আর ডানচোখটা ফুলে যা পিঁচুটি গড়াচ্ছিল- অনেকদিন ভাল করে দেখতেই পেত না। তারপর থেকে ও খুব সাবধান হয়ে গেছে । ভাল করে দুটো দিক দেখে বুঝে তারপর সট করে ওপারে। অবশ্য দরকার পড়লে তবেই ওপারে যায়। নইলে ওপারে আর কী কাজ! থাকে তো এপারেই।

সবদিন না হলেও প্রায়দিনই এটা- সেটা জুটেও যায়। রবিবার হলে তো কথাই নেই। এদিকটায় যে ক"টা বাড়ি আছে তারা বড়োলোক নয়। খাবার ফেলে না। তবে ঝড়তিপড়তি কিছু ফেলতেই হয়। একটা বাড়ি অবশ্য আছে, সে বাড়ির মেয়েটা দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পরে চুক চুক করে ডাক দেয়। খেয়াল করে দেখেছে ফি রবিবার সে একটা আস্ত মাংসের টুকরো তার জন্য নিয়ে আসবেই। কিন্তু ও বাড়িতে যেতে তার ভয় করে। একটা গাঁট্টাগোঁট্টা ছেলে-

ওই মেয়েটার ভাই-ই বোধহয়, তাকে দেখলেই একটা লাঠি নিয়ে এমন তাড়া করে যে একেকদিন পাঁইপাঁই করে পালিয়ে আসতে হয়।

আজ দুপুরে একটা রুটি আর খানিকটা টক টক গন্ধের খিচুড়ি পেয়েছিল একটা বাড়ির পিছনে দিকটায়। তারপর খানিকক্ষণ এদিকে ওদিকে ঘোরাঘুরি করে একটা গাছের ছায়ায় তোফা ঘুম দিয়ে কিছুক্ষণ আগে এসে বসেছিল রাস্তার ধারে। এইটা তার একটা বিশেষ শখ। রোজ রাস্তার ধারে একবার না বসলে মনে হয় দিনটাই বেকার গেল। শাঁইশাঁই করে গাড়িগুলো পেরোয় আর তার মনে হয় সে যদি ওইরকম ছুটতে পারত তা হলে ওই যে বেশ খানিক দূরে রাতের বেলায় আলো ঝলমল করে কী একটা জায়গায়, ওখানটাতে রোজ একবার ঘুরে আসতে পারত। ওখানে বোধহয় সবাই বড়োলোক। আর বড়োলোকরা তো খুব খাবার নষ্ট করে। তাহলে একবার চক্কর দিয়ে এলেই সারাদিনের মত আর ঝামেলা থাকে না। আবার মাঝেমাঝে মনে হয় এই বেশ আছি। চেনা জায়গা, মানুষগুলোও মুখচেনা। ওই গাঁট্টাগোঁট্টা ছেলেটা ছাড়া আর কেউ তাকে হ্যাটাও করে না। পেটভরে না হলেও একটু পরিশ্রম করলে মোটামুটি বেঁচে থাকার মত জুটে যায়।

আজকেও এসে বসেছিল তেমনভাবে যেভাবে বসলে নিজেকে একটা কেউকেটা মনে হয়। পিছনের পায়ের উপর বসে, সামনের ঠ্যাংদুটো সোজা খাড়া করে বসলে চারদিকটা বেশ ভাল দেখাও যায়। তাছাড়া ওইভাবে বসে মুখটা আকাশের দিকে তুলে দিলে, মানে কেলোও ওভাবে বসে উ-উ-উ করে যখন ডাক ছাড়ত তখন দেখেছে তাই বুঝতে পারে যে তখন সামনের থেকে দেখলে বেশ একটা মন্দির মন্দির লাগে। পা দুটো যেন মন্দিরের সামনের দিককার দুটো থাম আর নাকটা তখন মন্দিরের চূড়ো হয়ে যায়। কানদুটো নিচের দিকে ঝুলিয়ে দিলে যেন পদ্মফুলের পাপড়ি মনে হয়।

হুশ করে একটা গাড়ি পেরিয়ে গেল । আর তাকে যখন গাড়িটা পার করেছ তখন ধপ করে একটা শব্দ। মুখটা নামাতেই দেখতে পেয়েছে। ওই তো একটা কাগজের বাক্স। গায়ে হলুদ তেল তেল ছোপ। আর দেখা যাচ্ছে না। হুশ হাশ করে একটার পর একটা গাড়ি। তারই মাঝে নাকটা সামনের দিকে এগিয়ে জোরে শ্বাস নিতেই...ওহ,সেই গন্ধটা। সেই যে কীসব মশলা দেওয়া আর ঘি মাখানো সরু চালের ভাত আর তার সঙ্গে মাংসের বড়ো টুকরো, একবার কাদের বাড়িতে যেন বিয়েতে আস্তাকুড় ঘেঁটে খেয়েছিল। হ্যাঁ,সেই গন্ধটাই।ব্যাস, সে প্রস্তুত। শব্দেই বোঝা গেছে যে বাক্সটা খালি নয়। এখন রাস্তাটা পার হতে পারলেই...

প্রথমবার পেরোনোর জন্য শরীরটা একটু টানটান করে অপেক্ষা করল বাঁদিক থেকে আসা ট্রাকটার জন্য। ট্রাকটা পেরোতেই সে এগিয়েছে কি এগোয়নি হঠাৎ পিলে চমকানো একটা আওয়াজ। ওদিকে থেকে একটা বাস মাতালের মত টলতে টলতে খানিকটা এগিয়ে থেমে গেল। টায়ার না কী বলে সেটা ফেটে গেছে। ও তো আঁতকে উঠে এক ঝটকায় কয়েকহাত পিছিয়ে এল। তারপর আবার অপেক্ষা। গাড়ি যাচ্ছে তো যাচ্ছেই, শেষ আর হয়না। আবার একটু ফাঁকা পেয়ে রাস্তায় প্রায় উঠে পড়েছে, তখনই গেল গেল করে একটা প্রচন্ড গোলমাল। কীসের গোলমাল বুঝতে না বুঝতেই বাঁদিক থেকে আসা খালি ট্রাকটা বেসামাল হয়ে রাস্তা ছেড়ে নেমে পড়ে তার দিকে তীরের গতিতে এগিয়ে এল। ঠিক সময়ে উল্টো দিকে ভল্ট না মারতে পারলে...উঃ, খুব জোর বেঁচে গেল।

বুকের ধড়ফড়ানি সামলে বসে রইল কখন রাস্তা আবার একটু ফাঁকা হয়। একবার মনে হল কাজ নেই ওপারে গিয়ে। কিন্তু পেটে খিদে তো আছেই, তাছাড়া সেই দারুণ গন্ধওয়ালা

খাবারের প্যাকেটটা পড়ে আছে বেওয়ারিশ। কেউ যদি সন্ধান পেয়ে যায় তাহলেই তার বুক ফাটবে ওই টায়ারের মতন।

পরেরবারে সে খুব সাবধানে চারদিক লক্ষ রাখছে। ওই যে গাড়িটা, তার পেছনে একটা বাস। আবার দুটো গাড়ি তারপর একটা ট্রাক। আর ডানদিকে একটা সেই ট্রেকার, তারপর একটা বাস, আর আনেকটা পিছনে একটা গাড়ি আসছে। সে বুঝতে পারছে বাঁদিকের সবক”টা পেরোতে পেরোতে ডানদিকের ট্রেকার আর বাসটা পেরিয়ে যাবে। পেছনের গাড়িটা বেশ দূরে। ওটা আসার আগেই সে ওপারে যেতে পারবে।

ও ডানদিকে মুখ ফিরিয়ে গাড়িটার দিকে লক্ষ স্থির রেখেছে। বাসটা পেরোতেই- গাড়িটা তখনও খানিকটা দূরে- এক লাফ দিয়েছে। উল্টোদিক থেকে কখন যে একটা মোটর সাইকেল তীরের গতিতে আসছিল, ও খেয়ালই করেনি। লেজের ডগা ছুঁয়ে মোটর সাইকেলটা বেরিয়ে গেল। ভয় সামলাতে একটু সময় বয়ে গেল। তারপরেই ও ছুট লাগালো সেই বাক্সটার দিকে।

কিন্তু একি! কোথা থেকে একটা ময়লা ছেঁড়া ফ্রক পরা মেয়ে বাক্সটার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। ও লাফ দিতে গিয়েও যেন একটু থমকে গেল। ততক্ষণে মেয়েটাও ওকে দেখেছে। কী করবে বুঝতে না পেরে ও মেয়েটার দিকে মুখ ঘুরিয়ে একটা আলতো ঘেউ করল। ভয় পেয়ে মেয়েটা দু পা পিছিয়ে এল ওর চোখে চোখ রেখে। এখন বাক্সটার দিকে কারও নজর নেই। দুজনে দুজনকে দেখেছে সন্দেহের চোখে। খানিক পরে ও চোখ নামিয়ে মাটির গন্ধ শুঁকে একচক্কর কেটে বাক্সটার ওইপারে চলে গেল। এখন বাক্সটার দিকে দুজনের চোখ। মেয়েটা এক পা এগোতেই ও আবার সেই আলতো ঘেউ করল। মেয়েটা তখন কাঁধ থেকে ঝোলাটা নামিয়ে এদিক ওদিক চাইছে। বোধহয় একটা লাঠি বা ঢিলের খোঁজ করেছে যার কিছুই সে দেখতে পাচ্ছে না। আবার কিছুক্ষণ দুজনের দিকে।

হঠাৎ ও কি ভাবল, সামনের পা দুটো এগিয়ে সমস্ত শরীর টানটান করে আকাশের দিকে মুখ তুলে কুঁ- ই- ই করে একটা ডাক ছাড়ল। তারপর যেন কিছুই হয়নি এমনভাবে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানেই পিছনের পা গুটিয়ে বসে পড়ল। আরও কিছুক্ষণ সময় লাগল মেয়েটার। তারপর সে- ও হাঁটু মুড়ে বসে বাক্সটা কাছে টেনে নিল। নিজের ঝোলা থেকে একটা কাগজের টুকরো বের করে সেই বাক্সে যা ছিল তার অর্ধেক কাগজে ঢেলে ওর দিকে এগিয়ে ডাকল, আয়! ও উঠে আস্তে আস্তে এগিয়ে মেয়েটার পাশে বসে লেজ নাড়াতে লাগল। মেয়েটা ওর দিকে খাবারটা এগিয়ে দিয়ে বলল, নে খা। ওর মুখটা খুশিতে ভরে গেল। দুজনের খাওয়া শেষ হলে মেয়েটা কাঁধের ঝোলাটা তুলে যেদিক থেকে এসেছিল সেইদিকে হাঁটতে লাগল। ও কিছুক্ষণ তার পেছন পেছন গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর অনেক চেষ্টায় আবার ফিরে এল এইপারে।

সেইদিন থেকে দেখা যায় ও রোজ নিজের জীবন বাজি রেখে রাস্তার ওইপারে যায় । খানিকক্ষন এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে আকাশের দিকে মুখটা তুলে কুঁ- ই- ই- ই- ই করে ডাক ছাড়ে। তারপর সেদিন মেয়েটার চলে যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে থাকে, তাকিয়েই থাকে। তখন তার দু”টি চোখ মন কেমন করা মায়ায় জড়িয়ে যায়। একসময় আবারও অনেক চেষ্টার পর ধীর পায়ে ফিরে যায় তার ঠিকানাবিহীন ঘরের দিকে।

ছবিঃ দীপংকর

রাত দশটা বাজে। মলয়বাবু বাড়ির সামনে উদ্বিগ্ন হয়ে পায়াচারি করছেন, দরজার কাছে ওঁর স্ত্রী দাঁড়িয়ে। তাঁর মুখেও চিন্তার ছাপ স্পষ্ট। ব্যাপার দেখে আশপাশের বাড়ি থেকে কয়েকজন বেরিয়ে এলেন কী হয়েছে জানতে। ঘনশ্যামবাবুও এলেন। যদিও তাঁর বাড়ি মলয়বাবুর বাড়ির খুব কাছে নয়, কিন্তু তাও কি করে যেন জানতে পেরেছেন। রাস্তা দিয়ে দু একজন চেনা পরিচিত যারা যাচ্ছিল তারাও দাঁড়িয়ে পড়েছে। এখন মোটামুটি একটা জটলাই হয়ে গেছে বাড়িটার সামনে।

ব্যাপারটা হল, মলয়বাবুর ছেলে পিকলু এখনও বাড়ি ফেরে নি। পিকলু কলকাতায় কলেজে পড়ে, বাড়ি থেকেই যাতায়াত করে। সপ্তাহে তিন দিন আবার তার কম্পিউটার ক্লাশ থাকে। আজও ছিল। সাধারণত কম্পিউটার ক্লাশ করে আটটার মধ্যেই বাড়ি ঢুকে যায়। কিন্তু আজ দশটা বাজে অথচ পিকলুর পাত্তাই নেই। মোবাইলটাও বন্ধ। বাবা মার চিন্তা হওয়াই স্বাভাবিক। দিনকাল ভালো নয়।

কী হতে পারে সবাই সেই আলোচনাই করছেন। কেউ কেউ সান্ত্বনাও দিচ্ছেন, "এত ভাবছেন কেন মশাই? কোনো কারণে দেরি হচ্ছে, ঠিক এসে যাবে।"

ঘনশ্যামবাবু এতক্ষণ সব চুপচাপ শুনছিলেন, এবার বললেন, "আপনার ছেলেকে তো দেখি সব সময় কানে দুখানা তার গুঁজে গান শুনতে শুনতে যাচ্ছে। আর ফেরেও তো ওই মিলের পাশের গলিটা দিয়ে, শর্টকাট হবে বলে। ও রাস্তাটা তো ভালো নয়। এ ক"দিনে ক"টা ছিনতাই হল বলুন তো? নির্ঘাত পিকলুও ওদের পাল্লায় পড়েছে। ওর টাকাপয়সা, জিনিসপত্র কেড়ে নিয়ে ওকে ওখানেই মেরে ফেলে রেখে গেছে। সবাই মিলে ওখানেই যাই চলুন। তাড়াতাড়ি গেলে হয়তো সর্বনাশটা আটকানো যাবে।"

এই পর্যন্ত শুনেই পিকলুর মা “ওরে পিকলু রে” বলে আর্তনাদ করে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। সবাই ওনাকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। জল নিয়ে আয়, পাখা নিয়ে আয়, হাওয়া কর – সে এক মহা হট্টগোল শুরু হল।

“আপনি তো মশাই আচ্ছা লোক! এরকম করে কেউ বলে! যা বললেন তাইই হয়েছে পিকলুর, আপনি নিশ্চিত? কিছু একটা বললেই হল?” একজন বেশ রেগে গিয়েই বললেন ঘনশ্যামবাবুকে।

কিন্তু ঘনশ্যামবাবুর কোনো হেলদোল নেই। উলটে তিনি বেশ জোরের সঙ্গে বললেন, “কেন ভুলটা কী বলেছি? আর অসম্ভব, অস্বাভাবিকও কিছুই বলি নি। এরকম তো কতই হচ্ছে! খবরের কাগজে পড়েন না রোজ? পরে যাতে কেউ আমাকে না বলে, “আপনার যদি মনেই হয়েছিল তবে আগে কেন বলেন নি ঘনশ্যামবাবু? তাহলে হয়তো ছেলেটাকে বাঁচানো যেত।” তাই আগেই বলে দিলাম। সাবধান থাকাই ভালো। আর ভয়ের যদি কিছু নেই তাহলে মলয়বাবু এত অস্থিরই বা হচ্ছেন কেন?”

সবাই বুঝল ঘনশ্যামবাবুকে কিছু বলা বৃথা। আসলে ঘনশ্যামবাবু এরকমই। কোনো কিছু না ভেবেচিন্তে দুমদাম কথা বলাটাই ওনার স্বভাব।

এর মধ্যে হঠাৎ দেখা গেল পিকলু হনহন করে হেঁটে আসছে। জটলার মধ্যে “এসে গেছে, এসে গেছে, ওই তো আসছে” এরকম একটা রব উঠল। পিকলুও বাড়ির সামনে এত লোকজন দেখে অবাক। জানা গেল আজ কম্পিউটার ক্লাস শেষ হতেই দেরি হয়েছে, তারপর

রাস্তায় এত জ্যাম ছিল যে স্টেশনে পৌঁছতেই ঘাম ছুটে গেছে। আর মোবাইল ফোন অফ কেন? ব্যাটারির চার্জ নেই বলে। চার্জও এমন মোক্ষম সময়েই ফুরোয়!

"মোবাইলটা কি গান শোনার জন্যে না দরকারের সময় ফোন করার জন্যে? আমরা এদিকে চিন্তা ভাবনায় পাগল হয়ে যাচ্ছি, পাঁচজনে পাঁচ রকম কথা বলছে আর তুমি ফোন বন্ধ করে বসে আছ!" পিকলুর বাবা প্রায় তেড়ে এলেন।

সবাই তাঁকে সামলাল।

"ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন। হতেই পারে এরকম। গান তো আজকালকার সব ছেলেমেয়েই সব সময়েই শুনছে," এইসব বলেটলে দুজনকে বাড়ির মধ্যে ঢোকাল।

ফেরার পথে সবাই বলাবলি করল, পিকলুটা ঠিক সময়ে ফিরে এসে বাঁচিয়েছে। নাহলে ঘনশ্যামবাবু আরো কত কী যে বলতেন, কত কী যে করতেন তার ঠিক ঠিকানা নেই। কয়েকজনকে নিয়ে হয়তো মিলের পাশের গলিতেই চলে যেতেন। এর আগেও ওঁর কথা শুনে ঝামেলায় পড়তে হয়েছে পাড়ার সকলকে। এইতো মাস কয়েক আগের ঘটনা। সন্ধ্যের আড্ডায় অমলেশবাবু বললেন, "নিখিলবাবুর বাড়ি সকাল থেকে বন্ধ দেখছি। হঠাৎ কোথায় চলে গেলেন? কালও সকালে দেখা হল, বলেন নি তো কিছু।"

ঘনশ্যামবাবু একটু ভেবে বললেন, "আজ কত তারিখ বলুন তো?"

"আজ? আজ তো সাত তারিখ, এপ্রিল মাসের।"

"ও এইবার বুঝেছি নিখিলবাবু কোথায় গেছেন," ঘনশ্যামবাবু খুব খুশি, "প্রভাতবার্তা প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা করেছিল জানেন? নিখিলবাবু তাতে একটা লেখা পাঠিয়েছিলেন। আমাকে বললেন, "অনেক খেটেখুটে লিখলাম ঘনশ্যামবাবু। আশা করছি একটা প্রাইজ অন্তত পাব।" আজ সাত তারিখ মানে ওদের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। নিখিলবাবু নিশ্চয়ই প্রাইজ আনতে গেছেন। কলকাতায় ওনার মেয়ে থাকে, সকাল থেকেই তাই গেছেন, একেবারে অনুষ্ঠান শেষে বাড়ি ফিরবেন।"

সবাই তো অবাক। নিখিলবাবু প্রভাতবার্তার প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়েছেন? এ তো দারুণ খবর! অবশ্য নিখিলবাবু নাকি এককালে লিখতেন টিখতেন।

ঘনশ্যামবাবু বলেই চলেছেন, "অথচ আমাদের হাল দেখুন। কেউ কারুর খবরই রাখি না। আমরা ভুলেই গেছি যে গুণের কদর করতে হয়, গুণীকে মান দিতে হয়। নিখিলবাবু না জানি কী ভাবছেন।"

সবাই একমত, ঠিক খুব ভুল হয়ে গেছে। তবে এখনও দেরি হয় নি, ভুল সংশোধনের সময়ও আছে। ঠিক হল কাল সকালে সবাই মিলে নিখিলবাবুর বাড়িতে গিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানাবেন।

সেই মতো সবাই মিলে ফুলের মালা, পুষ্পস্তবক ইত্যাদি নিয়ে সাত সকালেই হাজির নিখিলবাবুর বাড়িতে।

নিখিলবাবু দরজা খুলতেই, শোভনবাবু যিনি পাড়ার অনুষ্ঠানে অ্যাঙ্করিং করেন তিনি দুবার গলা খাঁকারি দিয়ে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে উদাত্ত গলায় বলতে শুরু করলেন, "আমাদের পাড়ার বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রী নিখিলরঞ্জন সেনকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন। আপনার এই সাফল্য আমাদের শহরের প্রত্যেক বাসিন্দার কাছে এক বিরাট গর্বের ব্যাপার,"" বলে যেই মালাটা পরাতে গেছেন অমনি নিখিলবাবু একেবারে খিঁচিয়ে উঠলেন, "সাত সকালে ইয়ারকি মারতে এসেছেন? বলি বয়সটা কত হল? এই বয়সে এসব ফাজলামি?"

সবাই হতভম্ব। একজন ঘনশ্যামবাবুকে দেখিয়ে বললেন, "উনি যে বললেন আপনি বলেছেন প্রভাতবার্তার............"

"কী বলেছি আমি? বলেছি ঢাকঢোল পিটিয়ে একবারও যে আমি প্রভাতবার্তার প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়েছি? বলেছি? কি ঘনশ্যামবাবু বলুন, বলেছি কি?"

"আহা আপনি চটছেন কেন? আমি তো ভালো ভেবেই বলেছি। প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া মানে তো পুরস্কার পাওয়ারও সম্ভবনা থাকে, তাই না?" বললেন ঘনশ্যামবাবু।

"মজা পেয়েছেন, না?" নিখিলবাবু বলতে গেলে প্রায় তেড়েই এলেন।

সবাই কোনো রকম সামলালেন।

শোভনবাবু আমতা আমতা করে বললেন, "না মানে কাল আপনার বাড়িও বন্ধ ছিল। আবার কালই তো ওদের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানও ছিল তাই আমরা ভেবেছি.......... "

"তাই আপনারা ভাবলেন সাতসকালে এসে ফাজলামি করি। ননসেন্স!" নিখিলবাবু বাস্তবিক খুব রেগে গেছেন, "কাল আমার দাদার হঠাৎ শরীর খারাপের খবর পেয়ে

দৌড়েছিলাম। কত রাতে বাড়ি ফিরেছি জানেন? তার মধ্যে সকালবেলাই আপনাদের এই উৎপাত! যান বলছি এখান থেকে,” মুখের ওপরই দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন নিখিলবাবু।

এরপর থেকে ঘনশ্যামবাবুর কথা শুনে কেউ আর কিছু করে না। তাতে অবশ্য ঘনশ্যামবাবুর বিশেষ কিছুই এসে যায় না। তিনি তাঁর মতোই আছেন, একটুও পালটান নি।

ঘনশ্যামবাবুর এই স্বভাব নাকি বরাবরের। তখন সবে বছর তিনেক হল ওঁর বিয়ে হয়েছে। একদিন দুপুরেই তড়িঘড়ি অফিস থেকে বাড়ি চলে এলেন। এসেই স্ত্রীকে তাগাদা, “শিগগির তৈরি হয়ে নাও, এক্ষুণি বেরোতে হবে।”

ওনার স্ত্রী তো অবাক। কী হল হঠাৎ! কি না, অফিসে নাকি ঘনশ্যামবাবুর কাছে ফোন করেছিলেন ওনার স্ত্রীর ছোটো বোন বুল্টি।

“ফোনটা কেটে গেল। ভালো করে কিছু বুঝতে পারলাম না, ঘ্যাসঘ্যাস করে কি একটা আওয়াজ হচ্ছিল। বুল্টির গলাটা যেন কিরকম শোনাচ্ছিল আর খালি আমাদের আসতে বলছিল। তোমার বাবা তো ক”দিন আগেই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন টাইফয়েড হয়ে। আমার মনে হচ্ছে কিছু একটা খারাপ খবর। যাক গে এখন ওসব ভাবার সময় নেই। তুমি তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও। তাড়াতাড়ি গেলে তবু শেষ দেখাটা দেখতে পাবে।”

মোবাইল ফোন তো দূরের কথা, তখন ঘরে ঘরে ল্যান্ডলাইনও ছিল না। কাজেই আর ফোন টোন কিছু করা হল না। ঘনশ্যামবাবুর স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতেই তৈরি হলেন, কাঁদতে কাঁদতেই সারা রাস্তা গেলেন। শ্বশুরবাড়ি পৌঁছবার আগে ঘনশ্যামবাবু কিছু সাদা ফুলও কিনে নিলেন যদি পরে আর সময় না পাওয়া যায় এই ভেবে।

পৌঁছে জানা গেল বুল্টি খুব ভালোভাবে বি এ পাশ করেছে এই খবরটা জানাবার জন্যে ফোন করেছিল। আসতে বলাও এই জন্যেই, ভালো রেজাল্ট করার উপলক্ষ্যে দিদি জামাইবাবুকে খাওয়ানো। জামাইবাবু কী বুঝেছেন শুনে আর দিদির অবস্থা দেখে বুল্টি কিছুক্ষণ হাঁ হয়ে রইল, তারপর হেসে গড়িয়ে পড়ল। কিন্তু বুল্টির বাবা নিজের মৃতদেহের জন্যে জামাই- এর আনা ফুল দেখে বিলক্ষণ চটলেন। সেদিন আর কথাই বলেন নি তিনি ঘনশ্যামবাবুর সঙ্গে।

এই হচ্ছেন ঘনশ্যামবাবু। বরাবর এক রকম। ওনার পরিবারের লোকজনও ওনাকে বেশ এড়িয়ে চলে, চট করে ওনার কথা বিশ্বাস করে না।

নিখিলবাবুর সঙ্গে ওই বিচ্ছিরি ব্যাপারটা হয়ে যাবার পর থেকে সবাই ভেতরে ভেতরে রেগেই আছে ঘনশ্যামবাবুর ওপরে। নিখিলবাবু তো আর কারুর সঙ্গে আগের মতো স্বাভাবিকভাবে কথাই বলেন না। কিরকম যেন একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে গেছে। সবাই ভাবে কী করে একবার ঘনশ্যামবাবুকে জব্দ করা যায়, অন্তত একবার বোঝান দরকার যে এরকম দুমদাম কথা বললে বা কাজ করলে অন্যদের কিরকম লাগে। পাড়ার ছেলেবুড়ো এ ব্যাপারে একমত। সবাই কোনো না কোনো সময় ঘনশ্যামবাবুর এই আজব কথাবার্তা বা কাজকর্মের সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু কীভাবে?

এইসব ভাবনা চিন্তার মধ্যেই একদিন খবর পাওয়া গেল যে ঘনশ্যামবাবুকে নাকি লটারির টিকিট কিনতে দেখা গেছে। কৃপণ বলে ঘনশ্যামবাবুর অল্পবিস্তর বদনাম বরাবরই আছে। এই পুজোয় চাঁদা কম দেওয়া বা বিজয়ার পরে একটা রসগোল্লায় কাজ সারা – এই রকম আর কি। এই খবরটা পাওয়া মাত্রই সবাই উৎফুল্ল হয়ে উঠল। প্ল্যানও তৈরি হয়ে গেল।

সেদিন সন্ধ্যেয় আড্ডায় ঘনশ্যামবাবু আসামাত্রই একজন বললেন, “কি ঘনশ্যামবাবু, শুনলাম আপনি লটারির টিকিট কিনেছেন। তা টিকিট কাটা মানে তো প্রাইজ পাওয়ারও চান্স আছে। আমাদের কিন্তু খাওয়াতে হবে। না না ওই দুটো বিস্কুট আর একটা রসগোল্লায় চলবে না। আমরা দুপুরে পাত পেড়ে খাব।”

ঘনশ্যামবাবু তো হাঁ। ওনার লটারির টিকিট কেনার কথা এরা জানল কী করে?

শোভনবাবু বললেন, “কি টিকিট কিনেছেন, তার ড্র কবে সবই আমরা জানি। আসছে শনিবার দুপুরে আমরা সবাই যাচ্ছি আপনার বাড়িতে। এবার আর ছাড়ছি না। লটারি পাবেন আর ভুরিভোজ হবে না তাই কখনো হয়? এই যে মেনু আর ক”জন খাবো তাও লেখা আছে। এই নিন,এটা রাখুন,” শোভনবাবু কাগজটা ঘনশ্যামবাবুর পকেটেই ঢুকিয়ে দিলেন একেবারে।

এই প্রথম ঘনশ্যামবাবু বলার মতো জুতসই কিছু পেলেন না। কিন্তু মনে মনে বেশ চটলেন। আর দাঁড়ালেন না ওখানে। হনহন করে চলে গেলেন। সবাই খুশি, ভাবল এতেই এই অবস্থা, তাহলে সামনের শনিবার যখন সবাই মিলে যাব তখন কী হবে? সবাই ঠিক করে নিয়েছেন যে ভর দুপুরে গিয়ে একেবারে উপস্থিত হব, না খেয়ে নড়ব না। সে ঘনশ্যামবাবু লটারি পান আর নাই পান!

সবাই খুব একচোট হাসলেন।

কিন্তু এত পরিকল্পনা সত্ত্বেও সেই শনিবার যে কখন পেরিয়ে গেল কারুরই খেয়াল রইল না। একে তো নিম্নচাপের জন্যে দুদিন ধরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি চলছিল, তারপর শনিবারই ভারতের মরণ বাঁচন ওয়ান ডে ম্যাচও ছিল। সে ম্যাচও এমন জমেছিল শুরু থেকেই যে কেউ টিভির সামনে থেকে নড়তেই পারছিল না।

পরেরদিন রবিবার। সবাই মোড়ের মিষ্টির দোকানের সামনে সেই খেলার আলোচনাতেই যখন ব্যস্ত, ঠিক তখনই সেখানে বীরদর্পে ঘনশ্যামবাবুর প্রবেশ। হাতে বেশ ক”টা খবরের কাগজ। একটা নির্দিষ্ট পাতা বার করে সবার হাতে হাতে ধরিয়ে বললেন, “দেখুন দেখুন আপনাদের পাড়ার, শহরের সুনাম কিভাবে বাড়ালাম।”

সবাই তো অবাক। বলে কি এ! খবরের কাগজে নজর দিয়ে তো চক্ষুস্থির! শুধু খবরই নয়, ছবিও আছে। ঘনশ্যামবাবুর। খবরে প্রকাশ শ্রী ঘনশ্যাম দাস কবিরাজ গতকাল তাঁর মার মৃত্যুদিবস উপলক্ষ্যে নিকটবর্তী একটি আবাসিক বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রকে এলাহি ভোজন করিয়েছেন। এই আবাসিক বিদ্যালয়টিতে মূলত অনাথ এবং দুঃস্থ ছেলেরাই পড়াশোনা করে। ঘনশ্যামবাবু সম্প্রতি একটি লটারিতে কিছু অর্থ পুরস্কার পেয়েছেন। অন্য কিছু করার আগে তিনি এই দুঃস্থ ছাত্রদের ভুরিভোজন করিয়েছেন। ঘনশ্যামবাবুর এই দরদী মনের পরিচয় পেয়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মুগ্ধ ইত্যাদি ইত্যাদি।

“মানে আপনি সত্যিই লটারি পেয়েছেন?” নিখিলবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

“হ্যাঁ পেয়েছি তো। একেবারে ফার্স্ট প্রাইজ পাইনি ঠিকই, কিন্তু পেয়েছি। আপনারা তো কেউ কালকে এলেনই না! আমি কিন্তু আপনাদের ফরমাশ মতোই সব ব্যবস্থা করেছিলাম। ভাবলাম একবার মুখ ফুটে খেতে চেয়েছেন, কাউকেই নিরাশ করব না, তারপর কিছু টাকাও তো পেয়ে গেলাম। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন কেউ এলেন না, তখন বুঝলাম নির্ঘাত ভুলে মেরে দিয়েছেন সবাই! কিন্তু এত খাবার তো আর ফেলে দেওয়া যায় না, তাই সব ভ্যানে চাপিয়ে নিয়ে গেলাম স্কুলে। তখন আবার বৃষ্টিও শুরু হয়েছে, তার মধ্যেই গেলাম। ওদেরও

দুপুরের খাওয়া হয়ে গেছিল, কিন্তু ওরা সব রেখে দিল রাতের জন্যে। আমার ছেলের বন্ধু কাজ করে প্রভাতবার্তায়। তাকে বলে খবরটা ছাপানোরও ব্যবস্থা করে ফেললাম। ভালো করি নি?"

কে আর কী বলবে? কারুর মুখেই তখন আর কথা জোগাচ্ছে না। এরকমও হয়!

শুধু ঘনশ্যামবাবুর বহু দিনের প্রতিবেশী এক ভদ্রলোক বললেন, "কিন্তু ঘনশ্যামবাবু আপনার মা তো আগস্ট মাসে মারা যান নি। আমার খুব ভালো মনে আছে, উনি আপনার এই বাড়িতেই মারা গেছিলেন শীতকালে। খুব শীত পড়েছিল সেবার।"

ঘনশ্যামবাবু ওনার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বললেন, "মার মৃত্যুদিন কবে সেটা বড়ো কথা নয়। মা যে মারা গেছেন সেটা তো সত্যি। আর আমার উদ্দেশ্য কত ভালো, কত মহৎ সেটা দেখুন। দিনক্ষণ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন কেন?"

এই অকাট্য যুক্তির সামনে কেউই কিছু বলতে পারল না। তাছাড়া এত দুঃখে কি আর বলা যায়! দুঃখ তো কত কারণে। এক তো নিজেদের ভুলে যাওয়ার জন্যেই এরকম একটা ভোজ মিস হয়ে গেল, দুই ঘনশ্যামবাবুকে তো জব্দ করা গেলই না, উলটে তিনিই বিখ্যাত হয়ে গেলেন!

ছবিঃ শিমুল

অলকানন্দা রায়

আমার জন্ম অবিভক্ত বাংলার বরিশাল জেলার গাববাড়ি গ্রামে। চারপাশে বড়ো বড়ো নদী ও খালে ঘেরা আমার গ্রাম। তখনো দেশ ভাগ হয়নি, যৌথ পরিবার ভেঙে পড়েনি। উঠোনের চারপাশে একই পরিবারের বিভিন্ন তরফের ঘর। ডাকাতির ঘটনাটি যখন ঘটে, তখন আমার বয়স চার হবে। ১৯৪৫ সালের ঘটনা...

বৈশাখ মাসের অমাবস্যা। গরম যেমন তেমনি অন্ধকার। রাত হতে আমি বারান্দায় গিয়ে বাইরে তাকিয়ে বেশ ভয়ে ভয়ে ঘরে ঢুকে গেলাম। বড়ো ঘরে বিছানা পাতা রয়েছে, বিছানা মানে তো শীতলপাটি আর বালিশ। চট করে শুয়ে পড়লাম। সকালে মার সাথে মামাবাড়ি গেছিলাম। সন্ধের আগেই ফিরে এসেছি। মামাবাড়ি তো দক্ষিণদিকের মাঠটার পরই। কখন মা শুয়েছে, মশারি টাঙিয়েছে টেরই পাইনি।

কত রাত কে জানে–মার ডাকে আর টানাটানিতে উঠে পড়ে দেখি ঘরে বাতি জ্বলছে। দিদিও দাঁড়িয়ে আছে। জেঠিমা আর দিদি পাশের বিছানায় শুয়েছিলো। মা উঠে দরজা খুলে দিদির হাত ধরে, আমাকে কোলে নিয়ে বড়ো বারান্দা ছোটো বারান্দা পেরিয়ে উঠোনে নেমে এলেন। ঘরের পাশ দিয়ে গিয়েই আমাদের বাথরুম করালেন। তারপর উঠানে দিদির পাশে আমাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললেন, "একটু খাড়া, মুই এহনই ফিরমু।"

দিদি আমার হাত শক্ত করে ধরে আছে। চারদিকে নিকষ কালো অন্ধকার। নিস্তব্ধ রাত। দিদি চারদিকে তাকাচ্ছে আর বলছে, "ওমা বড়ো ভয় করতে আছে।"

"কিছু ভয় নাই, মুই বেশিদূর যামু না। এহনই আইয়া পড়মু।"

খানিক বাদেই মা এসে আমাকে কোলে নিয়ে দিদির হাত ধরে ঘরের দিকে যেতেই দেখলেন কুকুরগুলো উত্তর দিকে বাড়ির ঢোকার রাস্তায় প্রচন্ড চিৎকার করছে ও যেন ঝাঁপিয়ে

পড়ছে। মনে হল মা-ও ভয় পেয়েছেন। দুই মেয়েকে নিয়ে দ্রুত উঠে গেলেন বারান্দায়। সেখান থেকে উঠোনের দিকে তাকিয়ে দেখেন চারদিকে কালো কালো ছায়ায় ভরে গেছে।

তীব্র টর্চের আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। মা ঘরে ঢুকেই আমাকে নামিয়ে দরজা বন্ধ করে চিৎকার করে উঠলেন, "মাইজলাদিদি- শিগগির ওডো। লোকে উডান ভইরগ্যা গেছে।"

মা দরজা বন্ধ করে দরজা ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মুহুর্তের মধ্যে দরজায় আঘাত। দেশের বাড়ির কাঠের শক্ত দরজা, বেশ কিছুটা সময় সে স্থির ছিলো- তারপর প্রচণ্ড আঘাতে ভেঙে গেলো খিল। দিদি তখন আমাকে নিয়ে মায়ের বিছানায়, মাও ছিট্‌কে চলে এলেন বিছানায় দুই মেয়ের কাছে। ডাকাতরা হই হই করে ঢুকে পড়েছে ঘরে। কি চিৎকার তাদের! বড়ো বড়ো টর্চের আলোয় সমস্ত ঘর আলোকিত হয়ে গেলো। জেঠিমাও তীব্র চিৎকার করে উঠলেন। একজন ডাকাত ততক্ষণে হাতের রামদা দিয়ে মশারির কোণাগুলো ঝপাঝপ কেটে মশারিগুলো ছুঁড়ে দিয়েছে।

বাড়ির লোকজন সব তখন জেগে গেছে। বড়ো বারান্দার দু"দিকে মেঝেতে বিছানা। একদিকে আমার বাবা আর জেঠামশাই আর অন্যপাশে দুজন কাজের লোক। বারান্দার দু মাথায় দুটি খাট। ওখানে বাড়ির দুজন মাস্টারমশাই ঘুমোন। তাঁরা সেদিন তাদের বাড়িতে চলে গেছিলেন।

হইচই শুনে আমার জেঠামশাই মশারির মধ্যেই উঠে দাঁড়িয়েছেন। এক ডাকাত মশারির দুটো কোণা ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল আর ওনাকে দুচার ঘা দিয়ে হাত বেঁধে বসিয়ে দিল। কাজের লোকেদেরও সেই দশা। তারা বারবার বলছে, "মোরা এ বাড়ির কাজের লোক – মোগো ছাইড়গ্যা দ্যান," কিন্তু কে শোনে কার কথা? পিটিয়ে হাত, পা বেঁধে রেখে দিল তাদের।

জেঠিমা চিৎকার করে কাঁদছেন আর বলছেন, "বাবারা যা আছে সব লইয়া যাও। পরাণ কয়ডার ক্ষতি কইরোনা।" জবাবে "অ্যাই বুড়ি চুপ" বলে জোর ধমক।

জেঠিমার চিৎকার শুনে পাশের ঘর থেকে মেজদাদা "ও মা কী হইছে?" বলে ঘরে ঢুকতেই "ধর শালাকে" বলে সে কি মার!

পশ্চিম ভিটার পুবমুখো ঘর। মাঝখানে বড়ো ঘর তার পাশ দিয়ে অন্য ছোটো ঘর। দক্ষিণ পাশের ঘরটায় আমার ছোড়দা, টবিদা আর এ বাড়িতে লজিং- এ থেকে যে ছেলেটা পড়াশুনা করতো সে থাকে। ও ঘরেই তাদের পড়ার টেবিল, খাট, চেয়ার সব। মা আর জেঠিমার কান্না শুনে টবিদা যেই উঁকি দিয়েছে, অমনি চুলের মুঠি ধরে টেনে এনে মেরে হাত পা বেঁধে জেঠিমার পাশেই বসিয়ে দিলো। সুশীল বলে লজিং- এ থাকা ছেলেটি পা টিপে টিপে পালাবার ধান্দা করছিলো। তাকেও ধরে মেরে, তার হাতদুটো গামছা দিয়ে বেঁধে বারান্দার সেই খাটে ফেলে রাখলো হুমকি দিয়ে, "এই পলাবিনা।"

আমার ছোড়দা মশারির ফাঁক দিয়ে এসব দেখে খাটের তলায় ঢুকে পড়েছিল। খাটের তলায় ছিলো বিরাট একটা মাটির জালা। তার মধ্যে বীজ আলু রাখা ছিলো। আলুগুলো ঢেলে জালার মধ্যে ঢুকে পড়েছিলো সে। কিন্তু পুরো মাথাটা ঢেকেনি। সামান্য একটু বেরিয়ে ছিল।

পূর্ববাংলার বাড়িগুলোর ছিল মাঝখানে উঠান। উঠানকে ঘিরেই সকলের ঘর। আমাদের বড়ো বাড়ি বলে বিরাট উঠান। তার দক্ষিণ দিকে ছিলো বড়ো কাছারিঘর, উত্তর দিকে পুকুর। বাড়িতে আসা যাওয়ার পথ ছিলো দু"দিকেই। ডাকাতদলের দুই তিন জন উঠানে দাঁড়িয়ে পাহারার কাজ করছিল। অন্যরা লুঠপাটে ব্যস্ত। একতলা বাড়ি, কিন্তু উপরে দোতলার মত পাটাতন। সেখানেও উঠেছে দু"একজন। আমি তো মায়ের কোলে লুকিয়ে বসে আছি। মাকে বলে যাচ্ছি "মা- পলাইয়া যাই।" কিন্তু আমার দশ এগারো বছরের দিদি তখন

বীরাঙ্গনা। সে সব দেখেছে- ডাকাতরা আলমারির একটা দরজা খুলতে না পেয়ে সেটাকে যেই কাটতে যাবে, দিদি তাদের বাধা দিয়ে বললো,"হ্যান্ডেল ধইর্‍্যা বাঁদিকে ঠেলা দাও, খুইল্যা যাবে।"

আমাদের মন্দিরে নারায়ণ পুজো হয় গোটা বৈশাখ মাস ধরে। তার জন্য কাউখালি থেকে সের পাঁচেক চিনি আনা ছিল। একটা ডাকাত হাত ঢুকিয়ে পাত্র থেকে চিনি তুলেছে, তাই দেখে দিদি খুব ক্ষেপে গেল, "আমাগো নারায়ণের চিনিতে হাত দিছো ক্যান? আবার খাইতে আছো! দ্যাখবা কী দশা হয় তোমাগো!"

দিদির আবার একটা ছোটো সুটকেসও ছিলো। সেখানে তার নিজস্ব জিনিসপত্র, সামান্য টাকাপয়সা রাখত। একটা ডাকাত সুটকেসটা খুলতেই আবার বাধা, "এটা মোর সুটকেস। ওর মইধ্যে মোর টাকা।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে, রইলো তর সুটকেস" বলে ডাকাতটা সেটা তাড়াতাড়ি রেখে দিলো।

এদিকে অন্য ডাকাতরা তখন সারা বাড়ি দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল। আর কিছুক্ষণ পরপরই "খবরদারি হে!" বলে একসাথে চিৎকার করছিল। গ্রামের নীরবতার মধ্যে সেই ভয়ঙ্কর চিৎকার একটা বেশ ত্রাসের আবহ সৃষ্টি করেছিল। পুবের ভিটায় বড়ো জ্যাঠার দোতলা পাকা বাড়ি। তাদেরও দরজা ভেঙে একজন ডাকাত ঢুকেছিল, কিন্তু কোনও ঝামেলা করেনি। শুধু হুঁশিয়ারি দিয়েছিল, "চুপচাপ যে যেখানে আছিস, হে হেইখানে বইয়া থাকবি।"

হলে হবে কি, খানিক পরে পুবের ঘরের বড়ো বউ চুপচাপ খিড়কির দরজা খুলে বেড়িয়ে ছোটো খাল পেরিয়ে পাশের বাড়ি পার হয়ে চলে গেছিল মাঠে। মাঠের ওপাশে পাশাপাশি সব গ্রাম। সেই মাঠের মধ্যে ছুটছিল আর চিৎকার করছিল, "ডাকাইত পড়ছে মোগো বাড়ি! হগলে বাইরাইয়া আসো। দক্ষিণের মাঠ ছেড়ে যখন পশ্চিমের মাঠে যাচ্ছিল, দেখে ডাকাতদের টর্চের আলো ঘুরছে চতুর্দিকে। ধরা পড়ার ভয়ে বুদ্ধিমতি বড়োবউ মুহূর্তের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলে গেছিল।

বেশ কিছুটা সময় কেটে গেছে। বাড়ির অন্য লোকেরা, গ্রামের লোকেরা সব জেগে গেছে। বাড়ির কেউ কেউ পেছনের দরজা দিয়ে চলে গেছে বাড়ির বাইরে- পাশের সব গ্রামের লোকদের ডাকতে। আমার বড়ো জেঠতুতো দাদা, কবিরাজদা গরমের জন্য বারান্দায় শুয়েছিলো। উত্তর ভিটায় আর একটা ঘর, সেখানে তার ডিসপেন্সারি আর দুটো শোবার ঘর, সামনে পেছনে টানা বারান্দা। চ্যাঁচামেচি শুনে উঠে পালাবার চেষ্টা করছিলো, কিন্তু ডাকাতেরা ঠিক দেখে ফেলেছে। দু চারজন তো উঠোনে ছিলো পাহারার জন্য। ধরা পড়বার পর আঙুলের সোনার আংটিটা চেপে ধরে বলে, "মুই-এ বাড়ির কাজের লোক। কিছু জানিনা, মোরে মারবেন না যেন।" কিন্তু সেই বলে কি মারের হাত থেকে রেহাই পায়? তবে হ্যাঁ, পরিমাণে খানিক কম হয়েছিলো।

ইতিমধ্যে বাড়ির বাইরে শয়ে শয়ে লোক জড়ো হয়েছিল। কিন্তু ডাকাতের গাদা বন্দুকের ভয়ে সাহস করে বাড়ির মধ্যে ঢুকছিল না। ডাকাতের সর্দার খুঁজছিলো ঘরের কর্তা মানে আমার বাবাকে। আমার বাবাও বারান্দায় শুয়েছিলেন। বাবা বুঝেছিলেন এদের সামনে পড়লে প্রাণ যাবে। তাই কাটা মশারিটা জড়িয়ে বড়ো ঘরের দেয়ালের সাথে নিজেকে মিশিয়ে নিঃসাড়ে শুয়েছিলেন। ডাকাতরা লাথি মেরে বালিশগুলোও ছুঁড়ে দিয়েছিলো তাঁর গায়ের উপর।

"আরে বাড়ির কর্তাডা কোথায়? খোঁজ খোঁজ—" এই বলে তারা দক্ষিণের ঘরটায় ঢুকলো রামদা হাতে। একই কায়দায় কেটে ফেলে দিল মশারি কোণ। একটা একটা করে তোশক তুলে দেখতে দেখতে আমার ছোড়দার মাথার অংশটুকু দেখতে পেল। ওমনি "বাইরা বাইরা" বলে তার চুল ধরে টেনে তুলছে।

"পাইছি এবার কর্তারে। কোথায় কী আছে বাইর কর।"

আমার ছোড়দা খুব রাগী আর দুরন্ত দুঃসাহসী। সে খাটের তলা থেকে বেরোতে বেরোতে বলতে লাগল, "হু! কর্তারে পাইছে! দেহো দেহি কেমন কর্তা মুই। এবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিমু। সকাল দশটায় ইস্কুলে যাই, সন্ধ্যায় ফিরি। কোথায় কী আছি কেমনে জানি? দাড়ি - মোচও বাইরায়নি ভালো মত!"

ডাকাত খুব রেগে গিয়ে হাত তুলেছে- আর ছোড়দাও মুহুর্তের মধ্যে ডাকাতের হাত থেকে রামদা টেনে নিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে কোপ বসিয়েছে।

ডাকাতের সৌভাগ্য এবং ছোড়দার দুর্ভাগ্য যে ওরা দুজন যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল তার সামনের পড়ার টেবিল আর বিদ্যাসাগরী মোটা হাতলওয়ালা চেয়ার এবং ডাকাতটার মাথা বরাবর একটা মোটা লোহার তার ছিল। সেই দায়ের কোপ মোটা তারটিকে কেটে ডাকাতের

কাঁধের পাশে আঘাত করে চেয়ারের হাতলটিকে কেটে দুভাগ করে দিল। ডাকাত বিপদ বুঝে এবার দলবল নিয়ে উঠোনে নেমে গেল। ছোড়দাও সেই রামদা হাতে মূর্তিমান বিভীষিকার মত ডাকাতের পিছু নিতে ডাকাতরা তখন উর্ধ্বশ্বাসে উত্তর দিকে ছুটে পালাতে লাগল। দৌড়োতে দৌড়োতে ছোড়দা জোর হাঁক দিচ্ছিল, ‘‘হগলে বাইরাও, বিপদ আইসে!”

উত্তর দিকে বাড়ির বেরোবার রাস্তা ধরে একটু এগিয়ে বড়ো পুকুর- তার সামনে দিয়ে রাস্তা চলে গেছে মন্ডল বাড়ির দিকে। মন্ডলবাড়ি যাবার আগেই ছোটো মাঠের পরে একটা ভিটা। ভিটা পার হলেই নদী। ডাকাতদের গন্তব্য নদী। সেখানে তাদের নৌকা আছে। ছোড়দা ছুটতে ছুটতে হঠাৎ শোনে পাশেই কার গলা- ‘‘আউগা ভাইডি, মুই আসি তোর লগে।” তাকিয়ে দেখে মেজদা। হাতে লম্বা বাঁশের পাকানো লাঠি। দুই ভাই একসাথে তাড়া করে চলল। গ্রামের শয়ে শয়ে লোকও এবার ঢুকে পড়েছে পাশের মাঠে। তাদের চিৎকারে ডাকাতরা তখন দিশেহারা।

গ্রামের যজ্ঞেশ্বর যাত্রা- থিয়েটারে ডেলাইট আর হ্যাজাকবাতি সরবরাহ করে। সে বুদ্ধি করে চারটে হ্যাজাকবাতি আর ডেলাইট জ্বেলে মাঠে চলে এসেছে ততক্ষণে। চারদিক আলোয় আলো।

এদিকে আমার বাবা, জ্যাঠা ও বাড়ির অন্যান্য লোকেরা মরিয়া হয়ে হাতের কাছে যে যা পাচ্ছিল তাই নিয়েই ছুটে আসছিল। গ্রামের লোকেদের হাতে তো ল্যাজা, সড়কি, লাঠি সবই ছিল। ডাকাতরা প্রমাদ গুনলো। তারা তখন সৈন্যদের মত ব্যূহ রচনা করে পিছু হটছিল মাঠের মধ্যে দিয়ে আর তাদের হাতে যা ছিলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছিল।

তখনকার দিনে কাগজের টাকা কম ছিল। বেশি ছিল রুপোর টাকা বা কাঁচা টাকা। আমার বড়োদাদা বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে যাবে বলে টাকা জমানো হচ্ছিল বড়ো বড়ো কৌটো ভর্তি করে। ডাকাতরা আসলে এই টাকার খবর পেয়েই এসেছিল। তারা সেই টাকার কৌটো নিয়ে পালাচ্ছিল। এইবারে ধরা পড়বার ভয়ে তারা এক অদ্ভুত কৌশল নিল। বাড়ির অন্যান্য লুঠের জিনিসের সাথে সেই টাকার কৌটোগুলোও মাঠে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলো। মাঠে পা ডোবার মত জল আর তার মধ্যে ঝনঝন করে টাকা পড়তে শুরু করল ও লোকজন দিশাহারা হয়ে গেল।

ডাকাতদের এই কৌশলটা বেশ কাজে লাগল। গ্রামের অনেক লোক তখন টাকা কুড়োতে ব্যস্ত। এই ভাবে ওরা প্রায় নদীর কাছে এসেই জোরে ছুটতে লাগলো। ছোড়দা একজনকে তাড়া করছে। হাতে তার রামদা আর চিৎকার, “মোর বাবারে মারার শোধ মুই নিমু।” ডাকাতটা যেই ভিটেতে উঠে লাফ দিয়ে নিচে নেমেছে আর আমার ছোড়দাও লাফ দিয়ে নেমে ডাকাতকে চেপে ধরে বুকের উপর বসে রামদা তুলেছে। পিছন থেকে গ্রামের একজন লোক সেই উদ্যত রামদা সমেত হাত ধরে ফেলে বলল, “মারিসনা মারিসনা ,এডারে বাঁচাইয়া রাখতে হবে, তাইলে আরও ডাকাইত ধরা যাবে।”

“কিন্তু মোর বাবা যে-- ”

‘‘ওরে না, তোর বাবার কিছু হয়নাই। বাইচ্যা আছে।” ডাকাতের দল নৌকায় উঠেছে ততক্ষণে। লোকজন এবারে লম্বা বাঁশ দিয়ে আর বড়ো বড়ো মাটির চাকা ছুঁড়ে ছুঁড়ে একটা নৌকা ডুবিয়ে দিলো। অন্ধকারে ডুব সাঁতার দিয়ে হোগলাবনে লুকিয়ে পড়ল ডাকাতের দল।

ধরা পড়া ডাকাতটাকে পায়ে দড়ি বেঁধে মাঠের মধ্যে দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে এসে- পাশের এক ছাড়া (পরিত্যক্ত) বাড়িতে রাখা হলো। অনেক সময় ডাকাত ধরা পড়লে তারা

দ্বিগুণ বলে ফিরে এসে অত্যাচার করে ও সঙ্গীকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। ফলে সবাই সে রাতে সতর্ক হয়ে জেগেই কাটিয়ে দিল।

আমি মায়ের কোলের মধ্যে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল জানিনা। সকালবেলা বাবা আমাকে কোলে নিয়ে উঠোনে ডাকাত দেখাতে নিয়ে এসেছিলেন। আমার এখনও সেই দৃশ্য চোখের সামনে ভাসে। কালো পোশাক পরা একটা লোক উঠানের মধ্যে টানটান হয়ে শুয়ে আছে, যন্ত্রনায় গোঙাচ্ছে আর চারদিকে জনসমুদ্র। বড়ো জ্যাঠার ছাদে, অন্যঘরের টিনের চালে, সুপারি গাছ, নারকেল গাছের মাথায় তখন শুধু লোক আর লোক।

উপসংহারঃ বেশ কয়েক বছর পরে একদিন দুপুরবেলা এক চোখওয়ালা এক ভিখারি এসেছিল আমাদের বাড়িতে। সে খেয়েদেয়ে তার দুঃখের কাহিনী বলছিল, "কত্তা, আপনাগো বাড়িত মোগো দল ডাহাতি করতে আইসিলো। নাও ডোবার পর হোগলা বনে পলাইয়াছিলাম। আর আপনের বড়োপোলা (আমার বড়োদা) যে বেলাত যাবে, এ খবর মোগো দেছিল আপনাগো এক দূরের কুটুম। দেহেন, পাপ কইর‍্যা এখন কী দশা হইছে।"

ছবিঃ মৌসুমী

তেঁতুলে শ্রীমধুসূদন

অমর মিত্র

শ্রীমধুসূদন কারোর সাতে নেই পাঁচে নেই। নয়ে নেই ছয়ে নেই। ক- এ নেই খ- এ নেই। এমন সাদাসিধে লোকটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি। খায় দায় রিকশা চালায়, বাজায় ঝুমঝুমি। রাতে ঘুমোয় দিনে জাগে। আবার দিনেও ঘুমোয় রাতে তুফান মেলের সঙ্গে গল্প জোড়ে। রিকশা আবার কথা বলে নাকি? হ্যাঁ গো বলে। বলে বলে। কী বলে? তা মধুদা রিকশাওয়ালা জানে। সুখদুঃখের কথা হয় দুজনের ভিতর। মধুদাকে খুব ধরে পড়লে, বাবুদের বাগানের কাঁচা তেঁতুল একছড়া, আর তার সঙ্গে একটু এখো- গুড় হলেই হল, তারিয়ে তারিয়ে বলে দেবে সব। তেঁতুলে গুড় মাখিয়ে লম্বা জিভে চাটতে চাটতে বলবে একটু একটু করে।

রাত অনেক। কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী, অর্ধেক চাঁদ উঠল মাঝরাতে। রিকশা তো বাঁধা থাকে নিম গাছের সঙ্গে। নাহলে রাতে চোরছ্যাঁচড় এসে খুব বিরক্ত করে। একবার তো তাকে চুরি করেই নিয়ে গেল প্রায়, কিন্তু তুফানের কী বুদ্ধি, মানুষেরও অত বুদ্ধি হয় না।

এতটা কথার পর তোমাকে বলতে হবে, “হ্যাঁ, রিকশা বলে কি মানুষ না?”

শুনে মধুদা কী খুশি! বলে, “এই নে খা, কী সুন্দর তেঁতুল, কী টক, তুই কি পারবি খেতে?”

তুমি বললে, “না, টক খাওয়া বারণ।”

তাতে মধুদা আরও খুশি। বলল, “ঠিক, ছোটছেলেদের তেঁতুল খেতে নেই, ভূতে ধরে চাঁদুদা।”

তোমার নাম চন্দ্রমোহন। তুমিই হলে চাঁদু। তুমি বাবুবাড়ির ছেলে, তোমাকে মধুদা চাঁদুদা ডাকে। আবার ছোটবাবুও বলে। মধুদা বলছে রিকশা তুফান মেলের সঙ্গে তার আলাপের গল্প। তখন তুমি মানে চন্দ্রমোহন জিজ্ঞেস করে, “চোর যে চুরি করল তোমার রিকশাকে, তারপর কী হল?”

“কী হবে,” শ্রীমধুসূদন পা নাচাতে নাচাতে বলে, “চোর নিজে ঘাড়ে করে তারে পৌঁছে দিয়ে পায়ে হেঁটে বাড়ি গেল। কেন গেল, না, রিকশার চেন পড়ে যায় বার বার, মানে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে তুফান। কতবার চেন লাগাবে সে? তা না হয় ঠেলে নিয়ে গেল রিকশা, কিন্তু তার উপায়ও নেই। তিনটে চাকাই একসঙ্গে ফুস! বাতাস ছেড়ে দিল আপনা আপনি। তারপরও তা টানতে গিয়ে হ্যান্ডেলের এমন খোঁচা লাগল পেটে যে দম আটকে আসে প্রায়। এমন সব কাণ্ড ঘটতে চোর চূড়ামণি আর রিকশা ফেলে পালাবে যে তার উপায়ও নেই। সে তবু ওই রিকশাই টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু কী হল, দ্যাখে সামনে একটা গরু শুয়ে আছে রাস্তার আড়াআড়ি। হেট হেট করল, তবু সে নড়ে না। গরুর ঘুম বলে কথা। তখন হাত চলে গেল হর্নে.... প্যাঁক প্যাঁক.... হর্ন বেজে উঠতে লাগল। ভোর হয়নি তখন। নিশুতি রাতে প্যাঁক প্যাঁক হলে লোকের তো ঘুম ভাঙবে।”

এই অবধি বলে শ্রীমধুসূদন থামল। চাটতে লাগল কাঁচা তেঁতুল, এখো গুড়। তখন একটা লোক কোত্থেকে হেঁটে এল কে জানে। পায়ে গাবদা বুট জুতো, ঢলঢল করছে তাই নারকোল দড়ি দিয়ে বাঁধা পায়ের সঙ্গে। লোকটা বেঁটেও না, লম্বাও না। ফর্সা না, কালোও বলা যাবে না। তার মাথা একবারে নিপিশ করে পালিশ করা। মানে একটুও চুল নেই। চকচকে টাক। গায়ে নীল জামা, কালো হাফ প্যান্ট পরা। এমন লোককে বলে টেকো ভূত, মানে তেঁতুলে ভূত। আসলে তো মাথাটা পাকা তেঁতুল দিয়ে কাঁসার বাসন যেমন মাজে, তেমনি করে মাজা। পুরনো টাক অমন করেই মাজতে হয়।

লোকটা শ্রীমধুসূদনের কথা শুনল। কী শুনল না বোঝা গেল না, বলল, “এই রিকশা যাবে?”

মধুদা দেখল লোকটাকে, কথা বলল না, মেপে নিল। তেঁতুল চাটতে লাগল। নিজের মনে বলতে লাগল, “কানচা তেনতুল পানকা তেনতুল.... ”

লোকটা আবার বলল, “কী হল, রিকশা যাবে?”

মধুদা বলল, “ঘুমোচ্ছে, ডাকবে না, কাল রাতে চোরে নিয়ে যাচ্ছিল, ওরে জাগাবে না মশায়।”

মধুদার কথায় লোকটা ঘাবড়ায় না, বলে, “আরে তোমারে জিজ্ঞেস করছি, যাবে?”

“আমি কি রিকশা?”

লোকটা হাসল, বলল, “সোলাদানা যাব, নিয়ে যাবে?”

মধুদা জিজ্ঞেস করল, “হেঁটে যাব?”

“আহা হেঁটে যেতে হলে আমি তো একাই চলে যেতাম, তোমারে বলতাম?”

“আমার রিকশার খুব ধকল গেছে কাল রাতে, এখন ও একটু ঘুমোক।”

চন্দ্রমোহন বুঝল, এর মানে শ্রীমধুসূদন রিকশা নিয়ে এখন কোথাও যাবে না। তেঁতুল খাচ্ছে সে। তেঁতুলের সুখ ছেড়ে কেন যাবে সোলাদানা? লোকটাও কম যায় না, বলছে, “তেঁতুল খেয়ে চলো।”

“না আঁজ্ঞে, আচ্ছা তুমি সোলাদানা যাচ্ছেন কেন?”

সে বলল, “দরকার আছে।”

"কী দরকার?"

"তোমার জানা দরকার?"

"হ্যাঁ আঁজ্ঞে, কেন আমি যাব তা জানতি হবে না?"

"না হবে না, ভাড়া দেব তুমি যাবা।"

মধুদা বলল, "চাঁদুদা তুমি সাক্ষী, আমি ভাড়া নিয়ে সোলাদানা যাচ্ছি, তুমি তুফানের সঙ্গে থেকো, ঘুম ভাঙলে ওরে আমার ভিটেয় নিয়ে গিয়ে নিম গাছে বেঁধে বাড়ি যেও, আমি সোলাদানা এই যাব, এই আসব, ছুটে যাব দৌড়ে আসব, দ্যাও পাঁচ পাঁচ দশ টাকা দ্যাও যাওয়া আসার জন্যি।"

গামবুট পালিশ টাক লোকটা হা হা করে উঠল, "আরে বলছ কী, রিকশা যাবে না?"

"কেন আমি গেলি হবে না?"

"আমি যে রিকশায় যাব।"

"তাহলে বসে থাক, আমি তেঁতুল খাই, আপনি নাও যদি চাও, রিকশার ঘুম ভাঙুক, কাল রাতে খুব ধকল গেছে, চোরে খুব টানাটানি করেছে, তুফান বলে ফিরে আসতে পারল, তুমি হলি চুরি হয়ে যেতে।"

গামবুট তার টাকে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, "এখেনে খুব চোরের উপদ্রব?"

"হ্যাঁ আঁজ্ঞে, খুব, কদিন আগে আমার বাবার আমলের গামছাখানা গেল।"

চন্দ্রনাথ বলল, "গেছে ভাল হয়েছে, ছিঁড়ে ছিঁড়ে ওর কিছু আর ছিল? গেল বলে নতুন গামছা পেলে।"

জিভ আলটাকরায় ঠেকিয়ে উফস করে উঠে মধুদা বলল, "কি টক, এমন টক কোথায় হয় বল চাঁদুদা, চোরে সন্ধান পেলি তেঁতুল আর থাকবে না, কী বলচিলে, পুরনো গামছার

কথা, ছিঁড়ে গিয়েছিল তাতে কী হয়েছিল, এখন রাতির বেলায় গামছাটার কথা মনে এলি আমার বুক হু হু করে ওঠে, বাপ মরার সময় ওটি আমারে দিয়ে গেছল, সে আজগের কথা চাঁদুদা?” বলতে বলতে চোখ মুছল মধুদা রিকশাওয়ালা।

গামবুট পালিশ টাক বলল, “চোরের আর নাম থাকল না, ছেঁড়া গামছাও চুরি হয় এখেনে।”

মধুদা বলল, “হয়, চোর ধরার জন্যি বসে আছি রিকশা নিয়ে।”

হে হে করে হাসল গামবুট, “বসে থাকলে চোর ধরা দেবে?”

“দেবে, দেবে বলে বসে আছি।”

“তাহলে আমি হেঁটে যাই সোলাদানা, রিকশা তো যাবে না।”

“রাত কাবার হয়ে যাবে,” মধুদা বলল।

“কী বলছ, ওই তো গোলাবাড়ির পর সোলাদানা, বাঁদিকে গেল ফকির হাটখোলা, ডানদিকে উত্তমপুর, পশ্চিমে মধ্যমপুর...” গড়গড় করে বলে গেল চন্দ্রমোহন।

“উত্তম- মধ্যমপুর,” বলল মধুদা।

“তার মানে?”

“মানে আবার কী, বাইরের লোক ওই গাঁয়ে গেলে উত্তম- মধ্যম না খাইয়ে ছাড়ে না ওরা, লাঠিসোঁটা নিয়ে বসে থাকে বাইরের লোকের জন্যি, তাই ঘুরপথে যেতি হবে।” বলে মধুদা তেঁতুলে জিভ দিল। চেটে নিল তেঁতুলের টক। তারপর এখো গুড়।

গামবুট মাথা পালিশ লোকটা বলল, “আমারে যে যেতিই হবে।”

“গিয়ে হবে কী, বরং তেঁতুল খাও এখেনে বসে, তারপর ফিরে যাও, ওদিকে গেলে নিঘ্‌ঘাত চোর চোর করে তাড়া করে আসবে, এদিকে এখন যত চুরি হচ্ছে তত চোর ধরার ফাঁদ পাতা হচ্ছে, এটা তুমি জেনে নাও, তোমার টেকো মাথা আমার চেনা।”

লোকটা মাথায় হাত দিল, তারপর বলল, “কী করে চিনলে তুমি?”

“আমার এক স্যাঙাতের অমনি টাক ছিল, চাঁদের আলো টাকে পড়লি কী সোন্দর যে লাগত! শোনো বাপ, আমার তুফান মেল রিকশারে যে নিতে এসেছিল তার মাথায়ও এমনি টাক, রাতে সেই টাকে জোছনা পড়ে খুব বিপত্তি, সব দেখা গেল, আমি দেখলাম পষ্ট, পরে তুফানও আমারে বলল, চোরের টাক ছিল, সেই টাকেতে পালিশ ছিল... সেই পালিশে জোছনা ছিল... জোছনার ভিতর চোর ছিল।”

“এসব কী বলছ তুমি, আমি স্বর্গত হরিশ মল্লিক, আমি যাব বেয়াই মশায় স্বর্গত নেপেন সাধুর বাড়ি, তুমি বলছ আমি রিকশা নিতে এসেছিলাম? হতে পারে না।”

“হতে পারে।” মধুদা তেঁতুল মুখে নিয়ে বলল, “হতেই হবে।”

গামবুট মাটিতে পদাঘাত করে ধুলো উড়িয়ে বলল, “আমি বলছি, না না না।”

মধুদা রিকশাওয়ালা হাততালি দিয়ে বলল, “আমি বলছি হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ।”

“আমি ঈশ্বর হরিশ মল্লিক বলছি, না না না।”

“আমি ছিরি মদুসূদন তুফানওয়ালা বলছি, মাথা পালিশ চোর এসে টানাটানি করেছিল আমার তুফানকে।”

“বেশ করেছিল, আবার করবে, কিন্তু তার মাথায় টাক ছিল না।”

“ছিল।”

“না না না।”

বেশ চলতে লাগল না হ্যাঁ, না হ্যাঁ। গামবুট গর্জন করতে লাগল। গর্জন করতে লাগল মধুদাও। তার ভিতরে ঘুমিয়ে আছে তুফান মেল রিকশা। তার চেন খুলে যায় চাকা ঘুরলেই। ব্রেক কাজ করে না যখন তখন। কত না গোলমাল। বেশিদূর তাকে নিয়ে যাওয়া ঝুঁকির। মধুদা তাকে নিয়ে ঝাউতলায় সারাদিন বসে থাকে। তেঁতুল খায়। আম জাম পেয়ারা খায় আর কত কথাই না বলে তুফান মেলের। সবাই মেনে নিয়ে পায়ে হাঁটা দেয়। কিন্তু তেঁতুলে পালিশ টাক আর গামবুট মানছে না। সেও সমানে সমানে বলে যাচ্ছে। বিকেল পড়ে আসছে। পাখিরা ঘরে ফিরছে। চন্দ্রমোহনের আচমকা খেয়াল হয়, কী নাম বলছে লোকটা.... স্বর্গত হরিশ মল্লিক। স্বর্গত কাদের বলে? বুকটা ধক করে উঠল। কে এল মধুদার কাছে? রিকশা চাপতে কে এল? চন্দ্রমোহন চুপি চুপি সরে আসতে থাকে। দুজনে গর্জন করছে...করে যাচ্ছে, সে বড়ো বড়ো পায়ে বাড়ির দিকে। স্বর্গত...! বুক ছমছম করছে খুব।

ছবিঃ মলয়চন্দন সাহা

এই বাড়িটা

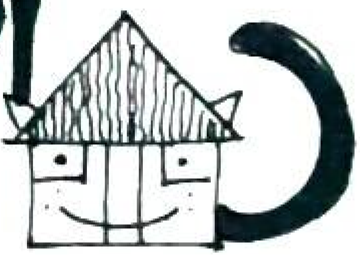

যশোধরা রায়চৌধুরী

মঞ্জিমাসিদের বাড়িটা একটা বড়োরাস্তার ওপরে। কিন্তু অন্যদিকে গলি আছে। রাস্তার উলটোদিকে একটা মাঠ। মাঠে যারা ঘুরে বেড়ায় তারা অনেকেই ওই বাড়িটার বাসিন্দা। বা ওখানে খেতে যায়, খেয়ে ফিরে আসে বাড়িটার বারান্দা থেকে সোজা লাফ দিয়ে মাঠে। মাঠের ঘাস নরম, সবুজ। ওর ওপর লাফানো বেশ সোজা।

ধুলি, ফলি, কলি আর মুলি। চার ভাইবোন। সাদা, সাদা পাটকিলে, সাদা কালো আর পাঁচমেশালি রঙ। বাকিরা তো শুধু খেতে যায়, লাইন করে যায়, খেয়ে ফিরে আসে। কিন্তু ধুলি ফলিদের আলাদা মানসম্মান আছে। ওরা ওই বাড়ির লোক। সবাই ওদের মান্যিগণ্যি করে।

মুলির নাক সবচেয়ে উঁচু। কারুর সঙ্গে কথাই বলে না এমনিতে। গায়ে ছোপ ছোপ কালো, লাল, খয়েরি, হলুদের ছোপ। এই রকমের রোশনাই দেওয়া কোট বেশি লোকের থাকে না। সব্বাই জানে পঞ্চরঙ্গীরা বেশি চালাক হয়। মুলির চলাফেরাও তাই অন্যরকম।

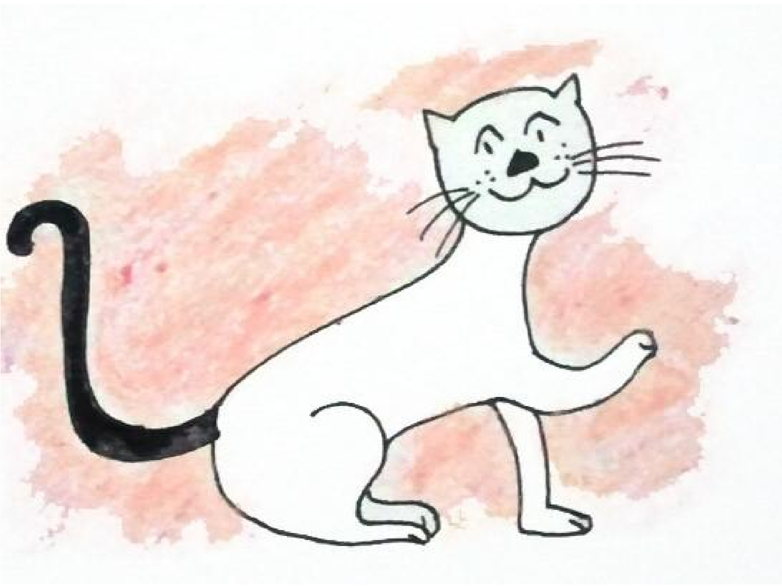

ধুলি একে সবার বড়ো। তায় সাদা ধবধবে। নাকের কাছে একটু কালো টিপ আছে। মঞ্জিদিদি বলে, নজর না লাগে তাই ভগবান ওকে কাজলের টিপ পরিয়ে পাঠিয়েছেন। বেশ বোকাসোকা, ভোলাভালা।

ফলি লাফাতে পারে দারুণ। অথচ ওর কথা কেউ মানে না। কলি খুব লোভা। সবচেয়ে আগে, খাবারের ডাক পড়লে ও দৌড় লাগায়। ও যখন লিডার হয়ে বাড়ির দিকে যায়, মাঠে নির্বিকার ঘুরতে থাকে ধুলি ফলি মুলি। মঞ্জিদিদি হয়ত তখন ডাকছে। আয় আয় আয়। ডাক বন্ধ হওয়ার আগেই কলি হাজির হয়ে যায়। কিন্তু অন্যরা

অপেক্ষা করবে কখন ডাক থামে। তারপর গটগট করে ওরা ঢুকবে, অ্যাজ ইফ পুরো নিজেদের ইচ্ছেতে চলছে। আসল কথা তো খাবার দেওয়া হয়েছে। গন্ধে মালুম হয়েছে।

খাবার দিয়েই মঞ্জিমাসি বলে, আয় আয় আয়। ধুলি আয় ফলি আয় কলি আয় মুলি আয়। গানের মত বেশ সুর করে বলে। শুনলেই কান খাড়া, লেজ খাড়া।

কিন্তু খাবারটা বেশি ডাকে ওদের। কারণ খাবারটার নিজের একটা গন্ধ আছে। আগে আরো বেশি ছিল। এক সময় ওদের বাড়িতে আসত কেষ্টা। বাজার থেকে ফেরার সময়, এক প্যাকেট মাছের কাঁটা দিয়ে যেত। বাজারে মাছ বিক্রি করে কেষ্টা। এই মাছের গন্ধটা জব্বর।

গলির ওইপ্রান্ত থেকে নাক উঁচু করে কলি মুলি পেয়ে যায়। ধুলির আবার একটা নাক একটু বন্ধ আছে। ওর ছোটবেলায় ফুলের বনে ঢুকেছিল, নাকে বোলতা হুল ফুটিয়ে দিয়েছিল। মরেই যেত, মঞ্জিদিদি খুব যত্ন করে, অ্যান্টিবায়োটিক খাইয়ে, তুলোয় ডেটল দিয়ে, ওকে বাঁচিয়েছে। এখন ওদের সবার মধ্যে তাই ধুলিকেই মঞ্জিদিদি বেশি ভালবাসে, হোক না ওর গোঁফ পোড়া। সে আরেক গল্প। ধুলি একবার জ্বলন্ত মোমবাতি শুঁকে দেখতে গিয়েছিল, ভেবেছিল মজার আলোটা দেখি তো শুঁকে, চেটে। নাকের চারপাশের সব বড়ো বড়ো, সুন্দর গোঁফ ফররর করে পুড়ে একদম শেষ। সেই যে গেল, ওর এখন মোমবাতি কেন শুধু , যে কোন আলো দেখলেই বেজায় ভয় করে।

আজকাল খাবারে তেমন গন্ধ নেই। মঞ্জিদিদির বোন রুপুদিদি আমেরিকায় থাকে, সে একগাদা ক্যাটফুড নামে একরকম জিনিস এনেছে। বড়ো বড়ো দশ কিলোর ছালায় পোরা গুঁড়ো গুঁড়ো ছোলার মত দেখতে সেগুলো। দূর থেকে গন্ধ হয়না, বরং খেতে শুরু করলে বেশ গন্ধ। আর খুব শুকনো, কাঁচা মাছের মত রসালো না। কিন্তু ধুলিদের অভ্যেস হয়ে গেছে। কী আর করা যাবে, যখন যেমন তখন তেমন, মঞ্জিদিদিই তো বলে, বলেই দেওয়ালে ঝোলানো একজন সাদা শাড়ি পরা দিদার ছবির দিকে তাকিয়ে নমো করে। ওই দিদাটাই নাকি মঞ্জিদিদিকে শিখিয়েছে , জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

সেটার মানে কী, কে জানে। তবে ধুলিদের মা অম্বা যখন ওদের এক মাস বয়সে ছেড়ে চলে গেল, তখন থেকে মঞ্জিদিদিই তো ওদের ড্রপারে দুধ খাইয়েছে, অনেক আদর যত্ন করে এই বড়োটি করেছে।

এখন ওরা পাড়া বেড়ায়। আর মঞ্জিদিদির বাড়িতে যে কাজ করে সেই আদুরি দিদি খুব রেগে বলেছে, সারা পাড়া ঝেঁটিয়ে আনা ময়লা কিছুতেই পরিষ্কার করবে না । আসলে ওর হিংসে হয়। এ বাড়ির সবাই ওর থেকে বেশি মান্যিগণ্যি করে ওই রাস্তার বেড়ালদের, এটা ও সহ্য করতে পারেনা।

একদিন আদুরি দিদি কেষ্টার সঙ্গে একটা ষড়যন্ত্র করল। কেষ্টার তো খুব রাগ, ওর চাকরি চলে গেছে। কাঁচা মাছ খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে যেদিন থেকে ধুলিদের, সেদিন থেকেই। খুব চটে আছে মঞ্জিদিদির ওপর। তাই, আদুরি দিদির সঙ্গে বাজারে দেখা হতেই বলল, "কী, তুমি এখনো তোমার সেই চারপেয়ে মুনিবগুলোর সেবাযত্ন করছ নাকি? কী লজ্জা কী লজ্জা।

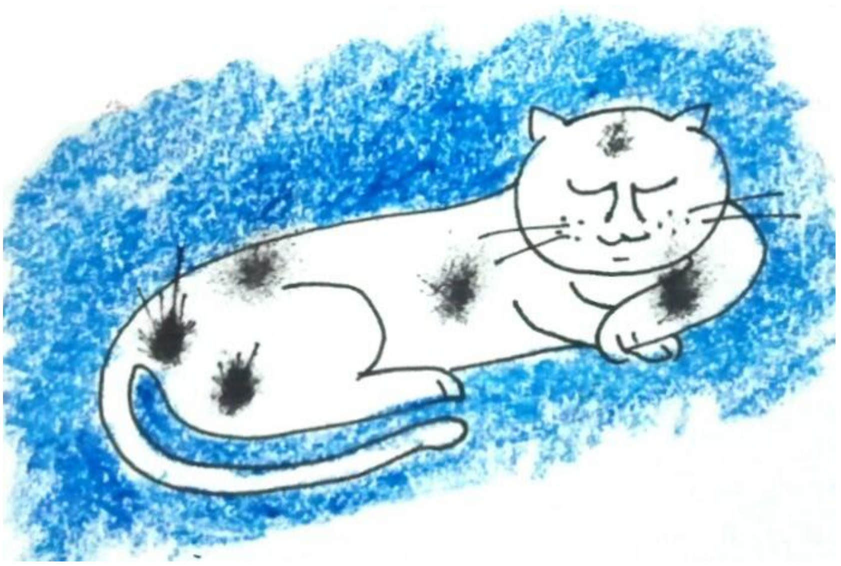

দু পেয়ে মানুষ হয়ে চারপেয়ে জন্তুদের সেবা করা, ওদের এঁটো সাফ করা, ওদের শোবার জায়গা করে দেওয়া। বাকি আরো নোংরা ব্যাপারগুলো তো ভাবাই যায় না। করো কী করে?"

আদুরি দিদি তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বলল, "কী করা যায় বল তো কেষ্টা ? এগুলোকে এখুনি ঝেঁটিয়ে বিদেয় করতে পাল্লে বাঁচি।"

প্ল্যান হয়ে গেল। বড়ো থলি দুটো নিয়ে রেডি থাকবে আদুরি দিদি। মঞ্জিদিদি শিগগিরি যাবে দু রাতের জন্য শান্তিনিকেতন, একটা কাজে। ওই দুদিনেই সব করে ফেলতে হবে।

থলির ভেতর একটু খাবার দিয়ে রাখবে। একবার যদি ওরা ভুল করে ঢুকে পড়ে, অমনি থলির মুখ বেঁধে ফেলবে, ফেলেই কেষ্টার হাতে হ্যান্ড ওভার। ওর সাইকেল করে গঙ্গার পাড়ে ছেড়ে দিয়ে আসবে ওদের।

"এই প্ল্যান যদি ঠিকঠাক করে নামিয়ে ফেলতে পারি, বুঝলে আদুরি দিদি, আমাকে একটা ভাল দেখে জিনিস দিও তো , তোমাদের মঞ্জি দিদির বোন তো আমেরিকা থাকে...তার আনা কত জিনিস তো দেখি এদিক ওদিক পড়ে থাকে তোমাদের ..."

"দোব রে, দোব।"

দুই ভিলেন মাঝরাত্তিরে বেড়াল পাচার করে। কিন্তু তিনজনকে কোন মতে ব্যাগে ভরতে না ভরতেই চতুর্থজন পালিয়ে যায়। সে কি এমনি হবার? কত আঁচড়কামড়, দুপদাপ, ধুমধাম। সারা বাড়ি লাফঝাঁপের পর তিনটে ব্যাগের মধ্যে লাফায় আর চেঁচায়, চেঁচায় আর লাফায়। দড়ি বাঁধা মুখ বুঝি খুলেই যায়।

ওদিকে, যেটা পালাল, সেটা পাঁচরঙাটা। মুলি। পাঁচ মিনিটে চীৎকার করে সারা পাড়ার "অবোলা জীব"দের ডেকে হাজির করল সে। ততক্ষণে অবশ্য সাইকেলে চেপে কেষ্টা বাকি তিনজনকে নিয়ে ভেগেছে।

বাড়িটার সামনে তিন দিন তিন রাত কুকুর বেড়াল এমনকি কাকেরাও ধর্না দিয়ে ছিল। মঞ্জিদিদি কাজকর্ম সেরে ফিরে এসে দেখল, লাইন দিয়ে বসে আছে অচেনা কারা কারা যেন। ঠিক অচেনা নয়। কুকুর পাগলা আর গোকুলকে কত দুধ পাঁউরুটি খাইয়েছে এক কালে। ওদের ভাইবোনদেরও। তবে তারা সব গাড়ি চাপা গেছে। নয়ত ডগ পাউন্ডে ধরে নিয়ে গেছে।

কাকেরাও আসে রান্নাঘরের জানালায়, শুকনো ভাত, আটারুটির গুঁড়ো খেয়ে যায়। ঠোঁট ঘষে জানালার শিকে। ওদের নিয়ে ইয়ার্কি? মঞ্জিদিদি সবার ভাষা বুঝতে পারে। সাদা শাড়ি পরা দিদাটাকে কি আর খামোখা পুজো করে নাকি?

আদুরি ভয়ে ভয়ে এল, মঞ্জিদিদির ডাকে।

"ধুলিদের দেখছি না কেন?"

"কে জানে কোথায় গেছে।"

"বললেই হল? কী পেয়েছিস? আমাকে যা বোঝাবি তাই বুঝব? ওরা চলেই যদি যায়, তাহলে কাকেরা এত বিচলিত, কুকুরেরা ক্ষিপ্ত, আর মুলি চটে কাঁই কেন? নিশ্চয়ই তুই কিছু করেছিস।"

"আঁই আঁই আঁই দিদি। আমি কী করব?"

"কেন, একবার তো তুই ওদের দুধ সব খেয়ে ফেলেছিলি।"

"আঁই আঁই, দুধ খাইনি গো! খেয়েছিলাম শুধু সরটুকুনি।"

"তা খা গে যা। তবে ওদের খুঁজে আনার দায়িত্বও তোর , এটা জানবি।"

পরদিন বাজারে গিয়ে কেষ্টাকে ধরল আদুরি। "ওদের ফিরিয়ে নে আয়। পয়সা দেবে দিদি। দেখিস। ঠিক পুরোস্কার দেবে।"

"ধ্যাত, কোত্থেকে আনব গো। সেই কব্বে ছেড়ে দিয়ে এয়েচি।"

"যাঃ। তবে তোর আর পারফুম হলনা। আমি একটা রেখেছিলাম তোর জন্য। "

সাতদিনের মাথায় ফিরে এল ধুলি, ফলি, কলি। পথ চিনে আসতে সময় লেগেছে। গন্ধ যতক্ষণ ঠিক দিকে বয় ততক্ষণ অসুবিধে হয় না। নইলে, একটু গুলিয়ে যায়।

ওরা একা ফেরেনি। সঙ্গে তাদের আরো তিন বন্ধু। রাস্তায় বন্ধুত্ব হয়েছিল। আলফা বিটা আর গামা।

এখন সারাদিন খেলে ওরা মাঠটায়। কাকেরা আর কুকুরেরাও আছে। তবে আদুরি দিদি আর ওদের সঙ্গে ঝামেলা করে না। কেষ্টার রাগও আর নেই। কারণ শুকনো ক্যাটফুড ফুরিয়ে গেছে। আবার চলে এসেছে কাঁচা মাছ। অনেক লাগছে এখন ।

ঘরদোর আর আগের মত নোংরা হয়না এখন। কারণ লিটার বক্স বসানো হয়েছে। তাতে বালি দেওয়া থাকে। ওরা বালি খুঁড়ে কাজ করে। বালি চাপা দেয়। মাঠ থেকে ঘুরে গিয়ে পাপোশে পা মুছে ঘরে ঢোকে। আর, নিজেদের মধ্যে মিলমিশ, তা বিশেষ নেই। সাতজন তো।

ছবিঃ মৌসুমী

অমিত দেবনাথ

অবশেষে একখানা বাড়ি দেখা গেল। অবশ্য একখানাই।

তবে দেখা যে গেছে, এই ঢের। রাস্তার যা দশা, আরও কিছুক্ষণ এই রাস্তায় গাড়ি চালাতে গেলে, গাড়ি নির্ঘাৎ জবাব দেবে।

বাড়িটা দূর থেকে দেখেই গ্রেস মার্টিন তার স্বামীর হাত চেপে ধরেছিল, "দেখেছো! ওখানেও নির্ঘাৎ কিছু জিনিস পাওয়া যাবে।"

তার স্বামী টম মার্টিন একটা "হুম" আওয়াজ করেই গাড়িটা ঢুকিয়ে দিল সোজা বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে। গ্রেস যেটাকে "জিনিস" বলল, কয়েকদিন ধরে বহু জায়গা ঘুরে সেই "অ্যান্টিক" সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছে তারা। গাড়ির আদ্ধেক বোঝাই হয়ে গেছে সেই সব জিনিসে। টমের অবশ্য তাতে কোন পরোয়া নেই। সদ্য এম. এ. পাশ করেই একটা দারুণ নামকরা স্কুলে শিক্ষকতার কাজ পেয়ে গেছে সে, গ্রেস তার সদ্য বিবাহিত সুন্দরী স্ত্রী।

বাড়িখানা সেকেলে, বহু পুরোনো আমলের, কিন্তু তার সাইনবোর্ডখানা ঝকঝক করছে –"ট্যুরিস্টস্ রেস্ট"। নতুন রঙ করা বোধহয়। গাড়ি থেকে তারা নামতে না নামতেই বাড়ির জীর্ণ দরজাটা আওয়াজ করে খুলে গেল। বেরিয়ে এলেন একজন মানুষ, বাড়িটার সমবয়সীই বোধহয়, মাথার পাকা চুলগুলো এই শেষ বিকেলের আলোতেও চকচক করছে, নড়বড়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে অভ্যর্থনা করলেন তাদের। দরজায় হাসিমুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন পুতুল পুতুল চেহারার এক বৃদ্ধা, তাদের ভেতরে নেওয়ার জন্য।

"আসুন, আসুন," হাসিমুখেই বললেন বৃদ্ধ ভদ্রলোক, "খুব ক্লান্ত লাগছে আপনাদের। আগে আপনাদের ঘর দেখিয়ে দিই, হাত- মুখ ধুয়ে চাঙ্গা হয়ে নিন, পরে চা খেতে খেতে আলাপ করা যাবে। আপনাদের ঘর দোতলায়, আশা করি কোন অসুবিধে হবে না।"

অসুবিধে হওয়ার কথাও নয় অবশ্য। কারণ বাড়িটার চেহারা বাইরে থেকে যা-ই দেখাক না কেন, ভেতরে ঘরটা দারুণ। ঘরের ভেতর পেল্লাই একখানা খাট, তাতে ইয়া পুরু গদি, একেবারে দুগ্ধফেননিভ শয্যা যাকে বলে। টম তো একটা লাফ মেরে বিছানায় লম্বা হল, আরামের আওয়াজ করল মুখ দিয়ে, কারণ সারাদিন ধরে গাড়ি গাড়ি চালিয়ে চালিয়ে পিঠটার আর কিছু নেই।

খানিকক্ষণ বাদে, চোখেমুখে জল দিয়ে চাঙ্গা হয়ে তারা নেমে এল নীচের একখানা ঘরে। এটাই বোধহয় ডাইনিং রুম, খুব হালকা একটা আলো জ্বলছে সেখানে, পুরোনো আমলের যত জিনিসপত্র বোঝাই ঘরটায়, আর একটা অদ্ভুত গন্ধ, পুরোনো দিনের বাড়িতে যেরকম গন্ধ থাকে।

বহু পুরোনো অথচ চমৎকার চায়ের কাপে (চায়ের কাপগুলোও অবশ্য "অ্যান্টিকের" পর্যায়ে পড়ে) চা এগিয়ে দিতে দিতে বললেন বৃদ্ধা মহিলা, "আমার নাম অ্যানা উইগিন। আপনারা আমায় অ্যানা বলেই ডাকবেন। আর উনি আমার স্বামী।" মহিলা বৃদ্ধ ভদ্রলোকের দিকে ইঙ্গিত করলেন।

"আমার নাম টম মার্টিন," বলল টম, "আর এই হল আমার স্ত্রী গ্রেস।"

"আলাপ করে খুশি হলাম," বললেন বৃদ্ধ ভদ্রলোক, যাঁর নাম জেসপার। "তা এদিকে কি বেড়াতে এসেছেন?"

"বেড়াচ্ছিও, আবার অ্যান্টিকও সংগ্রহ করছি। আপনাদের এখানেও এসেছি সেই কারণেই। পুরোনো আমলের ঘর সাজাবার সেরকম কোন জিনিসপত্র আছে নাকি আপনাদের কাছে?" ঘরের পুরোনো জিনিসগুলো দেখেই অবশ্য টম বলেছিল কথাগুলো।

"আজ্ঞে না, আমরা অ্যান্টিক রাখি না। যেগুলো দেখছেন, এগুলো সবই আমাদের দরকারি জিনিস। কাজে লাগে।"

হঠাৎ অ্যানা একগাল হেসে বললেন, "আপনাদের সদ্য বিয়ে হয়েছে মনে হচ্ছে?"

"ঠিকই ধরেছেন। সবে পাঁচ দিন হল," গ্রেস বলল।

"আপনারা তো খুবই ছেলেমানুষ," জেসপার বললেন।

"কই আর ছেলেমানুষ! আমার বয়স বাইশ, টমের চব্বিশ।"

জেসপার এমনভাবে মাথা দোলালেন যেন তিনি কিছু একটা আন্দাজ করেছিলেন এবং সেটা সঠিক। যদিও তিনি বলেননি তাঁর এবং অ্যানার বয়স কত। তিনি বললেন, "আমিও আমার স্ত্রীর থেকে বয়সে সামান্য বড়। তারপর চায়ে একটা চুমুক মেরে বললেন, আপনাদের তো তাহলে অবশ্যই আপনাদের জন্মতারিখগুলো অ্যানাকে বলা উচিত।"

"আমাদের জন্মতারিখ? কেন? কী ব্যাপার?" গ্রেস একটু হকচকিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল।

"অ্যানার একটা দারুণ গুণ আছে। ও কারুর জন্মতারিখ জানতে পারলে, সেই তারিখ থেকে ভবিষ্যৎবাণী করতে পারে।"

"আরে বাঃ! কীভাবে পারেন, অ্যাঁ, মিসেস উইগিন?"

"পা –রি," মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন বৃদ্ধা, "কত তারিখে তোমার জন্ম, সোনামণি?"

"এগারোই মে।"

"আরে না না," টম হেসে ফেলল, "ও ..."

আচমকা থতমত খেয়ে চুপ করে গেল সে, কারণ বৃদ্ধার চোখমুখের আকার বদলে গেছে।

জেসপার উঠে পড়লেন চেয়ার থেকে, হাত রেখেছেন তাঁর স্ত্রীর কাঁধে। ঘরের আলোটা যদিও খুবই আবছা, তবুও বোঝা যাচ্ছিল জেসপারের বলিষ্ঠ দুটো হাত আর লম্বা লম্বা আঙুলগুলো। আস্তে আস্তে তিনি বলছেন তাঁর স্ত্রীকে, "অ্যানা, বহুদিন পর সুযোগ এসেছে। এখন একদম উত্তেজিত হবে না। মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে।"

গ্রেস মার্টিনের গাটা কেমন শিরশির করে উঠল। স্বামীর দিকে একটা চোরা চাহনি দিয়ে সে বলল, "ঐ তারিখটার কোন বিশেষত্ব আছে কি?"

"ওটা অ্যানারও জন্মদিন।"

"তাই নাকি? তাহলে তো আমাদের ব্যাপারই আলাদা, কী বলেন?"

"কী সব আজে বাজে বকছ?" বলে উঠল টম, "নিজের জন্মদিনটা ..."

"ওঃ, টম, প্লিজ!"

"আরেক রাউন্ড চা খাওয়া যাক," বৃদ্ধ বললেন, "নতুন আরেক সেট কাপে। আর তার সঙ্গে টোস্ট।"

তিনি রান্নাঘর থেকে এক ট্রে বোঝাই করে চা টোস্ট নিয়ে যখন ফিরলেন, তখন বাকিরা জন্মদিন সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে হাসিঠাট্টা করছে। চারটে কাপে চা ঢেলে তিনি চেয়ারে বসে হাত তুলে বললেন, "এবারের চা- টা হল এই মহিলা দুজনের জন্মদিনের উদ্দেশ্যে।"

আবছা আলোতেও দেওয়ালে বিরাট হয়ে পড়ল তাঁর ছায়াটা। নিজের হাতে তিনি চা এগিয়ে দিলেন টম আর গ্রেসের দিকে। সবাই হেসে চায়ে চুমুক দিল।

"গিন্নি, দেখেছ তো," বৃদ্ধ বললেন, "বৃথা গেল না তাহলে।"

"কী বৃথা গেল না?" টম জিজ্ঞেস করল।

"গতকালই অ্যানা বলেছিল যে এ জায়গাটা আর ভাল লাগছে না, অন্য কোথাও চলে গেলেই হয়। আজকাল আর এই রাস্তা দিয়ে ট্যুরিস্ট বেশি আসে না। আর যাও বা আসে, তাদের মধ্যে থেকেও ঠিকঠাক লোক পেতে বহু বছর অপেক্ষা করতে হয়।"

"ঠিকঠাক লোক পেতে অপেক্ষা মানে?"

"আরে একই জন্মদিনওলা লোক, বুঝলে না?"

টম কথা না বলে ঘাড় নাড়ল। বুড়োদুটোর শোওয়ার সময় হয়ে গেছে, তবু যাচ্ছে না কেন, কে জানে। বহুদিন কোন কথা বলার লোক পায়নি বোধহয়, তাই এখনো বসে আছে। বসে আছে আর আগডুম বাগডুম বকছে। বয়স হলে ঠিক রুটিন মেনে না চললে তো এ জিনিস হবেই। কাল তাদের তিনশো মাইলেরও বেশি লম্বা রাস্তা পাড়ি দিতে হবে, এখন একটু বিশ্রামের অত্যন্ত প্রয়োজন। কাজেই ব্যাপারটা বাড়াবাড়ির পর্যায়ে যাওয়ার আগেই সে উঠে পড়ল।

“আরে দাঁড়াও দাঁড়াও,” জেসপার উইগিন বললেন, “ঘুমের সময় তো আর চলে যাচ্ছে না। তোমাকে একটা জিনিস বলি, এ জিনিস তুমি বোধহয় আগে শোনো নি।”

অগত্যা একটু কাষ্ঠ হেসে টম আবার বসল চেয়ারে।

“কিভাবে দীর্ঘজীবন লাভ করা যায়, সে সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণা আছে?”

“আজ্ঞে না।”

“একটা আশ্চর্য অঙ্কের খেলা কাজ করে চলেছে প্রকৃতিতে, বুঝলে,” বৃদ্ধ বললেন, “আমরা জানি, প্রতিদিন বহু মানুষ জন্মায়, বহু মানুষ মরেও যায়। কিন্তু এই আশ্চর্য অঙ্কটা দুইয়ের মধ্যে একটা ভারসাম্য বজায় রাখে।”

“বলেন কী?” টম একটা হাই চাপার প্রাণপণ চেষ্টা করতে করতে বলল।

“ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার করে বলছি, মন দিয়ে শুনলেই বুঝতে পারবে। প্রত্যেক দিনের জন্য –এই ধর, এগারোই মে, বা নয়ই জুন, বা ছয়ই ডিসেম্বর, বা যাই হোক না কেন, সময়ের মধ্যে আলাদা খোপ থাকে। এখন ধর, আজকে যাদের জন্ম হল, সময়ের মধ্যে এদের জায়গা হবে কিন্তু এই একই তারিখে ঠিক আগের বছর যারা জন্মেছে, তাদের সঙ্গে। এই অঙ্কটা যদি ঠিক ঠিক কাজ করে, তাহলে, আজ যারা জন্মেছে, তারা গত বছর একই দিনে যারা জন্মেছে, তাদের থেকে পাক্কা এক বছর বেশি বাঁচবে। অন্যান্য দিনগুলোর জন্যও এরকম ব্যাপারটা চলতে থাকবে। আমার কথা শুনছো তো?”

“হ্যাঁ ..., ” ঘুমচোখে জবাব দিল টম।

“কিন্তু এই অঙ্কটা সব সময়ে খাটে না। খাটে না এই কারণেই যে অসুখ- বিসুখ, দুর্ঘটনা –এইসব নানারকম কারণে অনেকে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই মরে যায়। বাকিরা বেঁচে থাকে ঐ ভারসাম্যটা রক্ষা করার জন্য।”

“নিশ্চয়ই,” বিড়বিড় করল টম।

“বিভিন্ন সময়ের বছরে এই যে বিভিন্ন সময়ের খোপ, এগুলো এভাবেই পরিচালিত হতে থাকে। অঙ্কের নিয়মেই জীবন বয়ে চলেছে, ঠিক যেভাবে অঙ্কের নিয়মে ঘুরে চলেছে গ্রহ আর নক্ষত্ররা।”

“আপনার কথায় যুক্তি আছে বটে,” টম বলল। টেবিলের ওপাশে বসে তার স্ত্রী গ্রেস বোধহয় ঘুমিয়েই পড়ল। “কিন্তু তাহলে জনসংখ্যা বাড়ছে কিভাবে?”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেটাও হিসেব করে দেখা হয়েছে। এত যুদ্ধ হয়েছে, মহামারী হয়েছে, এই হয়েছে, সেই হয়েছে –এতেও তো বহু লোক মরেছে। বাকিরা তাদের জায়গা নিচ্ছে। সময় পেলে আমি পুরোটাই তোমাকে বুঝিয়ে দিতে পারি।”

“আপনি এসব নিজে ভেবে বার করেছেন, মিঃ উইগিন?”

“আমি? না না, আমি না। একবার গরমকালে এক ইউরোপিয়ান ভদ্রলোক বেড়াতে এসে আমাদের সঙ্গে মাসখানেক ছিলেন। এই বাড়িতে নয় অবশ্য। তখন আমরা অন্য জায়গায় থাকতাম। তারপর থেকে আমরা বহুবার বাড়ি পাল্টেছি। তাঁর নাম ছিল মারেক জিয়ক। লোকটা ছিল অঙ্কের জাদুকর। আমাদের সঙ্গে থাকার সময়েই ওঁর একটা দুর্ঘটনা ঘটে। খুব বুড়ো হয়ে গেছিলেন তো –একদিন রাত্তিরে সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে কোমরে খুব চোট পান। ঐ বয়সে আর এই ধাক্কা সামলাতে পারেননি ভদ্রলোক, মারাও গিয়েছিলেন তার কয়েকদিনের মধ্যেই। খুবই দুঃখজনক ব্যাপার –তবে ঘটনা হল, ততদিনে আমরা ওঁর খুবই বিশ্বাসভাজন হয়ে গেছিলাম, যার জন্য মরার আগে উনি আমাদের এই ব্যাপারটা সম্বন্ধে বলে গেছিলেন।”

“ও। আচ্ছা।”

“বিশ্বাস হচ্ছে না?” জেসপার উইগিন বললেন, “জিয়ক সেসময় একটা বই লিখছিলেন –দর্শনের বই, কিন্তু পুরোটাই অঙ্কের ওপর ভিত্তি করে। বইটা তিনি শেষ করে যেতে পারেন নি। তবে ওর পান্ডুলিপিটা আমার কাছে আছে ..., ”

বৃদ্ধ চেয়ার থেকে উঠে বইয়ের আলমারি থেকে বার করে আনলেন একতাড়া কাগজ, “এটা পড়ে দেখলে পুরোটাই বুঝতে পারতে ... কিন্তু তোমার বোধহয় আর সময় হবে না,” মাথা নেড়ে বৃদ্ধ কাগজগুলো জায়গায় রেখে এলেন।

“আমার স্ত্রী ঘুমিয়ে পড়েছে বোধহয়। ওকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া দরকার।”

“ঠিক। মেয়েদের ক্ষেত্রেই ওটা আগে কাজ করে।”

“কী বললেন?”

“বলছি, মেয়েদের ক্ষেত্রেই ওটা আগে কাজ করে।”

““ওটা” মানে?”

“পাউডারটা।”

“পাউডার! তার মানে আপনি বলছেন ..., ” গ্রেসের দিকে একবার তাকিয়ে দুহাতে ভর দিয়ে বেশ কষ্ট করে উঠে দাঁড়াল টম, “আপনি চায়ে কিছু মিশিয়েছেন ... ”

“তোমাকে তো এতক্ষণ ধরে বললাম,” বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়লেন জেসপার উইগিন, “তুমি কিছুই না বুঝলে কী করব? তোমার স্ত্রী আর আমার স্ত্রী সময়ের একই খোপের অংশীদার। ওদের জন্মদিন একই। দেখতেই তো পাচ্ছ যে আমি আর অ্যানা স্বাভাবিক মানুষের তুলনায় অনেক বেশি বয়সী। সেটা কিভাবে সম্ভব হল, বুঝতে পারছ না?”

“তার মানে, আপনি ... আপনারা মানুষ খুন করে ... ”

“ঠিক ধরেছ।”

“আর এখন আপনি গ্রেসকে খুন করতে যাচ্ছেন?”

“শেষবার ঠিক লোকটাকে পাওয়া গেছিল উনিশ বছর আগে,” বৃদ্ধ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, “তাই না অ্যানা?”

বৃদ্ধা মাথা নেড়ে বললেন, “জেসপার সেদিক থেকে ভাগ্যবান। ও শেষ লোকটাকে পেয়েছিল আট বছর আগে।”

“উন্মাদ! বদ্ধ উন্মাদ আপনারা!” চিৎকার করে উঠল টম মার্টিন, “গ্রেস, উঠে পড়! চলে এস! আমাদের এক্ষুণি এখান থেকে চলে যেতে হবে!” কিন্তু টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে স্ত্রীকে ধাক্কা দিয়ে জাগানোর আগে সে নিজেই টলে পড়ে গেল চেয়ারটার ওপরেই, মাথা ঝুঁকে পড়ল বুকের ওপর।

কয়েক মুহুর্ত পর, আপ্রাণ চেষ্টা করে মাথা তুলল টম, জেসপার আর অ্যানা উইগিনের মুখগুলো দেখার চেষ্টা করল। কি যেন একটা মনে পড়ি পড়ি করেও পড়ছে না –কী যেন ওরা বলেছিল –নাকি তারই কিছু একটা বলার ছিল, কিন্তু তখন বলেনি...

"ভয় নেই, খোকাবাবু, কোন কষ্ট হবে না," বৃদ্ধ জেসপারের গলায় সহানুভূতির সুর, "তোমরা দুজনেই ঘুমিয়ে পড়বে।"

"আমরা... দু- জ- নে..."

"নিশ্চয়ই। দুজনেই। তোমাদের দুজনকেই মেরে ফেলতে হবে। না হলে তো তুমি বলে দেবে সবাইকে।"

"দাঁড়ান," টম অতিকষ্টে ফিসফিস করে বলল। তার চোখের সামনে এখন ছায়ারা নাচানাচি করছে। "দাঁড়ান..."

"তুমি মরে গেলেও অবশ্য ক্ষতি হবে না কোনও। বরং তোমার সময়ের খোপের কারও লাভ হবে। সে আরও বেশিদিন বাঁচবে, যার জন্মদিন আর তোমার জন্মদিন একই।"

"জন্মদিন," বলে উঠল টম, "জন্মদিন! হ্যাঁ, হ্যাঁ, জন্মদিন! এই তো সেই কথাটা! আপনারা ভুল করছেন... এগারোই মে..." দারুণ কষ্ট হচ্ছিল তার কথা বলতে, তবু আরও দেরি হয়ে যাবার আগেই প্রাণপণ চেষ্টায় সে শেষ করতে চাইছিল তার কথাটা, "গ্রেসের জন্মদিন নয়..."

"শান্ত হোন মিঃ মার্টিন," বিষণ্নস্বরে বললেন জেসপার উইগিন।

"না, না! বিশ্বাস করুন, এটা সত্যি! গ্রেস এগারোই মে- তেই জন্মেছে, কিন্তু ম্যানিলায়! ম্যানিলা ফিলিপাইন্স- এ। ওর বাবা ওখানকার কলেজে পড়াতেন। ওটা আন্তর্জাতিক তারিখরেখার ওপারে। ওটা অন্য সময়- ক্ষেত্র! বুঝতে পারছেন কথাটা? পুরো একদিনের তফাৎ..."

তার চোখের সামনে এখন সব অন্ধকার, ঘর অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে, তার মনে হল, ভেসে এল একটা কান্নার আওয়াজ। মনে হল বৃদ্ধা কাঁদতে শুরু করেছেন, এবং তারপর সে শুনতে পেল, সেটা নিশ্চিতভাবে বৃদ্ধ জেসপারের গলা, তিনি বলছেন, "শান্ত হও, অ্যানা, শান্ত হও। কেঁদো না। আমরা অন্য কাউকে পেয়ে যাব নিশ্চয়ই, বেশি দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই। আমরা অপেক্ষা করব..."

তারপর সব মুছে গেল টমের চোখের সামনে থেকে।

চোখে রোদ পড়ায় ঘুম ভেঙে গেল টমের। সে শুয়ে আছে সেই পেল্লায় খাটখানায়। পাশে শুয়ে গ্রেস, এখনও গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। তাদের জামাকাপড় পাটপাট করে ভাঁজ করে চেয়ারের ওপর রাখা।

টম একটা হাই তুলে উঠে বসল। গ্রেসেরও ঘুম ভেঙেছে। গ্রেস বলল, "সুপ্রভাত।"

"এখানে আমরা এলাম কীভাবে বলতো? আমার তো কিছুই মনে পড়ছে না।"

"আমারও।"

"দোতলায় এলাম কীভাবে, জামাকাপড়ই বা ছাড়লাম কখন, ভাঁজই বা করলাম কখন? গ্রেস...," টমের চোখে ভ্রূকুটি, "আমি কখনও জামাকাপড় ভাঁজ করি না, তুমি তো ভালো করেই জানো।"

"আমার যা মনে পড়ছে," গ্রেস মস্ত এক হাই তুলে বলল, "তা হল, আমি টেবিলেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম," ঘড়ি দেখল সে, "যাই হোক, এবার বেরোন উচিত। ন"টা বেজে গেছে।"

খানিকক্ষণের মধ্যেই তারা তৈরি হয়ে নীচে নেমে এল। টমের হাতে সুটকেস। অ্যানা উইগিন ডাইনিং রুমেই ছিলেন, এগিয়ে এসে বললেন, “সুপ্রভাত! ঘুম ভাল হয়েছিল তো?” বলে তাদের মুখের দিকে তাকালেন।

“হ্যাঁ, হয়েছিল,” সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল টম।

“ কাল এত ক্লান্ত ছিলেন,” অ্যানা বললেন, “জলখাবার খেয়ে বেরোবেন তো?”

“না, এক্ষুনি বেরোব, অনেক দেরি হয়ে গেছে।”

টম মানিব্যাগ বার করল। রাত্তিরের ভাড়াটা মেটাতে হবে। অ্যানা ওদের একটু অপেক্ষা করতে বললেন। কারণ তাঁর স্বামী চায়ের কাজ করতে মাঠে গেছেন, তাঁকে ডেকে আনতে হবে। অ্যানা গেলেন স্বামীকে ডাকতে, টম আর গ্রেস মার্টিন গেল তাদের গাড়ির দিকে। গাড়িতে সুটকেস তুলে দিয়ে গ্রেস বসে রইল, টম আবার ফিরে এল বাড়িতে, একা।

ফিরে এল, কারণ ডাইনিং রুমে এসেই তার নজরে পড়েছিল আগের রাত্তিরের সেই টেবিল, টেবিলের ওপর রাখা ট্রে, চায়ের সেট এবং পরের বারের কাপগুলো। ঐ কাপগুলো দেখেও প্রথমে সবই গোলমাল ঠেকছিল, পরক্ষণেই মনে পড়ে গেছিল আগের রাত্রের সমস্ত ঘটনাগুলো, গ্রেসেরও মনে পড়ে যায় ঘুমিয়ে পড়ার আগের সমস্ত ঘটনাই।

সে বইয়ের আলমারি থেকে চট করে টেনে আনল সেই কাগজের তাড়াখানা।। সত্যিই, এটা একটা পান্ডুলিপিই বটে, হাতে লেখা, পাতাগুলো সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হলদে হয়ে এসেছে। পান্ডুলিপির নাম –অঙ্কের মাধ্যমে জীবনের ব্যাখ্যা, লেখকের নাম লেখা আছে মারেক জিয়ক।

লেখকের নামের তলায়, অন্য একটা হস্তাক্ষরে লেখা –জন্মঃ ১৬১৩ মৃত্যু (দুর্ঘটনায়) ১৮০২।

রান্নাঘরে কারোর পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঝট করে পান্ডুলিপিটা জামার ভেতর ঢুকিয়ে ফেলে বইয়ের আলমারির কাছ থেকে পিছিয়ে এল টম।

চমৎকার গাছে ছাওয়া রাস্তা দিয়ে ছুটে চলেছিল তাদের গাড়িখানা। গ্রেস বলল, “ওঃ, জানো, আমার এখনও ঘুম পাচ্ছে। অদ্ভুত বাড়িটা, না? ঐ বাড়িটায় ঢুকলেই বোধহয় ঘুম পায়। আর বুড়োবুড়িদুটোও কেমন অদ্ভুত রকমের। তবে ওদের দু”জনেরই ব্যবহার কিন্তু খুব ভালো। তাই না?”

“যা বলেছ,” টম বলল।

“কত বয়স্ক ওঁরা, না? আমার এখন আশ্চর্য লাগছে।”

টম উত্তর দিল না। এ ব্যাপারটা তার আগেই ভাবা হয়ে গেছে। সে এখন ভাবছিল ঐ বাড়ি থেকে ঝেড়ে আনা পান্ডুলিপিটার কথা। কী সব অমূল্য সম্পদ লুকোনো আছে ঐ পান্ডুলিপিটার মধ্যে, ভাবা যায় না! এর মধ্যে অঙ্ক কষে, রীতিমত তথ্য দিয়ে বোঝানো আছে, একজন মানুষ কীভাবে দীর্ঘজীবন লাভ করতে পারে।

যদিও, পুরো ব্যাপারটাই ভূতুড়ে এবং অশুভ। তবুও...

ভাববে না ভেবেও সে ততক্ষণে ভাবতে শুরু করেছে তার স্ত্রীর এবং তার নিজের জন্মদিনের কথা।

[জাস্টিন কেস (Justin Case) রচিত “মেনি হ্যাপি রিটার্নস” অবলম্বনে]
ছবিঃ মৌসুমী

১

বাবা চাকরিসূত্রে বাইরে থাকলেও পুজোর ক”টা দিন অন্য কোথাও যান না। বাড়িতেই থাকেন। আর রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর প্রত্যেকবারই গাড়ি নিয়ে আমরা ঠাকুর দেখতে বের হই। একদিন কলকাতার উত্তর, একদিন দক্ষিণ আর একদিন পাড়ায়, মোটামুটি এই আমাদের প্রোগ্রাম থাকে। এইবারে ষষ্ঠীর দিন রাতে বাড়ি ফিরে বাবা খাওয়া দাওয়ার পর মাকে বললেন,”আমাদের কলিগ নীল, তোমার নীলকে মনে আছে তো?”

“বা রে! মনে থাকবে না কেন? কতবারই তো এসেছে আমাদের বাড়ি,” মা বললেন।

“নীলদের দেশের বাড়িতে দুর্গাপুজো হয়। বহুদিনের পুরোনো নাকি। প্রায় সত্তর- আশি বছর তো হবেই। একদম বাঙালি মতে সাবেকি পুজো। একচালা ঠাকুর, সবুজ রঙের মহিষাসুর আর সিংহটাও ঠিক সিংহ নয়, সিঙ্গি। বহুবারই বলে ওদের ওখানে যাবার কথা। এবারও বারবার বলছিল তোমাদের সকলকে নিয়ে যাবার জন্যে। যাবে নাকি, তাহলে অষ্টমীর দিন ভোরে বেরিয়ে পড়ব, সন্ধিপুজো দেখে নবমীর বিকেলে চলে আসব।”

“বাঃ তবে তো দারুণ ব্যাপার। চলো না, মা, ঘুরে আসি,” আমি বললাম।

“তাছাড়াও কি একটা সমস্যার কথা বলছিল নীলু। তোর মার সাহায্য চান নীলুর মা।”

“তাই নাকি? তাহলে তো ফাটাফাটি। তাহলে আর অষ্টমী কেন? কালই চলো।” আমি বললাম।

মায়ের আপত্তি নেই জেনে, বাবা ফোন লাগালেন নীলকাকুকে, আমরা আগামীকাল যে নীলকাকুর দেশের বাড়ি যাবো, বাবা সেটা জানিয়ে দিলেন।

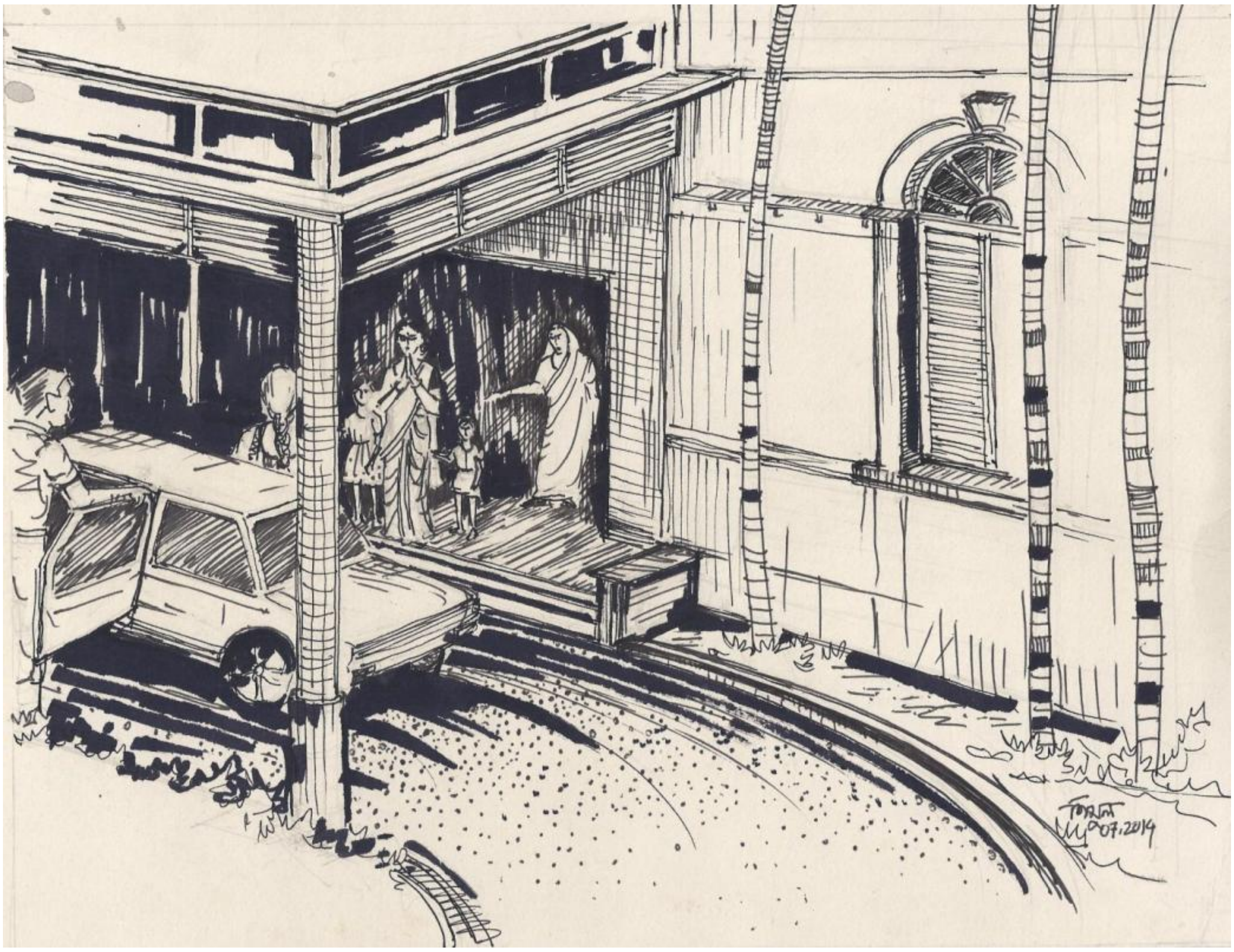

২

পরের দিন সকাল সাড়ে নটা নাগাদ বিশাল লোহার গেট পেরিয়ে আমরা ঢুকে পড়লাম নীলকাকুদের প্রাসাদোপম বাড়ির চৌহদ্দিতে। মুরাম বিছোনো রাস্তা গোল হয়ে ঘুরে গেছে গাড়ি বারান্দার নীচে দিয়ে। আমাদের গাড়িটা একদম দরজার সামনেই দাঁড়াতে, গাড়ির শব্দ পেয়ে দরজায় এলেন নীলকাকুর স্ত্রী রত্নাকাকিমা, নীলকাকুর দুই মেয়ে , ইতি আর উতি। ইতি বড়ো - ক্লাস থ্রিতে পড়ে আর উতি ছোট্ট তবে স্কুলে যায় - কেজি ওয়ান বা টুতে পড়ে। একটু পিছন থেকে ধীর পায়ে হেঁটে আসছিলেন বোধহয় নীলকাকুর মা। বেঁটেখাটো, একটু মোটাসোটা খুব ফর্সা বয়স্কা মহিলা। বয়সের কারণে চলতে একটু অসুবিধে হয় বোঝা যায়। হাঁটুতে ব্যথা পান নিশ্চয়ই। আমরা সবাই গাড়ি থেকে নেমে দরজার সামনে দাঁড়াতে উনি নিজেই বললেন, "আমি নীলুর মা, আমাকে মাসীমা বলতে পারো, মা। এসো মা এসো। মায়ের বাড়ি এক মেয়ে এসেছে ছেলেমেয়েকে নিয়ে, কিন্তু সঙ্গে জামাই আসে নি। আর তুমি এলে মা, সঙ্গে জামাই নিয়ে, ছেলে নিয়ে, ঘর পূর্ণ হয়ে গেল। এসো এসো, ভেতরে এসো।"

৩

খুব ভোরে উঠে কলকাতা থেকে রওনা হবার জন্যে দুপুরে খাওয়ার পর আমরা সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সাড়ে চারটে নাগাদ আমরা ঘুম থেকে উঠে সবে বারান্দায় বেরিয়েছি, নীলকাকুর মা এসে পড়লেন। সঙ্গে নীলকাকু। মায়ের পিঠে হাত রেখে নীলকাকুর মা বললেন, "যে জন্যে তোর অপেক্ষায় ছিলাম, সেটা এই বেলা বলে নিই, তা নইলে ওদিকে আবার আরতির সময় হয়ে যাবে। মায়ের আরতি দেখবি তো?"

মা বললেন, "মায়ের পুজো আরতি দেখতেই তো আসা। আপনি বলুন মাসীমা, কী কথা?"

নীলকাকু বললেন, "শুরুটা আমি বলে নিই, মা। তারপরে না হয় তুমি বোলো..."

"সেই ভালো। তুইই শুরু কর।"

নীলকাকু নিজেকে একটু গুছিয়ে নিলেন, তারপর শুরু করলেন ,

"আমাদের এই দত্ত পরিবারের উত্থানের শুরু আমার ঠাকুরদাদা - নরনারায়ণ দত্তর হাত ধরে। তার আগে আমরা এই গ্রামে সচ্ছল এবং সম্পন্ন এক পরিবার ছিলাম মাত্র, কিন্তু বাড়বাড়ন্ত আমার দাদু নরনারায়ণ দত্তর সময়েই। দাদু ছিলেন অসাধারণ মেধাবি। গ্রামের পাঠশালা আর প্রাইমারি স্কুলের গণ্ডি পার করেও তাঁর লেখাপড়ার তীব্র আগ্রহ দেখে দাদুর বাবা, আমার প্রপিতামহ শিবনারায়ণ ছেলেকে বর্ধমানে পাঠান এবং সেখানেই বোর্ডিং- এ থেকে তিনি হাইস্কুলের পাঠ শেষ করেন। শিবনারায়ণের মুখ উজ্জ্বল করে আমার দাদু ভীষণ ভাল রেজাল্ট করলেন এবং তারপর তিনি বর্ধমান ছেড়ে কলকাতায় গিয়ে লেখাপড়া শুরু করলেন। কিন্তু সেখানেও শেষ হল না। কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পড়া সাঙ্গ করে তিনি চলে যান কালাপানি পার হয়ে বিলেতে। সেখানে লন্ডন থেকে এম আর সি পি করে ফিরে এলেন দেশে।"

আমার দাদু নরনারায়ণ বিলেত ফেরত ডাক্তার হয়ে ফিরলেন, কিন্তু গ্রামে এসে তিনি খুব বিপদে পড়ে গেলেন। গ্রামের লোকেরা দাদুর জন্যে আমাদের পরিবারকে একঘরে করার হুমকি দিল।"

"একঘরে মানে?" আমি জিগ্যেস করলাম।

"আগেকার দিনে সাগর পার হয়ে কেউ বিলেত গেলে সাধারণ হিন্দু সমাজে তাকে পতিত বলে মনে করা হত। পতিত মানে তার মধ্যে আর হিন্দুত্ব নেই। সে সায়েবদের দেশে গিয়ে, তাদের সঙ্গে মেলামেশা, ওঠাবসা, খাওয়াদাওয়া করার জন্যে তার জাত চলে গেছে ধরা হত। তুই এখন থাম, পরে তোকে আরো বুঝিয়ে বলব, এখন নীলকাকুকে বলতে দে," মা বললেন।

"হ্যাঁ। একঘরে করে দেবার হুমকি দিল। আর বিধান দিল দাদুকে হিন্দু শাস্ত্রমতে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। দাদু রাজি হলেন না। তিনি গ্রাম ছেড়ে চলে গেলেন, কলকাতায় গিয়ে শুরু করলেন প্র্যাকটিস। কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি দারুণ পসার জমিয়ে প্রচুর অর্থ ও খ্যাতি অর্জন করে গ্রামে এই বাড়ি বানিয়েছিলেন এবং এই বাড়িতেই তিনি তুলে এনেছিলেন তাঁর বাবা- মা ও সমস্ত পরিবারকে। তাঁর বিপুল প্রভাব প্রতিপত্তির ভয়ে গ্রামের লোকেরা তখন আর সাহস করে নি দাদুর বিরুদ্ধে যাওয়ার। বরং এই বাড়িতে তিনি যখন দুর্গাপুজো চালু করলেন, গ্রামের সমস্ত লোক নির্দ্বিধায় আমাদের এই বাড়িতে এসেছিল, এবং পুজোর প্রসাদ পেয়েছিল যথা বিধিমতো।

"এই বাড়িতে গৃহপ্রবেশ হয়েছিল আজ থেকে সাতাত্তর বছর আগে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন, আর এই বাড়ির পুজোও চলছে ওই সাতাত্তর বছর ধরেই সাবেকি নিয়ম মেনে। কিন্তু আমাদের পক্ষে যতদিন যাচ্ছে, এই বাড়ি মেনটেন করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে। বাবা থাকতেই আমাদের কাছে এই বাড়ি বিক্রির অফার আসছিল বারবার, আমরা মনস্থির করতে পারছিলাম না। কিন্তু দিন দিন যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েই নিয়েছি এই বাড়ি বিক্রি করে

দেবার। এক প্রমোটার বেশ ভাল অফার দিয়েছে। মোটামুটি মাস তিন চারের মধ্যেই এই বাড়ি হস্তান্তর হয়ে যাবে। এই বাড়ি শুনেছি রিসর্ট হিসেবে ব্যবহার হবে। পিকনিক, পার্টি, গেট টুগেদার, হয়তো সিরিয়াল বা সিনেমার শুটিং...এইসব হবে আর কি। সে সব তো যা হবার হবে, এ বাড়ি বিক্রি করতে আমাদের যে মানসিক অবস্থা তাতো বুঝতেই পারছেন। কিন্তু এসব ছাড়াও আমাদের আরেকটা বড়ো দুশ্চিন্তা রয়েছে , যেটার জন্যেই আপনার সাহায্য চাইছি আমরা। মানে যেভাবে আপনি “স্বর্ণসুবর্ণ”- এর সেনদের হীরের গয়না চুরির সমস্যাটা মিটিয়েছিলেন, আশা করছি সেভাবে আমাদেরটাও...। আমাদের ব্যাপারটা সকলকে বলার নয়। খুব চেনা জানা, বিশ্বাসী নিজের জন ছাড়া। এর পরেরটুকু মা তুমিই বলো।”

নীলকাকু থামলেন। মা আর বাবা মুখ চাওয়া চাওয়ি করলেন। আমার তো ফাটাফাটি লাগছিল, কলকাতার বাইরে পুজো দেখতে এসে যদি একটা রহস্য ভেদ করে ফেলতে পারে মা, তার চেয়ে মজা আর কী হতে পারে?

নীলকাকুর মা একটু পরে গলাটা সাফ করে নিয়ে বলতে শুরু করলেন, “আমি এ বাড়িতে বউ হয়ে এসেছিলাম আজ থেকে বাহান্ন বছর আগে। আমার বয়েস তখন সতের। বিয়ের পর বউভাতের পরের দিন আমার ঘরে শ্বশুরমশাই, শ্বাশুড়িমা আর নীলুর বাবা এসেছিলেন। আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন একটা সোনার কাজললতা। খুব সুন্দর, ছোট্ট একটা সোনার মাছ। তার দুচোখে দুটো লাল রঙের পাথর বসান। মাছের পিঠে চাপ দিলে লেজের দিক থেকে খুলে যেত। ভেতরটা কাজল জমানোর জায়গা। মাথার দিকটা বাঁধা ছিল একটা ছোট্ট সোনার পিন দিয়ে , সেটাতেই ঘুরে যেত মাছের দুটো পিঠ। মাছের মাথায় একটা ছোট্ট সোনার হাতল ছিল ধরার সুবিধের জন্যে। নীলুর দাদু আমার হাতে ওই সোনার মাছ তুলে দিয়ে বলেছিলেন, “তুমি মা, আমাদের ঘরে এসেছ মালক্ষ্মী হয়ে। তোমার জেনে রাখা ভালো, এই সোনার কাজললতা - এই সোনার মাছ, আমাদের কাছে, তোমার এই পরিবারের কাছে ভীষণ শুভ একটা সম্পদ। এর শুধু যে অনেক দাম তাই নয়, আমাদের এই পরিবারের সমৃদ্ধির পিছনে এই মৎস্যরূপী কাজললতার বিপুল অবদান। আমাদের বিশ্বাস আমাদের পরিবারে এই মাছের উপস্থিতি আমাদের সকল অমঙ্গল ও অশুভ প্রভাব থেকে মুক্ত রেখেছে। কাজেই, এর মর্যাদা যেন কোন মতেই ক্ষুণ্ন না হয়, সেটা দেখা আমাদের কর্তব্য। তুমি ছেলেমানুষ, এখনই তোমার ছোট্ট কাঁধে এর গুরুদায়িত্ব আমরা দেব না, মা। কিন্তু এই পরিবারের শুভাশুভের দায়িত্ব যখন তোমার কাঁধে চলে আসবে, তখন এরও দায়িত্ব তোমাকেই নিতে হবে। আর এর কথা খুব কাছের লোক ছাড়া কেউ যেন না জানতে পারে, কারণ এর অর্থমূল্যের লোভে অনেকেই লোভি হয়ে উঠতে পারে। সেটা আমাদের পক্ষে আদৌ মঙ্গলের হবে না।”

“সেদিন আমি সেই কাজললতাটি মাথায় ঠেকিয়ে মায়ের, মানে নীলুর ঠাকুমার হাতে ফেরত দিয়েছিলাম। এখন ব্যাপারটা হচ্ছে, সেই সোনার মাছটি আমি আর একবার মাত্র দেখেছিলাম - নীলুর বিয়ের পর। নীলু আর রত্নার বিয়ের বউভাতের পরদিন ওদের হাতেও ওর বাবা আর আমি মাছটা তুলে দিয়েছিলাম এবং রত্নাও যথারীতি সোনার মাছটি ওর বাবার হাতে ফেরৎ দিয়েছিল। ব্যস, তারপরে আমি সোনার মাছটিকে আর দেখিনি। বহুদিন নীলুর দাদু মারা গেছেন, ঠাকুমাও মারা গেছেন অনেকদিন। নীলুর বাবাকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম এই কাজললতাটির কথা। উনি বলেছিলেন ওঁর কাছেই আছে। কিন্তু কোথায় রেখেছেন বলেন নি। গতবছর নীলুর বাবা যখন চলে গেলেন, আমি তখন নীলুর নিউ

আলিপুরের বাড়িতে ছিলাম। বউমার শরীর খারাপ বলে দেখতে গিয়েছিলাম। ওই সময়ে নীলুও কলকাতায় ছিল না, তাই। ওর বাবার হঠাৎ শরীর খারাপের সংবাদ পেয়ে আমরা যখন এখানে এসে পৌঁছলাম, ততক্ষণে সব শেষ।” নীলকাকুর মায়ের গলাটা বেশ কেঁপে গেল। তিনি কেঁদে ফেললেন। মা নীলকাকুর মায়ের কাঁধে সান্ত্বনার হাত রাখলেন।

মায়ের মানসিক অবস্থা বুঝে, নীলকাকু বলতে শুরু করলেন, “বাবা চলে যাবার পর, বাবার পড়ার ঘর আর মা- বাবার শোবার ঘর - সর্বত্র তন্ন তন্ন করে খুঁজেও আমরা কিন্তু ওই কাজললতার হদিশ আজও পাই নি। সেইজন্যে আমাদের এখন সবচেয়ে দুশ্চিন্তা হল, এই বাড়ি বিক্রি হয়ে গেলে, এই বাড়ির সঙ্গে ওই অমূল্য কাজললতাটাও না হাতছাড়া হয়ে যায়। অথবা বাবার মৃত্যু আর আমাদের এসে পৌঁছোনোর মধ্যে যে সময়টা ছিল, সেই সময়ে কেউ সেটা চুরি করে নিল কিনা... এটা জানা ভীষণ জরুরি।”

নীলকাকুর মা এতক্ষণে সামলে উঠেছিলেন, তিনি বললেন, “আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওই কাজললতা চুরি হয় নি, হতে পারে না। এই বাড়িতেই আছে। লুকোনো আছে কোথাও। সেটাই তোমাকে খুঁজে দিতে হবে, শোভা মা। কাল যখনই তুমি আসছ শুনলাম, নীলুকে বললাম এ ঈশ্বরের আশীর্বাদ। নীলুর মুখে তো তোমার দারুণ কীর্তির কথা শুনেছিলাম, আমি নিশ্চিত, পারলে তুমিই পারবে...”

নীলকাকুর মা মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন মায়ের উত্তর শোনার জন্যে। মা বললেন, “মাসীমা, জানি না আমি পারবো কিনা। তবে আমি চেষ্টা করব। নিশ্চই চেষ্টা করব। আমি বুঝতে পারছি আপনাদের পরিবারের কাছে এই সোনার কাজললতা কতখানি অমূল্য সম্পদ।” একটু ভেবে নিয়ে মা আবার বললেন, “আজকে তো আর সম্ভব নয়, কাল সকালে কিন্তু আমি ওই ঘর দুটো দেখতে চাই। মেসোমশাইয়ের পড়ার ঘর আর আপনাদের শোবার ঘর, দুটোই।”

“একশোবার দেখবে মা। তোমাকে তো দেখাতেই হবে। আরতির সময় হয়ে এল, চলো, সবাই নীচেয় চলো।”

৪

সকাল থেকে উপোস থেকে আমরা অষ্টমীর পুজো দেখলাম, অঞ্জলি দিলাম এবং প্রসাদ পেয়ে উপোস ভাঙলাম। তারপর নীলকাকু আর নীলকাকুর মা আমাদেরকে নিয়ে গেলেন নীলকাকুর বাবার পড়ার ঘরে। দরজায় মস্ত তালা দেয়া ছিল। নীলকাকুর মা চাবি দিয়ে দরজা খুলে ঘরে ঢুকলেন। আমরা তাঁর পিছনে। বদ্ধ ঘরে ঢুকতে পুরোনো পুরোনো একটা গন্ধ পেলাম, বহুদিনের পুরোনো বই থাকা গ্রন্থাগারে ঢুকলে যেমন পাওয়া যায়। ঘরে ঢুকে নীলকাকু ঘরের আলো, পাখা চালিয়ে দিলেন। খুলে দিলেন দুটো জানালা। ঘরটা অনেকটা আলোকিত হতে দেখলাম, উত্তর আর দক্ষিণের দুটো দেওয়াল বরাবর বই ভর্তি আলমারি - জানালার জায়গাটুকু ছাড়া। আর পুবদিকের দেওয়ালে জানালার সামনে মস্ত টেবিল আর চেয়ার। টেবিলের ওপাশের চেয়ারটা জানালার দিকে পিঠ করে রাখা আর টেবিলের এ পাশে আরো চারটে চেয়ার। জানালার ওপরে উইন্ডো এসি। উল্টোদিকের দেওয়ালে পাশাপাশি দুটো বেশ বড়ো তেলরঙের ছবি। জানা গেল ওঁরাই নীলকাকুর দাদু আর ঠাকুমা।

“শোভা মা, এই হচ্ছে, নীলুর বাবার পড়ার ঘর। উনি চলে যাবার পর এই ঘর আমরা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছি কিন্তু কোথাও সেই সোনার কাজললতা পাওয়া যায় নি,” নীলকাকুর মা একটা চেয়ার টেনে বসতে বসতে বললেন। মা, বাবা আর আমি ঘুরে ঘুরে

দেখতে লাগলাম বইয়ের আলমারিগুলো। মোটামুটি সবকটা আলমারি দেখা হয়ে গেলে মা বললেন,"এই বইগুলি কি সবই মেসোমশাইয়ের? মাসীমা, মেসোমশাইও ডাক্তার ছিলেন না?"

"হুঁ। ডাক্তার ছিলেন, কিন্তু ওঁনার নেশা ছিল বই পড়ার। অবসর পেলেই বই মুখে নিয়ে বসে থাকতেন," নীলকাকুর মা উত্তর দিলেন।

নীলকাকু বললেন, "গতকাল আপনাদের দাদুর সম্বন্ধে বললাম, বাবাকে নিয়ে প্রায় কিছুই বলিনি। আমার বাবা ডাক্তার ছিলেন, কিন্তু বাবা মনেপ্রাণে কোনদিনই মনে হয় ডাক্তার হতে চান নি। উনি কোনদিন বলেন নি, কিন্তু আমার মনে হয়েছে, জেনেরাল লাইনটাই ওঁর পছন্দের ছিল। ভালই ছাত্র ছিলেন, দাদুর চাপে পড়ে ডাক্তার হতে বাধ্য হয়েছিলেন। এম.ডি পাশ করার পর দাদুর কলকাতার চেম্বারে উনি বছর খানেক প্র্যাকটিশ করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু পরে সে সব ছেড়েছুড়ে উনি এলাহাবাদ চলে যান মেডিকেল কলেজে অধ্যাপকের চাকরি নিয়ে। সেখানে প্রায় বছর চারেক ছিলেন। তারপর দাদুর প্রভাবেই হোক বা অন্য কোন যোগাযোগেই হোক উনি কলকাতায় চলে আসেন। সারাটা জীবন তিনি বিভিন্ন কলেজে পড়িয়েই এসেছেন, কিন্তু সেভাবে জমিয়ে প্র্যাকটিশ করেননি কোনদিনই। আর ওই মা যা বললেন "বিভিন্ন বিষয়ে" যা ওঁনার বৃত্তির পক্ষে একান্তই কোন কাজের নয়, সেই সব বই পড়ার দিকেই তাঁর ঝোঁক ছিল বেশি। খুব আরাম অনুভব করতেন বইয়ের রাজ্যে। আমি জয়েন্ট এন্ট্রান্সে ডাক্তারি কারিগরি দুটোতেই সুযোগ পেয়ে, কারিগরি নিয়ে পড়ব বলেছিলাম, বাবা একবারের জন্যেও ডাক্তারি পড়তে বলেন নি। সাধারণত এমন হয় না। ডাক্তার বাবারা ছেলেকেও ডাক্তার করতে চান। বাবা চান নি।"

নীলকাকুর কথা শুনতে শুনতে মা নীলকাকুর বাবার টেবিলে রাখা ডায়েরিগুলো উলটে পালটে দেখছিলেন। নীলকাকুর কথা শেষ হতে মা বললেন, "মাসীমা, এই ডায়েরিগুলো পড়ে দেখতে পারি? আপনাদের যদি কোন আপত্তি না থাকে।"

"ওতে বউদি, কী দেখবেন? আমি পড়েছিলাম। একটাতে বেশ কিছু রোগির নাম, ঠিকানা, বয়েস আর বোধ হয় তাদের অসুখের ডাক্তারি নাম লেখা আছে। বাকিগুলোতে নানান সময়ে খেয়ালখুশিমতো যা মনে এসেছে তাই লিখে রেখে দিয়েছেন। পড়ে দেখতে চান পড়ে দেখুন, কিন্তু তেমন কিচ্ছু পাবেন না," নীলকাকু বললেন।

"পড়ে দেখতে চাস, দ্যাখ না, রেখে দে তোর কাছে...। কিন্তু তুই এই ঘরে একবার খুঁজে দেখবি না?" নীলকাকুর মা বললেন।

"মাসীমা, আপনারা বলছেন, তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কিছু পান নি, সেখানে আমি একদিন এসে কি খুঁজে দেখব বলুন তো? এই ঘরে নেই, আপনার শোবার ঘরেও নেই...। আমি নিশ্চিত। আমায় হদিশ দিতে পারে এই ডায়েরিগুলিই...এগুলো আমি রাখলাম। যাবার আগে ফেরৎ দিয়ে যাব, দেখি কতদূর কি করতে পারি।"

নীলকাকু আর নীলকাকুর মা দুজনেই খুব হতাশ ও অবাক হলেন। আমিও। আমি ভেবেছিলাম, মা নির্ঘাৎ কিছু একটা বুদ্ধি করে অসম্ভব কোন জায়গা থেকে জিনিসটা বের করে ফেলবেন। আমার মাথায় একটা দারুণ বুদ্ধি এসেছিল। বললাম , "মা, এমনও তো হতে পারে, এই এতো মোটা মোটা বইয়ের মধ্যে কোথাও লুকোনো আছে..."

"ফেলুদার "বোম্বাইয়ের বোম্বেটে"? নাঃ। সে হতেই পারে না। মেসোমশাই পড়তে ভালোবাসতেন, বই ভালোবাসতেন, তাঁর পক্ষে কোন বইয়ের প্রায় সব পাতাই কেটে নষ্ট করে

এই কাজ করা সম্ভব নয়। ও কাজ দুর্জনরাই করতে পারে, যাদের বই সম্পর্কে কোন অনুভূতিই নেই,” মা খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন।

কোণাগুলো দুমড়ে যাওয়া বহু পুরোনো ডায়েরিগুলো মায়ের হাত থেকে নিয়ে আমি ঘরের দিকে চললাম। আজ সকালটা যেভাবে সুন্দর শুরু হয়েছিল, ততটাই খারাপ লাগছে এখন। মা শেষ অব্দি হাল ছেড়ে দিয়ে এই ডায়েরিগুলোকেই সম্বল করল? নীলকাকু তো বলেই দিলেন, ডায়েরিতে কাজের জিনিস কিছু নেই, তবুও মা জেদ করলেন কেন? মা কী দেখলেন এই ডায়েরিগুলোতে? কে জানে?

৫

কাল রাত প্রায় সাড়ে বারোটায় সন্ধিপুজো দেখে এসে আমাদের শুতে শুতে প্রায় একটা বেজে গিয়েছিল। মা অবিশ্যি ফিরে এসে আবার টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে ডায়েরি মুখে নিয়ে বসে পড়েছিলেন আমাদের ঘরের টেবিলে। বাবা একবার বলেছিলেন “শুয়ে পড়ো, অনেক রাত হয়েছে।”

মা উত্তরে বলেছিলেন, “হুঁ।”

ওই উত্তর শুনে আমি চুপচাপ শুয়ে পড়েছিলাম। বুঝে গিয়েছিলাম মা এখন গভীর চিন্তায় ডুবে রয়েছেন। বিরক্ত করাটা ঠিক হবে না। কাজেই মায়ের ডাকে আজকে যখন ঘুম ভাঙল, আশ্চর্য না হয়ে পারলাম না, মা কখনই বা শুতে এলেন আর কখনই বা উঠে পড়ে স্নান টান সেরে ফেললেন। আমি উঠে বসে বললাম, “এর মধ্যে তোমার চান হয়ে গেল?”

“তবে? তোর আর তোর বাবার মতো নাকি? বেড়াতে এসে ভোঁসভোঁসিয়ে খালি ঘুম?”

“বা রে ঘুমোলাম কোথায়? কাল তো শুতে শুতেই একটা বেজে গেল। তুমি কখন শুলে?”

“শোয়াই হয় নি আমার। ডায়েরি পড়া শেষ করে ঘড়িতে দেখি সাড়ে চারটে বাজে। ব্যস। চানটা সেরে ফেললাম। নে নে চটপট রেডি হয়ে নে...।”

আমি উঠে ব্রাশে পেস্ট নিয়ে ব্রাশ করতে করতে বললাম, “কাজললতার কোন হদিশ পেলে, ডায়েরিতে?”

“মনে হচ্ছে, পেয়ে গেছি। এখন একটা ব্যাপার শুধু যাচাই করতে হবে...ব্যস।”

“পেয়ে গেছ? বলো কী? সত্যি?” আমরা দুজনেই চমকে উঠলাম, বাবার হঠাৎ এই প্রশ্ন শুনে। তার মানে বাবারও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, চুপটি করে শুয়ে শুয়ে আমাদের কথা শুনছিলেন।

“বাবা, তুমি জেগে? আমরা তো ভেবেছিলাম অঘোরে ঘুমোচ্ছ?” আমি বললাম।

“তোরা মা ছেলেতে যা শুরু করেছিস মাঝরাত থেকে, ছুটির দিনে যে একটু ঘুমোবো মজাসে, সে উপায়ও নেই। যাকগে”, বাবা উঠে বসলেন, কোলে মাথার বালিশটা নিয়ে বললেন, ”হদিশ পেয়ে গেছ? কোথায় আছে?”

“নিশ্চিত করে বলার সময় এখনো আসেনি, তার আগে আমার একটা খবর জানা দরকার, খবরটা সঠিক দিতে পারবেন একমাত্র মাসীমা,” মা বললেন।

বাবা খুব কৌতূহল নিয়ে জিগ্যেস করলেন,”কীসের খবর বলোতো?”

“উঁহু, এখন নয়। যথা সময়ে সব zআনতি পারবে... এখন আমরা বেরোব...ভুটকু, তোর হলো?”

৬

নীচেয় ঠাকুরদালানে, নীলকাকুর মা পুজোর জোগাড় করছিলেন। মা নীলকাকুর মায়ের পাশে বসে বললেন, “মাসীমা, আপনার কাছে কি একটা চাবি আছে? অনেকদিন আগে মেসোমশাই আপনাকে চাবিটা দিয়েছিলেন, কতদিন আগে, তা ধরুন বছর দশেক তো হবেই...। মনে পড়ে?”

নীলকাকুর মা সত্যি অবাক হয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন অনেকক্ষণ, মুখ দেখে মনে হল মনে করার চেষ্টা করছেন, কিছুক্ষণ পরে বললেন, “চাবি...হ্যাঁ, তুই বলাতে মনে পড়ছে বটে, একটা চাবি নীলুর বাবা আমাকে রাখতে দিয়েছিলেন, ওই রকমই হবে - প্রায় বছর দশেক - নীলুর বিয়ের কিছুদিন পরেই। কাল তোকে বললাম না, আমাকেও যেমন বিয়ের পর সোনার কাজললতা হাতে দিয়েছিলেন নীলুর ঠাকুমা আর দাদু, আমরাও নীলুর বউয়ের হাতে তুলে দিয়েছিলাম ওই সোনার মাছ। হ্যাঁ, এই অনুষ্ঠানের ক”দিন পরে, ওর বাবা, আমাকে একটা চাবি দিয়ে বলেছিলেন, খুব যত্ন করে রেখো। কীসের চাবি, তা বলেন নি, আমিও জিগ্যেস করিনি। রেখে দিয়েছিলাম যত্ন করেই। কবে কে জানে ভুলেও গিয়েছিলাম। তুই বলাতে মনে পড়ল। চাবি...চাবি...”

“হ্যাঁ মাসীমা, চাবি। স্টিলের লম্বা, বড়সড় চাবি, সে চাবির গায়ে ১১৯ ছাপ দেওয়া আছে।” নীলকাকুর মা খুব চিন্তিত মুখে মায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, ”ওই চাবিটা কি খুব জরুরি?”

“জরুরি। ওই চাবি আর ওই নম্বর যদি মিলে যায়, আপনার “হেমকান্ত মীন” আপনি পেয়ে যাবেন।”

““হেমকান্ত মীন” - মানে?”

“সোনারবরণ মাছ।”

৭

পুজোর যোগাড় সেরে, নীলকাকুর মা নিজের ঘরে গেলেন। তারপর পুজো শুরু হয়ে যেতে আবার মায়ের পাশে এসে বললেন, “চাবিটা পেয়েছি। আমার আলমারির লকারেই আলাদা করে এক কোণে রাখা ছিল। যেমনটি বলেছিলি সেরকমই, চাবির গায়ে ১১৯ লেখা আছে।”

মা কিছু বললেন না। মুচকি হাসলেন শুধু।

“তুই কি হাত গুণতে জানিস নাকি? কী করে সব ঠিকঠাক বললি? এমনকি চাবির নম্বরটাও?”

উত্তরে মা হেসে বললেন , ”মাসীমা, দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর আমরা সবাই আপনার ঘরে বসব, আপনার ঘরটাও দেখা হবে আর সব কথাও হবে। এই ভিড়ে এ সব কথা..”

নীলকাকুর মা বললেন, “ঠিক বলেছিস - একদম ঠিক।”

৮

দুপুরে খাওয়ার পর মা, বাবা আর আমি নীলকাকুর মায়ের ঘরে গেলাম। সেখানে নীলকাকুও ছিলেন। নীলকাকুর মা আর আমার মা বসলেন বিছানায় আর আমরা তিনজন চেয়ারে। একটু পরে রত্না কাকিমা ঘরে এলেন, বিছানায় মায়ের পাশে বসতে বসতে বললেন, “দিদিভাই, এত তাড়াতাড়ি কী করে সব বের করে ফেললেন বলুন তো? “

“হ্যাঁ, শোভা মার থেকে আগে শুনি কী করে এমন অসম্ভবকে সম্ভব করল, তাও একেবারে রাতারাতি!”

সকলে মায়ের দিকে তাকালেন, মা এখন কেন্দ্রবিন্দুতে, মা একটু চুপচাপ ভেবে নিলেন কিভাবে শুরু করবেন, তারপর বলতে শুরু করলেন, “আপনাদের, মানে মাসীমার আর নীলের কথা শুনে মেসোমশাই আর ওঁর বাবা সম্বন্ধে আমার যা ধারণা হয়েছে, সেটা আগে বলে নিই। কারণ তাতে স্পষ্ট বোঝা যাবে দুজনের দৃষ্টিকোণের ব্যাখ্যা।

“নীলের দাদু ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী এবং ভীষণ জেদি একরোখা একজন মানুষ। মোটামুটি নিজের চেষ্টায় লন্ডন থেকে ডাক্তারি পড়ে এসেছেন। গ্রামে ফিরে গ্রামের লোকেদের ব্যবহারে তিনি মাথা নত করেন নি, উল্টে আরো বেশি জেদি হয়েছেন নিজের লক্ষ্যে পৌঁছতে। মেধা আর অধ্যবসায় দিয়ে সফলও হয়েছেন খুব তাড়াতাড়ি। প্রায় ভেলকির মতো তিনি যশ, প্রতিপত্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে অর্থও অর্জন করেছেন। কথায় বলে না, ভগবান অধ্যবসায়ী লোকদেরই সহায় হয়ে থাকেন? ওঁর ক্ষেত্রে ব্যপারটা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি।

“কলকাতা মেডিকেল কলেজে এই সময়েই, একমাত্র কন্যার চিকিৎসার জন্যে আসেন রায়বাহাদুর মহারাজ শ্রী দীপেন্দ্রনারায়ণ পালচৌধুরি। তিনি আগে থেকেই মহারাজ ও চৌধুরি ছিলেন, “ইংরাজ সরকার বাহাদুরকে তৈলাক্ত” করে রায়বাহাদুরও হয়েছিলেন। তাঁর নয়নের মণি একমাত্র বালিকা কন্যা কোন এক দুরারোগ্য অজানা ব্যাধিতে দীর্ঘদিন ভুগছিলেন। মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ব্রিটিশ ডাক্তার কেসটি পাঠান তাঁর প্রিয় ছাত্র নীলের দাদুর কাছে। আশ্চর্যজনকভাবে নীলের দাদু মেয়েটির অসুখের লক্ষণ দেখে সঠিক রোগটি ধরতে পেরেছিলেন এবং তাঁর সুচিকিৎসায় খুব সহজেই- মাস দুয়েকের মধ্যে মেয়েটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছিল। খুব স্বাভাবিকভাবেই রায়বাহাদুর মহারাজ দীপেন্দ্রনারায়ণ অর্থের ব্যাপারে

কোন কার্পণ্য করেন নি, উপরন্তু তাঁর কন্যা আরোগ্য হবার খুশিতে তার ডাক্তারকাকুকে নিজের হাতে উপহার দিয়েছিলেন এই সোনার কাজললতাটি, যেটি একটি হেমকান্ত মীন।

"এই ঘটনার পরে নীলের দাদুকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয় নি কোনদিন, এরপর সাফল্য আর উন্নতির সকল সোপান তিনি খুব সহজেই পার হতে পেরেছিলেন। এই চিকিৎসার সাফল্য, পরিচিত মহলে তাঁকে রাতারাতি প্রায় ধন্বন্তরি বানিয়ে তুলেছিল। এরপরই তিনি এই বাড়ি বানিয়েছিলেন ও সেখানে দুর্গাপুজা চালু করেছিলেন।"

এই অবধি বলার পর মা একটু থামলেন। সকলেই চুপচাপ। একটু বাদে নীলকাকু কথা বললেন, "বউদি, এসব কথা কি ওই ডায়েরিগুলোতে লেখা আছে? আপনি এতসব কী করে জানলেন? সত্যি বলতে আমিও জানতাম না এত কাহিনী, মহারাজের মেয়ের চিকিৎসা এবং ওই সোনার কাজললতা পাওয়ার ইতিহাস। আমি ভেবেছিলাম দাদুই ওটা বানিয়েছিলেন। মা, তুমি জানতে?" নীলকাকু নিজের মাকে জিগ্যেস করলেন।

"জানতাম। তোর বাবার মুখে শুনেছিলাম, তবে ওই নামটাম অত মনে ছিল না। তুই দেখাচ্ছিস বটে, শোভা। তোর কথা রত্না আর নীলুর মুখে অনেক শুনেছি, কিন্তু দেখছি তার অনেক বেশি।"

মা একটু হেসে আবার বলতে শুরু করলেন, "নীলের দাদু অনেক উপার্জন করেছেন, কিন্তু এই সোনার কাজললতাটি ছিল তাঁর সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ। এই জিনিসটি তাঁকে আত্মতৃপ্তি দিত খুব। তাই এত দামি জিনিসটি বাড়িতে রাখা বিপজ্জনক বুঝেও তিনি কোনদিন নিজের কাছছাড়া করেন নি। আজীবন নিজের ঘরে সিন্দুকের মধ্যেই রেখেছিলেন তিনি, হয়তো মাঝে মাঝে দরজা বন্ধ করে, হাতে নিয়ে খুব সাবধানে দেখতেন জিনিসটা। তিনি মারা যাবার পর সোনার কাজললতাটি মেসোমশাইয়ের হাতে তুলে দেন তাঁর মা। এই কাজললতাটি মেসোমশাইয়ের কাছে কিন্তু হয়ে উঠল মস্ত বিড়ম্বনা। তিনি নির্বিবাদি সাদাসিধে মানুষ, তিনি এটা হাতে পেয়ে খুব বিপন্ন বোধ করলেন। কোথায় এবং কিভাবে এটিকে নিরাপদে রাখা সম্ভব সেই চিন্তাতেই তাঁর রাতের ঘুম ছুটে গেল। অনেক ভেবে চিন্তে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন এটিকে ব্যাংকের ভল্টে রাখার।"

"ব্যাংকের ভল্টে?" নীলকাকু জিগ্যেস করলেন।

"হ্যাঁ। ব্যাংকের ভল্টে। কলকাতায়। নিউআলিপুরের একটি ব্রাঞ্চে। প্রয়াগ ব্যাংক। আর তার চেয়েও আশ্চর্য ব্যাপার হল, এই খবরটা তিনি কাউকেই, এমনকি মাসীমাকেও স্পষ্ট করে বললেন না। এই গোপনীয়তার একটাই কারণ, তিনি ভীষণ বিপন্নবোধ করেছিলেন। কোনক্রমে যদি কোন উটকো লোকের কানে আসে এর অস্তিত্বের কথা, বিপদে পড়তে পারেন তিনি এবং তাঁর পুরো পরিবার। তাই এত গোপনীয়তা।"

"ঠিক বলেছিস, শোভা মা, নিউআলিপুরের আমাদের বাড়ির কাছেই বসুধা ব্যাংকে আমাদের একটা ভল্ট ছিলই, যেখানে আমার আর রত্না বউমার গয়নাপত্র আজও আমরা রাখি। কিন্তু যে ব্যাংক তুই বললি, সেখানে আমাকে সঙ্গে নিয়ে ওর বাবা আর একটা ভল্ট খুলিয়েছিল জয়েন্টলি। ওর দাদু মারা যাবার কিছুদিন পরে। তুই বলাতে আমার মনে পড়ল। আমি জিগ্যেস করেছিলাম, "একটা তো রয়েইছে, আবার ভল্ট নিয়ে কী হবে?" আমাকে ওর বাবা বলেছিল, "এমনিই ...আর একটা থাকা ভালো।" ওর বাবার নেহাত কোন খামখেয়াল ভেবে আমিও আর তেমন মাথা ঘামাই নি।"

“হ্যাঁ, মাসীমা। সে সময় আপনার হাতে উনি চাবিটাও দেন নি। চাবিটা দিয়েছিলেন, নীলের বিয়ের পর। আপনাদের পরিবারের পরম্পরা অনুযায়ী, রত্নার হাতে কাজললতাটি আনুষ্ঠানিক সমর্পণের পর, তিনি আবার ওটিকে ব্যাংকে রেখে আসেন এবং তারপর চাবিটি আপনাকে গচ্ছিত করেন।”

“আচ্ছা বউদি, এত মূল্যবান জিনিসটির ঠিক কত দাম, তার কোন হদিশ বলতে পারেন?”

“হদিশই দিতে পারি, সঠিক বলা সম্ভব নয়। তোমার দাদার মোবাইলে গুগ্‌ল সার্চ করে যা দাম জানতে পারলাম তাতে আমার ধারণা মতো তিরিশ- চল্লিশের কম নয়- ”

“তিরিশ- চল্লিশ হাজার?” আমি বলে ফেললাম।

“দূর বোকা, লাখ।” মা মৃদু হেসে আমাকে বললেন।

“তিরিশ- চল্লিশ লাখ?” নীলকাকু রীতিমতো চমকে উঠলেন।

“তারও বেশিই হবে হয়তো। রূপোর বডির ওপর ১৬০ গ্রাম ১৮ ক্যারাট সোনার পাত দিয়ে মোড়া এই মাছের চোখে বসানো আছে দুটো রুবি, বর্মিজ রুবি, ৮.৫ বাই ৭.৫ মিলিমিটার তার আকার। গুগ্‌ল্ সার্চ করে আমি যা দাম পেলাম তাতে এই রুবি, সোনা আর রূপোর দাম আমি ধরেছি। কিন্তু এ ছাড়াও আছে জিনিসটার শিল্পমূল্য এবং অ্যান্টিক ভ্যালু। যেটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।”

অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বললেন না। জিনিসটা দামি সকলেই জানতেন, কিন্তু এতটা দামি কেউ কল্পনাও করে উঠতে পারেন নি। সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে, মা আবার বললেন, “আপনারাও জানতেন না এই সোনার মাছের এতো দাম হতে পারে। মেসোমশাই জানতেন, তাই তিনি ঘরে রাখার কোন ঝুঁকি নেন নি, রেখেছিলেন ব্যাংকে। আর পাছে পাঁচকান হয়ে কোন বিপদ ঘটে যায়, এই ভয়ে কাউকেই খোলসা করে বলতেও পারেন নি। তবে ডায়েরিতে সব লিখে রেখে গেছেন। সরাসরি নয়, সংকেতে।”

“ওই ডায়েরি পড়ে আপনি সব কথা জেনে গেলেন, আর আমি ভেবেছিলাম, ওগুলো জঞ্জাল! ভাগ্যিস আমরা কেউ ফেলে দিই নি, দিলে আজ এত সব খবর আমরা জানতেও পারতাম না। এঘর সেঘর খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে, আমরা একসময় ধরেই নিতাম, ওটা চুরি হয়ে গেছে! কিন্তু সংকেতগুলো কী বলুনতো, বউদি?”

“নীল, এখন আর নয়, চলো সন্ধে হতে চলল, আরতির সময় হয়ে যাবে, ঠাকুদালানে যাই। আরতি সেরে আবার বসা যাবে...।”

নীলকাকুর মাও বললেন , “এঃ হে, ঠিক বলেছিস মা, তোর কথায় একদম বুঁদ হয়ে গেছিলাম, ছি ছি অনেক দেরি হয়ে গেল, চল আরতির যোগাড় করি, বউমা, চলো চলো...আরতির পর আবার শুরু হবে শোভা মায়ের সভা।”

৯

নীলকাকুর মায়ের ঘরে আবার আমরা জমায়েত হলাম পৌনে আটটা নাগাদ। বাড়িতে বানানো গরম গরম বেগুনি আর সঙ্গে চা। আমি চা খাই না, তবে বেশ অনেকগুলো বেগুনি খেয়ে ফেললাম। দিব্বি লাগল খেতে। চায়ে চুমুক দিয়ে, মা তাঁর ডায়েরি খুললেন , অনেকগুলো পাতা উলটে তিনি এক জায়গায় থামলেন, মুখ না তুলেই

বললেন, ”মেসোমশাইয়ের ডায়েরিতে মোট ৮৬৭টা এন্ট্রি আছে, তার মধ্যে এই তিনটে নামে একটু বিশেষত্ব আছে-

১. Hemkanta Meena, hearing plate, Village: Shashasthi, কে রাত ১৮.০০

২. Rupsa Majhi with red eyes , conjunctivitis (?)

৩. Chunilal Verma: age 75-85, Zero Point DI-GRAM - প্রাকৃতিক ও চিকিৎসাই হয় নি।

মেসোমশাই সমস্ত নাম, অসুখের নাম অথবা যাই কিছু লিখেছেন এই ডায়েরিতে সমস্তই ইংরিজিতে। কিন্তু এর মধ্যে দুজনের ক্ষেত্রে তিনি বাংলা ব্যবহার করেছেন, আর রূপসা মাঝির চোখ লাল হয়েছে, কনজাংটিভাইটিস লিখেও তিনি দ্বিধায় রয়েছেন। কেন? আর আমরা ডাক্তার না হয়েও বুঝতে পারছি অসুখগুলো কেমন যেন - মোটেই বিশ্বাসযোগ্য কোন অসুখ নয়।

“প্রথমেই বলি হেমকান্ত মীনা , রাজস্থানী নাম। তাঁর হিয়ারিং প্লেট হয়েছে? সে আবার কী অসুখ? কিন্তু এটাকে বাংলা করলে দাঁড়াবে শোনার প্লেট, শোনার পাত, সোনার পাত। তালব্য শ টাকে দন্ত্য স ভাবলে কিন্তু আমরা সূত্রটা বেশ পেয়ে যাচ্ছি। এরপরে চট করে ধরে ফেলতে অসুবিধে হয় না, আ কার বাদ দিলে রাজস্থানী ভদ্রলোক আসলে হেমকান্ত মীন মানে সোনার বরণ মাছ , সোনার পাত। এরপরে আসছে ভিলেজ মানে গ্রাম। গ্রামের নাম শষষ্ঠী। গ্রামের এমন নাম হতে পারে? কে জানে হতেও পারে, বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি? কিন্তু শষষ্ঠী মানে ১৬০ হলেও তো হতে পারে। আর গ্রাম যদি ধরি ওজনের একক, তাহলে কী দাঁড়াল, সোনার বরণ মাছ, সোনার পাত, গ্রাম ১৬০, এই অব্দি বুঝে ফেললে বাকিটা নিয়ে ভাবতেই হয় না , কারণ বাঙালিরা অন্ততঃ ১৮.০০ - মানে সন্ধে ছ”টাকে খামোকা রাত বলবে না। আসলে ওটা ক্যারাট ১৮, সোনার মধ্যে খাদের পরিমাণ।

“বুঝে নেওয়ার পর পরেরটা বেশ সহজ হয়ে যায়, রূপসা মাঝি লাল চোখের কোন মেয়ে নয় মোটেই, রূপো মাঝে, মানে মাঝখানে রূপো যেটা সোনার পাতে মোড়া আর তার চোখটা লাল। কনজাংটিভাইটিস, মোটেই নয়। তিন নম্বরের ভার্মাসায়েব ইউপি বা বিহারের কোন ভদ্রলোক নন, তিনি বরং বিদেশী, মায়ানমার, যার পুরোনো নাম ছিল বার্মা, আজও সেরা চুণির উৎস হিসেবে বার্মার নামই বলা হয়, বার্মিজ রুবি। কাজেই চুণিলাল ভার্মা আসলে, বার্মিজ চুণি, যার রঙ লাল। এরপরে একটু গোলমাল ছিল, এজ ৭৫-৮৫, মানে কি অত বছরের পুরোনো? জিরো পয়েন্ট ডাই-গ্রামটাই বা কি ব্যাপার? প্রাকৃতিক মানে ন্যাচরাল, আর চিকিৎসা হয় নি মানে তো আনট্রিটেড। তার মানে চুণিটা ন্যাচরাল আর আনট্রিটেড, কিন্তু মাঝের শব্দগুলো কী বোঝা যাচ্ছে না। নীল, তোমার দাদার মোবাইলে গুগ্‌ল্ ঘেঁটে পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হল, age আসলে age নয়, ওটা আসলে edge, মানে চুণির সাইজ ৭.৫ বাই ৮.৫ মিলিমিটার। ওজন জিরো পয়েন্ট দ্বি গ্রাম মানে ০.২ গ্রাম। ব্যাস আর সমস্যা নেই। পুরো ব্যাপারটা এবারে সবটা মিলে হল, সোনার বরণ মাছ, মাঝখানে রূপো, ১৮ ক্যারাট - ১৬০ গ্রাম সোনার পাতে মোড়া, চোখদুটো লাল - বার্মিজ চুণি, আয়তাকার সাইজ ৭.৫ বাই ৮.৫ মিলিমিটার, প্রত্যেকটার ওজন ০.২ গ্রাম। ন্যাচারাল অ্যান্ড আনট্রিটেড। আসলে দামি মণির ব্যাপার স্যাপারগুলো তেমন কিছুই জানতাম না, তাই এই জায়গায়টায় বেশ চিন্তায় পড়ে গেছিলাম।”

”না, বউদি, এ ধাঁধাঁর সমাধান আমার বাবা করতে পারতেন না।” নীলকাকুর এ কথায় বাবা খুব জোরে হেসে উঠলেন। বললেন,”কী বলছো তুমি, নীল। তোমার বাবাই তো এই ধাঁধাঁটা বানিয়েছিলেন।” বাবার এই কথায় সকলেই এবার হাসলেন, নীলকাকুর মাও খুব মজা পেলেন কথাটায়। নীল কাকু একটু অপ্রস্তুত হয়ে, মাথা চুলকে হেসে বললেন , ”তাও তো বটে। ঠিকই বলেছেন, সমরেশদা। তবে, যাই বলুন বউদির জবাব নেই। এবারে ব্যাংকের চাবির ব্যাপারটা, বউদি?”

“হ্যাঁ। বলছি, ভাই। বলার আগে, আমি মেসোমশাইয়ের অন্য একটি ডায়েরির এই

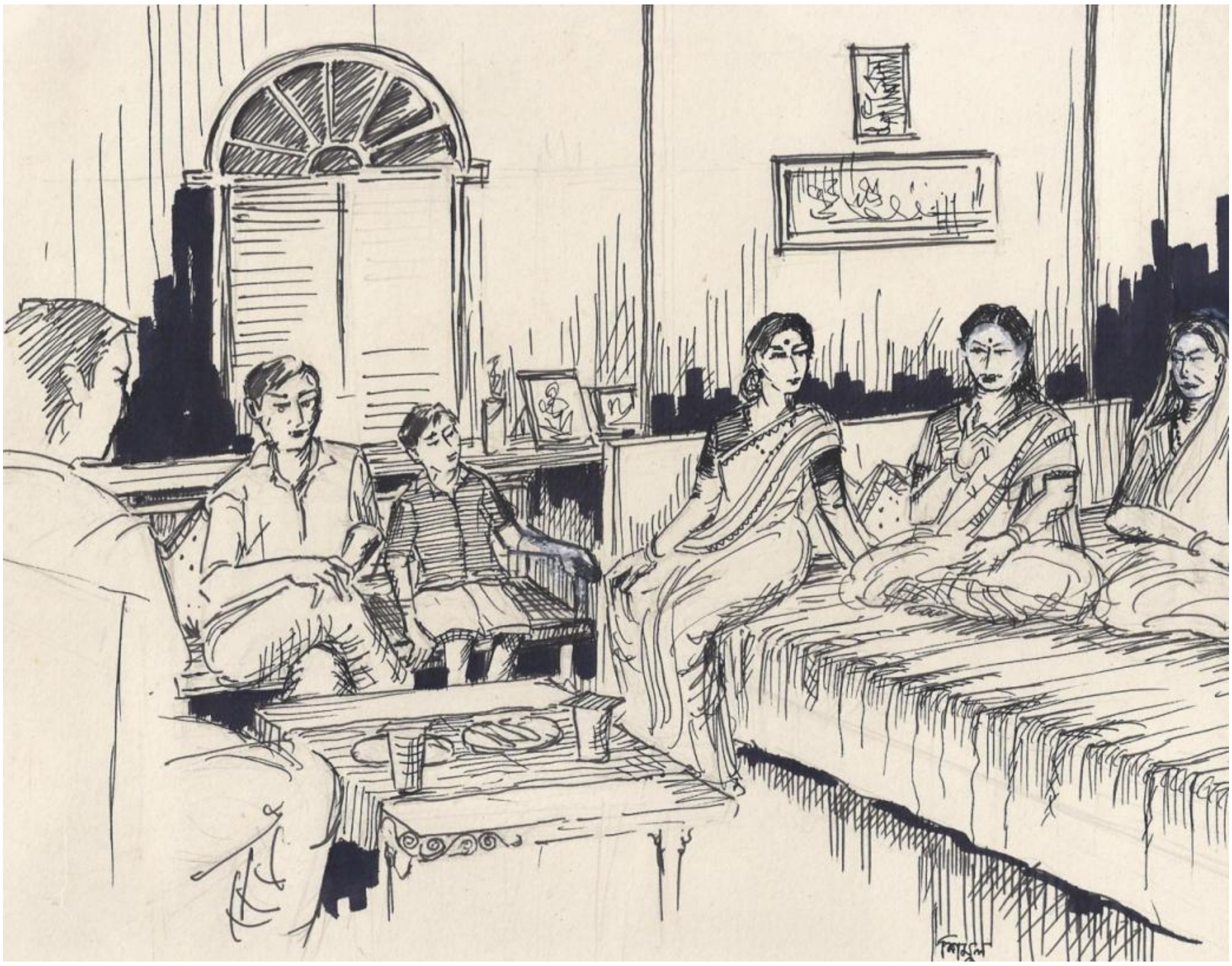

অংশটি আপনাদের পড়ে শোনাচ্ছি, একটু ভাবলে আপনারাও বুঝে যাবেন ইঙ্গিতটা।” দরকারি অংশটুকু মা নিজের ডায়েরিতে কপি করে নিয়েছিলেন, সেটা পড়া শুরু করলেন, “কলেজে অধ্যাপনার জন্য চারি বছর সাড়ে তিনমাস এলাহাবাদবাসী হইয়াছিলাম। বহুদিনের সাধও ছিল, এলাহাবাদের সঙ্গম চাক্ষুষ করিবার, যেস্থানে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর তিন স্রোতধারার মিলন ঘটিয়াছে সেস্থানে অবগাহন করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিবার। সে সাধ পূরণ হইল, অধিকন্তু অবসর পাইলে সঙ্গম তীরে অলস সময় কাটাইতেও বেশ লাগিত। পুস্তকে পড়িয়া, লোকমুখে শুনিয়া যাহা কল্পনা করিয়াছিলাম, তাহা সবটাই যে পূরণ হইয়াছিল এমন নহে, তথাপি মনোবাসনা পূরণ হইল এমত বলিতেই পারি।

“সঙ্গমের তীরে দাঁড়াইয়া তাহার বিস্তার দেখিয়া যারপরনাই মুগ্ধ হইতাম। গঙ্গা ও যমুনা মৃদুমন্দ স্রোতে প্রবাহিতা। গঙ্গার গৈরিক প্রবাহ অপেক্ষা যমুনার প্রবাহ অনেকটাই স্বচ্ছ,

তৎকারণবশতঃ যমুনার জল কিঞ্চিৎ নীলাভ দেখাইয়া থাকে। জানিনা ইহার পিছনে আজন্মলালিত নীল যমুনার রোমাণ্টিক রং অবচেতন মনে মিশিয়া রহিয়াছে কিনা , কারণ শ্রীমতী রাধারানি ও গোপবালক পরমশ্রীমান কানুর ভালোবাসায় বিধুর হইয়া এই যমুনা যুগ যুগান্ত হইতে প্রবাহমানা। ত্রিবেণীর দুই বেণী প্রত্যক্ষ করিলাম, অন্য বেণী সরস্বতী নদী বহুকাল পূর্বেই অন্তঃসলিলা হইয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রবহমানা।

“এই প্রসঙ্গে মনে পড়িল আমাদের হুগলীর ত্রিবেণী সঙ্গমেও সরস্বতী নাম্নী এক অন্তঃসলিলা নদীর কথা শুনিয়াছিলাম। সে কথা মনে স্মরণে আসিতে, এলাহাবাদের সঙ্গম তীরে দাঁড়াইয়া মনে হইল ইহার মধ্যে কোন গূঢ় অর্থ লুকাইয়া নাই তো?

“গঙ্গা আমাদের সমগ্র উত্তর ভারতের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস এবং ভবিষ্যতও বটে। যমুনা আমাদের প্রেম ও ভক্তির ইতিহাসতো বটেই, কিন্তু ভবিষ্যত কিনা তাহা ভাবীকালই বলিতে পারিবে। কিন্তু বিদ্যাস্বরূপা সরস্বতী আমাদের সনাতন ভারতীয় জ্ঞান ও দর্শনের ইতিহাস হইলেও অধুনা অন্তঃসলিলা হইয়া বহমানা এবং তাহার ভবিষ্যত বড়ই অনিশ্চিত! এই তিনটি নদীর ত্রিধারার গর্ভে যেন সঞ্চিত হইয়া আছে আমাদের সনাতন ভারতের অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডার।

“এই সকল গভীর তত্ত্বকথা চিন্তা করিতে করিতে একটি কবিতা মনে আসিল, তাহা এইরূপঃ-

এলাহাবাদের প্রয়াগতীরে গঙ্গাযমুনা বহে চলে ধীরে
গর্ভে তাহার সঞ্চিত বহুমূল্য ধন।
রুদ্ধ কক্ষ খুলিবে কি কেহ মনে জাগে মোর ঘোর সন্দেহ,
চিন্তাবিকল হইতেছে মোর মন।
হারাইয়া যদি যায় সেই চাবি সাত সতেরং বসে বসে ভাবি।
বড় ক্ষতি হবে, হায়, অপূরণ।”

পড়া শেষ করে মা ডায়েরি থেকে মুখ তুললেন। সকলেই একমনে মার পড়া শুনছিল, মা থামতে মায়ের মুখের দিকে তাকাল। সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে মা বললেন, “নদীতীরের ইংরিজি ব্যাংক, রিভার ব্যাংক। প্রয়াগতীরে মানে, প্রয়াগ ব্যাংকে। “গর্ভে তাহার সঞ্চিত বহুমূল্য ধন”, এর আগে তিনটি নদীর প্রবাহর সঙ্গে ভারতের সনাতন জ্ঞান আর ঐতিহ্যের ভাণ্ডার হিসেবে যেন প্রয়াগগর্ভকে তুলনা করেছেন, সেটাও যেমন সত্যি, প্রয়াগ ব্যাংকের ভল্টে গচ্ছিত রাখা তাঁর সোনার কাজললতাটিও একই রকম বহুমূল্য ধন। সেই ভল্ট কে খুলবে, সেই চিন্তায় তিনি উতলা। যদি এই ভল্টের চাবিটি হারিয়ে যায় তাতেই বা কী হবে এই নিয়ে তিনি সাত- পাঁচ বা সাত- সতেরো ভাবতে পারতেন। কিন্তু তিনি ওসব না ভেবে “সাত- সতেরং” ভেবেছেন, কেন? আমরা ছোটবেলায় নামতা পড়েছিলাম , সাতসতেরং একশো উনিশ, তাহলে ওটা কি চাবির নম্বর? মনে হচ্ছে তাই। মাসীমাও তাই বললেন, চাবির নম্বর ১১৯।”

মায়ের কথা শেষ হতেই, রত্না কাকিমা বললেন, “দিদিভাই, আমার মাথা আজ এর বেশি আর নিতে পারবে না, আজ এই পর্যন্ত থাক। ওদিকে আমার কন্যাদুটিও টিভি দেখতে দেখতে নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে, ওদের ঘুম থেকে তুলে খাওয়াতে আমার ঘুম ছুটে যাবে। কাজেই আমি উঠলাম দিদিভাই।”

১১

একাদশীর দিন ভোরে আমরা রওনা হলাম কলকাতার দিকে। রাস্তায় আমরা কেউই তেমন কথাবার্তা বলিনি। আসলে আমরা সকলেই নিজের নিজের মতো করে ভাবছিলাম এই কটা দিনের কথা। পুজো। প্রকৃতি। নীলকাকুদের আপ্যায়ন। আর নিশ্চয়ই হেমকান্ত মীনের কথা। বাবা বর্ধমানে থেমে মিষ্টির দোকান থেকে মিহিদানা আর সীতাভোগ নিয়ে এলেন কলকাতায় নিয়ে যাবার জন্যে। বর্ধমান শহর ছাড়িয়ে এক্সপ্রেসওয়েতে পড়ে বাবা গাড়িতে যখন বেশ স্পিড তুললেন, আমি বাবাকে জিগ্যেস করলাম, "বাবা, এবারে মায়ের পারিশ্রমিক কত হতে পারে বলে তোমার মনে হয়? সেবার তো হীরে বসানো সোনার হার পেয়েছিল ভীষণমামার মায়ের কাছে- তাও তো মাত্র সাড়ে তিন লাখ টাকার গয়না উদ্ধার করে। এবার তো চল্লিশ লাখ বা তারও বেশি।"

"কি জানি। দিতেও পারে, নাও পারে, চেনাশোনার মধ্যে টাকা তো আর নেওয়া যায় না...। আর নীলদের তো আর সোনার দোকানও নেই যে একখানা সোনার গয়না দিয়ে দেবে...।" বাবা গাড়ি চালাতে চালাতে মায়ের দিকে তাকালেন। মা কিছু বললেন না, একদম সামনে তাকিয়ে ছিলেন রাস্তার দিকে। অনেকক্ষণ পর মা বললেন ,

"আমার পারিশ্রমিক যথাস্থানে রাখা আছে।"

"তার মানে? কোথায়?" বাবা খুব অবাক স্বরে জিগ্যেস করলেন। আমিও আশ্চর্য না হয়ে পারলাম না।

"প্রয়াগ ব্যাংকের ভল্টে।" মা খুব নিরুত্তাপ গলায় বললেন।

"কী করে জানলে? ডায়েরিতে লেখা আছে?" বাবা জিগ্যেস করলেন।

"হুঁ।"

"কী লেখা আছে?" আমি জিগ্যেস করলাম।

"ধাঁধা।" মা গম্ভীর স্বরে বললেন।

"বলো না, মা" আমি মায়ের কাঁধে হাত রেখে বায়না করলাম।

"বলছি শোন। পথের শেষে যে জন এসে খুলে দিবে রুদ্ধ দ্বার-
আসুক সিদ্ধি, আসুক ঋদ্ধি গুণীর গুণে দু" দু" চার।
আর কিছু থাক কিংবা না থাক বুদ্ধি আছে সাকুল্যে-
তার আসল আদর, আসল কদর পাওনা কনকমূল্যে।
ব্রাহ্মণ হোক, ক্ষত্রিয় হোক, হোক সে বৈশ্য শূদ্রা
করে সেলাম, রেখে দিলাম চারটি সোনার মুদ্রা"।
বুঝলে কিছু? না বুঝলে এখন থাক, প্রয়াগ ব্যাংকের ভল্ট খুললে বুঝিয়ে দেব।"

"বারে, এটা তুমি বললে না কেন, নীলকাকুদের?"

"ছিঃ, নিজের কথা আগে থেকে ঢাক পিটিয়ে বলতে আছে?"

১২

লক্ষ্মীপুজো সেরে, দুদিন পরে নীলকাকুরা কলকাতায় ফিরলেন। ফিরেই প্রয়াগ ব্যাংকে দেখা করে কথাবার্তা বলে সব ঠিক করে ফেললেন। মাকে ফোন করে জানালেন - নীলকাকু আর নীলকাকুর মা ব্যাংকে গিয়ে ভল্ট খুলে দুটো বাক্স নিয়ে এসেছেন, একটা বড়ো আরেকটা

ছোট। আর সঙ্গে একটা খামের মধ্যে সাদা কাগজে নীলকাকুর বাবার হাতে লেখা একটা কবিতা। বড়ো বাক্সে আছে সোনার কাজললতা। আর ছোট বাক্সে আছে চারটে সোনার কয়েন।

শনিবার আমরা নীলকাকুর বাড়ি গিয়ে যখন পৌঁছলাম তখন রাত প্রায় সাড়ে আটটা, বাবার অফিস থেকে ফিরতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। আমরা পৌঁছতেই লেখাপড়া ছেড়ে ইতি আর উতি দৌড়ে এল। আমরা আসাতে ওরা খুব আনন্দ পেয়েছে। আমরা নীলকাকুর মায়ের ঘরে গিয়ে বসলাম। কাকিমা ইতি আর উতিকে নিয়ে অন্যঘরে চলে গেলেন ভুলিয়ে ভালিয়ে। নীলকাকু আমাদের সঙ্গেই ছিল। নীলকাকুর মা স্টিলের আলমারি খুলে লকার থেকে বের করলেন বাক্সদুটো- সঙ্গে একটা ছোট খাম। সবকিছু নিয়ে নীলকাকুর মা বিছানায় বসলেন। মা বিছানাতেই বসে ছিলেন। আমার অবস্থা উত্তেজনায় টানটান। নীলকাকুর মা বড়ো বাক্সটা খুলে মায়ের হাতে তুলে দিলেন। নীল রঙের মখমলের নরম প্যাডের ওপর শোয়ানো রয়েছে মাছটা। সোনার মাছ। লাল রুবির চোখ। সারা গায়ে আঁশের নিখুঁত দাগ দাগ দেওয়া। লেজ আর পাখনাগুলিও খুব সুন্দর মানানসই। সব মিলিয়ে দুর্দান্ত সুন্দর জিনিসটা। বাবা হাতে নিয়ে দেখে বললেন, “অপূর্ব, অসাধারণ। দামের কথা যদি ভুলেও যাই, অদ্ভুত সুন্দর, সত্যিকারের শিল্পকর্ম। আগেকার দিনের রাজা মহারাজারা সুন্দর জিনিসের কদর জানতেন।”

আমিও দেখার পর নীলকাকুর মায়ের হাতে ফেরত দিলাম বাক্সটি। নীলকাকুর মা বাক্স বন্ধ করে আবার আলমারির লকারে রেখে এলেন। এরপর খামটি খুলে, একটা সাদা কাগজ বের করে মাকে বললেন, “শোভা মা, নীলুর বাবা আবার একটা ধাঁধা তোমার জন্যে রেখে দিয়েছেন, আমি পড়ছি, শোনো - “পথের শেষে যে জন এসে খুলে দিবে রুদ্ধ দ্বার”... এই লাইনটা শুনেই মা বাকিটাও বলে দিলেন

“ ‘আসুক সিদ্ধি, আসুক ঋদ্ধি গুণীর গুণে দু দু চার।
আর কিছু থাক কিংবা না থাক বুদ্ধি আছে সাকুল্যে-
তার আসল আদর, আসল কদর পাওনা কনকমূল্যে।
ব্রাহ্মণ হোক, ক্ষত্রিয় হোক, হোক সে বৈশ্য শূদ্রা
করে সেলাম, রেখে দিলাম চারটি সোনার মুদ্রা ’ ”

“বউদি, এটাও ওই ডায়েরিতে ছিল? আপনি আগে বলেননি তো!” মা কোন উত্তর দিলেন না, শুধু হাসলেন একটু।

“শোভা মা না বললেও আমি কিন্তু এটার মানে বুঝে ফেলেছি, তাই ছোট বাক্সটি আমি শোভা মায়ের হাতেই তুলে দিলাম।” নীলকাকুর মা এই কথা বলে মায়ের হাতে তুলে দিলেন ছোট বাক্সটি। মা দুহাতে বাক্সটি নিয়ে বললেন, “এ আমার প্রতি আপনার আর মেসোমশাইয়ের আশীর্বাদ।” তারপর রেখে নিলেন নিজের হাতেই।

“খুলে দেখবেন না বউদি, ভেতরে কী আছে?” নীলকাকু জিগ্যেস করল মাকে।

“জানি। চারটে সোনার কয়েন - দুটো গণেশঠাকুরের আর দুটো মালক্ষ্মীর ছবি।” মা বললেন।

“নাঃ আপনার সঙ্গে পারা অসম্ভব। চারটে কয়েন তো বুঝলেন, কিন্তু ঠাকুরের ছবিগুলো কী করে ধরে ফেললেন?”

“সিদ্ধি দান করেন গণেশজি, ঋদ্ধি দান করেন মা লক্ষ্মী, তাঁরাই আছেন, দুজন করে।” মা উত্তর দিলেন।

- “আর কত গ্রামের কয়েন, সেটা?” নীলকাকু পরীক্ষা নেওয়ার মতো জিগ্যেস করল।

“না, সেটা লেখা নেই মেসোমশাইয়ের ডায়েরিতে। আর তাছাড়া সে ব্যাপারে আমার খুব কৌতূহলও নেই। কারণ আমার কাছে মেসোমশাইয়ের আশীর্বাদের মূল্য অনেক বেশি।” মা খুব আবেগের সঙ্গে বললেন কথাগুলি।

“সে আর তোকে বলতে হবে না, মা। সে আমি তোকে প্রথম দেখাতেই বুঝেছিলাম। তুই আমাদেরকে যে কী চিন্তা মুক্ত করলি, মা, সে আমরাই জানি- ” নীলকাকুর মা বললেন।

“আর কি সহজ করে সবকিছু মিটিয়ে দিলেন, সেটা বলো, মা - ” নীলকাকু বলল।

“ঠিক কথা, কাজেই আমি, নীলু আর বউমা মিলে একটা পঞ্চাশ হাজারের চেক তোর হাতে দিতে চাই...” এই বলে নীলকাকুর মা মায়ের হাতে আরেকটি সাদা খাম তুলে দিলেন আর বললেন, “এই খামে ওই চারটে সোনার কয়েনের সার্টিফিকেটটাও রাখা আছে, প্রয়াগ ব্যাংকের, রেখে দিস যত্ন করে।”

সব কিছু মিটে যেতে, আমরা সেদিন নীলকাকুদের বাড়ি রাতের খাবার সেরেই ফিরেছিলাম। ইতি আর উতির পরের দিন রবিবার স্কুল নেই বলে জেগে রইল অনেক রাত অবধি। আর সোমবার দিন সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ নীলকাকুর মা ফোন করেছিলেন মাকে, ফোন রেখে মা আমাকে বললেন, “যাক বাবা, হেমকান্ত মীনামহাশয় আবার প্রয়াগতীরে নির্বিঘ্নে ঢুকে পড়েছেন।”

ছবিঃ শিমুল

হাইলাকান্দির হুডিনি

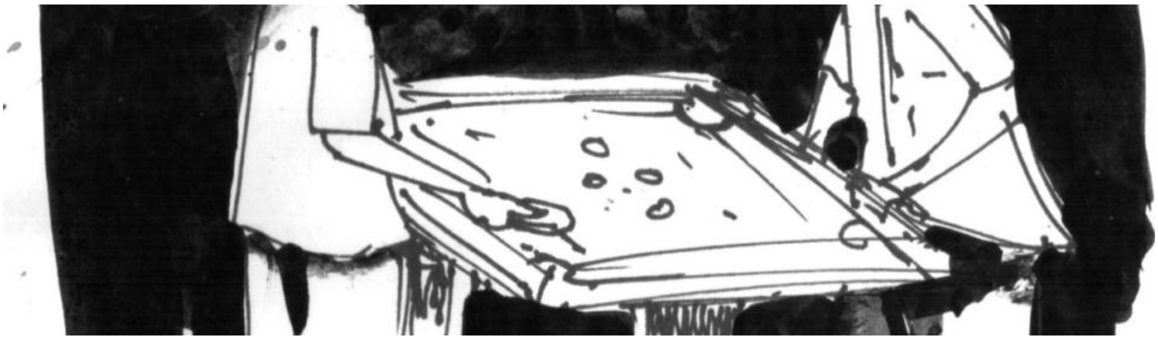

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য

জন্ম- মৃত্যু- বিয়ে তিন বিধাতা নিয়ে, এ কথাটা যে কতটা সত্যি তার প্রমাণ ওঙ্কার পেল যখন তার আজন্ম জলপাইগুড়িতে বড় হওয়া দিদির বিয়ে হল অসমের হাইলাকান্দিতে। শীর্ষদা একটা কলেজে পড়ায়। দিদির বিয়ের সময় গিয়ে জায়গাটা খারাপ লাগেনি ওঙ্কারের। আশেপাশে সবুজ চা- বাগান রয়েছে, মন ভাল করে দেওয়া পাহাড় রয়েছে, মানুষজনও দিব্যি আন্তরিক।

বিয়ে হয়ে যাবার পর দিদি বারবার বলছিল একবার হাইলাকান্দি ঘুরে যাবার জন্য। কিন্তু সদ্য ব্যাঙ্কের চাকরিতে ঢুকে ওঙ্কারের ছুটি নেই। মার্চ মাসে কাজের চাপ ছিল, তখন আসা হয়নি। অবশেষে এপ্রিলে এক সপ্তাহের জন্য ওঙ্কার এসেছে এখানে।

জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন থেকে সকালের কামরূপ এক্সপ্রেস ধরে সন্ধেবেলা গুয়াহাটি পৌঁছেছিল ওঙ্কার। হোটেলে ফ্রেশ হয়ে রাতের খাওয়া সেরে পল্টনবাজার থেকে একটা ওভারনাইট বাসে চেপে বসেছিল সে। পরদিন সকালে সেই বাস তাকে নামিয়ে দিল হাইলাকান্দি বাজারে।

সন্ধেবেলা শীর্ষদাদের বাড়ির ছাদে ক্যারাম খেলছিল দুজন মিলে। ওঙ্কারের ক্যারামে হাত ভাল। প্রত্যেক বছর তাদের জোনে সবগুলো ব্যাঙ্ক মিলিয়ে একটা ক্যারাম কম্পিটিশন হয়। তাতে ওঙ্কার রানার আপ হয়েছে এবার। শীর্ষদা ওঙ্কারের সামনে দাঁড়াতেই পারল না। দুটো গেম হেরে সে তারিফ করে বলল, “তোমার ক্যারামের হাত লা- জবাব। নাহ, হাইলাকান্দির হুডিনি ছাড়া তোমায় কেউ হারাতে পারবে বলে মনে হয় না!”

ওঙ্কার অবাক হয়ে বলল, “হাইলাকান্দির হুডিনি? তিনি আবার কে?”

শীর্ষদা হাসল, “ম্যাজিশিয়ান হ্যারি হুডিনির নাম শুনেছ? এখানেও একজন হুডিনি আছেন। ইনি অবশ্য ক্যারামের জাদুকর। ভদ্রলোকের আসল নাম কাদের কিবরিয়া। হাইলাকান্দি তো বটেই, আশপাশের শিলচর, বদরপুর, করিমগঞ্জ থেকেও অনেকে খেলতে এসেছে কাদের মিঞাঁর সঙ্গে। কিন্তু আজ অবধি কেউ হারাতে পারেনি ওঁকে।”

ওঙ্কার বলল, “কী করেন ভদ্রলোক?”

শীর্ষদা বলল, “আমাদের কলেজ ক্যাম্পাসে কাদের মিঞাঁর চায়ের দোকান। আগে দোকানে খদ্দের না থাকলে মাঝেসাঝে ক্লাবে এসে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আমাদের ক্যারাম খেলা দেখতেন। একদিন একটা দুর্ঘটনায় ওঁর ডান হাত কবজি থেকে কাটা পড়ে যায়। বাধ্য হয়ে বাঁ হাতেই একটু একটু করে সব কাজ করতে শিখে নেন ভদ্রলোক। শুধু তাই নয়,

ক্যারাম খেলাও শিখে ফেলেন বাঁ হাতে। সেটার পিছনে অবশ্য একটা ইন্টারেস্টিং গল্প আছে।”

ওঙ্কার নড়েচড়ে উঠে বলল, “গল্পটা শোনাও তবে।”

শীর্ষদা হাসল, “বছর কয়েক আগের একদিনের কথা। রাতভর বৃষ্টি হল খুব। পরদিন কলেজে অ্যাটেনডেন্স কম। বিকেলে ক্লাবঘরে বসে বসে বোর হচ্ছিলাম। সঙ্গীসাথীর দেখা নেই। শেষে অধৈর্য হয়ে কাদের মিঞাঁর দোকানে এক কাপ চা নিয়ে বসলাম। সেদিন ওঁর দোকানেও খদ্দের নেই। আমার উসখুস দেখে কাদের মিঞাঁ বললেন, ‘চলুন স্যার ক্যারামে আপনাকে সঙ্গ দিই।’

“আমার বিস্মিত মুখ-চোখ দেখে নিজেই বললেন, ‘অভ্যাস করে করে সব কাজ করতে শিখে গেছি বাঁ হাতে। এমনকী সই পর্যন্ত করতে পারছি। চেষ্টা করলে ক্যারাম খেলতে পারব না কেন?’ ”

ওঙ্কার কৌতূহলী স্বরে বলল, “তারপর?”

শীর্ষদা বলল, “দুজনে খেলতে শুরু করলাম। কাদের মিঞাঁ কিছুক্ষণের মধ্যেই খেলাটা রপ্ত করে ফেললেন। বললে বিশ্বাস করবে না শেষ অবধি আমি গেমটা হেরে গেলাম। প্রণবেশ পরদিন ক্লাবে ধরে নিয়ে এল কাদের মিঞাঁকে। সে-ও চার বোর্ডে গেম খেয়ে গেল। তারপর রামামৃতও হেরে গেল কাদের মিঞাঁর কাছে। খবর প্রচার হয়ে গেল হাওয়ার বেগে। এক এক করে সকলের মাথা হেঁট হয়ে গেল ওঁর সঙ্গে খেলতে গিয়ে। রামামৃত কাদের মিঞাঁর নাম দিয়ে দিল ‘হাইলাকান্দির হুডিনি’। সেই নামটাই ছড়িয়ে গেল লোকের মুখে মুখে।”

ওঙ্কার বলল, “কাদের মিঞাঁর সঙ্গে একহাত খেলার জন্য সাধ হচ্ছে খুব। শীর্ষদা তুমি ব্যাবস্থা করে দাও প্লিজ।”

শীর্ষদা হেসে বলল, “বেশ কাল আমাদের ক্লাবে নিয়ে যাব তোমাকে।”

পরদিন শীর্ষদার কলেজে এসেছে ওঙ্কার। ক্লাবঘরের একদিকে একটা টেবিল-টেনিস বোর্ড। একটা তক্তপোশে বসে দাবার ঘুঁটি সাজিয়ে তন্ময় হয়ে দাবা খেলছেন দুজন। দুটো ক্যারাম বোর্ড আছে। চারজন দাঁড়িয়ে ডাবলস খেলছেন একটা ক্যারামে। অন্যটা ফাঁকা।

শীর্ষদা গিয়ে ডেকে নিয়ে এল কাদের মিঞাঁকে। ঢোলা পাজামা আর সাদা ফতুয়া পরা প্রৌঢ় মানুষটাকে দেখল ওঙ্কার। নিরীহ সাদামাটা চেহারা। ডান হাতের কবজি থেকে নেই। কাঠের একটা নকল হাত লাগানো সেখানে। মোটা ফ্রেমের চশমার আড়ালে চোখদুটো ভাসাভাসা। তামাটে গায়ের রং, গোঁফহীন একমুখ সাদা দাড়ি। ওঙ্কারের দিকে তাকিয়ে সৌজন্যের একটু হাসি হাসলেন, আদাব জানালেন বাঁ হাত তুলে।

শুরু হল খেলা। কাদের মিঞাঁ কথা বলেন না খেলার সময়। নিজের দান এলে বাঁ হাতের স্ট্রাইকার বসিয়ে বোর্ডের দিকে তাকিয়েই থাকেন দু-চার সেকেন্ড। তারপর তাঁর

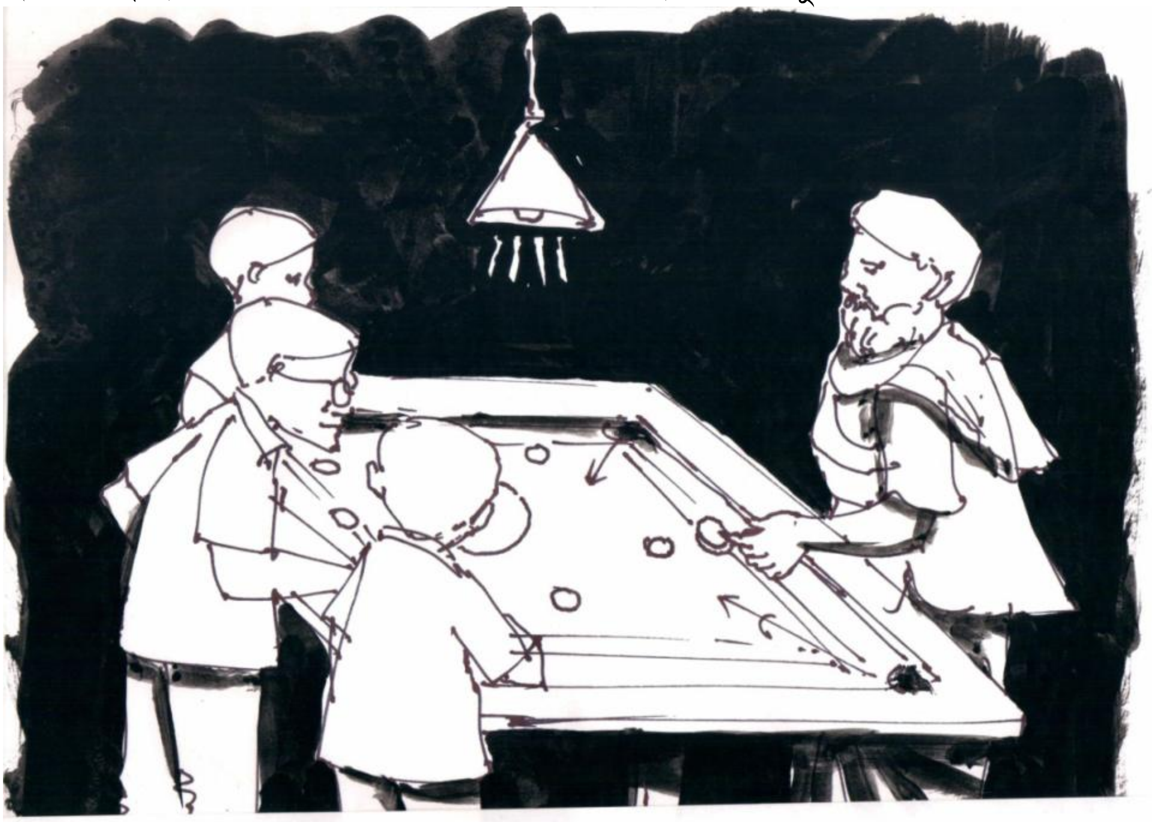

আঙুল থেকে বেরোনো স্ট্রাইকার আলতো স্পর্শ করে ঘুঁটিতে। যেন নিয়তিনির্দিষ্ট, এমন অমোঘভাবে সেই ঘুঁটিটা পড়ে যায় পকেটে। এমন অবিশ্বাস্য পারফেকশন কখনও দেখেনি ওঙ্কার। সারাক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে থেকে হেরে গেল সে। মানুষটা সত্যিই যেন ক্যারামের হুডিনি।

গো হারান হেরে যাওয়ায় লজ্জায় লাল হয়ে যাচ্ছিল ওঙ্কার। কাদের মিঞাঁ নিস্পৃহ মুখ করে চলে গেলেন দোকান সামলাতে। ওঙ্কার অবাক হয়ে দেখল যে দর্শকদের মধ্যে একটুও চাঞ্চল্য নেই। যাঁরা খেলা দেখছিলেন তাঁরা নিজের নিজের কাজে ফিরে গেলেন। যেন সকলেই জানতেন যে এমনটাই হবে। যত বড় প্রতিপক্ষই হোক না কেন হাইলাকান্দির হুডিনি হারতে পারেন না।

বাড়ি ফিরে খাবার টেবিলে শুকনো মুখে ওঙ্কার বলল, “একজন প্রতিবন্ধী মানুষ বাঁ হাতে আমাকে হারিয়ে দেবেন আমি কস্মিনকালেও ভাবিনি।”

দিদি সান্ত্বনা দিয়ে বলল, “জীবনই হোক বা স্পোর্টস, লড়াই করে হেরে যাবার মধ্যে অসম্মানের কিছু নেই। ভাল করে প্র্যাকটিস কর। পরের বার যখন আসবি তখন চেষ্টা করে দ্যাখ ওঁকে হারাতে পারিস কিনা।”

শীর্ষদা বলল, “স্তেফান জাইগের ‘বিওয়ার অফ পিটি’ নামে একটা বই পড়েছিলাম। জীবনকে কীভাবে নেওয়া উচিত সেটা নিয়ে আলোচনা আছে বইটায়। জীবনটা প্রত্যাশা আর প্রাপ্তিতে মধুর নয়। সব কাজই সঠিকভাবে সম্পন্ন হয় না সবসময়, সেটাই বাস্তব সত্য। জীবনে আচমকা মুখ থুবড়ে পড়লে আমরা হতাশ হই, ভেঙে পড়ি, ক্রমাগত কাঁদুনি গেয়ে নিজের ব্যক্তিগত দুঃখকে সকলের কাছে আলোচনার বিষয় করে তুলি। অথচ আচমকা পঙ্গু হয়ে

যাবার পর কাদের মিঞাঁ কিন্তু একবারের জন্যও আমাদের কাছে এসে অভিযোগ জানাননি। সাহায্যও চাননি। বরং একটু একটু করে বাঁ হাতে সব কাজ করতে অভ্যস্ত করে নিয়েছেন নিজেকে। মানুষটার মনের জোরের কথা ভাবো একবার।”

জলপাইগুড়িতে ফিরে এসেছে ওঙ্কার। কিছুদিন বাদে দিদির সঙ্গে ফোনে কথা হল। সাধারণ দু'চারটে কথার পর ওঙ্কার বলল, “তোদের হাইলাকান্দির হুডিনিকে হারাতে পারল কেউ?”

দিদি বলল, “এখনও পারেনি। অসমের স্টেট লেভেল ক্যারাম চ্যাম্পিয়ন প্রকাশ বরদলইয়ের নাম শুনেছিস? গত সপ্তাহে তাঁর শালার বিয়ে হল এখানে। বিয়েতে বরযাত্রী হয়ে এসে বিপাকে পড়েছিলেন ভদ্রলোক। লোকজন কাদের মিঞাঁর সঙ্গে ডুয়েল লাগিয়ে দিয়েছিল প্রকাশের। প্রকাশ প্রথমে তেমন মন দিয়ে খেলেননি। কিন্তু অবশ্যম্ভাবী হার নিশ্চিত দেখে যখন গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছেন তখন আর কিছু করার নেই। হেরে গেছেন কাদের মিঞাঁর কাছে।”

শীর্ষদা হেসেই কুটিপাটি, “হেরে যাবার পর প্রকাশ বরদলইয়ের থতমত খাওয়া মুখটা একবার দেখতে যদি তুমি!”

জামাইষষ্ঠীর সময় দিদি আর শীর্ষদা এল জলপাইগুড়িতে। ট্রেন থেকে প্ল্যাটফর্মে সবে নেমেছে শীর্ষদারা। এগিয়ে গিয়ে দিদির হাত থেকে লাগেজব্যাগটা নিজের হাতে নিয়ে ওঙ্কার বলল, “হাইলাকান্দির হুডিনির কী খবর?”

দিদি হাসল, “মেঘালয়ের তুরা থেকে এক ভদ্রলোক খেলতে এসে হেরে ফিরে গেলেন। তবে কাদের মিঞাঁর শরীরটা বিগড়েছে। হার্টের অসুখ ধরা পড়েছে। বদরপুরে কেমন এক ভাগ্নে থাকে, সে এসে আছে অসুস্থ মামার কাছে।”

শীর্ষদা বলল, “আমরা ক্লাব থেকে হাজার পঞ্চাশেক টাকা দিয়েছি চাঁদা তুলে। সামনের সপ্তাহেই কাদের মিঞাঁকে চিকিৎসার জন্য দক্ষিণ ভারতে নিয়ে যাওয়া হবে।”

চাকরিতে একটা প্রোমোশন হয়েছে ওঙ্কারের। তার কাজের চাপ বেড়েছে। তার মধ্যেও ক্যারাম প্র্যাকটিস করছে নিয়মিত। তার ফলও ফলেছে। এ বছর তাদের অফিসের ক্যারাম কম্পিটিশনে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ওঙ্কার। সেদিন ফোন করে সেই খবরটাই দিচ্ছিল শীর্ষদাকে। যথারীতি কাদের মিঞাঁর প্রসঙ্গও উঠল। শীর্ষদা বলল, “ওঁর হার্টে তিনটে ব্লকেজ ধরা পড়েছে। ডাক্তার বলেছেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাইপাস অপারেশন করাতে হবে। লাখ দুয়েক টাকার ধাক্কা। কিন্তু অত টাকা ওঁদের না থাকায় অপারেশনটা করানো যাচ্ছে না।”

কয়েক মাস গড়িয়ে গেছে। সেদিন হাইলাকান্দি থেকে খবর এল, দিদির কোল আলো করে ফুটফুটে এক শিশু জন্ম নিয়েছে। দিদি নার্সিংহোম থেকে ফিরে এসেছে বাড়িতে। মা আর শিশু, দুজনেই ভাল আছে। যতই অফিসের কাজের চাপ থাক, এবার হাইলাকান্দি যেতেই হবে তাকে। ব্রাঞ্চ ম্যানেজারকে বলে তিনদিনের ছুটি ম্যানেজ করে হাইলাকান্দির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে দিল ওঙ্কার।

ছেলেটা অবিকল দিদির মতো দেখতে। কোঁকড়া চুল, বড় বড় চোখ, লাল টুকটুকে ঠোঁট। একটুও কান্নাকাটি নেই, সারাদিন শুধু ঘুমোচ্ছে আর ঘুমের মধ্যে হাসছে। নার্সিং হোম থেকে ফিরে এসে দিদিও এখন অনেকটা ফিট। হাঁটাচলা, ঘরের কাজকর্ম সবই করছে। শীর্ষদা কয়েকদিনের ছুটি নিয়েছিল। আজ থেকে আবার যেতে শুরু করেছে কলেজে। ওঙ্কারেরও কাল

বাদে পরশু বিকেলের বাসে গুয়াহাটি ফেরার কথা। রাতে খাবার টেবিলে বসে ওঙ্কার বলল, "কাদের মিঞাঁর অপারেশন হয়েছে?"

দিদি বলল, "কী করে হবে? টাকাই তো জোগাড় হয়নি এখনও। এর ওর থেকে সাহায্য নিয়ে একলাখ জোগাড় হয়েছে। কিন্তু আরও একলাখ টাকা চাই। মইনুদ্দিন হায়াত নামে এক ব্যবসায়ী অপারেশনের জন্য বাকি টাকা দিতে রাজি হয়েছেন। তবে তিনি একটা অদ্ভুত শর্ত রেখেছেন।"

ওঙ্কার বলল, "কী শর্ত?"

শীর্ষদা বলল, মইনুদ্দিন টাকার কুমির। ওঁর একমাত্র ছেলে মুন্না কলেজে পড়ে। ছেলের আবদারে সায় দিয়ে বাইক, সেলফোন, ল্যাপটপ আর ঝাঁ চকচকে গাড়ি কিনে দিয়েছেন মইনুদ্দিন। মুন্না এবার ইন্টার কলেজ ক্যারামে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ক্যারামে কলেজ সেরা হয়েই বাবুর শখ হয়েছে হাইলাকান্দির হুডিনিকে হারাবেন। একমাত্র ছেলের আবদার বলে কথা! মইনুদ্দিন কাদের মিঞাঁর কাছে লোক পাঠিয়েছিলেন। মুন্নার কাছে ক্যারামে হেরে গেলে এক লাখ টাকার চেক দেবেন তিনি। তবে পুরো ব্যাপারটাই গোপনে রাখতে হবে, পাঁচকান যেন না হয়।

ওঙ্কার বিস্মিত হয়ে বলল, "কাদের মিঞাঁ রাজি হয়েছেন এই শর্তে?"

শীর্ষদা ঘাড় নেড়ে বলল, "প্রথমে রাজি হয়নি। কিন্তু পরে অনেক মিলে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওঁকে রাজি করিয়েছে। ক্যারামে একটা গেম হারলে কীই বা আসবে- যাবে ওঁর। আগে প্রাণ তারপর তো মানসন্মান।"

আজ সেই চ্যালেঞ্জের ম্যাচ। খেলার মাঠে মঞ্চ বানানো হয়েছে। ডায়াসের ওপর রাখা হয়েছে ক্যারাম। মঞ্চের ঠিক পাশে লাগানো হয়েছে দৈত্যাকার পর্দা। সেখানে সরাসরি ম্যাচ সম্প্রচার হবে। এর পুরো খরচটাই বহন করছেন মইনুদ্দিন। শীর্ষদা আর ওঙ্কার এসেছে খেলা দেখতে। শীর্ষদা বিশেষ অতিথিদের একজন, তাই ডায়াসের ওপরেই বসার জায়গা করে দেওয়া হয়েছে তাদের দুজনের। ওঙ্কারের পাশের চেয়ারে বসেছেন মাঝবয়েসি দশাসই চেহারার মইনুদ্দিন। মেহেন্দি করা চুলদাড়ি, চোখে সুরমা, ধূর্ত মুখচোখ। উদ্ধত ভঙ্গীতে পান চিবোচ্ছেন।

একজন ধরে ধরে ডায়াসে তুলল কাদের মিঞাঁকে। ধুঁকতে ধুঁকতে মঞ্চে উঠে আসা মানুষটাকে দেখে চমকে গেল ওঙ্কার। রোগে জর্জর মানুষটির মুখের চামড়া ঝুলে গেছে, চোখ ঢুকে গেছে কোটরে, মুখে বয়সের আঁকিবুঁকি। শ্বাস নিতেও যেন বড় কষ্ট তাঁর।

শুরু হল খেলা। একটাই গেম হবে, পঁয়ত্রিশ পয়েন্টের। কিন্তু কাদের মিঞাঁর দূরের তো বটেই সামনের সহজ ঘুঁটি পর্যন্ত লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছে। শীর্ষদা বড় বড় শ্বাস ফেলছে। ওঙ্কারেরও ভীষণ হতাশ লাগছে খেলা দেখে। এই খেলার ভবিতব্য কী সেটা তাদের জানা। কিন্তু এই প্রথম হাইলাকান্দির হুডিনিকে হারতে দেখে চাপা গুণগুণ শুরু হয়ে গেছে দর্শকদের মধ্যে।

প্রথম বোর্ডে মুন্না নয় পয়েন্ট পেল। দ্বিতীয় বোর্ডেও একই ছবি। তৃতীয় বোর্ডের শেষে মুন্নার পয়েন্ট গিয়ে দাঁড়াল সাতাশে। ওঙ্কার দেখল, কাদের মিঞাঁ ঠোঁট দিয়ে ঠোঁট চেপে রয়েছেন। চোখেমুখে একটা চাপা যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে। ইচ্ছে করে হেরে যেতে হবে সেটা মেনে নিতে পারছেন না কিছুতেই। ওদিকে মইনুদ্দিন পান চিবোতে চিবোতে অঙ্গভঙ্গী করছেন আর বাজে রসিকতা করছেন কাদের মিঞাঁর দিকে তাকিয়ে। ছেলের হাতে হাইলাকান্দির হুডিনির

অশ্বমেধের ঘোড়া থেমে যাবে আজ, সেজন্য মইনুদ্দিনের চোখমুখ থেকে দম্ভ ঠিকরে বেরোচ্ছে।

হঠাৎ কাদের মিঞাঁ মুখ ফিরিয়ে দেখলেন মইনুদ্দিনকে। স্থির, মর্মভেদী সে দৃষ্টি। অস্বস্তিতে চোখ সরিয়ে নিলেন মইনুদ্দিন। এর পরই পাশার দান ঘুরে গেল সহসা। চতুর্থ বোর্ডে একতরফা খেলে কাদের মিঞাঁ উড়িয়ে দিলেন মুন্নাকে। পরের বোর্ডেও একই ঘটনা। দর্শকরা দেখলেন আবার নতুন করে হাইলাকান্দির হুডিনির হাতে কথা বলছে স্ট্রাইকার।

হতভম্ব মুন্না বারবার তাকাচ্ছে তার আব্বাজানের দিকে। ভুরু কুঁচকে গেছে মইনুদ্দিনের। সাজানো চিত্রনাট্যে তো এমন লেখা ছিল না! কি আশ্চর্য! এই বেয়াদব লোকটার কি বেঁচে থাকার মোহ নেই?

মইনুদ্দিন হায়াত ক্রুদ্ধ চোখে তাকালেন কাদের মিঞাঁর দিকে। তাতে তাঁর খুব বেশি ভাবান্তর হল না। পরের বোর্ডও জিতলেন কাদের মিঞাঁ। এবার পয়েন্ট সমান সমান হয়ে গেল। দু'জনেই দাঁড়াল সাতাশ পয়েন্টে। জিততে হলে চাই আর আট পয়েন্ট।

মুন্না হিট করে পাঁচটা ঘুঁটি ফেলে দিয়েছিল। কাদের মিঞাঁ প্রবল চাপের মধ্যে তিনটে হাতের কাছের ঘুঁটি ফেললেন ঠান্ডা মাথায়! নিপুণ স্থৈর্য নিয়ে তিনি একটা করে ঘুঁটি ফেলছেন আর মুন্নার মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে যাচ্ছে।

এক এক করে আটটা ঘুঁটি পড়ে গেল পকেটে। শেষ ঘুঁটিটা বেশ দূরের। কাদের মিঞাঁ স্ট্রাইকার দাগে বসিয়ে তাকিয়ে আছেন ঘুঁটিটার দিকে।

হঠাৎ তাঁর ঘাড়ের কাছে কোত্থেকে একটা বড়সড় পোকা উড়ে এসে বসল। ওঙ্কার দেখল পোকাটা কামড়ে দিয়েছে। ফুলে লাল হয়ে গিয়েছে জায়গাটা। সেদিকে ভ্রুক্ষেপই নেই তাঁর। একটিবারের জন্যও ঘাড়ে হাত দিলেন না কাদের মিঞাঁ। একাগ্র হয়ে ঘুঁটিটাই শুধু দেখছেন তিনি। যেটুকুও শোরগোল হচ্ছিল এখন তা-ও বন্ধ। প্রত্যেকটা দর্শক চুপ করে গেছে, শ্বাস নিতেও ভুলে গেছে সকলে।

অবশেষে, কাদের মিঞাঁর হাত থেকে বেরোনো স্ট্রাইকার আলতো করে গিয়ে লাগল ঘুঁটিটায়। মসৃণভাবে কোণাকুণি পকেটে ঢুকে গেল ঘুঁটিটা। বাঁধভাঙা উল্লাসের কলরোল তুলে দর্শকেরা কাঁধে তুলে নিল হাইলাকান্দির হুডিনিকে।

মুখ চুণ হয়ে গেছে মইনুদ্দিনের। গজগজ করতে করতে দ্রুত পায়ে চলে যাচ্ছেন মঞ্চ ছেড়ে। শীর্ষদা হেসে ফেলল হো হো করে। ওঙ্কার কিছু বলতে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই ভিড়ের ওদিকটা থেকে হঠাৎ ভেসে এল শোরগোল। দু'চারজন ধরাধরি করে এনে ডায়াসের মধ্যে শুইয়ে দিল তাঁকে।

কাদের মিঞাঁ শুয়ে আছেন মঞ্চের পাটাতনে। বেঁকে গেছে ঠোঁট, চোয়াল। চশমা ছিটকে গেছে কোথায়। দুটো চোখ খোলা, চোখের মণিদুটো স্থির, ঠোঁটের কোণ থেকে ফেনা গড়িয়ে পড়ছে। মঞ্চে অভ্যাগতদের মধ্যে একজন ডাক্তার খেলা দেখতে এসেছিলেন। রক্তচাপ মাপার যন্ত্র কিংবা স্টেথো কিছুই আনেননি সঙ্গে করে। তিনি এগিয়ে গিয়ে কাদের মিঞাঁর বাঁ হাতের কবজি তুলে নাড়ি ধরে থাকলেন। তারপর শুকনো মুখ করে ছেড়ে দিলেন হাতটা। উৎকন্ঠিত লোকজনের মুখের দিকে তাকিয়ে ঘাড় নেড়ে বললেন, কাদের মিঞাঁ আর নেই। খুব সম্ভবত হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে তাঁর।

কান্নার রোল উঠেছে চারদিকে, বিলাপ করছে সকলে। ওঙ্কারের ঠোঁট থরথর করে কাঁপছে, চোখ ভেজা। শীর্ষদার চোখেও জল। নীচু গলায় বলল, "দুর্বিপাকে আমাদের যে

কারো অঙ্গহানি হতে পারে। কিন্তু সেই প্রবল প্রতিবন্ধ কাটিয়ে উঠতে পারে খুব কম মানুষ। কাদের মিঞাঁ পেরেছিলেন। ইচ্ছে করলেই আপোস করতে পারতেন। কিন্তু যেকোন চ্যাম্পিয়নের মতই তাঁর দৃপ্ত অহং আপোস করার চাইতে মৃত্যুবরণ করাকেই শ্রেয় বলে সায় দিয়েছিল। কী স্পিরিট ছিল মানুষটার! হ্যাটস অফ টু হিম।”

বুকের মধ্যে তুমুল কষ্টের একটা অনুভূতি হচ্ছে। হাইলাকান্দির হুডিনির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একবার ক্যারাম খেলার সুযোগ পেয়েছিল ওঙ্কার। এক অবিস্মরণীয় ইন্দ্রজাল সামনে দাঁড়িয়ে দেখেছে সে। ওঙ্কার জানে সেই সুখস্মৃতি তার মন থেকে মুছে যাবে না কোনওদিন।

ছবিঃ মলয়চন্দন সাহা

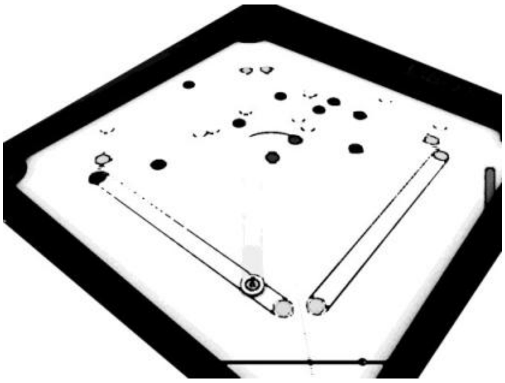

রতনতনু ঘাটী

এবার অয়নদার জন্মদিনে সারাদিন ধরে খুব আনন্দ করেছিল পুচন। সকালে বেলুন ফোলানো থেকে শুরু করে রঙিন কাগজ কেটে- কেটে শিকল তৈরি করেছে দুজনে। অয়নদার দাদুর সঙ্গে অয়নদা আর পুচন গিয়ে বাজার থেকে ফুল কিনে এনেছে।

কাকিমা মানে অয়নদার মা ফুলদানি এনে টেবিলে বসিয়ে দিয়ে বলেছেন, "পুচন, তুই এতে ফুল সাজিয়ে ফ্যাল তো।"

অয়ন তক্ষুনি এক গোছা গোলাপ দিয়ে সুন্দর করে ফুলদানি সাজিয়ে দিয়েছে। দেখে কাকিমা বলেছেন, "বাঃ, খুব সুন্দর হয়েছে রে।"

সন্ধ্যেবেলা বসার ঘরের যেখানটায় অয়নের জন্মদিন হবে, সেখানে একটা টেবিল রাখা হয়েছে। তার উপর কাকিমা সাদা নকশা করা কাপড় পেতে দিয়েছেন। সারা দুপুর ধরে অয়নদার সঙ্গে পুচন রং পেনসিল দিয়ে যত গাছপালা, ঘরবাড়ি, নদী আর নৌকোর ছবি এঁকেছিল, সব দুজনে আঠা দিয়ে কাপড়টার উপর বসিয়েছে অয়ন আর পুচন।

পুচন অয়নদাকে বলেছে, "জানো অয়নদা, এই ছবিগুলোর মাঝখানে তোমার জন্মদিনের কেকটা রাখা হবে। আর তুমি এমনি করে কেকটা কাটবে ছুরি দিয়ে।" বলে পুচন তার ডানহাতের আঙুল দিয়ে কেক কাটার ভঙ্গি করে দেখিয়েছে। সেই দেখে অয়ন তো হেসে একপাক নেচে নিয়েছে।

পুচন সবে ক্লাস ফোরে উঠেছে। আর অয়ন সিক্স। অয়নদের বাড়িতে কিছু আনন্দ-উৎসব হলে পুচন চলে আসে। পুচন অয়নদের রান্নামাসির ছেলে। অয়নের মা যখন বলেন, রাধারানি, কাল সকাল থেকে পুচনকে নিয়ে আসবে। ও কাল সারাদিন আমাদের বাড়িতে থাকবে, তখন রাধারানি দু হাত নেড়ে বলে, "না গো বউদি, পুচনের আসার দরকার নেই। তোমাদের বাড়িতে যখন যা কিছু হয়, পুচন তো থাকেই। এবার আর এসে কাজ নেই।"

অয়নের মা বলেন, "তোমাকে অত ওস্তাদি করতে হবে না রাধারানি। আমি যেন সকালবেলা তোমার সঙ্গে পুচনকে দেখতে পাই।"

পুচন আসবে শুনলে সবচেয়ে খুশি হয় অয়ন। পুচন আসলে অয়নের একটা বন্ধু হয়ে উঠেছে।

এই তো সেদিন অয়নের জন্মদিনে যখন অয়নকে কাকিমা সন্ধ্যেবেলা নতুন জামা-প্যান্ট পরিয়ে সাজিয়ে দিলেন, পুচন দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিল। বেশ মানিয়েছে অয়নদাকে।

মনে- মনে বলছিল, আর মানাবে না- ই বা কেন? এ পাড়ায় অয়নদার মতো অমন ভালো ছেলে আর একটাও খুঁজে পাওয়া যাবে কি?

অয়নকে সাজানো হয়ে গেলে কাকিমা হাতের ইশারায় পুচনকে ঘরে ডেকে তাকেও নতুন জামা- প্যান্ট পরিয়ে দিলেন।

সেই দেখে তো রান্নামাসির সে কী রাগ। বলেছে, “বউদি, এসব আবার করলে কেন? এই জন্যে বলি, পুচনকে কোন উৎসবের দিন তোমাদের বাড়ি নিয়ে আসব না।”

তারপরে রাতে খাওয়ার শেষে পুচন যখন মা’র সাথে বাড়ি আসবে বলে রেডি, অয়ন ছুটে গিয়ে ওর উপহারের টেবিল থেকে একটা রঙের বাক্স এনে পুচনকে দিয়ে বলেছিল, “এটা দিয়ে ভাল ভাল ছবি আঁকবি। আমি আর তুই এবার ‘খেয়ালখুশি’ ক্লাবের বসে আঁকো থেকে পুরস্কার জিতে আনবই, দেখিস।”

খুশি- খুশি মুখে পুচন ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছিল অয়নের কথায়।

কিন্তু আজ ক’দিন হল, অয়নদার জন্যে ভীষণ মন খারাপ পুচনের। তার না স্কুল যেতে মন চাইছে, না কিছু খেতে ইচ্ছে করছে বাড়িতে। যেদিন মার মুখে শুনেছে, অয়নদার কী নাকি কঠিন অসুখ হয়েছে। অনেক রক্ত দিতে হবে।

সেদিন থেকে নাকি অয়নদার স্কুল যাওয়াও বন্ধ হয়েছে। মাঠে খেলতে যাওয়া ডাক্তারের বারণ। অনেক কিছু খাওয়াতেও নাকি নিষেধ হয়েছে অয়নদার।

মা যখন অয়নদাদের বাড়ি থেকে কাজ সেরে ফিরে আসে, পুচন অনেক আশা নিয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। এসেই মা হয়তো বলবে, জানিস তো পুচন, অয়নের অসুখ- টসুখ সবই নাকি ভুল খবর ছিল। ডাক্তারি পরীক্ষায় কিছুই ধরা পড়েনি।

না, মার মুখ থেকে ওরকম কোন কথাই শুনতে পায় না পুচন। সেদিন রাতে শুতে যাওয়ার সময় পুচন মাকে বলল, “মা কাল সকালে আমি তোমার সঙ্গে যাব অয়নদাকে দেখতে।”

বাবা বলল, “তা যাস’খন। অয়ন ছেলেটা বড়ো ভাল রে! কেন যে অমন অসুখ করল?”

বাবা প্রতিদিন সকালে উঠেই দূরের ইঁট ভাটায় কাজ করতে যায়। বাসে করে যেতে হয়। ফেরে রাত আটটা- ন’টায়। বাবা সকালে কাজে বেরিয়ে যেতেই পুচন মার সঙ্গে এল অয়নদাদের বাড়ি। সত্যি, অয়নদা কী রোগা হয়ে গেছে। মুখটা কেমন শুকনো। ঘরের ভিতর অয়ন বিছানায় শুয়ে আছে। পুচন অয়নের কাছে গিয়ে ওর মাথার পাশে বসল। মাথায় হাত রাখল অয়নের। বলল, “অয়নদা, দেখো, তুমি ভাল হয়ে যাবে। তুমি একদম সেরে যাবে অয়নদা। আমি তোমাকে রক্ত দেব।”

পুচনের কথা শুনে ক্ষীণ একটু হাসল অয়ন। ওর হাতটা বুকের উপর টেনে নিল। এমন সময় কাকিমা ঘরে এলেন। পুচন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “কাকিমা, আমি অয়নদাকে রক্ত দেব।”

কাকিমা পুচনের মাথায় হাত রেখে বললেন, “দূর পাগল! তুই ওইটুকু ছেলে। তোর রক্ত ডাক্তার নেবেই না। আর মাত্র একজন হলেই হয়ে যাবে। তোর কাকু পাড়ার ক্লাবে বলে এসেছেন। অয়নের রক্তের সঙ্গে মিলবে এমন একজনকে ওরা জোগাড় করে দেবে বলেছে। ”

বাড়ি এসে পুচন অনেক করে ভগবানকে বলল, “ঠাকুর, ভাল লোককে কেন যে অমন অসুখ দাও তুমি? তুমি আমার অয়নদাকে ভাল করে দাও।”

রাতে যখন বাবা কাজ সেরে ফিরে এল, পুচন বাবার কাছ ঘেঁষে বসল। ওর কান্ড দেখে বাবা বলল, "কী গো পুচনবাবু, কিছু বলবে বলে মনে হচ্ছে? কী বলো না।"

পুচন আরও বাবার কাছ ঘেঁষে সরে বসল। তারপর বলল, "কাল তোমাকে কাজে যেতে হবে না। তুমি আমার মা'র সঙ্গে কাল অয়নদার বাড়ি যাবে।"

বাবা বলল, "কাজে না গেলে আমাদের চলবে কী করে রে?"

পুচন জেদের গলায় বলল, "তুমি অয়নদাকে রক্ত দেবে চলো বাবা। কাকিমা বলেছেন, আর একজনকে পেলেই অয়নদার অসুখ সেরে যাবে।"

পুচনের মাও বলল, "অয়নরা কত ভালবাসে আমাদের পুচনকে। চলো, কালই যাই আমরা অয়নের বাড়ি।"

সকালে পুচনের বাবাকে বাড়িতে আসতে দেখে অয়নের মা-বাবা দুজনের অবাক। কতবার কত উপলক্ষে বাড়িতে ডাকা হয়েছে। কিন্তু পুচনের বাবা এতই লাজুক যে, আসেনি কোনওদিন।

পুচন বলল, "কাকিমা, অয়নদাকে বাবা রক্ত দেবে।"

পুচনের কথা শুনে অয়নের বাবা-মা তো অবাক। পুচনের মা লাজুক হেসে, "তোমরা কথা বলো বউদি! আমার কি দাঁড়িয়ে থাকলে চলে?" বলেই রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

পুচন অয়নের মার হাত ধরে বলল, "কাকিমা, তুমি হ্যাঁ বলো আগে।"

অয়নের বাবা পুচনের বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি তো কাজের লোক। কাজ কামাই হয়ে যাবে যে?"

পুচনের বাবা বলল, "তা হোক দাদা। অয়ন তো আমারও ছেলের মতো। ওর ভাল হয়ে ওঠাটা আমার একদিনের কাজের চেয়ে অনেক বড়ো।"

অয়নের বাবা বললেন, "তা বেশ। তার আগে তো রক্ত পরীক্ষা করে দেখা দরকার। রক্তের গ্রুপ মিললে তবেই না?"

অয়নের বাবার সঙ্গে পুচনের বাবাও বেরিয়ে গেলেন রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করার জন্যে। পুচন গিয়ে বসল অয়নের পাশে। অয়নের মাথার পাশে রং পেনসিলের বাক্স আর কাগজ পড়ে আছে।

পুচন বলল, "চলো অয়নদা, আমরা একটা ছবি আঁকি। তুমি আমাকে কোথায় কী রং করব, দেখিয়ে দেবে তো?"

অয়ন ঘাড় দুলিয়ে বলল, "আগে তুই আঁক তো। তারপর তো রং।"

পুচন একটা নদীর ছবি আঁকতে লাগল। উপুড় হয়ে শুয়ে অয়ন দেখতে লাগল তার ছবি আঁকা। একটু পরে পুচন রং পেনসিলটা অয়নের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "অয়নদা, এবার তুমি একটু আঁকো।"

পুচনের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হেসে অয়ন বলল, "তুই আঁক। আমার হাতে কি এখন আর অত জোর আছে রে? তুই আঁক। আমি বরং তোকে দেখিয়ে দিই।"

পুচন অয়নের হাত থেকে রং পেনসিল নিয়ে ছবিটায় ফের রং করতে শুরু করল। দেখতে-দেখতে একটা সুন্দর নদীর ছবি ফুটে উঠল কাগজে। এবার পুচন বলল, "বলো অয়নদা, নদীর মাঝখানে একটা নৌকোর ছবি না থাকলে কি ভাল লাগে?"

সেই নদীর মাঝে নৌকো আঁকা শেষ হয়েছে, অমনি ওরা দেখল, বাড়িতে ঢুকছেন অয়নের বাবার সঙ্গে পুচনের বাবাও।

অয়নের বাবা হেসে বললেন, "জানিস অয়ন, তোর রক্তের সঙ্গে পুচনের বাবার রক্তের গ্রুপ মিলে গেছে। আর আমাদের চিন্তা নেই।"

ওঁদের কথা শুনে রান্নাঘর থেকে অয়নের মা'র সঙ্গে ছুটে এল পুচনের মাও। অয়নের মা'র দিকে তাকিয়ে অয়নের বাবা বললেন, "শোনো, আমরা অয়নের অপারেশনের দিন ঠিক করেই এলাম। পরশু।"

সকলের মুখে হাসির রেখা চিকচিক করে উঠল। পুচনের বাবা বলল, "দাদা, আমরা আজ চলি? পরশু আমি ঠিক নার্সিং হোমে সকাল- সকালই চলে যাব।" বলে পুচনকে বলল, "চল রে পুচন, আর ছবি আঁকতে হবে না। এবার বাড়ি চল।"

পুচন ছবিটা অয়নের হাতে দিয়ে বলল, "এই ছবিটা তোমাকে দিলাম অয়নদা। আজ আসি গো। তোমার অপারেশনের দিন বাবার সঙ্গে আমিও যাব।"

পুচন আর তার বাবা বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় গিয়ে নামল। সেদিকে তাকিয়ে থাকল অয়ন। পুচনের আঁকা নৌকো- ভাসা নদীর ছবিটা তখন অয়নের হাতে।

ছবিঃ শিমুল

উল্টো পাল্টো

শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

বাবার আবার বদলি হল। চিঠি পেয়ে কাদুপিসি তো রেগেই অস্থির। হাতের কাছে আর কাউকে না পেয়ে আমাকেই চেপে ধরল – হ্যাঁরে তোদের বাবা কিসের চাকরি করে যে হপ্তায় হপ্তায় বদলি হতে হয়? খুব রাগ হল! আমি জানবো কোত্থেকে? আমার এমনিতেই অঙ্ক- টঙ্ক হয় না বলে মাথার চুল খাড়া হয়ে থাকে, বুদ্ধি নাকি কম! তার ওপর পাঁচ ক্লাসেই তিনবার ইস্কুল বদল করতে হয়েছে।

মা'র অবাক হবার কিছু ছিল না, আমাদেরও না, হলামও না। অমন বদলি অনেক দেখা আছে। বাকসো প্যাঁটরা তো চট দিয়ে ঘিরে বাঁধাই থাকে, গোছাবার মধ্যে কটা থালাবাসন আর বিছানা আর আমাদের বইপত্তর। ঘন্টাখানেকের মধ্যে বাঁধা হয়ে গেল। এবেলা ওবেলা খাওয়া হবে কলাপাতায়, ব্যস। শুধু আবার করে নতুন ইস্কুলে ভর্তি পরীক্ষা দিতে হতে পারে বলে আমাদের চার ভাইবোনের যা একটু মনখারাপ। বাবলির অবশ্য সবটাতেই খুশি থাকা অভ্যেস, ওর হাসি শুনে কাদুপিসি মুখ গোমড়া করে বলল, রেলের চাকুরে ও অনেক দেখেছে, এরকম চাকা লাগানো ব্যাপার আর একটিও দেখেনি।

মা শুধু একটা ব্যাপারেই একটু মুষড়ে রইলেন। যাবার সময় বাবা থাকতে পারছেন না। তবে মালপত্তর গাড়িতে তুলে আবার জায়গামত নামিয়ে নেওয়ারও লোকজন থাকবে। আমরা শুধু বাড়ি থেকে দু'পা হেঁটে রেলের কামরায় গিয়ে বসবো, ব্যস। রাতের গাড়ি, তাছাড়া জঙ্গুলে পথে ঘন্টা ছয়েক যেতে হবে বলে মা একটু গাঁইগুঁই করে অগত্যা রাজি হয়ে গেলেন। কাদুপিসি কাজে জবাব দিয়ে ওর মেয়ের বাড়ি চলে গেল আর সব বারের মত।

মাঝরাত্তির নাগাদ পৌঁছে গেলাম সেখানে। টিমটিমে বাতি জ্বলা ছোট্ট স্টেশন। যথারীতি এখানেও বাবা আসতে পারেননি কাজ পড়ে গেছে বলে। তবে লোকজনের ব্যবস্থা করা ছিল যথেষ্ট। তারাই লোকেদের মাথায় করে মালপত্তর সমেত আমাদের দুটো ঘোড়ার গাড়িতে তুলে রওনা করিয়ে দিল। ঘুমচোখে চারদিক নজর করে একটু থমকে গেলাম, এ রকম জঙ্গুলে জায়গায় আর থাকা হয়নি বাপু! থাকবার বাড়ি নাকি স্টেশন থেকে একটু তফাতে।

বেশ খানিকক্ষণ ঘোড়ার গাড়িতে লটর পটর করতে করতে যখন সেখানে পৌঁছলাম তখন রাত গভীর। অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, হঠাৎ কোত্থেকে লম্ফ হাতে তিন চারজন লোক এসে হাজির। তারা বেশ কাজের। আধঘণ্টার মধ্যে সব মালপত্তর গুছিয়ে খাবার দাবার বিছানা করা সব সেরে তারা চলে গেল। আমরাও পেটভরে খাওয়া দাওয়া করে মেঝেতে পাতা বিছানায় শুয়ে ঘুম। দু তিনবার বাড়ির পাশেই শেয়াল- টেয়াল ডাকলেও দু'চোখ খুলে রাখতে পারলাম না। তাছাড়া এদের রান্নাটাও বলতে নেই, জব্বর। একঘুমে রাত কাবার।

সকালে ঘুম থেকে উঠে চোখ জুড়িয়ে গেল। কী সুন্দর জায়গা রে বাবা! চারদিকে ঘন জঙ্গল, মাঝখানে ছোট মত একটা টিলার ওপরে পুরনো ঢং- এর আদ্যিকালের সাহেবি বাংলো। রাস্তা থেকে বাড়িতে যাবার পথে ঘেসো জমির ঢালে ধাপে ধাপে পাথর বসানো, সিঁড়ির চেয়ে ঢের ভাল। মাথার ওপর টালির চাল, রান্নাঘরে চিমনি, চারদিক ঘিরে চওড়া বারান্দা। ঠিক যেমন বিলিতি ছবির বইতে থাকে সেরকম। সব চাইতে ভাল হল আশপাশে আর কোনও ঘরবাড়ি নেই, অন্তত আমাদের চোখে তো পড়ল না। শুধু কাল রাতে যে পথে স্টেশন থেকে এসেছি সেই পাথর বাঁধানো রাস্তা বাড়ি থেকে আরও একটু এগিয়ে ঘন বেঘো জঙ্গলের মাঝে বাঁক নিয়ে চলে গেছে। কোথায় গেছে কে জানে!

চাদ্দিকে জঙ্গল দেখে মা একটু কিন্তু কিন্তু করায় দাদা খুব বিজ্ঞ মানুষের মতো বলল – হিমালয়ের তলাকার তরাই অঞ্চলটা নাকি এরকমই হয়। মা শুধু বললেন, তোর বাবার কাণ্ডটা দেখলি? লোকজনের ব্যবস্থা করলেই সব হয়ে গেল? পাঁচদিন হল দেখা নেই! এখন বাজার করাই কাকে দিয়ে? যা স্টেশনের ছিরি দেখলাম বাজার বসে বলে তো মনে হল না, খাবো কী?

বলতে না বলতে একজন কালোকুলো লোক মাটির একটা হাঁড়ি হাতে বারান্দায় উঠে এলেন, পেছনে আর একটা লোকের মাথায় ঝুড়ি ভর্তি তরি তরকারি মাছ- টাছ। হাঁড়ি মেঝেতে নামিয়ে শালপাতার ঢাকনা খুলতেই ভুর ভুর করতে লাগলো নলেনগুড়ের গন্ধ। একগাল হেসে কপালে জোড়হাত ঠেকিয়ে সিঁড়িতে বসলেন তিনি। গলার আওয়াজ বড়ই মোলায়েম। - কিছু ভাববেন না মা জননী, বাবু সব পাঠিয়ে দিলেন। এই সকালের গাড়িতেই কাজে গেলেন কিনা! দু'চারদিন বাদে বাড়ি ফিরবেন। কোনও অসুবিধে হলে আমি ছিচরণে হাজির। ওরে দাঁড়িয়ে রইলি কেন, বাজারটা দিয়ে আয় ভেতরে। হাঁড়িতে টাটকা নলেন গুড়ের সন্দেশ, খেয়ে দেখুন মা।

লোকটি চলে যাবার পর মা'র হাঁমুখ বন্ধ হল। আমরাও পায়ে পায়ে এসে দাঁড়ালাম।

সক্কালবেলায় বারান্দার টেবিলে চা জলখাবার দিয়ে কে যে ঘুম ভাঙিয়েছিল আগে বুঝিনি। এখন একজনকে দেখলাম ঘোমটা মাথায় মা'র কাছে কী রান্না হবে জানতে এলো। পরে মা বললেন ওর নাম এলোকেশী, তোরা মাসি বলে ডাকবি। তোদের কাদুপিসির চাইতে

কম নয়। চমৎকার রান্নার হাত। বাবলি বলল, কিন্তু ওর বড্ডো উঁচু দাঁত আর গুলি গুলি চোখ কেন? দিদি বলল, ছি, অমন বলতে নেই! আমাদের কাদুপিসিকে কি এমন ভালো দেখতে?

একটু পরে মা গেলেন রান্নাঘরে, আমরা গেলাম বন দেখতে। বাড়ির পেছনেই ঝোপঝাড় আর বড় বড় পাথরের আড়ালে প্রায় শুকিয়ে যাওয়া একটা নদীর খাত আছে বুঝতেই পারিনি। পাথরের আড়ালে একটা ছোট নৌকো উলটে পড়ে আছে, দিদি বলল বোধহয় নৌকোর তলায় আলকাতরা মাখিয়ে শুকোতে দিয়েছে কেউ। দাদা বলল নদীতে জল বাড়লে চড়া যাবে, হাঁটুজলের বেশি জল নেই নদীতে। একটু এগোতেই দেখি পুরনো একটা রেলপুল। তার মানে পাশেই রেল যাবার আর একটা রাস্তা আছে। পাথর- টাথর ডিঙিয়ে জলের

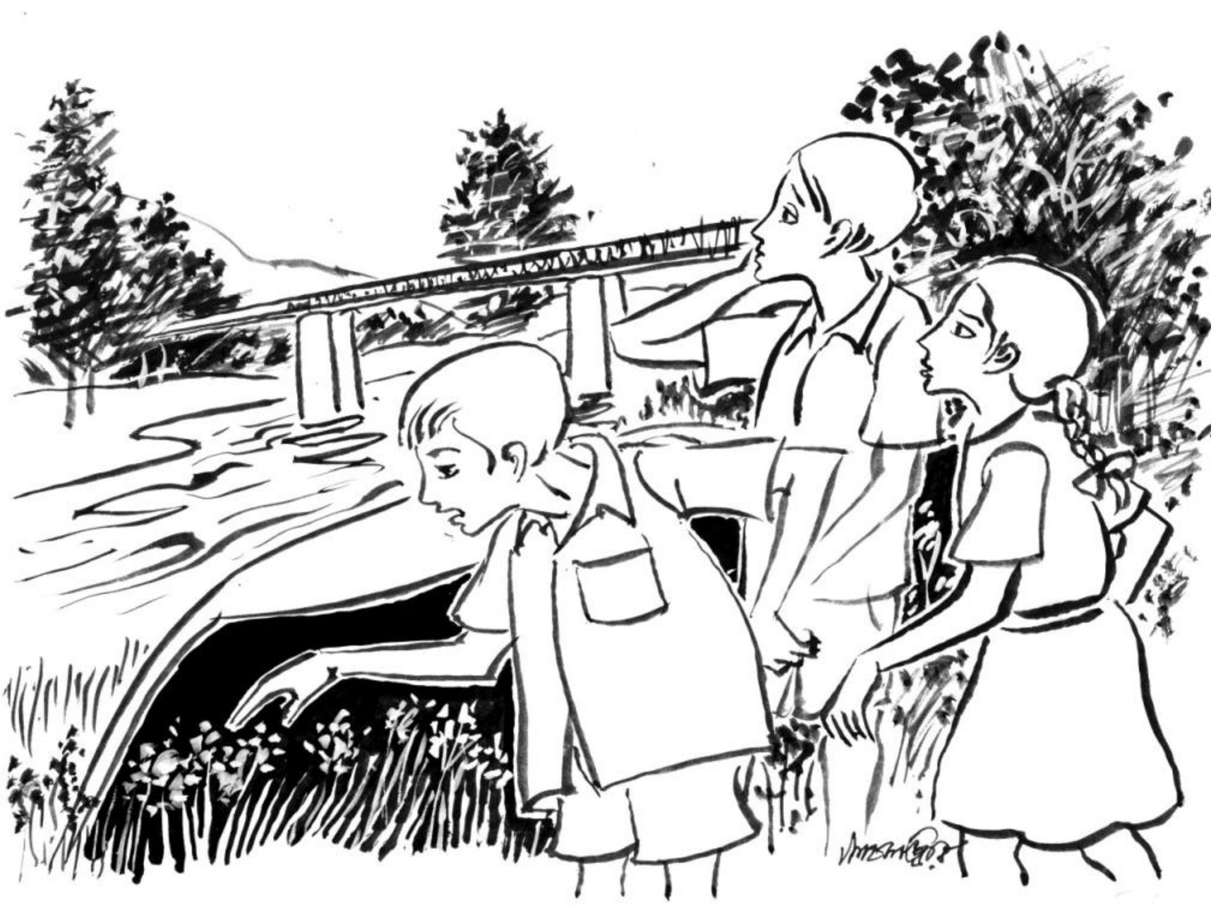

কাছে গিয়ে বসলাম। কী যে সুন্দর লাগলো বলবার নয়! দিদি হঠাৎ বালির ওপর কী সব দাগ দেখতে পেয়ে বলল বাঘের থাবার ছাপ নয়তো? দাদা বকলো ওকে, বাঘ না তোর মুণ্ডু! লোকালয়ের এত কাছে ওরা আসে- টাসে না।

তিরতির করে স্রোত বইছে, তলায় সাদা বালির ওপর রংবেরং- এর কত যে পাথর! সবজে নীল শ্যাওলা স্রোতের সাথে সাথে দুলছে। তার ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট মাছেরা খেলা করছে। সব মিলিয়ে ভারি চমৎকার জায়গা।

পাথরের ওপর বসে জলে ছোট ছোট নুড়ি ফেলতে ফেলতে দাদা চুপিচুপি বলল, এখানে স্কুল- টুল বোধহয় নেই রে। যাক ঝামেলা নেই। ওমনি বন থেকে একদল ছেলেমেয়ে বার হয়ে এসে নদীর সোঁতা পেরিয়ে ওপারে কোথায় যেন চলল। তাদের পিঠে বইয়ের ব্যাগ, বেজায় তাড়া তাদের পায়ে। ওপারের বনের মাঝে কোত্থেকে আবার যেন রেলগাড়ির হুইসলের

শব্দও কানে এল। দিদি থতমত খেয়ে বলল, নাঃ অংক-টংকগুলো করতে হবে মন দিয়ে, বাড়ি চল।

সোজা পথে না ফিরে রেলপুলের এপারে ন্যারোগেজ লাইনটা ডানদিকে বাঁক নিয়ে ঢুকে গেছে বনের ভেতর সেই পথ ধরলাম। বনবাদাড়ে আধঘন্টাটাক হাঁটতেই বাড়ি ফেরার রাস্তা পাওয়া গেল। দিদির আবার গন্ধ বাতিক। নাক উঁচু করে চোখ বুঁজিয়ে ফিসফিস করছিল, চিড়িয়াখানার গন্ধ পাচ্ছি রে! পা চালিয়ে দশ মিনিটে বাড়ি।

মা'র সাথে খুব জমে গেছে নতুনমাসির। আমাদের দেখে একচোট বকে-টকে মা পড়তে বসতে বললেন। কিছুক্ষণ আগেই নাকি এক সাহেব এসে আমাদের খোঁজখবর করছিলেন, দুপুরে আবার পড়াতে আসবেন। মাসি তাঁকে 'ফাদারবাবা' বলে ডাকে। ওঁর ইস্কুলেই পড়ব আমরা এখন থেকে। মা একটু গম্ভীরভাবে বললেন, তোদের বাবা এলে বলবো আর বদলি-টদলি হলেও এখানেই থেকে যাবো আমরা। এতো ভাল জায়গায় জন্মে অবধি থাকা হয়নি! ফাদারবাবার ইস্কুলে নাকি ভর্তি পরীক্ষাও নেই। আমাদের আর পায় কে! রান্না-টান্না শেষ, ভুরভুর করে তার সুগন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। এলোকেশীমাসি মায়ের মাথায় তেল মাখাতে বসল। আরামে মায়ের দু'চোখ বোঁজানো মুখে হাসি।

বড় ভাল লোক ফাদার। কথা বলে মনেই হল না অত বুড়ো। এদিকে রোগা, কোলকুঁজো, পাকা চুলদাড়ি আর বেজায় ঢ্যাঙা। এসেই বলে, আমার নাম জন, তোরা যা খুশি ডাকতে পারিস। দিদি বলল, মাসি তো ফাদারবাবা বলে ডাকে তোমায়! কী হাসি শুনে। বলে দূর, ফাদারও যা বাবাও তা। বলুক গে, তোদের যা ইচ্ছে বলবি। দাদা বলল, স্কুল কোথায় আমরা জানি। ফাদার অবাক। কোথায়? সকালে নদী পেরিয়ে পোড়োদের যেতে দেখেছি বলায় একগাল হেসে বলল সে তো আজ সকালে ওখানে ছিল স্কুল। কাল বসবে অন্য জায়গায়।

আমরা অবাক! ইস্কুল বুঝি চলেফিরে বেড়ায়? শুনে ফাদার আরও অবাক। ঘরের মধ্যে হয় নাকি পড়াশুনো? দম আটকে মরবো যে! খোলা চোখে খোলা হাওয়ায় চলে ফিরে বেড়ালে তবেই তো মন খোলে রে। মন না খুললে আবার পড়াশুনো কী? শুনে-টুনে তাক লেগে গেল। বাবলির তো স্কুলের মুখ দেখা হয়নি এখনও, সবে ক'দিন হল কথা ফুটেছে। মুখে আঙুল দিয়ে খানিকক্ষণ ফাদারকে দেখে কী বুঝলো কে জানে সটান উঠল গিয়ে ফাদারের কোলে। ওকে ঘাড়ে বসিয়ে সেকি ঠ্যাঙ ঠেঙি নাচ বুড়োর। সারা দুপুর এই করেই কাটল আমাদের। বাড়ির পেছনদিকে নদীর ধারে একটা পাথরে বসে জলে পা ডোবালেন ফাদার। আমরাও এক একটা পাথরে বসে পড়তেই আজব কাণ্ড! কী করে খবর পেল কে জানে, ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে ছেলেমেয়ের দল জুটে গেল চারপাশে। তার মানে বনের আড়ালে ঘরবাড়ি আছে। ফাদার কিছু না বলতেই বালির ওপর কাঠি দিয়ে কেউ আঁক কষছে, কেউ ছবি আঁকছে, কবিতা লিখছে কেউ। নাচগানও করতে লাগল কেউ কেউ। ক'জনের সঙ্গে আলাপও হয়ে গেল আমাদের। বিকেল হতে ফাদার উঠে বললেন কাল সকালে ঝর্নার ধারে স্কুল বসবে। বিদায়-টিদায় নিয়ে ফাদার চলে যেতেই সব শুনশান। শুধু একটা ছেলে আমাদের সাথে কিছুক্ষণ থেকে বলে গেল সকালে ডাকতে আসবে। ওর নাম গুনো। নদীর আরেকটু ভাঁটির দিকে ওর বাড়ি।

সবাই চলে যাবার পর দাদা একটু কিন্তু কিন্তু ভাব করে বলল, হঠাৎ কোত্থেকে ছেলেমেয়েগুলো এল বলতো? দিদি বলল, ফাদারের সাথে বলা কওয়া ছিল নিশ্চয়। দাদার ভুরু তবু কুঁচকে রইল।

দু'দিনেই আমাদের বন্ধু জুটে গেল অনেক। গুনো তো ছিলই; দুলু, হামু, শিমু, ধানি, রুমুদের সাথেও গলায় গলায় বন্ধুত্ব হল। ফাদার কত কী যে শেখালেন, আমার খাড়া চুল আর খাড়া রইল না। তেলমাখা বাঁশে বাঁদর ওঠানামা বা চৌবাচ্চার নল দিয়ে জল পড়ে যাবার অঙ্কও মনে হচ্ছে জলভাত। দাদা আর দিদি তো মহা পণ্ডিত হয়ে উঠল দু'দিনেই। বাবলি পর্যন্ত আধো আধো গলায় রাইম বলতে শিখে গেল। মা তো বেজায় খুশি। সকাল বিকেল গুনো-হামুদের মায়েদের বাড়িতে আসাযাওয়া লেগেই রইল। ফাদারকে মা নেমন্তন্ন খাওয়ালেন। নদী থেকে গামছা দিয়ে চুনোমাছ ধরা শিখিয়ে দিল দুখীরাম বলে একটা বড় ছেলে, তার কড়কড়ে ভাজা দিয়ে ডালভাত খেল বন্ধুরা।

সেদিন সকাল থেকেই আকাশটা থমথমে। স্কুলে আজ শুধু গান গাওয়া হল সারা দুপুর। বাড়ি ফেরার পথে আকাশ কালো করে মেঘ জমতে লাগল। সন্ধে নাগাদ বনের গাছ উথালপাথাল করে ঝড় উঠল। দরজা জানালা বন্ধ করে মায়ের পাশে বসে আছি, এমন সময় কড় কড় কড়াৎ করে কাছেই কোথাও বাজ পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি। ঝোড়ো হাওয়ায় সারা বাড়ি যেন কাঁপছে। টালির ওপর শিলাবৃষ্টির বড় বড় শিল পড়ছে। বাতি কখন নিভে গেছে। মাকে জড়িয়ে আমরা চারজন 'জৈমিনি জৈমিনি' বলে বাজ আটকাবার মন্ত্র জপছি, এমন সময় বাইরে কারা যেন ছুটতে ছুটতে বাড়ির দিকে উঠে এল। দরজা ধাক্কা দিয়ে আমাদের নাম ধরে ডাকছে কেউ। যেন বাবার গলা শুনলাম মনে হল। ছুটে গিয়ে দরজা খুলতেই বাবা আর আরও চার-পাঁচজন লোক ঘরে ঢুকে এলেন। সবার পেছনে মাথায় গামছা দিয়ে কাদুপিসি। ও থাকলে তো আর কারও কথা বলবার উপায় নেই! ওই ঝড়ের শব্দ ছাপিয়ে চিল চীৎকার করতে লাগল কাদুপিসি।

- হ্যাঁ গা গিন্নীমা, তোমার বরের তো কাণ্ডজ্ঞান ছিল না কোনও কালে। তোমারও কি তাই? ছেলেপুলে নিয়ে কোথায় নামবার কথা কোথায় নেবে একেবারে হাওয়া! পাঁচদিন ধরে কতো থানা পুলিশ করে তবে কার কাছ থেকে যেন আজ দুপুরে খবর পেয়ে আসছি।

বাবা মাথা চুলকোতে চুলকোতে পাশের একজনকে দেখিয়ে লজ্জা লজ্জা মুখ করে বললেন, আমি এদিকে ভুল করে ঘুমচোখে তোমরা মনে করে ওনার পরিবারশুদ্ধু নামিয়ে নিয়ে সে এক মুশকিল। তবে ইনি ভালমানুষ বলে বুঝতে পেরে আবার তোমাদেরও খুঁজতে এলেন। হাসছেন লোকটি, মানে আমি বসে আছি পরের স্টেশনে, ইনি অন্ধকারে বুঝতে না পেরে... হি হি। তবে আপনারা ওই জঙ্গলে নাবলেন কী বলে? মা কী আর বলবেন!

ভদ্রলোক খুব চিন্তিতভাবে বললেন, কিছুতেই বুঝতে পারছি না কারা আপনাদের নিয়ে এলো। আর এই পোড়ো বাড়িতে পাঁচদিন কাটালেন কী করে?

মা তো অবাক। পোড়োবাড়ি?

- আজ্ঞে হ্যাঁ। গত একশো বছর এ বাড়িতে কারও পা পড়েনি। পুরনো ন্যারোগেজের একটা স্টেশন আগে ছিল বটে, লোকজনও থাকত কিছু। অসুখ করে সব উজাড় হবার পর এখন তো স্টেশনটাও নেই। ভূতের ভয়ে কেউ আসে না এখানে।

সত্যিই এলোকেশীমাসিকেও কোথাও পাওয়া গেল না, বিদ্যুতের আলোয় দেখলাম বাড়িটাও যেন দাঁত বার করে হাসছে।

ছবিঃ শিবশংকর ভট্টাচার্য

রাতপ্রহরী

শিশির বিশ্বাস

অদ্ভুত গল্পটা শুনেছিলাম দিবাকরবাবুর কাছে। অফিসের দুই বন্ধু মিলে সেই প্রথম বেড়াতে গিয়েছিলাম রাজগির। শীতের মরশুম। উইকএন্ড-এর দিনগুলোয় রাজগিরে ভ্রমণার্থীদের ভিড় কখনও যে মাত্রাছাড়া হয়ে যায়, জানা ছিল না। গোড়ায় তাই বেশ সমস্যায় পড়েছিলা। হোটেল সব ভরতি। ঠাঁই নেই কোথাও। শেষে মুশকিল আসান হল দিবাকরবাবুর সৌজন্যে। বাজারের পথে আলাপ। কাছেই এক হোটেলের ম্যানেজার। পরিষ্কার ধুতি পাঞ্জাবি পরা সৌম্যকান্তি মাঝবয়সি মানুষটি তখন রিকশায় একরাশ বাজার চাপিয়ে রওনা হবার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। পরিস্থিতি অনুধাবন করে নিজেই আর একটা রিকশা ডেকে তুলে নিলেন আমাদের। অবশ্য গোড়াতেই উনি জানিয়েছিলেন, জায়গা ওঁর হোটেলেও নেই। তবু ব্যবস্থা যে একটা হবে, বুঝতে অসুবিধা হয়নি।

অজাতশত্রুগড়ের খুব কাছেই হোটেলটা তেমন বড় না হলেও বেশ ছিমছাম। লনে চমৎকার বাগান। পরিচর্যার ছাপ সুস্পষ্ট। রিকশা গেটের বাইরে এসে দাঁড়াতেই দুজন কর্মচারী ছুটে এল। বাজারের মালপত্র তাদের জিম্মায় দিয়ে উনি আমাদের তিনতলায় একটা ছোট ঘরে নিয়ে এসে বললেন, "এটা আমারই রাতের আস্তানা। আপাতত সঙ্গের জিনিসপত্র এখানে রেখে স্নানটা সেরে নিন। হট স্প্রিং খুব দূরে নয়। ইচ্ছে হলে সেখানেও যেতে পারেন। ততক্ষণে রান্নাটাও হয়ে যাবে। খেয়ে বের হয়ে পড়ুন। আসলে ব্যাপারটা কী জানেন, এখানে সবাই আসে উইক এন্ড ট্যুরে। তাই সময় বড় কম। অথচ কত কিছুই যে দেখার রয়েছে এই রাজগিরে! অযথা সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না।"

সদ্যপরিচিত দুই ব্যক্তির সঙ্গে এক হোটেল ম্যানেজারের এই ব্যবহারে অবাক হয়েছিলাম ঠিকই। কিন্তু সেই মুহূর্তে আরও বেশি অবাক হয়েছিলাম অন্য এক কারণে। ঘরের একপাশে ছোট একটা তক্তাপোশ। পরিপাটি করে বিছানা পাতা। পাশে দুটি বড়- বড় শেলফ ভর্তি শুধু বই। বেশির ভাগই প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপর। তারই ভিতর দামি লেদারে বাঁধানো ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের ঢাউস আকৃতির গোটা কয়েক 'অ্যানুয়াল রিপোর্ট' ও রয়েছে। বেশ পুরানো। একটি তো সেই ১৯০৫- ১৯০৬ সালের।

ইতিহাসের ছাত্র ছিলাম। সেই সূত্রে জানি এসব বই সাধারণ পাঠকের ঘরে বড়ো একটা থাকে না। ফস করে বলে ফেললাম, "স্যার, আপনি কি কলেজে পড়াতেন? ইতিহাস?"

মৃদু হাসলেন উনি। মাথা নেড়ে বললেন, "না ভাই। তা ছাড়া আমার প্রথাগত বিদ্যেও তেমন বলার মত কিছু নয়।"

"এসব, এসব বই তাহলে আপনার নয়?"হাল ছাড়লাম না আমি।

"তা আর বলি কী করে?" ফের মৃদু হাসলেন মানুষটি। "আসলে ব্যাপার কি জানেন, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস বরাবরই টানে আমাকে। বিশেষ করে এই রাজগির। এর প্রতিটা ধূলিকণায় মিশে আছে আমাদের অতীত গৌরব। স্যার আলেকজান্ডার ক্যানিংহাম, জন মার্শাল , থিয়োডর ব্লক, ভি এইচ জ্যাকসন–এর মত প্রথিতযশা প্রত্নতত্ত্ববিদ আর ঐতিহাসিকরা নানা সময় এখানে সেই ইতিহাসের খোঁজে অনুসন্ধান করে গেছেন। তাঁদেরই কিছু লেখা রয়েছে ওই বইগুলোয়। যাই হোক, আপনাদের কিন্তু দেরি হয়ে যাচ্ছে ভাই। থাকবেন মাত্র দুদিন। দেরি না করে তৈরি হয়ে নিন এবার।" প্রসঙ্গ বদলে তাগাদা লাগালেন উনি।

ব্যাপারটা এরপর আর এগোয়নি। চটপট স্নান- খাওয়া সেরে একটা টাঙ্গা নিয়ে বের হয়ে পড়েছিলাম দর্শনীয় স্থানগুলি ঘুরে দেখার জন্য। ফিরতে বেশ দেরিই হয়ে গেল তারপর। শেষ বিকেলে গৃধ্রকূট পাহাড়ের চুড়োয় ভগবান বুদ্ধ আর সারিপুত্তের বাসস্থান দেখে নামতে- নামতে সন্ধে হয়ে গেল। হোটেলে ফিরতে- ফিরতে প্রায় আটটা। দিবাকরবাবু নেই। কী কাজে বের হয়েছেন। কাউন্টারের ছেলেটির কাছে শুনলাম পাশের এক লজে রাতে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। সারাদিনের ধকলে দু' জনেই তখন বেশ ক্লান্ত। দেরি না করে চলে গেলাম সেখানে।

খানিক বিশ্রামের পর রাতের খাওয়ার জন্য হোটেলে আসতে একটু দেরিই হয়ে গিয়েছিল । ডাইনিং রুম প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। গোছগাছ শুরু হয়েছে। দিবাকরবাবুর খোঁজ নিতে শুনি উনি নিজের ঘরে রয়েছেন। চটপট খাওয়া সেরে পায়ে- পায়ে এগিয়ে গেলাম সেদিকে । ছোট্ট ঘরের ভিতর পাতা বিছানায় বসে ভদ্রলোক একমনে কী একটা বই পড়ছিলেন। আমাদের সাড়া পেয়ে সামান্য চোখ তুলে পাশে বসতে ইঙ্গিত করে বললেন , "আরে আসুন- আসুন। আমারই দেখা করা উচিত ছিল। আসলে রোমিলা থাপারের নতুন এই বইটা আজই হাতে পেয়েছি । তাই সময় করে উঠতে পারিনি। তা সব দেখা হল?"

সকালের ব্যাপারটা তখনও মাথা থেকে নামেনি । বরং সারাদিন ঘোরাঘুরির পর বেড়েছে আরও। এই রাতে ভদ্রলোককে যথেষ্ট বিরক্ত করা হচ্ছে বুঝেও তক্তাপোশের

একধারে বসে একটু উসকে দেবার জন্য বললাম, "ওই পিকনিকের মেজাজে যেটুকু দেখা হয়। গোটা কয়েক ভাঙা ইট- পাথরের ঢিপি।"

কাজ হল। মানুষটির চোখদুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো হঠাৎ। হাতের বইটা পাশে উলটে রেখে বললেন, "সেটাই তো স্বাভাবিক। বলি তাহলে, আজ থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগে প্রথম যেবার এখানে আসি জানতাম না কিছুই। গাইড বলতে ছিল টাঙ্গাওয়ালা বৃদ্ধ রমজান মিয়াঁ। বন্ধুদের সাথে হইহই করে বেড়াবার ফাঁকে সেদিন তার কথা কতক শুনেছিলাম কতক শুনিনি। কিন্তু কৌতুহলের মূলে সেই মানুষটিই। ফিরে গেলাম বটে তবে ব্যাপারটা মাথা থেকে নামল না আর। কিন্তু সে সব বলতে গেলে যে রাত ভোর হয়ে যাবে ভাই।"

"তা হোক না স্যার।" প্রায় হাঁ- হাঁ করে উঠলাম দুজন। "শুনেছি, সারাদিন হোটেল সামলেও প্রতিদিন গভীর রাত পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। তা একটা রাত না হয় নষ্টই করলেন আজ।"

"না- না সে কথা নয়।"একটু যেন বিব্রত হলেন মানুষটি। "আসলে এসব নীরস ইট- পাথরের কথা বড়ো একটা যে শুনতে চায় না কেউ। তা ছাড়া , এই রাজগিরের কতটুকুই বা আর জানা গেছে বলুন ? তেমন অনুসন্ধানই বা আর হল কোথায়?"

থামলেন উনি। নীরবে বন্ধ জানালার কাচের ভিতর দিয়ে বাইরে হালকা চাঁদের আলোয় অজাতশত্রুগড়ের পিছনে উঁচু ঢিপিটার দিকে তাকিয়ে রইলেন খানিক। তারপর বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "ওই যে ঢিপিটা, ভগবান বুদ্ধের দেহাবশেষের উপর সম্রাট অশোক ওখানেই তৈরি করিয়েছিলেন সুবিশাল এক স্তূপ। পাশে সুদীর্ঘ এক অশোকস্তম্ভ। সেই স্তূপ আজ শুধুমাত্রই মাটির ঢিপি। আর অশোকস্তম্ভ, যার শীর্ষে শোভা পেত শিল্পসুষমামন্ডিত চমৎকার এক হস্তীমূর্তি, তার কোনও চিহ্নই আজ আর নেই। সাত শতকের মাঝামাঝি হিউয়েন সাং- ও দেখে গিয়েছেন সেটা। কোথায় গেল তাহলে? অত বড় একটা স্তম্ভ সরিয়ে নেওয়া তো সহজ কথা নয়! আমার তো মনে হয় সেটির ভাঙা টুকরো কাছেই মাটির তলায় রয়েছে কোথাও। তেমন অনুসন্ধানই হয়নি। টাঙ্গায় যে পথে গেলেন, তার অনেকটাই সেই পুরানো আমলের রাজপথ। দু'ধারে বনজঙ্গলের ভিতর অবহেলায় পড়ে রয়েছে পাথরের ভিত আর ভাঙা দেওয়ালের অবশেষ। তেমন অনুসন্ধানের ফলে বের হতে পারে চমকপ্রদ কোনও তথ্য, ইতিহাস। এই অজাতশত্রুগড়, ১৯০৫- ১৯০৬ সালের পর তেমন কোনও খননকাজ এখানেও আর হয়নি।"

একটানা কথা বলে থামলেন উনি। শীতের রাত ইতিমধ্যে প্রায় নিস্তব্ধ। পথে মানুষজনের সাড়াশব্দ নেই। বুঝতে পারছিলাম মানুষটির কথা শেষ হয়নি এখনো। সম্ভবত ঝালিয়ে নিচ্ছেন ভিতরে। উসকে দেবার জন্য বললাম, "তা সেই আকর্ষণেই কি কাজ নিয়ে চলে এলেন এখানে?"

একটু লাজুক হাসলেন উনি। মাথা নেড়ে বললেন, "না ভাই, তা নয়। তবে সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। বললে বিশ্বাস করবে না কেউ। কোনও দিন বলিওনি কাউকে। শুনবেন?"

অভিজ্ঞ মানুষটির কাছ থেকে কিছু শুনব বলেই আজ এসেছিলাম। কিন্তু সেটা যে এমন দিকে বাঁক নেবে ভাবিনি। গল্পের গন্ধ পেয়ে গুছিয়ে বসে শুধু মাথা নাড়ালাম। দিবাকরবাবু বলতে শুরু করলেন, "সেই যে প্রথমবার রাজগিরে বেড়াতে এসে বৃদ্ধ টাঙ্গাওয়ালার দৌলতে মাথায় ভূতটা চাপল, তারপর নামেনি আর। রাজগিরের উপর লেখা কোনও বইয়ের সন্ধান

পেলেই সংগ্রহ করে পড়ে ফেলি। আর ওই পড়তে পড়তেই প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপর ঝোঁকটা এল। বছর দুয়েক পর ফের এলাম এখানে । তবে একা। বাণেশ্বর প্রসাদের সঙ্গে দেখা সেই প্রথম দিনেই। প্রায় যেচে এসেই সেদিন ও আলাপ জুড়েছিল আমার সাথে। ডিসেম্বরের দুপুর। ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম মনিয়ার মঠের ধ্বংসাবশেষের চারপাশে। হঠাৎ দেখি পাশে দাঁড়িয়ে পেটানো মজবুত চেহারের একটা দেহাতি মানুষ। বয়স তিরিশের বেশি নয়। পরনে আধময়লা পোশাক। আমি চোখ তুলে তাকাতে লোকটা সামান্য উশখুশ করে বিনীতভাবে বলল, "বাবুজি, আপ রিসার্চ কর রহে হো কেয়া?"

লোকটার কথায় লজ্জাই পেলাম একটু। মুখের ভাবে গোপনও রইলনা সেটা। তাড়াতাড়ি বললাম, "না ভাই, আমি তেমন কিছু নই। সামান্য একজন ট্যুরিস্ট মাত্র।"

বললাম বটে, কিন্তু ফল হল উলটো। আমার ওই লাজুক ভাবটিকে লোকটি বিদ্যাজনিত বিনয় বলে ভাবল। মৃদু হেসে হিন্দিতেই বলল, "আমাকে ভোলাতে পারবেন না বাবুজি। মামুলি ট্যুরিস্ট আদমি যে আপনি নন, সেটা দেখেই বুঝেছি।"

আরও অবাক হয়ে বললাম "কেন বলুন তো?"

ও বলল, "বাবুজি আমি আর্কিওলজিকাল বিভাগের একজন ক্যাজুয়াল কর্মী। এই মনিয়ার মঠে ডিউটি করছি গত প্রায় দেড় বছর। টুরিস্ট তো বড় কম দেখিনি। সবাই এক রকমের। হইহই করে আসে। সিঁড়ি ভেঙে চাতালের উপর উঠে, ভিতরে এক ঝলক উঁকি দিয়ে খানিক হাসিঠাট্টা করে সময় কাটিয়ে ছোটে টাঙ্গা নয়তো বাসের দিকে। বোঝেনা কিছুই। সে ধৈর্যও নেই। আর থাকবেই বা কেন? প্রাচীন রাজগৃহের রক্ষাকর্তা যক্ষ মণিনাগের এই মন্দির আজ ভাঙা ইটের এক ধ্বংসাবশেষ বই তো নয়। কেউ তাই দু- চার মিনিটের বেশি দাঁড়ায়ও না। দাঁড়াবার প্রয়োজনও বোধ করে না। কিন্তু বাবুজি, আপনাকেই আজ প্রথম ব্যতিক্রম দেখলাম। দু' ঘন্টার উপর রয়েছেন এখানে। খুঁটিয়ে দেখছেন সব। লিখেও রাখছেন। মামুলি এক ট্যুরিস্টের কাজ নয় এসব।"

কথা শেষ করে মানুষটি এমন সহজ সরল দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল যে, ওর ভ্রান্ত ধারণাটা আর ভাঙতে ইচ্ছে হল না। বললাম, "আপনার নাম কী ভাই?"

আমার কথায় লোকটা প্রায় কৃতার্থ হয়ে গেল, খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল চোখ দুটো। বলল, "জি বাণেশ্বর প্রসাদ বাবুজি। নালন্দায় বাড়ি। পুরোনো এসব ধ্বংসাবশেষের সঙ্গে পরিচয় তাই আমার ছেলেবেলা থেকেই। কেন জানি না, এসব জিনিস তখন থেকেই ভীষণ আকর্ষণ করে আমাকে। আগে বুঝতাম না কিছুই। এখন সামান্য বুঝি হয়তো। কিন্তু তাতে হয়েছে আরো মুশকিল। গরিব ঘরের ছেলে। লেখাপড়া তেমন শিখতে পারিনি । হিন্দিটা কোনো রকমে আসে। এত কম বিদ্যে নিয়ে এসব কি আর হয় বাবুজি? "

ততক্ষণে মানুষটাকে কিছুটা ভাল লেগে গেছে। বললাম, "এসব ধ্বংসাবশেষের ইতিহাস খুব জানতে ইচ্ছে করে বুঝি?"

আমার কথায় একটু যেন লজ্জা পেল মানুষটি। রোদে পোড়া ফর্সা মুখটা লাল হয়ে উঠল। আমতা আমতা করে বলল, "তা, তা ঠিক বাবুজি। তবে আসল ব্যাপারটা হল রাজগিরের এই ধ্বংসাবশেষের ভিতর এসে নিরিবিলিতে খানিক দাঁড়ালে, আমি নিজেই যেন কোথাও হারিয়ে যাই। কী যেন একটা ঘটে যায় ভিতরে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে আবছা এক জনপদের ছবি। রাজপথ, অশ্বশকট আর গোশকটের ব্যস্ততা, বড় বড় অট্টালিকা, বিপণি, মানুষের ভিড়। যক্ষ মনিনাগের মন্দিরে পুণ্যার্থী। আর আশ্চর্য বাবুজি, সেই ভিড়ে

বক্ষত্রাণ পরিহিত অশ্বারূঢ় একটি মানুষকেও দেখতে পাই কখনও! কোমরবন্ধে তরবারি। মাথায় শিরস্ত্রাণ। হাতে সুদীর্ঘ ভল্ল। পরণে উজ্জ্বল নীল- সাদা পোশাক। তারপরেই হারিয়ে যায় ছবিটা।”

মানুষটির ভিতরে যে চমৎকার একটি ইতিহাস সচেতন, কল্পনাপ্রবণ মন লুকিয়ে রয়েছে, বুঝতে অসুবিধা হয়নি এরপর। বললাম, “আপনি ভাগ্যবান বাণেশ্বরবাবু। প্রায় তিন হাজার বছর আগে এই নগরীর যে ছবি আপনি মানসনেত্রে দেখেছেন, তা অনেক বিশেষজ্ঞেরও ক্ষমতার বাইরে। আপনি লিখে ফেলুন না সেসব কথা। দারুণ ব্যাপার হবে।”

“সত্যি বলছেন বাবুজি?” উজ্জ্বল হয়ে উঠল বাণেশ্বর প্রসাদের চোখদুটো।

নীরবে মাথা নাড়লাম। ও বলল, “সত্যি কথা বলছি বাবুজি। কিছু- কিছু লিখেও ফেলেছি। কিন্তু কোনও কিছুই যে বেশিক্ষণ দেখা যায় না! সব গোলমাল করে দেয় ওই নীল- সাদা পোশাক পরা অশ্বারোহী মানুষটি। এসে পড়লেই মুহূর্তে মিলিয়ে যায় সব। বাবুজি লোকটার নাম বীরবাহু। নগরের রাজপ্রহরী। এই তো দিনকয়েক আগে এক দুপুরে একা বসে আছি। চোখের সামনে হঠাৎ দেখি এক রাজপ্রাসাদ। পশ্চিম দিকে ওই যে পোড়া জমিটা দেখছেন, ওইখানে। সিংহদ্বারের সামনে মানুষের ভিড়, ব্যস্ততা। শাণিত অস্ত্র হাতে প্রহরীবৃন্দ। পাঁচ ঘোড়ার এক রথ এসে দাঁড়াল সেখানে। উজ্জ্বল পোশাক- পরা পেশিবহুল একটি মানুষ নামলেন। কাড়ানাকাড়া বেজে উঠল। রাজা শ্রেণীক- এর নামে জয়ধ্বনি করে উঠল সবাই। হাত তুলে অভিনন্দন গ্রহণ করলেন তিনি। ঠিক সেই সময় নীল- সাদা পোশাকের সেই অশ্বারোহীটি ঘোড়ার খুরের শব্দে হাজির হল কোথা থেকে। ব্যাস, হারিয়ে গেল সব।”

কথায়- কথায় বেলা পড়ে আসছে। আজই সোনভান্ডার আর রণভূমির দিকটাও ঘুরে দেখব ঠিক করে রেখেছি। প্রসঙ্গ পালটে সেই কথাই জানালাম।

শুনে ব্যস্ত হয়ে উঠল বাণেশ্বর প্রসাদ। “ছি ছি, অযথা সময় নষ্ট করছি আপনার! দাঁড়ান বাবুজি একটা রিকশা ডেকে দিই। আরামে ঘুরে আসতে পারবেন”

হেসে বললাম, “রিকশার দরকার নেই ভাই। নিশ্চিন্তে দেখার কাজটা তেমন হয় না ওতে। হেঁটেই যাব।”

আমার কথায় ভুরু কুঁচকে উঠল বাণেশ্বর প্রসাদের। একটু পরে বলল, তা ঠিক বাবুজি। কিন্তু এই বিকেলে এদিকের পথঘাট তেমন নিরাপদ নয়। বিশেষ করে ওই রণভূমির দিকটা। খুবই নির্জন। দূরত্বও কম নয়। ”

“তা আর কী করা যাবে। তেমন কিছু হলে একা রিকশাওয়ালাও কি কিছু করতে পারবে? এই মনিয়ার মঠেও তো হেঁটেই এলাম।”হেসে উড়িয়ে দিলাম আমি।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বাণেশ্বর প্রসাদ আর বলল না কিছু। দেরি না করে আমিও বের হয়ে পড়লাম।”

এই পর্যন্ত বলে দিবাকরবাবু থামলেন হঠাৎ। সামনে দুই শ্রোতার উপর নিঃশব্দে চোখ বুলিয়ে নিলেন। বাইরে রাত ইতিমধ্যে গভীর হয়েছে আরও। নীচে পথ দিয়ে দ্রুত একটা টাঙ্গা চলেছে বাজারের দিকে। এই নিস্তব্ধ রাতে আওয়াজটা কেমন গা ছমছমিয়ে দেয়। পাশে দেবু বলল, “রণভুমির ওদিকে কিন্তু আমাদেরও যাওয়া হয়নি।”

ঘোড়ার ঘুরের খটখট শব্দ ততক্ষণে মিলিয়ে গেছে দূরে। দিবাকরবাবু বললেন “হ্যাঁ রণভূমি, যেখানে জরাসন্ধের মল্লযুদ্ধের আখড়া ছিল বলে বিশ্বাস, সেদিকে টাঙ্গা বা রিকশাওলায়া এখনও বড় একটা যেতে যেতে চায় না। সেই তিরিশ বছর আগেও ব্যতিক্রম ছিল না। তবু বাণেশ্বর প্রসাদের কথায় কর্ণপাত করিনি সেদিন। আসলে বয়সটাও তো কম ছিল। তার উপর ভিতরের তাগিদটাও ছিল। শুনেছিলাম, ওদিকে ঝোপজঙ্গলের ভিতর কিছু ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে আছে এখনো। কিন্তু পরে মনে হয়েছিল, একা ওদিকে না গেলেই ভাল হত বোধহয়।

সোনভাণ্ডার ঘুরে যখন রণভূমির পথ ধরলাম বিকেল তখন ঘন হতে শুরু করেছে। নির্জন পথের দু’ধারে হালকা জঙ্গল, ঝোপঝাড়। জনমানুষের চিহ্নমাত্র নেই। একদিন এই পথের দু’ধারে ছিল সুসজ্জিত অট্টালিকাশ্রেণী, বাসগৃহ। বিপণীগুলিতে মানুষের ভিড়। গমগম করত সারাদিন। সন্ধ্যায় জ্বলে উঠতো আলো। আজ সব শূন্য। চিহ্নমাত্র নেই কিছুর। ভাবতে-ভাবতে এগিয়ে চলেছিলাম। হঠাৎ পিছন থেকে কানে এল ঘোড়ার খুরের খটখট আওয়াজ। গোড়ায় ভেবেছিলাম কোনও টাঙ্গা বোধহয়। দর্শনার্থী নিয়ে চলেছে রণভূমির দিকে। কিন্তু ভুল ভাঙতে দেরি হল না। টাঙ্গা নয়। তেজি ঘোড়ায় চড়ে এদিকে আসছে কেউ। কৌতূহলী হয়ে ঘাড় ফিরিয়েছিলাম। অবাক কান্ড! কিচ্ছু নেই কোথাও। আওয়াজটাও মিলিয়ে গেছে হঠাৎ। নির্জন বনভূমিতে শুধু মর্মরধ্বনি। পুরো ব্যাপারটাকে মনে ভুল বলেই উড়িয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু খানিক বাদে সেই একই ব্যাপার ঘটল আবার। রণভূমির কাছাকাছি পৌঁছে গেছি তখন। পিছনে ফের সেই ঘোড়ার খুরের শব্দ। তাকিয়ে সেবারও দেখতে পেলাম না কিছু। আওয়াজটাও আগের মতই মিলিয়ে গেল।

ভয়ডর কোনও কালেই তেমন ছিল না। থাকলে এই অপরিচিত স্থানে বাণেশ্বর প্রসাদের ওই সতর্কতার পরে একা পা বাড়াতাম না। তবু পড়ন্ত বিকেলের সেই জনমানবহীন নির্জন বনপথে এরপর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। রণভূমিতে আর দেরি করিনি বিশেষ। ফিরে এসেছিলাম।”

“পথে আর কিছু হয়নি? ”দিবাকরবাবু সামান্য থামতেই প্রায় রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করলাম।

“না ভাই, সেদিন আর কিছু ঘটেনি। তবে এর দু’দিন পরে অশোকস্তূপের কাছে যে ব্যাপারটা হয়েছিল, তার কোনও ব্যখ্যা আজও আমার কাছে নেই।”বলে ফের জানালা দিয়ে অজাতশত্রুগড়ের পিছনে উঁচু ঢিপিটার দিকে কয়েক মুহুর্ত নীরবে তাকিয়ে রইলেন উনি। তারপর শুরু করলেন আবার, “অশোকস্তূপের ওই যে ঢিপি, ওদিকে আজও বড় একটা যায় না কেউ। তেমন রাস্তাও নেই। পাশে ক্ষীণ এক জলধারা। এখন প্রায় মজে এলেও একসময় ওটাই ছিল সরস্বতী নদী। পাশেই শ্মশানঘাট। এই শ্মশানের উল্লেখ হিউয়েন সাং- এর লেখাতেও রয়েছে। মজা নালার ধারে বহু পুরোনো ভাঙাচোরা একটা ঘাটের ধ্বংসাবশেষ এখনো টিকে আছে। মনে রাখা দরকার, সম্রাট অশোক যখন এখানে আসেন রাজগিরের গৌরব তখন অনেকটাই ম্লান। মগধের রাজধানী সরে গেছে পাটলিপুত্রে। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অনেকেই চলে গেছেন সেখানে। নগরের মূল অংশের হতশ্রী অবস্থা। যেটুকু তখনো বজায় রয়েছে, তার সবটাই প্রায় অজাতশত্রুর আমলে তৈরি এই নতুন গড়কে কেন্দ্র করে। ভগবান বুদ্ধের পূতাস্থির ওপর স্তূপ তৈরির জন্য এই স্থানটি তাই অনেক চিন্তাভাবনা করেই নির্বাচন করা হয়েছিল। যাই হোক, সেবার রাজগিরে সেটাই আমার শেষ দিন। পরের দিন ভোরেই ফেরবার বাস ধরব। মোটামুটি সব ঘোরা হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। বাকি শুধু ওই অশোকস্তূপের

দিকটা। খুব কাছে হলেও ওদিকে তখনও আমার যাওয়া হয় নি। সেদিন তাই বিকেলেই বের হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু ওদিকে যাওয়ার যে রাস্তা নেই, তেমন জানতাম না তখন। ভেবেছিলাম গড়ের দক্ষিণ পাশ ধরে সহজেই পৌঁছে যেতে পারব। কিন্তু পথে নেমে বুঝলাম ব্যাপারটা সহজ নয় অত। অনেকটা ঘুরে যখন কাছে এসে পৌঁছোলাম, সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াল জলকাদায় ভরা সরস্বতী নদীর মজা খাতটা। পাশেই একখন্ড পোড়ো জমিতে সেই শ্মশান। খানিক দূরে ঝোপঝাড়ের ভিতর পুরোনো দিনের সেই ভাঙ্গাচোরা ঘাট পড়ে রয়েছে নিতান্ত অবহেলায়। এই পড়ন্ত বিকেলে জনমানুষের চিহ্নমাত্র নেই। নির্জন খাঁখাঁ করছে।

ওপরেই অশোকস্তুপের উঁচু ঢিপিটা। কিন্তু অনেক খুঁজেও যাওয়ার পথ পেলাম না। মজা খাত হলেও সামান্য জল রয়েছে। কাদা আরও বেশি। বুঝতে বাকি রইল না, সম্পূর্ণ ভুল পথে এসে পড়েছি। ঢিপিটায় যাবার রাস্তা এদিক দিয়ে নয়। খোঁজখবর নিয়ে বের হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তখন আর সময় নেই। বেলা পড়ে আসেছে। দিনশেষে একঝাঁক পাখি কলরব করে উড়ে গেল বেণুবনের দিকে। আর একটু চেষ্টা করে দেখব কিনা ভাবছি, হঠাৎ পিছনে সেই পরিচিত ঘোড়ার খুরের খটখট আওয়াজ। সেই প্রথম দিনের পরে ব্যাপারটা ঘটেনি আর। চমকে ঘাড় ফেরালাম। না, কিচ্ছু নেই কোথাও। আওয়াজটাও থেমে গেছে। এক ঝলক দমকা হিমেল বাতাস শুধু ছুটে এল গড়ের দিক থেকে। শিরশির করে উঠল সারা শরীর। ক্যাঁ-ক্যাঁ শব্দে অচেনা একটা পাখি কোথাও ডেকে উঠল। জায়গাটা জনবসতি থেকে এমন কিছু দূরে নয়। বেলা পড়তে শুরু করলেও তাই চিন্তা তেমন হয় নি। তবু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আর দেরি করাটা উপযুক্ত বোধ হল না। অশোকস্তুপ দেখা মুলতুবি রেখেই ফেরবার পথ ধরলাম।

আসার সময় ঘুরতে হয়েছে অনেকটা। সময়ও লেগেছিল। আগেই তাই ভেবে রেখেছিলাম, ফেরবার সময় পশ্চিম দিকের মাটির দেওয়াল টপকে, গড়ের ভিতর দিয়ে কোনাকুনি পাড়ি দেব। তাড়াতাড়ি হবে। পায়ে চলা কোনও পথও পাওয়া যাবে হয়তো।

বাইরে পাথরের ওই ভগ্ন প্রাচীরটুকু ছাড়া অজাতশত্রু- গড়ের ভিতর দেখার মত আর কিছুই অবশিষ্ট নেই আজ। উঁচুনিচু, অসমান বিশাল এক প্রান্তর। তারই মাঝে ইতস্তত বেড়ে উঠেছে বড়- বড় ঘাস আর ঝোপঝাড়, মাটির ঢিপি। আড়াই হাজার বছর আগে এই দুর্গনগরী তৈরি হয়েছিল অজাতশত্রুর আমলে। নাম অজাতশত্রু হলেও মানুষটির শত্রু ছিল অনেক। একেই তো পিতা বিম্বিসারকে কারাবন্দি করে তিনি সিংহাসনে বসেছিলেন। সেই কারণে বুদ্ধদেবের অনুগামী, নগরের সাধারণ মানুষ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ যে তাঁকে মোটেই ভাল চোখে দেখতেন না, উচ্চাকাঙ্খী এবং দুরদর্শী মানুষটি সেটা ভাল করে জানতেন। তার উপর তিনি তখন প্রতিবেশী কোশল, লিচ্ছবি, বৈশালী, কাশী প্রভৃতি রাজ্যগুলি জয় করার স্বপ্ন দেখছেন। প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে। নগরের পুরানো রাজপ্রাসাদ তাই তখন মোটেই নিরাপদ ছিল না তাঁর কাছে। আর সেই কারণেই তৈরি করেছিলেন এই দুর্গ। ভিতরে বিশাল রাজপ্রাসাদ। বিশ্বস্ত ব্যক্তি এবং অমাত্যবৃন্দের বাসস্থান। সেনানিবাস। সব নিয়ে একদিন গমগম করত এই গড়। আজ শুধুই এক পরিত্যক্ত প্রান্তর। জনমানুষের চিহ্নমাত্র নেই।

পুরোনো সেই দিনের কথা ভাবতে- ভাবতে মাঠ ভেঙে দ্রুত এগিয়ে চলেছি, হঠাৎ দেখি লাল টালির একটা ছাউনি। অমন পাতলা চৌকোনা টালি আগে দেখিনি। ঘরটাও নজরে পড়েনি এতক্ষণ। সম্ভবত দ্রুত চলার তাগিদে খেয়াল হয়নি। কৌতুহলী হয়ে পায়ে- পায়ে এগিয়ে গেলাম। তিনদিক খোলা ছাউনিটার নীচে পড়ে রয়েছে ঝকমকে সুদীর্ঘ এক পাথরের স্তম্ভ। স্তম্ভের গায়ে এক জায়গায় অপরিচিত অক্ষরে লেখা রয়েছে কিছু। সেদিকে তাকিয়ে মুহুর্তে সারা শরীর প্রায় কাঁটা দিয়ে উঠল। এই জিনিসের ভাঙা কয়েকটা টুকরো, সারনাথের

ধ্বংসাবশেষের ভিতর আগে দেখেছি। সন্দেহ নেই, এটা পুরান রাজগৃহের সেই হারিয়ে যাওয়া অশোকস্তম্ভ। স্তম্ভ- শীর্ষের হস্তী- মুর্তিটিও পাশে রয়েছে। বড়- বড় গোটা কয়েক জালায় নানা জাতীয় আরক আর রাসায়নিক পদার্থ। ছোট বড় নানা আকারের একাধিক বুরুশ। শানপাথরের টুকরো। বোঝা যায় পালিশের কাজ শেষ হয়নি এখনো। আশেপাশে জনমানুষ কাউকেই দেখতে পেলাম না।

অবাক হয়ে দেখছি। ভয়ানক ব্যাপারটা ঘটে গেল ওই সময়। হঠাৎ অদূরে একটা টিপির আড়াল থেকে রে- রে করে ছুটে এল দুটি মানুষ। অবিন্যস্ত জামাপ্যান্ট- পরা শক্তপোক্ত শরীর। কশ বেয়ে গড়াচ্ছে পানের রস। কিছু বুঝে ওঠার আগেই একজন ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার উপর। ঘটনার আকস্মিকতায় গোড়ায় প্রায় বিমূঢ় হয়ে গেলেও মূহূর্তে সামলে নিয়ে লোকটাকে লক্ষ করে সজোরে হাত চালালাম। একটু আধটু শরীরচর্চা করতাম তখন। কাজ হল। ঘুরে পড়ে গেল লোকটা। দেখে থমকে গেল পিছনের মানুষটা। তারপরেই জামার নীচে কোমর থেকে মস্ত এক ভোজালি বের করে এগিয়ে এল আমার দিকে। ততক্ষণে আগের লোকটাও উঠে দাঁড়িয়েছে। হাতে তারও একটা লম্বা ছুরি। হিংস্র গলায় চেঁচিয়ে উঠল, "খতম কর দো, খতম কর দো উনকো। বহুত মারা।"

প্রমাদ গুনলাম এবার। সম্ভবত ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যেই এসেছিল লোকদুটো। দামি ক্যামেরা, ঘড়ি রয়েছে সঙ্গে। কিছু টাকা পয়সাও আছে। মার খেয়ে হিংস্র হয়ে উঠেছে এবার। দু'জনের মুখ দেখেই বুঝতে পারছিলাম, নিতান্ত অপ্রয়োজনেও এরা খুন করতে অভ্যস্ত। এই নির্জন প্রান্তরের মাঝে আর একটা খুন করতে কিছুমাত্র হাত কাঁপবে না। উপায় না দেখে ঝোপঝাড় ভেঙে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করলাম। অপরিচিত পথ। হোঁচট খেলাম বার কয়েক। পিছনে আততায়ী দুজন ততক্ষণে তাড়া করে প্রায় ধরে ফেলেছে আমাকে। বুঝতে পারছি বাঁচার সব আশাই প্রায় শেষ। এমন সময় ঘটল সেই অদ্ভুত ব্যাপারটা। হঠাৎ পিছনে কানে এল ঘোড়ার খুরের সেই খটখট আওয়াজ। অনেক দ্রুত। ঘোড়ায় চড়ে তীব্র বেগে এদিকে ছুটে আসছে কেউ। তারপরই এক আততায়ীর অন্তিম আর্তনাদ ভেসে এল পিছন থেকে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, তেজি ঘোড়ার পিঠে এক বর্মধারী অশ্বারোহী। পরণে উজ্জ্বল নীল- সাদা পোশাক। কোমরবন্ধে তরবারি। মাথায় শিরস্ত্রাণ। হাতের সুদীর্ঘ বর্শা বিঁধিয়ে দিয়েছেন এক আততায়ীর পিঠে। লোকটা পড়ে যেতেই অশ্বারোহী ফের তাঁর অস্ত্র চালালেন দ্বিতীয় আততায়ীকে লক্ষ করে। নিমেষে পড়ে গেল সে- ও।

প্রায় চোখের পলকে ঘটে গেল ব্যাপারটা। তারপরই উন্মুক্ত অস্ত্র হাতে অশ্ব ঘোরালেন তিনি। আর সেই সময়েই এক ঝলকের জন্য দেখতে পেলাম তাঁর মুখটি। কদিন আগে দেখা মনিয়ার মঠের সেই বাণেশ্বর প্রসাদ। দেখতে- দেখতে সেই অশ্বারোহী দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে মিলিয়ে গেলেন অদূরে গাছপালার আড়ালে অন্ধকারে। মিলিয়ে গেল ঘোড়ার খুরের আওয়াজও। চারপাশে তাকিয়ে সেই দীর্ঘ খোলা ছাউনিটিও আর দেখতে পেলাম না । শুধু অদূরে পড়ে রয়েছে নিহত দুই আততায়ীর রক্তাক্ত দেহ।"

থামলেন দিবাকরবাবু। প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে গল্প গিলছিলাম এতক্ষণ । কোনও মতে একটা ঢোঁক গিলে তাড়াতাড়ি বললাম, "তারপর?"

“তারপর বলার মতো তেমন কিছু আর নেই ভাই,” অল্প হাসলেন ভদ্রলোক, “পরের দিন সকালে বাস। বের হয়ে শুনলাম, ভোরে অজাতশত্রুগড়ের ভিতর দুটো লাশ পাওয়া গেছে। কাছেই এক গ্রামে বাড়ি। নানা অপরাধে ধরা পড়ে জেলও খেটেছে বার কয়েক করে।”

“আর বাণেশ্বর প্রসাদ?” প্রশ্ন করল দেবু।

“সে- ও এক রহস্য বলতে পারেন।” সামান্য মলিন হাসলেন উনি, “পরের বছর রাজগিরে এসেই খোঁজ করেছিলাম তাঁর। এমনকি যেখানে ওর বাড়ি বলেছিল সেই নালন্দাতেও। পাইনি কোথাও। তারপর তো হোটেলের এই কাজ নিয়ে চলে এলাম এখানে। কিন্তু খোঁজ পাইনি আর। অদ্ভুত সেই ব্যাপারটা রহস্যই রয়ে গেছে।”

ছবিঃ শিবশংকর ভট্টাচার্য

ওপরের দিদা

শুভশ্রী ভট্টাচার্য

আমার মামারবাড়িটা ছিল রাসবিহারীর মোড়ের কাছে। ভাড়াবাড়ি। সেখানে নিচের তলায় দাদু, দিদা আর মামা থাকত। দোতলায় থাকতেন বাড়িওলারা। আমি তো তখন বাড়িওলা- টোলা বুঝতাম না, ওনাদের ডাকতাম ওপরের দাদু আর ওপরের দিদা বলে।

ওপরের দিদা এককালে নাকি খুব ডাকসাইটে সুন্দরী ছিলেন। ধবধবে ফর্সা রঙ, নাকটা টিয়াপাখির ঠোঁটের মত টিকলো, তাতে আবার জ্বলন্ত হীরের বিরাট নাকছাবি। চোখগুলো কটা, আর একটা অদ্ভুত অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দু চোখে মাখানো। বিশেষ করে উনি যখন বাথরুম যাবার জন্য সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতেন, তখন আমার দিকে এমন একদৃষ্টে চেয়ে থাকতেন যে আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে আসত। আমাকে আবার মাঝে মাঝে মুখখানা হাসি হাসি করে হাতছানি দিয়ে ডাকতেন। মুখে সর্বক্ষণই কী একটা চিবোতেন। আর সেই সময় ঠোঁটের দুদিকের কষ বেয়ে লাল- লাল কী সব যেন গড়াত। আমার মনে হত রক্ত। ওঁর এককালের অত্যন্ত ধারালো মুখটা চামড়া কুঁচকে আর দাঁত পড়ে গিয়ে কেমন কেমন একটা যেন হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

আমার স্থির ধারণা ছিল যে উনি আসলে মানুষ না, ডাইনি। ছাদে যে উনি পায়রা পোষেন, নিশ্চয়ই সবসময় তাদেরই মুণ্ডু ছিঁড়ে চিবিয়ে চিবিয়ে খান। আর পায়রাগুলো আসলে মানুষের বাচ্চা ছিল কিনা তা- ই বা কে বলতে পারে? ওনাকে দেখলেই তাই আমি একছুটে পালিয়ে গিয়ে খাটের তলায় ঢুকে পড়তাম। কাঠপিঁপড়ের কামড় অগ্রাহ্য করে। অথচ ওঁর ব্যাপারে কৌতুহলও ছিল ষোল আনার ওপর আঠারো আনা। আড়াল থেকেই উঁকি মেরে মেরে নজর রাখতাম ওঁর গতিবিধির দিকে। দিদার কাছে কেমন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে উনি আমার কথা সব জেনে নিতেন। আমি কোন ক্লাসে উঠলাম, কী খেতে ভালোবাসি, আর কতদিন থাকব—এই সব। আপাতভাবে সবই নির্দোষ প্রশ্ন। কিন্তু আমার মনে হত সবের পেছনেই একটা ভয়ঙ্কর অভিসন্ধি আছে। আমাকেও হয়তো পায়রা বানিয়ে ফেলবার ইচ্ছে।

আমি নিজের চোখে পাশের গলিতে হাড়গোড় পড়ে থাকতেও দেখেছি। যদিও দিদা বলল, ওটা নাকি মুরগির হাড়, কাকে বা বেড়ালে এনে ফেলেছে। কিন্তু আমি জানি ওটা পায়রার না হয়ে যায় না। একদিন আমি মনস্থির করলাম, এই পায়রার ব্যাপারটা নিজের চোখে না দেখলে আর চলছে না। সেদিনই সকালবেলা ওপরের দাদু যেই বেরিয়ে গেল, দাদু-

দিদাও ধারেকাছে নেই, আমি পা টিপে টিপে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলাম। দোতলায় কারোর সাড়া- শব্দ না পেয়ে সোজা তিনতলায়। সিঁড়ি যেখানে শেষ হয়েছে, তার মুখোমুখি একটা বড় রান্নাঘর। চকচকে লাল মেঝে। পেছনদিকে আরো তিন- চার ধাপ উঠে ঠাকুরের ঘর। দেখি রান্নাঘরের দরজা ভেজানো। ভেতর থেকে ছ্যাঁকছোঁক আওয়াজ আসছে। আমি ততক্ষণে নিশ্চিত, যে ঠিক সময়েই এসে পড়েছি। ভেতরে নিশ্চয়ই গোপনীয় কোন কাজ চলছে, তাই দরজাটা বন্ধ। হতে পারে পায়রার ছাল ছাড়ানো জাতীয়।

অসীম সাহসে ভর দিয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখি উনি পা ছড়িয়ে মেঝেতে বসে একটা রুপোলি হাঁসের ঘাড় মটকে, তার ডানা খুলে ফেলে তার ভেতর থেকে কি একটা নিয়ে খুব যত্ন করে মুখে পুরলেন। এদিকে মেঝেতে রাখা জ্বলন্ত গ্যাসের ওপর আলু, কুমড়ো,

পটলের তরকারিতে পোড়া লেগে যাচ্ছে, সেদিকে খেয়ালই নেই। পাঁচফোড়নের গন্ধে চারদিক ভরে গেছে, নইলে হাঁসের ভেতরে কী আছে গন্ধে খানিকটা বোঝা যেত।

হঠাৎ তরকারির কথা মনে পড়ে গিয়ে দ্রুত হাতে উনি খুন্তি নাড়তে লাগলেন। তারপরেই জল গড়াতে পিছন ঘুরে আমাকে দরজার ফাঁকে দেখে ফেললেন। অমনি মুখে ফুটে উঠল কান এঁটো করা হাসি। মুখের ঝোল টেনে ঢোঁক গিলে উনি বললেন, "আরে-- গাল্লু যে! আমার কি ভাগ্যি। এতদিন পর নিজে থেকেই আজ বুঝি আসা হল?"

তারপর কড়ায় জল ছিটিয়ে, চাপা দিয়ে, হাঁটু চেপে ধরে কোনমতে কাতরাতে কাতরাতে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর একটা জালের আলমারি খুলে একটা ডিবে থেকে চারটে নারকোল নাড়ু বার করে একটা বাটি করে আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। এভাবেই বোধহয়

বাচ্চাদের ভুলিয়ে ভালিয়ে পায়রা করে রেখে দেওয়া হয়। তারপর, আমার চোখের দিকে অপলক তাকিয়ে বললেন, "কী? আমাকে এতো ভয় পাও কেন'?"

আমার তখন গলা শুকিয়ে গেছে, কোন আওয়াজ বেরোল না। পেছন ফিরে যে পালাব, সেই অবস্থাও তখন নেই। পুরোপুরি সম্মোহিত। সাপেরাও নাকি শুধু নজর দিয়ে এরকম সম্মোহিত করে ফেলে শিকারকে। গিলে ফেলার আগে। কোন মতে ওঁর চোখ থেকে চোখ সরিয়ে মেঝেতে রাখা রুপোলি হাঁসটার দিকে তাকালাম। উনি বললেন, "ওটা দেখবে?" বলে নিয়ে এসে ঠিক একই ভাবে ওটার ঘাড় মটকে, ডানা খুলে ভেতরে দেখালেন। ছোট ছোট গোল গোল বিভিন্ন খোপে পানের বিভিন্ন মশলা রাখা। সেই পাত্রগুলো সরালে তার তলায় পানপাতার ভাণ্ডার। লাল রঙের নরম একটা মশলা তুলে জিগ্যেস করলেন আমি খেতে চাই কিনা। আমি মাথা নাড়লাম। কিন্তু এসব দেখার পর নারকোল নাড়ুগুলোতে বিষ- টিষ নেই বলেই মনে হতে লাগল।

সেদিন দুপুরে দিদা- দাদুর মাঝখানে শুয়ে দাদুর কাছে গল্প শুনতে শুনতে ব্যাপারটা ভাবছিলাম। এতদিন তাহলে যা ভেবেছি সবটাই ভুল! সব দেখেশুনে একটু হতাশও বোধহয় হয়েছিলাম। ওপরের দিদাকে আর পাঁচটা লোকের মতই সাধারণ ভাবতে ঠিক ভাল লাগছিল না। সবই তো বুঝলাম, কিন্তু তাহলে আমার দিকে তাকানোটা অমন লোম খাড়া করা কেন, সেটাই এখন রহস্য।

দাদু কিছুক্ষণ বাদেই যথারীতি লাল ঘোড়া- নীল ঘোড়ার গল্পটা বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়ল। তখন দিদাকে সব ঘটনাটা খুলে বললাম। শুধু আমার সন্দেহের কথাটা চেপে গেলাম। কী জানি হয়তো হাসবে। শুনে দিদা বলল, অনেকদিন আগে ওপরের দিদা যখন এবাড়িতে বিয়ে হয়ে আসেন, তখনও দাদু- দিদারা এই বাড়িতেই ভাড়া থাকত। প্রথমে নাকি ওপরের দিদার একটা মেয়ে হয়ে কদিন পরেই মারা যায়। তারপর থেকে শোকে উনি কেমন একটু পাগল পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। পরে অনেক ডাক্তার- বদ্যি করাতে খানিকটা সুস্থ হয়ে ওঠেন। তারপর দুই ছেলেমেয়ে হওয়ার পর সেই শোকের ওপর পাথর চাপা পড়ে যায়। আমাকে জন্মের পর দেখতে নাকি হুবহু সেই মেয়েটির মত ছিল। তাই মা যখন আমাকে হসপিটাল থেকে নিয়ে এসে বেশ কিছুদিন টানা মামারবাড়িতে ছিল, সেই সময় রোজ দুবেলা নিয়ম করে উনি নীচে আসতেন আমাকে দেখতে। আমি বিছানায় শুয়ে হাত- পা নেড়ে খেলা করতাম, আর উনি পাশে একটা চেয়ারে বসে অপলকে শুধু চেয়ে থাকতেন আমার দিকে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আর কিছু করতেন না।

ছবিঃ শিবশংকর ভট্টাচার্য

চোর ধরার গল্প

সোনালী ঘোষাল

আজ শুক্রবার। প্রতিটা শুক্রবারের মত আজও বিকেলে রাই, ঋদ্ধিমা, অর্ণা, পর্ণা, অবন্তী, শ্রাবন্তী আর রাইয়ের কাকুর ছেলে ঋক এসে জুটেছে রাইদের বাড়িতে। ওদের বাড়িটা বেশ বড় আর ড্রইংরুমটাতো বিশাল। দামি সোফা, বড় বড় অয়েল পেন্টিং আর সুন্দর সুন্দর শো- পিস দিয়ে ঘরটা সাজানো। মেঝেতে দামি কার্পেট। হাত- পা ছড়ানোর অনেক জায়গা।

ওরা সবাই শহরের নামি- দামি স্কুলের ছাত্রী। শনি আর রবি দু'দিনই ওদের স্কুলে ছুটি থাকে। এই শুক্রবার সন্ধেটা ওরা সবাই অলিখিতভাবে পড়ার ছুটি নিয়ে নিয়েছে। বাদবাকি পাঁচদিনই তো ভোরে উঠে রেডি হয়ে স্কুলে যাওয়া। তিনটে- সাড়ে তিনটেয় স্কুল বাসে বাড়ি ফিরে এসেই ড্রেস ছেড়ে হাত- মুখ ধুয়ে খেয়েই একটু ঘুমোনো। ছ'টায় উঠেই রুটিন মাফিক নাচ, গান, আঁকা, অ্যাবাকাস আর স্কুলের হোমটাস্ক করতে করতে ওরা ক্লান্ত। তাই এই একটা সন্ধ্যা ওরা একটু মুক্তির নিশ্বাস ফেলতে এখানে আসে।

ওদের মত করে ওরা গল্প- গুজব করে। নিজেদের নিজেদের স্কুলের বন্ধুদের কথা, কোন মিস খুব রাগী, কোন মিস কাকে বেশি ভালোবাসেন, হোমটাস্ক করে না গেলে কোন মিস কেমন ভাবে শাস্তি দেন আবার কোন মিস ক্লাসওয়ার্ক করাতে গিয়ে টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েন, কার ক'টা পুতুল আছে, সেগুলোর মধ্যে আবার ক'টা বার্বি আর ক'টা বেটি এসবই ওদের আলোচ্য বিষয়।

রাইয়ের আম্মা ওদের সবারই আম্মা। অন্যান্য দিন আম্মার টি. ভি সিরিয়াল দেখার অভ্যেস থাকলেও শুক্রবার তিনি টি. ভি বন্ধ করে ওদের আলোচনা মন দিয়ে শোনেন। কখনও

বা তাদের নাচ- গান করতেও বলেন। এদিনের সন্ধ্যাটা ওদের সঙ্গে কাটাতে তাঁর খুব ভালো লাগে।

আজ ঋক হঠাৎবলে উঠল, "জানিস আমাদের ক্লাসে না একটা চোর আছে।"

"কী রকম? কী রকম?" সবাই সমস্বরে বলে উঠল।

ঋক বলল, "চোরটা না সুযোগ পেলেই সবার ভালো ভালো টিফিন খেয়ে নেয়।"

"তোরা চোর ধরতে পারছিস না?" অবন্তী বলল।

"কী করে ধরব? কখন যে চুপিসাড়ে সব সাবাড় করে দেয় বুঝতেই পারি না।"

ওদের মধ্যে শ্রাবন্তী বয়সে বড়। সে ক্লাস ফাইভে পড়ে। সে বলল, "তোদের টিফিন আবার কাক কিংবা বেড়ালে খেয়ে নেয় নাতো? ভালো করে নজর করেছিস?"

"দূর তা কী করে হবে? ওরা কী করে জানবে কে ভালো টিফিন এনেছে? কই, রুটি, আলুভাজা বা চিঁড়ের পোলাও তো খেয়ে নেয় না? কিন্তু ভালো কেক, চকো পাই, পিজা, নুড্‌ল্‌ বা চিকেন চাউমিন আনলেই তা হজম করে ফেলবে।"

এতক্ষণ আম্মা মনযোগ দিয়ে সব শুনছিলেন। উল- কাঁটাটা হাত থেকে সরিয়ে এবার বললেন, "শোন তোমাদের আজ একটা চোর ধরার গল্প বলি। আমার স্কুল জীবনের গল্প।"

তোমরা সত্যি সত্যি চোরকে ধরেছিলে? কী করে চোর ধরা পড়ল?" অবাক গলায় সবাই জানতে চাইল।

"সে অনেককাল আগের কথা। তখন আমি আজিমগঞ্জের একটা স্কুলে ক্লাস সিক্সে পড়ি। পুজোর ছুটি পড়তে তখন আর দিন পাঁচেক বাকি। বড়দিমণি সব ক্লাসে ক্লাসে নোটিশ পাঠালেন আমরা যেন আয়া, মাসী, ঝাড়ুদার কাকু এদের দেবার জন্য প্রত্যেকে আট আনা করে আনি।

"পুজোর আর তিনদিন বাকি। বড়দির আদেশ মত আমরা সবাই আট আনা পয়সা এনেছি। আমার বাবা কলকাতা থেকে পুজোর বাজার করে ফেরবার সময় আমার জন্য একটা জ্যামিতির বাক্স কিনে এনেছিলেন। তখন সবে প্লাস্টিকের জিনিসের চল হয়েছে। কম্পাস ছাড়া বাকি স্কেল, চাঁদা, ত্রিভুজ সবই প্লাস্টিকে তৈরি। আমার তো জিনিসগুলো খুবই পছন্দ। বন্ধুদের দেখানোর জন্য সেই জ্যামিতির বাক্সের মধ্যেই আট আনাটা নিয়ে স্কুলে গিয়েছি।

"আমাদের এক সহপাঠী রেবার বাড়ি গন্ডগ্রামে। সেখানে বড়োদের কোন স্কুল না থাকায় সে তার মামাবাড়িতে থেকে পড়াশুনা করত। বোনেদের পুজোয় উপহার দেবে বলে আসার পথে সে চার- পাঁচ রঙের চুলের ফিতে কিনে নিয়ে এসেছিল।

"প্রার্থনার ঘন্টা পড়লে আমরা যে যার বইপত্র ক্লাসে রেখে নীচে চলে এসেছি। প্রাথর্নার শেষে সবাই আবার যে যার জায়গায় ফিরে গেলাম। নাম ডাকার পর শ্রেণী শিক্ষিকা একটা রোলনাম্বার লেখা কাগজ মনিটরকে দিয়ে বললেন পয়সাগুলো সংগ্রহ করে তাঁকে দিতে। ব্যাগ খুলতেই সবার চোখ কপালে ওঠার অবস্থা। পয়সা সমেত আমার জ্যামিতির বাক্স, রেবার কুড়ি গজ ফিতে, কারও দামি পেন সব উধাও। খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ। সবার ব্যাগ খোঁজা হল। কোথাও কিছু নেই। ভালো ভালো জিনিস সমেত সবারই চাঁদার পয়সা কর্পুরের মত উবে গেছে। বড়দির কাছে নালিশ জানানো হল। আমাদের সবার মন খুব খারাপ। পড়াশুনায় মন বসছে না।

"চতুর্থ পিরিয়ডের পর টিফিনের ঘন্টা পড়বে। এমন সময় বড়দি আমাদের ক্লাসের কোনো মেয়েকে বাইরে বেরোতে নিষেধ করে নোটিশ পাঠালেন। আমরা সব চুপচাপ বসে আছি। খানিক বাদে বেত হাতে বড়দি এসে ঢুকলেন।

"আমাদের লাইব্রেরি ঘরটা ছিল তিনতলার ছাতে, এককোণে। ছোট্ট একখানা ঘরে দু'তিনটে আলমারি, তাতেই বই রাখা থাকত। আমরা নীচু ক্লাসের মেয়েরা কোনোদিন সে ঘরে যাইনি। উঁচু ক্লাসের মেয়েরা সেখানে যেত কি না মনে পড়ছে না। বড়দি বললেন, 'লাইব্রেরি ঘরের এককোণে টেবিলের উপর একটা মন্ত্রপূত হাঁড়ি রাখা আছে। মেয়েরা সব রোল নাম্বার অনুযায়ী লাইন করে ওপরে যাবে। মন্ত্রপূত হাঁড়িটায় হাত রাখবে। যে চুরি করেছে মন্ত্রপড়া হাঁড়িটা তার হাতে আটকে গিয়ে ঘুরতে থাকবে, কিছুতেই খোলা যাবে না। হাঁড়িতে হাত দেবার পরে আবার সবাই লাইন করে হাত পিছনে রেখে নেমে আসবে। চোর ধরা পড়বেই।'

"রোলনাম্বার অনুযায়ী আমরা একে একে ছাতে উঠে এলাম। প্রথমেই চোখে পড়ল তিন- চারজন দিদিমণি ওপরে সিঁড়ির সামনে থেকে লাইব্রেরি ঘর অবধি দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সব মেয়ে ঠিকঠাক লাইন করে ওপরে উঠে যাচ্ছে কি না তা পরখ করার জন্যে শ্রেণীকক্ষেও একজন শিক্ষিকা উপস্থিত ছিলেন। রোলনাম্বার এক হওয়ার সুবাদে আমিই প্রথম সুযোগ পেলাম লাইব্রেরিতে প্রবেশ করার।

"ঘরে ঢুকে বেশ গা ছমছম করতে লাগল। অন্ধকার ঘুটঘুটে ঘর। চারপাশের কিছুই নজরে পড়ছে না। এককোণে একটা টিমটিমে প্রদীপের আলো জ্বলতে দেখে এগিয়ে গেলাম। টেবিলের উপর একটা কুচকুচে কালো হাঁড়ি। তাতে দুটো চোখ আর দুটো বের করা দাঁতের সারি। দু'পাশে বড় বড় ধুপদানিতে এক গোছা করে ধূপ জ্বলছে। সামান্য আলো আর আঁধারিতে বেশ একটা রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। সাহসভরে হাঁড়িতে হাত বুলিয়ে বেরিয়ে এলাম। হাতটা পেছনেই রাখা ছিল। শিক্ষিকারা একে একে আমাদের হাত পরীক্ষা করে নীচে পাঠিয়ে দিলেন। বাথরুমে সাবান আর তোয়ালে রাখা ছিল। হাত ধুতে গিয়ে দেখি আমার ধবধবে ফর্সা হাত কালো হয়ে গেছে।"

এতক্ষণ উদগ্রীব হয়ে শোনার পর রাই বলে উঠল, "আম্মা, কে চোর তোমরা তা জানতে পেরেছিলে?"

"চোরের হাতটা তো হাঁড়ির সঙ্গে আটকে গিয়েছিল তাহলে সেটা খুলে দিল কে?" অর্ণা জিজ্ঞাসা করল।

"আচ্ছা আম্মা, চোরটার কী শাস্তি হল? ওকে কি স্কুল থেকে রাস্টিকেট করা হয়েছিল?" ঋদ্ধিমার আকুল প্রশ্ন।

"থামো, থামো,এত গোলমাল কোরো না। তোমাদের সব প্রশ্নের উত্তর তো একসঙ্গে দেওয়া যাবে না ভাই। চেষ্টা করছি এক এক করে উত্তর দেবার। তোমরা ততক্ষণ চুপচাপ বসে থাকো।" আম্মা উত্তর দিতে শুরু করলেন, "হ্যাঁ, চোর ধরা পড়েছিল। সায়নী নামে যে মেয়েটা চুরি করেছিল যে কিন্তু খুব অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে। তার ঠাকুর্দা সেখানকার একজন নামজাদা ডাক্তার। বাবা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। আসলে কী জানো? আমাদের ধারণা, অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়। কিন্তু সবক্ষেত্রে তা হয় না। মেয়েটার হাতটান রোগ ছিল। কারোর কিছু ভালো জিনিস দেখলেই ও আর লোভ সামলাতে পারত না, নিজের অজান্তেই চুরি করে ফেলত।

"কিন্তু আমরা আমাদের হারানো জিনিসপত্র ফিরে পাইনি। সেগুলো ও যে কোথায় লুকিয়ে ফেলেছিল অনেক জেরা করেও তা জানা যায়নি। চুরি করার কথা ও স্বীকারই করেনি।"

"চোরের হাতটা তো হাঁড়ির সঙ্গে জুড়ে গেছিল, ভয় পেয়ে ও কান্নাকাটি শুরু করেনি?" ঋক বলে উঠল।

"তাহলে তোমাদের আসল কথাটা বলি শোন। আমাদের স্কুলের সেক্রেটারি মহাশয়ের পরামর্শমতো বড়দিমণি চোর ধরার জন্য মন্ত্রপূত হাঁড়িটার কথা বলে সেটাকে অন্ধকার ঘরের এককোণে রেখে গা ছমছম করা ভূতুড়ে পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন। হাঁড়িটার গায়ে কালো আলকাতরা পুরু করে লাগানো ছিল। হাঁড়িটার মাঝখানে দুটো গর্ত করে ভূতের চোখ তৈরি করা হয়েছিল। খড়িমাটি দিয়ে বড় বড় দাঁতের দুটি সারি আঁকানো হয়েছিল যাতে আমরা ছোট ছোট মেয়েরা ভয় পেয়ে যাই। যারা মনে- প্রাণে জানতাম চোর নই তারা নির্ভয়ে হাঁড়িতে হাত দিয়েছিলাম। তাইতেই আলকাতরা আমাদের হাতে লেগে গিয়েছিল। আর সায়নী তো মনে মনে জানত যে সে চুরি করেছে তাই হাতে হাঁড়ি আটকে যাবার ভয়ে ওতে হাতই দেয়নি। ফলে ওর হাতে আলকাতরাও লাগেনি। ধবধবে পরিষ্কার হাত ও শিক্ষিকাদের সামনে মেলে ধরেছিল। আর তাতেই কেল্লা ফতে। বড়দির অভিপ্রায় পূর্ণ হয়েছিল।

"সায়নীর অভিভাবককে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। সব ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা দেওয়া হলে মেয়ের হয়ে উনি আন্তরিকভাবে ক্ষমা চেয়ে নেন। জানান যে খুব ছোট বয়স থেকেই ওর হাতটান স্বভাব। অনেক ডাক্তার দেখানো হয়েছিল। তারা জানিয়েছেন সায়নী এক মানসিক রোগের শিকার। এ রোগ সহজে যাবার নয়।

"একথা জানার পর ওকে আর শাস্তি দেওয়া হয়নি। মানবিকতার কারণে স্কুল থেকে বহিষ্কারও করা হয়নি। তবে আমরা, সহপাঠীরা সদাসতর্ক থাকতাম যাতে আর কারোর কিছু চুরি না যায়।

"তবে কথায় আছে না, 'স্বভাব যায় না মলে'? ওর ক্ষেত্রে সেই কথাটা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিয়েছিল। শুনেছিলাম, বিয়ের পরপরই ও ওর নতুন বরের দামি হীরের আংটি চুরি করেছিল। তারপর অবশ্য আর ওর খবর রাখিনি বা রাখার চেষ্টাও করিনি।"

ছবিঃ মলয়চন্দন সাহা

কন্যাকুমারীর শাঁখ

তাপস মৌলিক

মানেভঞ্জন জায়গাটার একটা মজা আছে। টাউনটার বেশির ভাগই বাংলায়, অর্থাৎ ভারতে; কিছুটা আবার নেপালে। নেপালের দিকের পাড়াটার সামনে সাইনবোর্ড লাগানো আছে – "ওয়েলকাম টু নেপাল"। গেলেই হল।

একটা ভাড়া করা টাটা সুমোয় শিলিগুড়ি থেকে মিরিক, সুখিয়াপোখরি হয়ে মানেভঞ্জন যখন নামলাম তখন বিকেল পৌনে তিনটে। ঝিরঝির করে খুব হালকা বৃষ্টি পড়ছে। চারপাশের সবুজ পাহাড় কুয়াশার চাদরে ঢাকা। জিপের স্ট্যান্ডে গাড়ি থেকে নামতেই বাঁদিকের একটা দোকানের বারান্দা থেকে একজন বাংলায় বলে উঠল, "কি দাদা, বাঙালি তো? এখানে চলে আসুন। হোটেল লাগবে তো?"

তাকিয়ে দেখি একজন রোগা, লম্বা, মাঝবয়সী ভদ্রলোক, পরনে খয়েরি রঙের ফুল সোয়েটার আর আকাশী মাফলার, সারা গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, আমার দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসছেন। "আসুন, চলে আসুন। দোতলায় রুম খালি আছে। নিচে রেস্টুরেন্ট আছে। কোনও অসুবিধে নেই।"

সাদা চুনকাম করা বাড়িটার একতলায় দোকানঘর। দোতলার সামনে একটা বারান্দা, তার রেলিঙ থেকে সাইনবোর্ড টাঙানো আছে – "কাঞ্চনজঙ্ঘা লজ"। লোকটা মনে হয় হোটেলের দালাল-টালাল হবে। চেহারা দেখে তো তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু এখানে এসেও বাঙালি দালালি করছে? তাজ্জব! যাই হোক, দালালদের আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। তারা ডানদিকে যেতে বললে আমি বাঁদিকে যাই। চুপচাপ গাড়ি থেকে রুকস্যাকটা নামিয়ে, পিঠে নিয়ে সামনের দিকে হাঁটা দিলাম। বৃষ্টি খুবই অল্প অল্প পড়ছে, তাই ছাতাটা আর বার করলাম না। লোকটা পেছন থেকে আবার বলল, "আরে দাদা, ওদিকে পাবেন না। সব বন্ধ। এটাই একমাত্র খুলেছে।" পেছন ফিরে একটু ভদ্রতার হাসি হেসে হাত নেড়ে বললাম, "না না, ঠিক আছে।"

পাবো না মানে? মানেভঞ্জনে কি একটা হোটেল? সান্দাকফু- ফালুটের রাস্তার ট্রেকার আর ট্যুরিস্টদের কল্যাণে মানেভঞ্জন এখন রীতিমত ব্যস্ত টাউন। বৃষ্টিভেজা সরু পিচরাস্তার দু' ধারে সারি দিয়ে দোকান। রাস্তার পাশে লাইন দিয়ে ল্যান্ডরোভার জীপ দাঁড়িয়ে আছে, গাড়ি ভাড়া করে সান্দাকফু যেতে হলে এগুলোই ভরসা।

অথচ প্রথম যখন আমি মানেভঞ্জন এসেছিলাম তখন সে একটা ছোট্ট গ্রাম। সবুজ পাহাড়ের ঢালে ছড়ানো ছেটানো কতগুলো বাড়ি, একটা লজ, গোটা তিন ঝুপড়ি মত দোকান। সে অবশ্য তেইশ বছর আগের কথা, ১৯৮৯ সালে। তখন মানেভঞ্জন অবধিই জীপ চলত, তারপরে হাঁটতে হত।

রাস্তার দু'পাশে আরও দু'তিনটে হোটেল চোখে পড়ল, তবে সেগুলো বন্ধই বটে। আরও একটু এগোতে বাজার এলাকাটা ছাড়িয়ে গেলাম। এদিকে আর দোকানপাট নেই, কিছু ঘরবাড়ি আছে। রাস্তায় লোকজনও কেউ নেই। ব্যাপারটা কী? কিছুটা পিছিয়ে এসে একটা দোকানে জিগ্যেস করে জানলাম, এদিকের কোনও হোটেল সত্যিই খোলা নেই। বলল, জীপস্ট্যান্ডেই খোলা পেতে পারেন, আর কোথাও পাবেন না।

এদিকে বৃষ্টিটা একটু জোরেই আরম্ভ হয়েছে তখন। তাড়াতাড়ি স্ট্যান্ডে ফিরে সেই "কাঞ্চনজঙ্ঘা লজ"- এর নিচে দোকানটার সামনে বারান্দাতে রুকস্যাক নামিয়ে দাঁড়ালাম। রুমাল বার করে মাথার জল মুছছি, এমন সময় সেই ভদ্রলোক ফের উদয় হলেন, "আসুন, আসুন। ওদিকের হোটেলগুলো এখনও খোলেনি। সবে সিজন শুরু হয়েছে তো। দোতলায় ভাল রুম আছে, আমার সঙ্গে আসুন।"

আমার রুকস্যাকটা কাঁধে তুলে নিয়ে ভদ্রলোক দোকানটার পাশের একটা সরু গলি দিয়ে রওনা দিলেন। অগত্যা আমিও তাঁর পিছু পিছু চললাম। গলি দিয়ে দোকানের পেছনে গিয়ে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। সামনের বারান্দার লাগোয়া একটা ঘরে রুকস্যাকটা নামিয়ে রেখে ভদ্রলোক বললেন, "এখানে ঢুকে পড়ুন। চা খাবেন তো? আমি নিয়ে আসছি।"

খাটে বসে জুতো খুলতে খুলতে চা হাজির। ভদ্রলোককে জিগ্যেস করলাম, "বাকি হোটেল- ফোটেল সব বন্ধ কেন বলুন তো?" উনি বললেন, "সান্দাকফু- ফালুটের রাস্তা তো ১৬ই জুন থেকে ১৫ই সেপ্টেম্বর বর্ষার জন্য বন্ধ থাকে। এবারে বর্ষা তো এখনও চলছে। দেখছেন না, বৃষ্টি হয়েই যাচ্ছে। আজ ২২শে সেপ্টেম্বর। সবে গতকাল সান্দাকফু অবধি গাড়ির রাস্তা খুলেছে। ট্যুরিস্টদের আনাগোনা এখনও সেরকম আরম্ভ হয়নি। দু'একজন ট্রেকার যাচ্ছে। এইবারে আস্তে আস্তে সব শুরু হবে, হোটেলগুলোও খুলবে একে একে। আপনি কতদূর যাবেন? সান্দাকফু? গাড়িতে যাবেন না ট্রেক করে?"

"সান্দাকফু- ফালুট হয়ে গোর্খে দিয়ে রিম্বিক নামব। গাড়ি কি হবে? হেঁটেই যাব।"

"গাইড লাগবে তো? পোর্টার? আমার চেনাজানা ভাল লোক আছে। খবর দিয়ে দিচ্ছি।"

"না না, গাইড কী হবে? আমি এ রাস্তায় আগেও এসেছি। চেনা রাস্তা।"

"গাইড ছাড়া তো এখন যেতে দেয় না। সান্দাকফু- ফালুট সিংগালিলা ন্যাশনাল পার্কের মধ্যে পড়ে। টিকিট কেটে, গাইড নিয়ে তবেই যেতে দেয়। তাছাড়া আপনি একা এসেছেন, বৃষ্টিবাদলার দিন, রাস্তায় লোকও তেমন নেই, সঙ্গে একজন নিয়েই নিন।"

"ঠিক আছে, দরকার হলে বলব আপনাকে।"

"বেশ, আমি নিচেই আছি। একটা হাঁক দেবেন।"

এ তো ভাল জ্বালা! গাইডও কি দালাল মারফৎ নিতে হবে নাকি? এ দেখি পদে পদে দালালের উপদ্রব। শুনেছি গাইডদের অ্যাসোসিয়েশন আছে, সেখান থেকে গাইড নিতে হয়। উটকো লোকের মাধ্যমে অচেনা গাইড না নিয়ে অ্যাসোসিয়েশন থেকে নেওয়াই নিরাপদ। অ্যাসোসিয়েশনের গাইডরা বেগড়বাই করে না, নালিশ করে দিলে ওদের লাইসেন্স বাতিল হয়ে যাবে। ওদের অফিসটা খুঁজে বার করলেই হবে। গাইড ছাড়া যে এখন যাওয়া যায় না সেটা অবশ্য লোকটা ঠিকই বলেছে। তবে আমার দরকার একজন পোর্টার কাম গাইড, যে রাস্তাটাও চেনে, আবার আমার রুকস্যাকের কিছু মালপত্রও পিঠে নেবে। নিয়ম বাঁচবে, খরচা কমবে, হালকা হয়ে হাঁটাও যাবে।

চা খেয়ে ফ্রেশ হয়ে নিয়ে সামনের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। আধঘণ্টা পরে বৃষ্টিটা বন্ধ হল। জুতো গলিয়ে বেরিয়ে পড়লাম গাইড অ্যাসোসিয়েশনের অফিসটার খোঁজে। লোকজনকে জিজ্ঞেস করে অফিসে পৌঁছে শুনি সেটা আধঘণ্টা আগে বন্ধ হয়ে গেছে, আবার কাল দশটার পর খুলবে। ট্রেকারদের ভিড় নেই, তাই অফিসে চাপও নেই। এটা আরেকটা জ্বালা হল। ভেবেছিলাম কাল সকালে বৃষ্টি না থাকলে ভোরবেলাই বেরিয়ে যাব। এ তো দেখছি গাইড ঠিক করে বেরোতে বেরোতেই দুপুর বারোটা বেজে যাবে। তারপর কতদূর আর যাওয়া যাবে! তাছাড়া ট্রেকিং সবসময় ভোরবেলা শুরু করাই ভাল, কেননা দুপুর দু'টোর পরেই পাহাড়ে আবহাওয়া খারাপ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

লজে ফিরে আবার দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। ফের টিপ টিপ করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ঘন কুয়াশায় চারদিক ঢেকে যাচ্ছে। উইন্ডচিটারটা গায়ে দিয়ে ভাবলাম আরেক কাপ চা হলে মন্দ হয় না। নিচে ঝুঁকে দেখলাম তলার বারান্দায় সেই ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। হেঁকে বললাম, "দাদা, এক কাপ চা হবে?" ভদ্রলোক বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই, নিয়ে আসছি ওপরে।"

দশ মিনিটের মধ্যেই একটা বিশাল কাপ ভর্তি ধোঁয়াওঠা চা নিয়ে ভদ্রলোক ওপরে উঠে এলেন। নিজের জন্যও এক কাপ এনেছেন। চায়ে চুমুক দিতে দিতে জিগ্যেস করলেন, "গাইড পেলেন?"

সমস্যাটা বললাম। আমার পোর্টার- কাম- গাইডের চাহিদাটাও বললাম। শুনে উনি বললেন, "আপনি যদি কাল সকালে বেরোতে চান, বেরোতে পারেন। এখানে আমার চেনাজানা কিছু গাইড আর পোর্টার আছে। তাদের ফোন নাম্বার আছে। ফোন করলে আধঘণ্টার ভেতরই চলে আসবে। সবাই লোকাল লোক। আর সবাই অ্যাসোসিয়েশনের নথিভুক্ত গাইড বা পোর্টার। আপনি কাউকে ঠিক করলে সেই কাল ভোরবেলা অ্যাসোসিয়েশনের অফিস খুলিয়ে আপনাকে দিয়ে কন্ট্রাক্ট খাতায় সই করিয়ে নেবে। অ্যাসোসিয়েশনকে এড়িয়ে ওরা যায় না।"

বললাম, "দেখুন তা হলে ফোন- টোন করে, কাউকে পাওয়া যায় কি না। তবে বয়স্ক গোমড়ামুখো লোক জুটিয়ে দেবেন না, বেশ ইয়াং চটপটে একটা ছেলে পেলে ভাল হয়। একা একা যাবো তো, একটু গল্পগুজব করতে করতে যাওয়া যাবে।"

"ঠিক আছে, দেখি কাকে পাওয়া যায়", এই বলে ভদ্রলোক নিচে নেমে গেলেন।

আধঘণ্টার ভেতরেই ভদ্রলোক একটি স্থানীয় ছেলেকে নিয়ে হাজির। বললেন ওই নাকি আমার সঙ্গে যাবে। ছেলেটির সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমার পছন্দ হয়ে গেল। নাম অজয় গুরুং, বয়েস কুড়ি, সামনের বছর সুখিয়াপোখরি হাই স্কুল থেকে হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা

দেবে, ছুটির সময় গাইডের কাজ করে। বেশ শান্ত, ভদ্র ছেলে। জিগ্যেস করে জানলাম, সান্দাকফু- ফালুট ও বহুবার গেছে, বিভিন্ন টিমের সঙ্গে। তবে আমি যখন শেষবার এই রুটে এসেছি তখন ওর জন্মই হয় নি। ওকে বলে দিলাম, কাল সকালে আকাশ পরিষ্কার থাকলে ভোরবেলা চলে আসতে। যত তাড়াতাড়ি পারি বেরিয়ে যাব।

গুরুং বেরিয়ে যাওয়ার পর ভদ্রলোককে একটা ধন্যবাদ দিয়ে জিগ্যেস করলাম, "আপনি এখানে কতদিন আছেন?" উনি বললেন, "আমি তো গতকালই এসেছি। একটা ছোট্ট কাজ ছিল। আগামীকাল ভোরবেলা আমিও বেরিয়ে যাব।"আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, "সে কী? বেরিয়ে যাবেন মানে? আপনি এখানে থাকেন না?"

"না না, আমার বাড়ি দুর্গাপুরে। এখানে আমি প্রায় প্রতিবছরই একবার করে আসি। আগে আগে বছরে দু'বারও আসতাম।"

"বলেন কী? আমি তো ভেবেছি আপনি এই হোটেলেরই লোক।"

"না না, আমিও আপনার মতোই একজন বোর্ডার। ট্যুরিস্ট। আপনার পাশের ঘরেই আছি। তবে এখানে এতবার এসেছি যে এরা সবাই আমার চেনাজানা হয়ে গেছে।"

"এ রাম, ছি ছি। তবে আপনি আমার রুকস্যাক বয়ে আনলেন কেন? চা- ও নিয়ে এলেন। আমি আবার আপনাকেই হেঁকে বললাম চা হবে কি না! সরি, কিছু মনে করবেন না। আমি একদম বুঝতে পারি নি।"

"আরে না না, তাতে কী হয়েছে? আপনি সারাদিন জার্নি করে এসেছেন, ক্লান্ত, তাই ওপরে চা দিয়ে গেলাম। আমি তো সারাদিন বসেই আছি। এখানে এলে এই লজেই বরাবর উঠি তো, তাই এখানকার তিব্বতী মালকিন আমায় খুব ভালবাসেন। আমিও টুকটাক কাজকর্ম করে দি, বসে থাকতে পারি না।"

বোঝো কাণ্ড! আর আমি এনাকে সেই প্রথম থেকে দালাল মনে করে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছি। অবশ্য ভদ্রলোকের গায়ে পড়ে হেল্প করার চেষ্টা দেখলে সেটা মনে হওয়া খুব অস্বাভাবিক নয়।

উনি নিচে নেমে যাচ্ছিলেন। পাপস্খালনের জন্য বললাম, "আরে বসুন না, একটু গল্প করা যাক। আপনার নামটাই তো জানা হয়নি।"

ভদ্রলোকের নাম গৌতম কোঙার। বললেন, "এখানকার বেশির ভাগ লোকই বৌদ্ধ। আমার নামটার জন্য এরা আমাকে আরও পছন্দ করে। গৌতম বুদ্ধের নেমসেক বলে কথা!"

"মানেভঞ্জন অবধি এলেন, আর সান্দাকফু- ফালুট না গিয়ে ফিরে যাচ্ছেন যে?"

"না না, আমি যাচ্ছি নেপালে। মুক্তিনাথ যাওয়ার জন্য বেরিয়েছি। কাল সকালে এখান থেকে কাঠমান্ডুর দিকে রওনা দেব, সেখান থেকে পোখরা। একটা ছোট্ট কাজের জন্য মানেভঞ্জন জাস্ট ছুঁয়ে গেলাম। সান্দাকফু ফালুট আমি আগে অনেকবার গেছি। এখন আর অত হাঁটতে পারি না, দম পাই না। বয়েস তো প্রায় পঞ্চাশ হতে চলল। তিরিশ বছর আগে পাহাড়ে আসা শুরু করেছিলাম। ১৯৮৭তে দার্জিলিং- এর হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট থেকে বেসিক মাউন্টেনিয়ারিং কোর্সও করেছিলাম। "বি" গ্রেড পেয়েছিলাম অবশ্য, তাই অ্যাডভান্স কোর্সটা আর করা হয় নি। তারপর বছর পনেরো প্রচুর ট্রেক করেছি। এখন শুধু ঘুরে বেড়াই। পাহাড় দেখি, মানুষজন দেখি। বেশি হাঁটতে পারি না বলে সাধারণত যেসব জায়গা অবধি গাড়ি যায়, সেই অবধি যাই। মাঝে মাঝে এক- দু'দিনের সোজা ট্রেক থাকলে মেরে দি। এই আর কি!"

নিচে নামার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে গৌতমবাবু বললেন, "যাই নিচে যাই। রাতের খাবার কখন খাবেন? আটটা নাগাদ নীচে রেস্টুরেন্টে নেমে আসুন, একসঙ্গে গল্প করতে করতে খাওয়া যাবে। নাকি রুমে বসেই খাবেন?"

"না না, নীচেই খাবো। আটটায় নামবো তাহলে, ঠিক আছে।"

লজটা চালান একজন তিব্বতী মহিলা। এনাদের বয়স আন্দাজ করা খুব শক্ত, তবে মনে হয় ষাটের কাছাকাছি হবে। বেঁটেখাটো, গোলগাল, সুন্দর চেহারা। খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। লজটা এমনিতে খুব সাধারণ, কিন্তু এত পরিপাটি করে গোছানো আর পরিষ্কার যে মন ভাল হয়ে যায়। আটটা নাগাদ নিচে নেমে ডাইনিং রুমে ঢুকলাম। বাইরে তখনও টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়েই চলেছে, বেশ হাওয়াও দিচ্ছে। কাল সকালে পরিষ্কার থাকলে হয়!

ডাইনিং রুমের সঙ্গেই লাগোয়া কিচেন। সেখানে দেখি গৌতমবাবু একের পর এক রুটি বেলে চলেছেন, আর সেই তিব্বতী মালকিন রুটি সেঁকছেন। বললাম, "সে কী, আপনি তো দেখছি কিচেনেও ঢুকে পড়েছেন!"

"এই, দিদিকে একটু হেল্প করছি আর কি। কী আর করব, কোনও কাজ নেই, আমি আবার বসে থাকতে পারি না। বসে পড়ুন, গরম গরম রুটি দিয়ে আরম্ভ করুন, আমিও আসছি।"

টেবিলে বসার পর গৌতমবাবুই সার্ভ করলেন। তারপর নিজের খাবারও নিজেই নিয়ে আমার সামনে বসে পড়লেন। রুটি, ডাল আর সবজি। গরম গরম দারুণ খাবার। বললাম, "আপনি তো এঁদের একদম ঘরের লোক হয়ে গেছেন দেখছি। এই লজেরই লোক মনে করে আমি ভুল কিছু করিনি।"

"হাঃ হাঃ, যা বলেছেন। আসলে এঁরা এত সহজ সরল, এত ভালমানুষ, এত সহজে এঁরা মানুষকে আপন করে নেন, ভাবাই যায় না। ঠিকই বলেছেন, আমি এঁদের ঘরের লোকই হয়ে গেছি। এই দিদি তো আমায় খুবই ভালবাসেন, অনেকদিন ধরে। আমিও তাই যখনই আসি, হাতে হাতে একটু কাজকম্মো করে দি।"

লজের মালকিন টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের খাওয়ার তদারক করছিলেন। এনারা বাংলা ভালোই বুঝতে পারেন, বহুদিন ধরে ট্যুরিস্টদের মুখে শুনছেন। আমাদের কথাবার্তা শুনে বললেন, "গৌতমদাদা মেরে আপনা ভাই হ্যায়। মুঝে কিতনা হেল্প করতে হ্যায়, খানা পকানে মে, খানা দেনে মে। কভি কভি তো বর্তন ধোনে কে লিয়ে ভি বৈঠ যাতে হ্যায়। রুকিয়ে, আপকো দিখাতি হুঁ, গৌতমদাদা নে মেরে লিয়ে ইস বার কেয়া লায়া হ্যায়।"

এই বলে উনি একটা কাঁসার থালায় করে খুব সুন্দর একটা সাদা শঙ্খ এনে পাশের টেবিলে রাখলেন। বললেন, "ম্যায় নে একবার স্রিফ বোলি থি, ঔর গৌতমদাদা নে কন্যাকুমারী যা কর মেরে লিয়ে ইয়ে শঙ্খ্ লে কে আয়া। ম্যায় ইতনা খুশ হুয়া, ইতনা খুশ হুয়া, মেরি আঁখো মে পানি বহ্ গিয়া। বোলিয়ে না, আপনা ভাই নেহি হোনে সে ইয়ে সব কোই করতে হ্যায়?"

গৌতমবাবুকে জিগ্যেস করলাম, "এটা কি কন্যাকুমারী থেকে কিনেছেন?"

"হ্যাঁ। আর বলবেন না! দিদির অনেকদিনের শখ একটা ভাল শঙ্খের। গতবছর এই সময় এখানে এসেছিলাম একবার। কথায় কথায় দিদি বলে ফেলেছিলেন। বললাম যে কন্যাকুমারীতে খুব ভাল শঙ্খ পাওয়া যায়, আমি তোমার জন্য নিয়ে আসব। দিদি আমায় এত ভালবাসে, এখানে এলে এত যত্ন করে, কোনও দিন তো মুখ ফুটে কিছু চায় নি। এঁরা খুব অল্পে সন্তুষ্ট। আমি দিদিকে রান্নাবান্নায় একটু হেল্প করে দি, করতে ভাল লাগে, সারা বছর তো দিদি একার হাতে সব সামলায়। তা ভাবলাম, দিদির শখের কথাটা যখন জেনেই ফেলেছি, তখন চেষ্টা করে দেখি। এবার মার্চ মাসে চলে গেলাম কন্যাকুমারী। সেখান থেকে এটা কিনলাম দিদির জন্য। আসলে এটা দিতেই আমার এখানে আসা। ভেবেছিলাম আজ সকালেই বেরিয়ে যাব। সেটা আর হল কই! দিদিই আটকে দিল।"

বাইরে থেকে ঝিরঝিরে বৃষ্টির আওয়াজ আসছে। ডাইনিং রুমের টিমটিমে ঘোলাটে আলোয় দেওয়ালে টাঙানো থাংকাগুলো কেমন ভুতুড়ে লাগছে। চুপচাপ খাচ্ছিলাম, আর ভাবছিলাম, আমি এ কোথায় আছি? গতকালও এই সময় আলোঝলমল কোলাহলমুখর শিয়ালদা স্টেশনে ছিলাম। আর আজ? এটা কোন সাল? ২০১২? অসম্ভব। এখন, এই ২০১২ সালে এটা কেউ বিশ্বাস করবে? কোন্ পাহাড়ি পথের এক অখ্যাত হোটেলের তিব্বতী মালকিন কথায় কথায় এক শহুরে বোর্ডারকে বলে ফেলল যে তার একটা ভাল শঙ্খের খুব শখ, আর সেই লোকটি নিজের পয়সায় গোটা ভারতবর্ষ পেরিয়ে কন্যাকুমারী গিয়ে তার জন্য শঙ্খ কিনে নিয়ে এল? কী, না, কন্যাকুমারীতে খুব ভাল শঙ্খ পাওয়া যায়! পৃথিবীতে এখনো এরকম লোক আছে?

খাওয়া শেষ করে হাত ধুয়ে এসে টেবিল থেকে শঙ্খটা তুলে নিলাম। কী সুন্দর! অসাধারণ! গৌতমবাবু বললেন, "কানে দিয়ে শুনুন, সমুদ্রের আওয়াজ শুনতে পাবেন। দিদিকে শুনিয়েছি। দিদি তো কোনও দিন সমুদ্র দেখেনি, খুব সম্ভব দেখবেও না। তাই আওয়াজটাই একটু শুনিয়ে দিলাম। বাইরে বারান্দায় গিয়ে চোখ বন্ধ করে কানে দিন, ওখানে হাওয়া আছে, ভাল শোনা যাবে।"

শঙ্খটা হাতে নিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এলাম। তারপর কানে লাগালাম। চোখ বন্ধ করলাম। এক মুহূর্তে পৌঁছে গেলাম সমুদ্রের ধারে। বাতাসের শন্ শন্ শব্দ। বালির চরে ঢেউ ভেঙে পড়ার আওয়াজ। এইটুকু একটা সামান্য শঙ্খ, অথচ কী অদ্ভুত তার গুণ! কানে দিয়ে শোনো, শুনবে অতলান্ত অনন্ত মহাসমুদ্রের ঢেউ একের পর এক ভেঙে পড়ছে, বিরামহীন, ক্লান্তিহীন। মনে হল, মানুষও ঠিক এমনই। বাইরে থেকে দেখো, সাধারণ, সামান্য সব মানুষ। নিজের নিজের সুখ, দুঃখ, স্বার্থ, শখ-আহ্লাদ, হাসিকান্না, কলহ- কোলাহল নিয়ে গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে চলেছে। একটু কান পেতে শোনো। শুনবে অতলান্ত, অনন্ত মানবসমুদ্রের ঢেউ যুগ যুগ ধরে পাড়ে ভেঙে পড়ছে। বিরামহীন, ক্লান্তিহীন।

ছবিঃ শিবশংকর ভট্টাচার্য

ভ্রমণ

পাহাড়ি গ্রামের গপ্পো

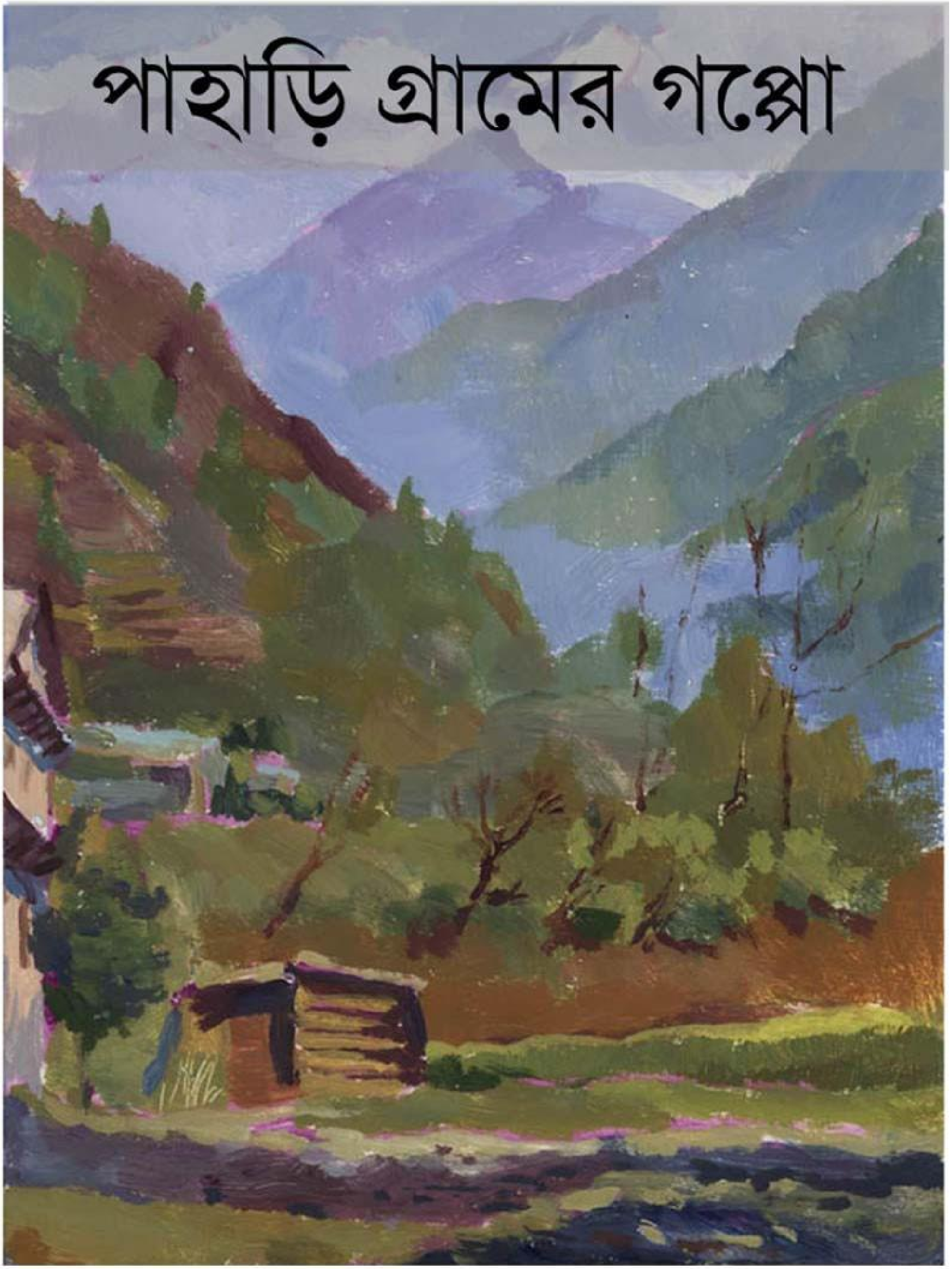

ইন্দ্রনাথ

আমাদের দেশের উত্তরদিকে যে বিরাট পাহাড়শ্রেণী সেটাই হিমালয়। এই হিমালয় পাহাড়ের গায়ে গাড়ি চলা রাস্তার ধারে কাছে, আনাচে কানাচে দূরে দূরে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য গ্রাম। কোনো কোনো গ্রামে পায়ে হেঁটে পৌঁছতে সারা দিন এমনকি দুদিন তিনদিনও লেগে যায়। ছবির মতো সুন্দর সেসব গ্রাম। আরো সুন্দর সেখানকার মানুষজন।

এরকমই বেশ কিছু গ্রামে যাবার সুযোগ ঘটেছে আমার, অনেকের সাথে, বেড়াতে বেড়াতে নেহাৎ এক দুদিনের জন্যে। কোনো গ্রামে একবার, কোনো গ্রামে একাধিকবার। উত্তরাখন্ডের এমন কয়েকটা গ্রাম বেড়ানোর সাদামাটা গল্পই শোনাব এবার। সেসব গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলা পাহাড়ি নদী, গভীর জঙ্গল, সবুজ পাহাড়ি ঢাল, পাহাড়ের চূড়ার মাথার সাদা বরফ, রঙ বেরঙের জানা অজানা ফুল, নানান প্রজাতির পাখি, যদি কখোনো দেখতে ইচ্ছে করে তোমাদের!

তোমাদেরই মতো আমার এক ছোট্ট বন্ধু আমাকে এমনি এক পাহাড়ি গ্রামের কাছে দাঁড়িয়ে বলেছিল, " জানো, আমাদের দেশটা এতো বড়ো আর এত সুন্দর......"

খাতি

খাতি গ্রাম। দূরে পিন্ডারি গ্লেসিয়ার

গতবারে খাইবগড় গ্রামের কথা বলেছিলাম মনে আছে তো! পিন্ডারি গ্লেসিয়ার যাবার পথে কাপকোট ভারারি ছাড়িয়ে সেই যে গোপালরামদার বাড়ি যেখানে! তো সেই পথেই আরেকটা গ্রাম হল খাতি। তবে একটু দূরে।

পিন্ডারির পথে পাহাড়ের মাথায় একটা বিখ্যাত জায়গা হল ঢাকুরিখাল। এই ঢাকুরিখাল পেরিয়ে আট কিলোমিটার গিয়ে তবে খাতি গ্রাম। পাহাড়ের মাথায়, তায় আবার খাল। শুনে অবাক হচ্ছ তো! খাল মানে গিরিপথ। পাহাড়ের গিরিশিরার মধ্যে অপেক্ষাকৃত নিচু অংশ, যেখান দিয়ে এপাশ থেকে ওপাশে মোটামুটি সহজভাবে পারাপার করা যায় তাকেই ইংরিজিতে পাস আর আঞ্চলিক কথ্যভাষায় খাল বলা হয়।

ঢাকুরিখালের উচ্চতা কমবেশি ৯০০০ ফুট। সুন্দরডুংগা উপত্যকাতে যারা ট্রেকিং বা পর্বত পদযাত্রার জন্য যান তাঁদেরও এই খাতি পেরিয়েই যেতে হয়। তবেই দেখছো এই এলাকাতে দুটি দর্শনীয় স্থানে যেতে হলে এই গ্রামটা পেরোতে হচ্ছে। বস্তুত সুন্দরডুংগা নদী আর পিন্ডার নদী দুপাশ থেকে এসে এই গ্রামের পায়ের কাছে এসে মিলেছে। এবারে নদী পেরিয়ে যার যেদিকে যেতে ইচ্ছে করে চলে যাও।

প্রথমবার যখন আমি এই গ্রামে আসি সে এক মজার কান্ড। দিন দশ বারো পাহাড়ের জনমনিষ্যিহীন এলাকাতে ঘুরে ঘুরে ফেরাপথে সুন্দরডুংগা নদী ধরে তো আমরা

রওনা দিয়েছি খাতির দিকে। এতদিন খাবার বলতে আটার রুটি আর আলু- কুমড়ো বা লাউয়ের সবজি ব্যস। সেদিন মনে খুব আনন্দ। খাতি গ্রামে একটা চায়ের দোকান আছে শুনেছি, তার লাগোয়া একটা চাল ডাল আনাজপাতির দোকানও আছে। সেখানে ডিম পাওয়া যায় আর চা দোকানিকে বললে সে কি আর এক আধটা ডিম ভেজে দেবে না? তো সেই স্বপ্নে বিভোর হয়ে আমরা তো প্রাণপণে হাঁটছি।

বিকেলের আলো মরে আসার আগেই আমরা একে একে সেই দোকানির চাতালে পৌঁছেও গেলাম। আর কী! প্রত্যেকের জন্য দু দুটো ডিমের ওমলেটের অর্ডার দিতে কি আর দেরি হয়? আমাদের এক বন্ধু বেশ চালাক, সে কি করল, একসাথে দুটো ডিমের ওমলেট না খেয়ে এক্টা একটা ডিমের দুটো ওমলেট খেল যাতে আমাদেরটা শেষ হবার পরও তার খাবার পর্বটা চলতেই থাকে।

খাতি বেশ বড়ো গ্রাম। এখানে আট ক্লাস অবধি স্কুল আছে। চাষের খেতও আছে অনেকখানি। সেখানে গম রামদানা আলু আর নানা রকম সবজির চাষ হয়। গরু ভেড়া ছাগল প্রায় প্রতি বাড়িতেই পালন করা হয়। ইদানীং ভ্রমনকারী বেড়ে যাওয়াতে বেশ কতগুলি থাকার জায়গাও হয়েছে । গ্রামের মানুষেরা হোটেলের ব্যবসা চালিয়ে দু পয়সা আয় করছে। কেউ কেউ ড্রাইভারি শিখে গাড়ি চালাচ্ছে। লোকসংখ্যাও আশপাশের অন্যান্য গ্রামের তুলনায় খাতি গ্রামেই বেশি। পিন্ডারির পথে এটাই শেষ গ্রাম কিনা। তাই এর গুরুত্বও অনেক বেশি।

এই এলাকার চার পাঁচটা গ্রাম নিয়ে যে পঞ্চায়েত তার মূল কেন্দ্র খাতিতে। গাড়োয়াল মন্ডল বিকাশ নিগম ছাড়াও লোকনির্মান বিভাগের বাংলোও আছে। সেখানেও লোক এসে থাকতে পারে। আগে এ গ্রামে হেঁটেই আসতে হত। বছর দুই হল রাস্তা প্রায় এর গোড়ায় পৌঁছে গেছে। শেষের কিলোমিটার চারেক এখন হেঁটে গ্রামের ভেতর ঢুকতে হয়। গতবছর থেকে বৈদ্যুতিক খুঁটি পোঁতার কাজও আরম্ভ হয়েছে তবে প্রথাগত বিদ্যুৎ সেখানে কবে পৌঁছবে তা বলা মুশকিল। আপাতত সৌরবিদ্যুতেই কাজ চলছে। গম ভাঙানোর কাজে কিন্তু পিন্ডারির খরস্রোতই ভরসা। জল এসে একটা পাথরের চাকা ঘোরাচ্ছে আর সেখানেই গম পেষাই। তার পাশ দিয়ে রাস্তা উঠে গেছে গ্রামের অন্যপাশে। সে পথে একটু এগোলে গ্রামের মন্দিরে ওঠার লম্বা সিঁড়ি। সিঁড়ি ভেঙে উঠে এলে গ্রামের একেবারে মধ্যিখানে। মন্দিরের ঘন্টা বাজিয়ে পেন্নাম ঠুকে বাঁ হাতে খানিক গেলেই লোক নির্মান বিভাগের বাংলো আর তার গা লাগোয়া চায়ের দোকান।

জলবিভাজিকা কাকে বলে জানো নিশ্চই। দুটি উপত্যকার মাঝের পাহাড়শ্রেণী। এপাশের জল বৃষ্টি এপাশে ওপাশের জল বৃষ্টি ওপাশে। ওই যে বললাম সুন্দরডুংগা আর পিন্ডারি এসে গ্রামের পায়ের কাছে এসে মিলেছে। তো খাতিগ্রামের ওপর থেকে এই দুই উপত্যকার জলবিভাজিকার পাহাড় চমৎকার দেখা যায়। যেন মনে হবে ভুগোল বই থেকে আঁকা ছবিটাই এনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। দূরের পাহাড়গুলো পরপর ছায়া ছায়া হয়ে

জলবিভাজিকা- বাঁয়ে সুন্দরডুংগা, ডাইনে পিন্ডারি

কুয়াশার মতো মিলিয়ে গেছে। সুন্দরডুংগা নদী বরাবর আরো ওপাশে তাকালে মাইকতোলি পাহাড় দেখা যাবে। অবশ্য আকাশ পরিষ্কার থাকলে তবেই। মাইকতোলি বেশ উঁচু শৃঙ্গ। আট হাজারি না হলেও সাত হাজারির দলে পড়ে সে। আর তাতে চড়া মোটেও সহজ কার্য নয়। বেশ শক্তপোক্ত কাজ সেটা। পর্বতারোহী মাত্রেই জানেন সেটা।

এই খাতিতে ঢোকার মুখে একবার এক কান্ড হয়েছিল। সেবারে ফিরছিলাম পিন্ডারির দিক থেকে। দিব্যি সুন্দর পথ। একটু আধটু ঝিরি ঝিরি যা বৃষ্টি বাদল হচ্ছে তা ধর্তব্যের মধ্যে না আনলেই হয়। খুশি মনে রাস্তা চলছি। খুব যে চড়াই উৎরাই তাও নয়। বেশ খানিকটা পথ বাকি তখনও। ডান পাশের পাহাড় বেয়ে এসে রাস্তার ওপর দিয়ে এক চিলতে ধারা বয়ে চলেছে। বড় করে পা ফেললেই তাকে ডিঙিয়ে যাওয়া যায়।

কেন জানিনা ধারাটার কাছাকাছি আসার পর, ফুট পাঁচেক দূর তখন, দেখি কি, ডানপাশ থেকে একটা নুড়ি জলের সাথে গড়িয়ে পড়ল। মন কু গেয়েছিল কিনা আজকে আর মনে নেই। থমকে দাঁড়ালাম কয়েক সেকেন্ড। আর অমনি ওপর থেকে একখানা একতলা বাড়ির সমান পাথর রাশি রাশি ছোটো পাথর কাদাগোলা জল, মাটি বালি সমেত হুড়মুড় করে এসে পথের প্রায় সাত আট ফুট সমেত বাঁদিকের ঢালে নেমে গাছগাছালির ভিড়ে ফুট দশেক নেমে স্থির হল। হঠাৎ অমন দাঁড়িয়ে না পড়লে ওই স্তূপের নিচে আমাদেরও ঠাঁই হত বলাই বাহুল্য। মিনিট দশেক অপেক্ষা করে অতি সন্তর্পণে আমরা ওই ধসা জায়গাটা পেরোলাম। খাতি বাংলোতে পৌঁছতে এর পর আরও ঘন্টাখানেক লেগেছিল। আর পৌঁছনোর মিনিটখানেকের মধ্যে প্রবল তোড়ে বৃষ্টি নেমেছিল। সাত আট ঘন্টা সেই বৃষ্টির জেরে আমাদের পেরিয়ে আসা গ্রামে ঢোকার রাস্তার প্রায় আধকিলোমিটার সম্পূর্ণ পিন্ডারিতে নেমে গিয়েছিল। আজও গেলে পরিষ্কার দেখা যাবে কেউ যেন কেক কাটার মতো করে মসৃণভাবে পাহাড়ের একপাশ কেটে নিয়েছে অর্ধচন্দ্রাকারে। সোজা দুশো ফুট নীচে নদীর কূল অবধি। পিন্ডারি এখানে যথেষ্ট খরস্রোতা।

নায়কদাদা এই সেদিন বলছিলেন, "প্রকৃতপক্ষে অ্যাডভেঞ্চার করা যায় না, অ্যাডভেঞ্চার হঠাৎই অভিযাত্রীর সামনে এসে দাঁড়ায়।" এমনভাবেই হয়ত।

ফটোগ্রাফিঃ তমালিকা কুন্ডু

জোসেফ শেরিডান লে ফানু
অনুবাদঃ মহাশ্বেতা

শেষ পর্ব

তার গলার অভাবিক উত্তেজিত স্বরে তারা বিচলিত হয়ে গিয়ে তারা সঙ্গে সঙ্গে তাকে কিছু পানীয় দিল। হাতে পাওয়া মাত্র সে পাগলের মত ঢকঢক করে খেয়ে ফেলল নিমেষের মধ্যে। শেষ হওয়া মাত্র সে আবার চেঁচিয়ে উঠলল,

“খাবার দাও কিছু, খাবার চাই। হায় ভগবান, কিছু একটা খেতে দাও আমায় তোমরা! নয়তো আমি মারা পড়ব!”

টেবিলে তখনও তাদের নৈশভোজের অনেকটা পড়েছিল। শলকেন দৌড়ে গিয়ে তার কিছুটা তুলে আনতে গেল। কিন্তু তার কিছু করার আগেই রোজ উঠে এসে খাবারগুলোর ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে দুর্ভিক্ষপীড়িতের মত খেতে লাগল। তার ক্ষিদে কিছুটা মিটলে সে অঝোরে কান্না শুরু করল। সে কান্না লজ্জার না অন্য কিছুর সেটা বোঝা গেল না।

‘‘গির্জার কোন পাদ্রিকে ডেকে আনো, এক্ষুণি! যতক্ষণ সে না আ্সে আমার বিপদ কাটবে না। তাড়াতাড়ি ডেকে আনো!”

জেরার্ড ডাউ সঙ্গে সঙ্গে একজন বেয়ারাকে পাঠিয়ে দিল পাদ্রির খোঁজে। তারপর সে ভাইঝীকে তার ঘরে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিল। বলল সে অনেক দূর থেকে এসেছে, এবার একটু বিশ্রাম করুক। কিন্তু রোজ নারাজ, সে কিছুতেই যেতে চাইল না। অবশেষে তার অনুমতি পাওয়া গেল এই শর্তে যে তাকে আমরা কোনমতেই একা ছেঁড়ে যেতে পারব না। সর্বক্ষণ অন্তত একজনকে তার সাথে থাকতেই হবে।

“উফ! পাদ্রি এলে আমি বেঁচে যাবো। জীবিত ও মৃতের এক হওয়া কখনই উচিৎ নয়। স্বয়ং ভগবানের এতে নিষেধ আছে।“

এইটুকু বলেই সে তার শরীর ছেড়ে দিল। ডাউ ও শলকেন তাকে কোনমতে ধরে ধরে তাকে ঘরে নিয়ে যেতে তৈরি হল। সে ক্ষণে ক্ষণে কেঁদে উঠছিল। তারপর একসময় সে আবার

বলল "কাকাবাবু, আমায় ছেড়ে যেও না তোমরা। এক মুহূর্তের জন্যও নয়। যদি যাও তাহলে চিরটাকালের মত আমায় হারিয়ে ফেলবে।"

জেরার্ড ডাউয়ের ঘরে ঢোকার ঠিক আগে একটা বেশ বড়সড় ঘরে গিয়ে ঢুকল তারা। শলকেন ও ডাউ দু'জনের হাতেই একটা করে মোমবাতি ছিল, অতএব ঘরের চারিদিক অল্প হলেও আলোকিত হয়ে উঠেছিল। এই বড় ঘরটাতে ঢুকেই রোজ হঠাৎ থেমে গেল আর ফিসফিস করে যা বলল তাতে তারা ভয়ে কাঠ হয়ে গেল—

"ভগবান! সে চলে এসেছে! সে এখানেই আছে! ওই তো! ওই তো দেখো ওই তো দাঁড়িয়ে আছে!"

এই বলে সে ভিতরের ঘরের দিকে আঙুল তুলে দেখাল। শলকেনের মনে হল যে সে একটা ছায়ামূর্তিকে সেই ঘরের মধ্যে ভেসে ভেসে ঢুকতে দেখল। কোমর থেকে তলোয়ারটা টেনে হাতে তুলে নিয়ে, আর ঘরটাকে আরও বেশি আলোকিত করবার জন্য মোমবাতিটা উঁচিয়ে সে সেই ঘরটাতে ঢুকে পড়ল। কিন্তু কোথাও কিচ্ছু নেই। ঘরটা একেবারেই ফাঁকা। অথচ সে প্রায় স্পষ্টভাবেই ঘরে কাউকে একটা ঢুকতে দেখেছিল। হঠাৎ ভয় ও উৎকন্ঠার একটা স্রোত বয়ে গেল তার শরীর জুড়ে। সে ঘামতে লাগল। ঠিক তখনি রোজের গলা শুনতে পেল সে। অত্যন্ত আতঙ্কিত ও ব্যাথিত স্বরে সে তাদের তাকে না ছেড়ে যেতে অনুরোধ করছিল। আর শান্ত থাকতে পারল না শলকেন।

"আমি দেখেছি ওকে," রোজ বলছিল, "ও এইখানেই আছে। আমাকে ও বোকা বানাতে পারবে না। আমি ওকে চিনি। আমার কাছাকাছিই আছে, আমার সাথেই আছে, এই ঘরের মধ্যেই আছে। ভগবানের দিব্যি, আমাকে এই বিপদের হাত থেকে বাঁচাতে চাইলে আমায় এক নিমেষের জন্যও একা ছেড়ে যেও না।"

শেষমেষ তারা দুজন মিলে রোজকে বিছানায় শুতে রাজি করল। কিন্তু শুয়ে থেকেও সে তাদের দুজনকে প্রাণপণে সেখানে তার সাথে থাকতে অনুরোধ করল। মাঝে মাঝে অদ্ভুত, দুর্বোধ্য কিছু কথাও বলছিল সে – "জীবিত ও মৃত কখনও এক হতে পারে না। ভগবানের বারণ আছে এতে।" তারপর, "যে জেগে আছে, তাকে ঘুম পাড়িয়ে দাও, স্বপ্নচরকে ঘুম দাও।"

পাদ্রি আসা অবধি সে এইরকম রহস্যময়, বিচ্ছিন্ন কথা বলতেই থাকল। জেরার্ড ডাউ আশঙ্কা করছিলেন যে কোন এক সাংঘাতিক মানসিক আঘাতে মেয়েটার বুদ্ধি লোপ পেতে বসেছে। তার এত রাত্রে আসা, পোশাক আশাকের এই দুরবস্থা, পাগলের মত আচরণ দেখে ডাউয়ের মনে হচ্ছিল সে পাগলাগারদ বা সেরকম কোন জায়গা থেকে পালিয়ে এসেছে, আর ভয় পাচ্ছিল তাকে ধরবার জন্য কেউ না কেউ উপস্থিত হবে। সে ঠিক করল পাদ্রির কথাবার্তায় ভাইঝির মাথাটা একটু ঠিক হলেই সে ডাক্তার ডেকে আনবে। আর তা হওয়া অবধি সে তাকে আর কোন প্রশ্নই করতে সাহস পেল না পাছে কোন বেদনাদায়ক স্মৃতি মনে পড়ে গিয়ে সে আরও ভেঙে পড়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পাদ্রি চলে এল। বেশ বয়স্ক এক ভদ্রলোক, মুখে ঈশ্বরভক্তির ছাপ। ডাউ এঁকে খুবই সম্মান করতেন। তিনি ছিলেন এক নাম করা তার্কিক, কিন্তু মানুষ হিসেবে ভালবাসার থেকে তর্কের প্রতিপক্ষ হিসেবে ভয়টাই অন্য লোকের তরফ থেকে তার ভাগ্যে বেশি

পড়ত। তাঁর নীতিবোধ পবিত্র, মস্তিষ্ক তুখোড়, ও হৃদয়টি বরফের মতই ঠান্ডা। তিনি দরজা দিয়ে বাইরের ঘরে ঢুকলেন। ঢোকামাত্র রোজ তাঁকে তার জন্য প্রার্থনা করতে অনুরোধ করল।

এর পরে যে ঘটনাটা ঘটল, সেটাকে বোধগম্য করতে হলে সেই স্থানে প্রত্যেক ব্যক্তির আপাত অবস্থান আমাকে বিশদে বোঝাতে হবে। বৃদ্ধ পাদ্রি ও শলকেন ছিল বাইরের ঘরে, রোজ শুয়েছিল ভিতরের ঘরে, তার দরজা খোলা ছিল। তার খাটের ধারে তার অনুরোধে দাঁড়িয়েছিল তার কাকা। শোবার ঘরটাতে একটা মোমবাতি জ্বলছিল। এবার পাদ্রি গলা খাঁকারি দিয়ে তার প্রার্থনা শুরু করার তোড়জোড় করতে লাগলেন। ওমনি হাওয়ার একটা অপ্রত্যাশিত ঝাপটায় রোজের ঘরে জ্বলতে থাকা মোমবাতিটিকে নিভিয়ে দিল। সে তখন ভয়ার্ত গলায় বলে উঠল,

"গডফ্রে, আরেকটা মোমবাতি নিয়ে এস। এই অন্ধকারটা মোটেই ভাল নয়!"

জেরার্ড ডাউ তখন হঠাৎ রোজের বারংবার অনুরোধটা ভুলে গিয়ে অনেকটা ঝোঁকের বশেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন মোমবাতি আনবার জন্য।

"হায় ভগবান, কাকাবাবু যেও না! আমায় ছেড়ে যেও না!" সে চেঁচিয়ে উঠল। আর একই সঙ্গে সে খাট থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল আর তার পিছনে ধেয়ে এল তার হাত ধরে তাকে রুখবার জন্য। কিন্তু একটু দেরিই বোধহয় হয়ে গেছিল। সে ঘরের চৌকাঠ পেরোনো মাত্রই, ঘরের দরজাটা ধরাম করে বন্ধ হয়ে গেল। শলকেন তক্ষুণি দৌড়ে দরজার কাছে গিয়ে ঠেলতে লাগল। ডাউও তার বিস্ময় কাটিয়ে হাত লাগাল, কিন্তু দু'জন সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও দরজাটাকে এক চুলও সরাতে পারল না। চিৎকারের পর চিৎকার ভেসে আসতে লাগল দরজার ওপাশ থেকে। ভয়ঙ্কর আতঙ্ক, ত্রাসের চিৎকার। শলকেন ও ডাউ ঠেলতেই লাগল, কিন্তু কিছুতেই কিছু আর হল না। ভিতর থেকে লড়াই বা হাতাহাতির কোন আওয়াজ আসছিল না, শুধু রোজের ভয়ার্ত চিৎকার যেগুলো ক্রমে আরও জোরালো হয়ে উঠছিল। সেইসঙ্গেই তারা শুনতে পেল ভারি জানালার ছিটিকিনি খোলার আওয়াজ, তারপর জানলাটার ঘষে ঘষে খুলে যাওয়ার শব্দ। তারপর শেষ একটা চিৎকার, ব্যথায় পরিপুর্ণ একটা চিৎকার, আগেরগুলোর থেকে অনেক বেশিক্ষণ ধরে চলল সেটা। কোন মানুষ যে ওইরকম চিৎকার করতে সক্ষম তা ওটা না শুনলে হয়তো বিশ্বাসই হত না তাদের। তারপরেই একটা মৃত্যুর মত নিস্তব্ধতা নেমে এল গোটা ঘরে। খাটের ওপর থেকে জানালার দিকে চলে যাওয়া হাল্কা দুটো পায়ের আওয়াজ শোনা গেল, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজাটা খুলে গেল। অন্যদিক থেকে যারা চাপ দিয়ে যাচ্ছিল, তারা প্রায় মাটিতেই পড়ে গেল হুড়মুড়িয়ে। জানালাটা হাট করে খোলা ছিল, শলকেন লাফিয়ে উঠে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল নিচের রাস্তা ও খালের দিকে। একটা কেউ ছিল না সেখানে। শুধু তার মনে হল সে দেখল খালের জলে একের পর এক বিশাল গোলাকৃতি এলাকা জুড়ে ঢেউ উঠে যাচ্ছে। যেন সেখানে খানিকক্ষণ আগেই ভারি কিছু একটা পড়েছে।

রোজকে আর কখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। আর তার সেই রহস্যময় স্বামীরও কোন খবর পাওয়া যায়নি। এই জটিল রহস্যের জালের ওপর আলোকপাত করার মত কোন সন্ধানই আর কেউ পায়নি। কিন্তু একটা ঘটনা ঘটেছিল, যা হয়তো যৌক্তিক ভাবে বিশ্বাস করা যায় না, কিন্তু তা শলকেনের ওপর একটা দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছিল। এইসব ঘটনার অনেকদিন পরে শলকেন একবার রটারড্যামের গেছিল। তখন সে অনেক দূরে থাকত। কিছুদিন আগেই তার বাবা মারা গেছিলেন আর রটারড্যামের গির্জাতেই তাঁকে সমাধিস্ত করা হবে, এমন কথা হয়েছিল। গ্রাম

থেকে গির্জায় যাওয়ার জন্য সমাধিযাত্রীদের বেশ অনেকটা রাস্তাই হাঁটতে হয়েছিল, আর খুব বেশি লোকও আসেনি। শলকেন দুপুরের দিকে এসে গির্জায় বসে তাঁদের অপেক্ষা করছিল।

আস্তে আস্তে সন্ধে হয়ে এল কিন্তু সমাধিযাত্রীদের তখনও কোনও সন্ধান নেই।শলকেন হাঁটতে হাঁটতে গির্জার ভিতরে ঢুকে গেল। সমাধিযাত্রাটির বিজ্ঞপ্তি আগে থেকেই দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যে সমাধিকক্ষে দেহটা রাখবার কথা সেটাও খুলে রাখা হয়েছিল। গির্জার তত্ত্বাবধায়ক ভদ্রলোক তাকে সেখানে ঘোরাঘুরি করতে দেখে তাকে তাঁর সঙ্গে চা পান করবার আমন্ত্রণ জানালেন। সেটা শীতকাল। প্রতিবছরের মত সে বছরও তিনি ফায়ারপ্লেসে একটা বড়সড় আগুন জ্বালিয়ে বসেছিলেন। ঘরের অন্য দিকে একটা সিঁড়ি, সেটা দিয়েই সমাধিকক্ষে যেতে হয়। শলকেন ও তত্ত্বাবধায়ক ভদ্রলোক আগুনের ধারে বসল। তাঁর সাথে কথা বলবার বেশ কয়েকটা ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর, শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে নিজের পাইপটা জ্বালিয়ে ফুঁকতে লাগল।

অনেক দুঃখ, দুশ্চিন্তা ও ভাবনা সত্ত্বেও শলকেন আগুনের ধারে বসে সে আস্তে আস্তে ঘুমে ঢলে পড়েছিল। তার ঘুম ভাঙল ঘাড়ে একটা হালকা ঠেলা খেয়ে। প্রথমে সে মনে করল গির্জার তত্ত্বাবধায়ক ভদ্রলোকই তাকে ডেকে তুলছেন। কিন্তু এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল ভদ্রলোক আর ঘরে নেই। সে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল। তারপর চোখ কচলে তাকাতে দেখে একটা মেয়ের অস্পষ্ট মূর্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে। গায়ে সাদা রঙের একটা পোশাক। তার কিছুটা তার মুখের সামনে ঘোমটার মত ঝুলছে। তার হাতে একটা জ্বলন্ত লম্ফ। সে তার থেকে আস্তে আস্তে দূরে চলে জ্বাচ্ছিল, ঘরের কোণে সেই সিঁড়িগুলোর দিকে।

শলকেনের একটু ভয় ভয় লাগল মেয়েটিকে দেখে, কিন্তু তাকে অনুসরণ করবার একটা অদম্য ইচ্ছাও তার হতে লাগল একই সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত সে তার পিছু পিছু যেতে লাগল। কিন্তু কিছুটা নেমে যাওয়ার পর মেয়েটি হঠাৎ থেমে গেল। শলকেনও সিড়িগুলোর মাথায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। মেয়েটা তার লম্ফটা মুখের কাছে এনে শলকেনের দিকে ঘুড়ে দাঁড়ালো। লম্ফের আলোয় শলকেন লক্ষ্য করল যে মেয়েটার মুখটা অবিকল তার প্রথম ভালবাসা, রোজ ভেন্ডারকস্টের মত। সেই মুখে কোন ভয়ের বা দুঃখের ছাপ ছিল না। তার বদলে তার মুখে ছিল সেই প্রাণখোলা হাসিটা যা অল্পবয়সে শলকেনের প্রাণ জয় করে নিয়েছিল। বিস্ময় ও কৌতুহলের এক অদ্ভুত মিশ্রণ তাকে মেয়েটার সেই ছায়ামূর্তির পিছন পিছন নিয়ে চলল। সে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল, শলকেন তাকে অনুসরণ করল। তারপর বাঁদিকে ঘুরে গিয়ে, একটা সরু গলিমত দিয়ে কিছুটা হেঁটে গিয়ে তারা যেখানে পৌঁছুলো, সেখানে ঢুকে শলকেন অবাক হয়ে গেল। একটা সেকেলে ডাচ শোওয়ার ঘর। ঠিক যেমনটার ছবি জেরার্ড ডাউ এক সময় এঁকে বিখ্যাত হয়েছিল। চারিদিকে অনেক দামি দামি অ্যান্টিক আসবাবপত্র ছড়ান। ঘরের এককোণে একটা বিশাল পালংক, তার চারিদিকে মোটা ভারী কালো কাপড়ের পর্দা ঝুলছে।

এই সময় মূর্তিটি বারংবার তারদিকে ফিরে তাকাতে লাগল আর আস্তে আস্তে পালঙ্কটার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। বিছানার একদম কাছে গিয়ে সে পর্দাগুলো টেনে সরিয়ে দিল, আর তার লম্ফের আলোয় আতঙ্কিত শলকেন দেখল, বিছানায় সোজা হয়ে বসে আছে ভ্যান্ডারহাউজেনের সেই ভয়ঙ্কর মূর্তি! তার মুখের ভাবে ভয়ঙ্কর এক ক্রোধ প্রকাশ পাচ্ছিল। তাকে দেখা মাত্রই শলকেন অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। আর সেখানেই সে পড়ে রইল পরদিন সকাল অবধি। কিছু লোক সমাধিকক্ষের দরজা বন্ধ করতে এসে তাকে খুঁজে পেল সেই

অবস্থায়। সে একটা বেশ বড়সড় কক্ষে পড়ে ছিল যেখানে তার আগে বেশ অনেককাল কেউ পদার্পণই করেনি। তার পাশেই ছিল কয়েকটা পিলারের ওপর দাঁড় করানো একটা বিরাট কফিন। পোকা-মাকড়ের আক্রমণ থেকে বাঁচাতেই এমন ব্যবস্থা।

বুড়োবয়সে মৃত্যু অবধি সেইরাত্রে সে যা দেখেছিল তা বিশ্বাস করে গেছিল শলকেন। আর সেই ঘটনা তার ওপরে যেরকম প্রভাব বিস্তার করেছিল তার একটা চিহ্ন হিসেবে রেখে গেছিল স্মৃতি থেকে আঁকা একটা ছবি। সেই দৃশ্যটা দেখার কিছুদিন পরই সে সেই ছবিখানি এঁকেছিল। ছবিটাতে শলকেনের সেইসব বিশেষত্বগুলো সবই ছিল যেগুলো পরে তার ছবি এত বিখ্যাত করে তোলে। কিন্তু তার সাথে আরেকটা বস্তুও ছিল যার জন্য সেই ছবিটিকে আমি আরও মূল্যবান গণ্য করি। ছবিটিতে ছিল সেই রোজ ভেল্ডারকস্ট, রহস্যময় ভাবে উধাও হয়ে যাওয়ার পর যাকে আর কখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি।

ছবিঃ মৌসুমী

দেশবিদেশের ভূত

সংহিতা

নিশি মাঝরাতে ডাকে। ডাকে প্রিয়জনের গলার স্বর নকল করে। তবে একসাথে মাত্র দুবার। তাই প্রিয়বন্ধু কিংবা মা, বাবা, ভাইবোনের গলায় মাঝ রাতে কেউ ডাকলে গুণতে হয় তিনবার ডাক পড়লো কিনা। নিশি হলে একসাথে দুবারের বেশি ডাকতে পারে না। তাই তিনবার ডাক শোনা গেলে নিশ্চিত যে যেই ডাকুক সে নিশি নয়। ডেকে নিয়ে গিয়ে নিশি আসলে মেরে ফেলে। নিশির হাতে মরা মানুষও নিশিই হয়। আবার মানুষ মারার জন্য কোনো কোনো তান্ত্রিক নাকি নিশি বশে রাখে। কারো মতে নিশি ডাকে ঘোর অমাবস্যায়। আবার কারো মতে কৃষ্ণপক্ষের যে কোনো ঘুটঘুটে অন্ধকার রাতে।

রোমের লেমুরে ভয়ঙ্করও বটে, ভীতুও বটে। যে সমস্ত মানুষকে নাকি বিধি সম্মত প্রক্রিয়ায় গোর দেওয়া হয় না, তারাই লেমুরে পরিণত হয়। যে সব মানুষের কবরে সমাধি মন্দির তৈরি করা হয় না বা তার সম্পর্কে ভালো ভালো কথা খোদাই করা পাথরের খন্ড কবরের পাশে রাখা থাকে না তারাও নাকি লেমুরে হয়ে থাকে। মৃত্যুর পরের প্রাপ্য আদর না পেয়ে নাকি এরা প্রতিহিংসাপরায়ণ হয় ওঠে। লেমুরে না মানুষ না মৃত মানুষ। এরা মাঝামাঝি অতৃপ্ত আত্মা। প্রজাতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী রোমে মে মাসের ৯, ১১, আর ১৩ তারিখে এদের পুজো করা হত এদের রাগ কমানোর চেষ্টায়। এইসব দিনে গৃহকর্তা মাঝরাতে জেগে উঠে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে পিছন দিকে কালো বিন ছুঁড়তেন। তাই খেয়ে এরা তুষ্ট হতো। ব্রোঞ্জের বাসন ঠুকে ঠুকে শব্দ করে এরা গোষ্ঠীপতির বিচারের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রতিবাদ জানাতো।

ভূতুরে বাড়ি

পিকলু

পার্ক স্ট্রিট থেকে মল্লিক বাজারের দিকে এগোলেই চোখে পড়ে দক্ষিণ পার্ক স্ট্রিট কবরখানা। শ্যেওলা পড়া, গাছা গাছালিতে ঢাকা ভিনদেশী কবরগুলো সময়ের সাথে সাথে মিলিয়ে গেছে ইতিহাসের পাতায়।

একেতেই সেকালে মানুষের আয়ু বেশি হত না। তার উপর বিদেশি আবহাওয়া, যুদ্ধ, মহামারি এসবের প্রকোপে ইংরেজদের কবর দেওয়ার জায়গার অভাব পড়ে। এইজন্যই সতেরশো সাতষট্টি সালে তৈরি করা হয় এই কবরখানাটিকে।

আজ যা পার্ক স্ট্রিট তখন তার নাম ছিল বেরিইং গ্রাউন্ড রোড বা বাংলায় বললে, কবরখানা রোড। নামেই বোঝা যায় হয়তো সে সময় কী হারে মানুষ মারা গেছিলেন। এই কবরখানা উইলিয়াম জোন্স ,ডিরোজিও , জর্জ বগল এবং আরো অনেক বিখ্যাত ইংরেজদের সমাধিস্থল ।

শেওলায় ঢাকা এই কবরখানা বর্তমানে ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক স্ররবেক্ষন বা আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার এর তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত। কবরখানার দরজা রোজ সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত সাধারণ মানুষের জন্য খোলা থাকে। কবরখানার স্থাপত্য সময়ের সঙ্গে শ্যাওলা জমে আর রঙ চটে এক অদ্ভুত সুন্দর রূপ নিয়েছে। ভিতরে ঢুকলে মনে হয় যেন শহরের বুকের মধ্যে থেকেও শহর থেকে অনেক দূরে নির্জন কোথাও এসে পড়া হয়েছে, যেখানে হয়তো বা আসা বারণ, হয়তো বারণ সেইখানকার একাকিত্বে বাধা দেওয়া। প্রচুর মানুষ প্রায় প্রতিদিনই এখানে আসেন ছবি তুলতে, আড্ডা মারতে বা নেহাতই নির্জনে সময় কাটাতে। কবরখানার প্রচুর ছবি

ইন্টারনেট ঘাঁটলেই পাওয়া যাবে। কিন্তু যা শুধু অনুভব করা যায়, দেখা যায় না। যা চোখের পলক ফেলতেই হারিয়ে যায় অন্ধকারে তাকে ক্যামেরায় বন্দি করলে সমস্যা হতে পারে।

দুহাজার সাত সালে কয়েকজন ছাত্রছাত্রী সেমিটেরিতে আড্ডা দিচ্ছিলেন। তখন তারা বেশ কিছু ছবিও তোলেন। ছবিগুলো প্রিন্ট হয়ে আসলে বেশ কটা ছবিতেই কিছু কালো ছায়া দেখতে পাওয়া যায়। ছবির রিল আবার ওয়াশ করালেও সেই ছায়া থেকে গিয়েছিল। একবার সেমিটেরিথেকে বেরোবার পরই আমার এক পরিচিত রাস্তার মাঝখানে বমি করতে শুরু করে। সুস্থ সবল ছেলেটা হঠাৎ বমি করতে শুরু করলে জিজ্ঞাসা করে জানা যায় তার নাকি হঠাৎই মনে হয়েছিল তার স্পাইনাল কর্ডে কেউ আঁচড় কাটছে।

এরকম বমির ঘটনা আরো অনেকের সাথে হয়েছে আগে। একজন তাঁর নিজস্ব ব্লগে লিখেছেন, “আমি ছবি তুলে বেরোবার পর থেকেই আমার হঠাৎ করে হাঁপ উঠে গেল , কিছু বুঝলাম না কেন। আমার তো হাঁপানিও নেই।”

এখানকার প্রহরীরা অবশ্য এই ব্যাপারটাকে সম্পূর্ণ আষাঢ়ে গল্প বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। অনেকেই অপার্থিব কিছু দেখার আশা নিয়ে এসে ফিরে গেছেন খালি হাতে। তবু এটা মনে রাখতেই হবে, সবার পঞ্চেন্দ্রিয় সমান হয় না। আর এইসব অনুভূতি দেখে বোঝা সম্ভবও হয়না হয়তো। সেমিটেরিতে ঢোকার পরথেকেই গা ছমছম করাটাও স্বাভাবিক। কবরের নীচের মানুষগুলোর মতই এই কবরখানাও মৃত যে। তার আত্মাটাও তো শান্তি পায়নি।

আকাশের ডাক

(ঘোড়ার ডাক আর আকাশের ডাক এই দুইই কিন্তু সবার আগে ভারতবর্ষে শোনা গিয়েছল। প্রথমটা করেছিলেন শের শা। আর দ্বিতীয়টা?)

ডাকব্যবস্থা কবে চালু হয়েছিল বলা মুশকিল। তবে সেই আদিকাল থেকেই ডাক বা চিঠি আদান প্রদান চলত। কখনও বিশেষ দূতের মাধ্যমে, কখনো পায়রার মাধ্যমে, কখনো ঘোড়ায় টানা গাড়িতে, ট্রেনে, মোটর গাড়িতে, প্লেনে ... । একটা খাম বা পোস্টকার্ড নিয়ে যেত কত অনুভূতি , এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়। নিয়ে যেত টাকা। পোস্টম্যান পৌঁছে দিত কত জিনিসপত্র। বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থাটাই বদলে গেছে পুরোপুরি। এখন খুব কম মানুষ কাগজে চিঠি লিখে সেই চিঠি ডাকে পাঠায়। প্রায় পুরো ডাক বিভাগের দুনিয়াটাই বদলে গিয়ে ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। কারো চিঠির অপেক্ষা করার দরকার নেই, ই- মেল করো, এক মুহূর্তে লেখা পৌঁছে যাবে প্রাপকের কাছে। পুজোর শুভেচ্ছা, নববর্ষের শুভেচ্ছা – গ্রিটিংস কার্ড এখন আর কেউ প্রায় ডাকে পাঠায় না, মোবাইল ফোন থেকে একটা ছোট এসএমএস যথেষ্ট। বর্তমান ইলেক্ট্রনিক মেইলের আগে দ্রুততম চিঠি পাঠানো যেত ফ্যাক্স করে। তার আগে দ্রুততম লিখিত বার্তা পাঠানো যেত টেলিগ্রাম করে। এছাড়া দ্রুততম উপায়ে চিঠি পাঠাবার জন্যে একটা সময় চালু হয়েছিল এয়ারমেল। প্রথমে বেলুন করে চিঠি পৌঁছোবার ব্যবস্থা হয়েছিল, তারপর চালু হল উড়োজাহাজ মেইল। সেই উড়োজাহাজ মেইল চালুর প্রথম দিককার কিছু রোমহর্ষক ঘটনার কথা শুনিয়েছেন **অরিন্দম দেবনাথ।**

১৭ আগস্ট ১৮৫৯ তারিখে অভিজ্ঞ বেলুনবাজ জন ওয়াইস তাঁর বেলুন জুপিটারে করে আমেরিকার লাফাইতি থেকে

ক্রফরদসভিল পর্যন্ত - ৩০ কিলোমিটার দুরত্বে ১২৩ টা চিঠি আর ২৩টা সার্কুলার নিয়ে উড়ে গিয়ে সূচনা করেছিলেন এয়ারমেল পরিষেবার। শুরু হয়েছিল এক নতুন যুগের।

১৯০৩ সালের ১৭ই ডিসেম্বর দুই রাইট ভাই অরভিল্ ও উইলবার আকাশে যান্ত্রিক যান এরোপ্লেন ওড়ালেন। মাত্র ১২ সেকেন্ড স্থায়ী ১২০ ফুট দূরত্ব আকাশ পথে পাড়ি জমানো এই দুরন্ত আবিষ্কার বদলে দিল দুনিয়াটা। আকাশে উড়তে শুরু করল কলের পাখি। বিপ্লব এল যোগাযোগ ব্যবস্থায়। মাটিতে কলের গাড়ি আর আকাশে কলের পাখি , দুনিয়াটাকে করে আনল আরও ছোট।

পাইলটরা উড়োজাহাজকে জনপ্রিয় করে তুলতে আকাশে নানা কেরামতি দেখাতে শুরু করলেন বিশ্ব জুড়ে। শুরু করার চেষ্টা করলেন নানা পরিষেবা। চিঠিপত্র আদানপ্রদানকে আরও দ্রুততর করার জন্যে উড়োজাহাজ ব্যবহারের চিন্তাভাবনা চলতে লাগল।

FIRST "AERIAL POST," ALLAHABAD, FEBRUARY 18, 1911.

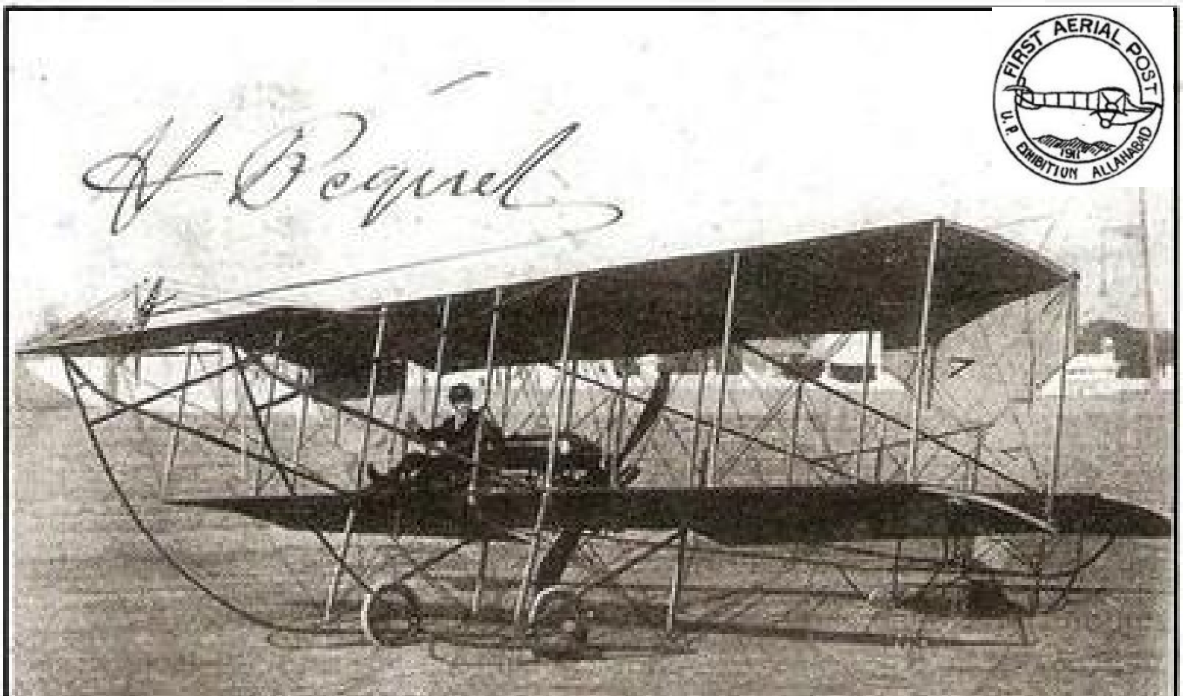

১৯১১ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি ফরাসি বৈমানিক হেনরি পেকুএত প্রায় ৬০০০ চিঠি সম্বলিত বিমান ওড়ালেন ভারতবর্ষের এলাহবাদ শহরের পোলো ময়দান থেকে। যমুনা নদীর ওপর দিয়ে একটি হাম্বার বাইপ্লেন নিয়ে হেনরি উড়ে গিয়ে নামলেন ৫ মাইল দূরের শিল্পশহর নৈনিতে। এক নতুন ইতিহাস শুরু হল।

বিশ্বের প্রথম সরকারী এয়ারমেল চালু হল এই উড়ান দিয়ে। সবকটা চিঠি বিলি হল ‘ফার্স্ট এরিয়াল পোস্ট, ১৯১১, ইউ পি এগজিবিশান এলাহাবাদ’ ছাপ মেরে।

ভারতে সাধারণ ডাকের থেকে এয়ারমেলের খরচা একটু বেশি পড়তে লাগল কারণ ডাক বিভাগ ইয়ুথ হস্টেল বিল্ডিং বানানোর সারচার্জ জুড়ে দিলেন তার সঙ্গে।

এর পর ১৯১১ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম বিমান ডাক উড়ল। আভিংটন নামে এক বৈমানিক নিউইয়র্ক এর গার্ডেন সিটি থেকে এক বিশাল চিঠির বোঝা তার ফিক্সড উইং প্লেনে চাপিয়ে উড়ে গেলেন নিকটবর্তী শহর মিনিওলাতে। মাটি থেকে ৫০০ ফুট ওপর দিয়ে উড়েছিল বিমানটা !

অদ্ভুত চরিত্র ছিল আভিংটনের। ১৮৭৯ সালে জন্ম। যখন বয়স ৯ , তখন আভিংটন একটা ১ ডলার মূল্যের ইলেকট্রিক মোটর ও একটি এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্স নামের বই উপহার পেয়েছিলেন। এই বইটি আভিংটনের প্রিয় বন্ধু ছিল। বই পড়ে পড়ে নানা ধরণের পরীক্ষা চালাতেন তিনি। আভিংটনের মাসির দরজার ঘণ্টা প্রায়শই বাজত না কারণ সে ওই ঘন্টার ব্যাটারি খুলে নিত বিজ্ঞানের নানা খেলা খেলতে। ১৬ বছর বয়েসে আভিংটন এডিসন ইলেক্ট্রিক ইলুমিনেটিং কোম্পানিতে চাকরি নিলেন বেয়ারা হিসেবে। বেতন সপ্তাহে ৩ ডলার। এখানে আভিংটন হাতেকলমে দেখলেন কি ভাবে বিদ্যুতায়নের বিপ্লব ঘটছে। ১৯০০ সালে আভিংটন ম্যাসাচুসেটস ইন্সিটিউট অফ টেকনোলজিতে ইলেকট্রিক বিভাগে ভর্তি হলেন।

আভিংটন মোটর সাইকেল ও গাড়ির কলকব্জার ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে পড়লেন। উৎসাহী হয়ে পড়লেন সদ্য আবিষ্কৃত উড়োজাহাজ নিয়ে। যা কিছু নতুন সেখানেই আভিংটন হামলে পড়তে লাগলেন। বৈমানিক হবার জন্যে ফ্রান্সের লাউ বেলেরি এভিয়েশান- এ ভর্তি হতে চাইলেন। ম্যাসাচুসেটস ইন্সিটিউট অফ টেকনোলজির ছাত্রবন্ধুরা টাকা জোগাড় করে আভিংটনকে বিমান চালনা শেখাতে পাঠালেন ফ্রান্সে। কারণ সকলেই আভিংটনকে খুব ভালবাসত। অর্থের অভাবে আভিংটন এর বিমান চালনা শেখা হবে না, এটা আভিংটনের বন্ধুদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। তার ওপর আকাশ যান ব্যাপারটাই একদম নতুন এবং চ্যালেঞ্জিং।

বন্ধুদের নিরাশ করেননি আভিংটন। ভালভাবে বিমানচালনা শিখলেন। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম ডাক নিয়ে আকাশে উড়লেন তিনি। গড়লেন এক নতুন ইতিহাস।

কাজটা সহজ ছিল না। পোস্টমাস্টার জেনারেল ফ্রাঙ্ক হিচকক অনেকদিন ধরে আকাশপথ ব্যবহার করে দ্রুত চিঠিপত্র বিলির কথা ভাবছিলেন। তবে ভাবলেই তো হল না। অনেক অনুমতি ও অর্থের দরকার। হিচকক নিউইয়র্ক এর লেফটেন্যান্ট গভর্নর ওয়ুদ্রুফ কে পাশে পেলেন। আভিংটনের কানে খবরটা যাওয়া মাত্র তিনি লেফটেন্যান্ট গভর্নরকে ধরে বসলেন। তিনি প্লেন চালাতে চান। এবং পুরো কাজটা করতে রাজি কোন অর্থ ছাড়াই।

একজন ডাকটিকিট সংগ্রাহক হিসেবে আর্ভিংটন জানতেন ডাকবহনকারী প্রথম বিমানের বিমান চালক হবার ঐতিহাসিক গুরুত্ব।

১৯১১ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর , নিউইয়র্ক এর গার্ডেন সিটিতে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল এভিয়েশান টুর্নামেন্টে ডাকবিভাগও অংশগ্রহণ করেছিল। এই দিন আর্ভিংটন ডাকবিভাগের প্রথম বিমান চালক হিসাবে শপথ নিলেন। এই পর্যন্ত ঠিক ছিল। শুধু দর্শকরা জানতেন না যে তাঁরা এইদিন একটি ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষি হতে চলেছেন। হিচকক ঘোষণা করলেন, দেশে এয়ার মেল সার্ভিস চালু করা হচ্ছে। কেউ চাইলে দেশের যে কোন প্রান্তে পোস্টকার্ড পাঠাতে পারেন, এবং এই পোস্টকার্ড পাঠানো হবে বিমানে করে, আর তাতে ‘বাই এয়ার মেল’ ছাপ লাগানো হবে। সাড়া মিলল অভূতপূর্ব। লাইন লাগিয়ে লোকে পাগলের মত পোস্টকার্ড লিখতে শুরু করলেন। জমা পড়েছিল ৪৩২৪৭ খানা পোস্টকার্ড। সাতদিন লেগেছিল চিঠিগুলো বাছাই করে ছাপ্পা মেরে প্লেনে করে পাঠাতে।

এর একশ বছর পর, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১১ সালে আমেরিকার পোস্টাল মিউজিয়াম, আর্ভিংটনের এই অভিযান কাহিনী দর্শকদের সামনে এক অনুষ্ঠানে তুলে ধরেন। ১৯৩৬ সালে, ৫৬ বছর বয়সে আর্ভিংটন মারা গিয়েছিলেন ক্যান্সার রোগে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিয়মিত এয়ার মেল চালু হয় ১৯১৮ সালে। ওয়াশিংটন, ফিলাডেলফিয়া, পেনসিলভ্যানিয়া , নিউইয়র্ক এই সব শহরের মধ্যে এয়ার মেল চালু হল।

বিমানযোগে চিঠি নিয়ে যাওয়ার কাজটা শুরুর দিকে ছিল খুব রোমহর্ষক। সেই সময় বিমানগুলো ছিল খুব পলকা। মাঝে মাঝে বিগড়ে যেত। জায়গার অভাবে অনেক সময় চিঠিপত্র কোলে নিয়ে বসতে হত। যোগাযোগব্যবস্থা ছিল না থাকার সামিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডাক বিভাগের নিজস্ব বিমানবহর ছিল। ছিল দক্ষ মিস্ত্রির দল। কিন্তু খামখেয়ালি আবহাওয়া প্রায়শই পুরো বিমান ডাক ব্যবস্থাটাকে নড়বড়ে করে দিত। বৈমানিকের দক্ষতার উপরে নির্ভর করত বিমানের ওড়া। এখন বিমান অনেকটাই যন্ত্র নির্ভর চলে, কিন্তু সে সময়কার কথাই আলাদা। ১৯১৮র ডিসেম্বরে তুষারপাত , জোরালো হাওয়া, কুয়াশা সব মিলিয়ে বিমান ডাকবিভাগের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের অবস্থাটা খুবই সঙ্গিন হয়ে উঠেছিল। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়াতে এরকম একটা পরিষেবা চালানো, তাও বিমান পরিবহনের সেই আদিকালে, খুব কঠিন ছিল।

বৈমানিকদের নিয়মিত বিমান ওড়ানো ছাড়াও বিমান চালানো অনুশীলন করতে হত রুটিন মেনে। এবং এটা করতে হত অভিজ্ঞ বৈমানিকদের অধীনে। সে যুগে প্লেন মাটি থেকে ওড়ানো ও নামানোটা ছিল কঠিন কাজ।

অনুশীলনের একটা অভিজ্ঞতা শোনা যাক। ডান দাভিসন নামের এক তরুণ বৈমানিক ডাক বিভাগে যোগ দিয়েছিলেন ১৯১৮ সালের ২ ডিসেম্বর। ১ সপ্তাহব্যাপী ট্রেনিং এর পর ৭ ডিসেম্বর অভিজ্ঞ পাইলট নিউটনকে অনুসরণ করছিলেন আর একটি বিমান নিয়ে। মাটিতে

নেমে আসার পর নিউটন দাভিসানকে অন্য একটি বিমানে করে একা উড়তে পাঠালেন। প্রায় ২৫০ লিটার তেল ভরে দাভিসান আকাশে উড়লেন একা বিকেল ৩ টে ৪০ মিনিটে। বিকেল ৪টে নাগাদ নেমে আসছিলেন ঠিক মত , কিন্তু কী যে হল, মাটিতে নামের আগে বিমানের মুখ উঁচু করে আবার উড়ে গেলেন আকাশে, হারিয়ে গেলেন দিগন্তে। ৪ টে ৫০ মিনিটে উদ্বিগ্ন নিউটন একটি ফোন পেলেন, দাভিসন অন্য প্রান্ত থেকে জানালেন স্টেটেন আইল্যান্ড এর গ্রান্ট সিটির পোলো মাঠে অবতরণ করেছেন, কিন্তু নামতে গিয়ে বিমান এর ল্যান্ডিং গিয়ার, প্রপেলার, দুটো ডানা ও রেডিয়েটার ভেঙে ফেলেছেন।

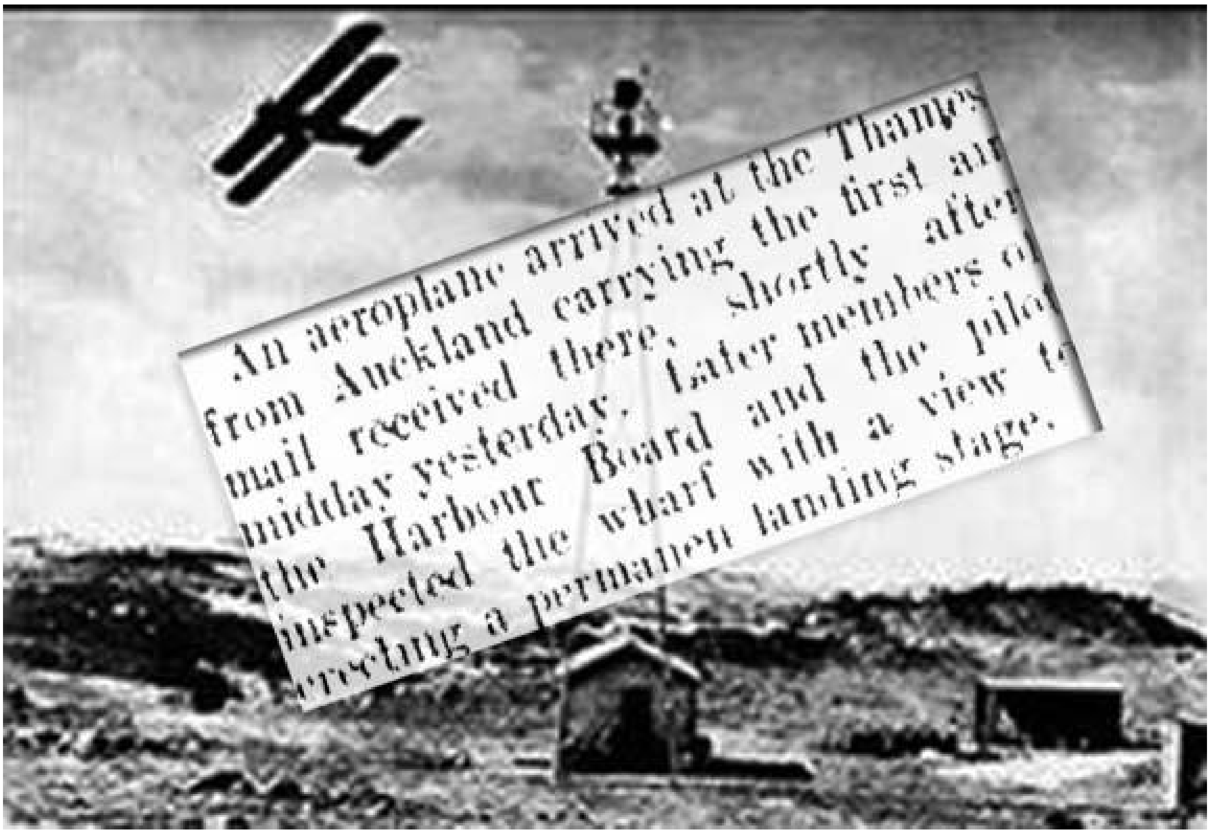

দাভিসন নির্দিষ্ট জায়গায় না নামার এক অদ্ভুত ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন নামার সময় তাঁর মনে হয়েছিলে তেল আছে তাই আরও খানিকটা ওড়া যায়। তারপর খানিকটা ওড়ার পর তাঁর মনে হল এয়ার প্রেশার কম থাকার ফলে ইঞ্জিনে বোধহয় ঠিক মত তেল আসছে না। তাই তিনি তাড়াহুড়ো করে পোলো গ্রাউন্ডে নামতে গিয়ে প্লেনটা ভেঙে ফেলেছেন। শত চেষ্টা করেও দাভিসনকে ঠিক মত ট্রেনিং দিতে ব্যর্থ হয়ে তার চাকরিটা খারিজ করে দিয়েছিলেন কর্তৃপক্ষ জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে।

১৯১৮ সালের ২ ডিসেম্বর স্মিথ নামের এক বৈমানিক ডাক বিভাগে যোগ দিয়েছিলেন। যোগ দেবার মাত্র ১৪ দিন পর ১৬ ডিসেম্বর, হাভিলান্দ এয়ারপ্লেন ডি এইচ ৪ নামের এক প্রশিক্ষণ বিমানে ওড়াকালীন এয়ারফিল্ডে আছড়ে পড়েন বিমান সহ। ইঞ্জিনেরর সাথে পিষে মারা যান স্মিথ। তখন ইঞ্জিনের প্রায় লাগোয়া থাকত চালকের বসার আসন। তারপর থাকত চিঠিপত্র রাখার জায়গা। স্মিথের মর্মান্তিক মৃত্যুর পর বিমানে কিছু রদবদল হল। ইঞ্জিন আর চালকের মাঝখানে চিঠিপত্র রাখার জায়গা পরিবর্তন করা হল, বিমানের নাম পরিবর্তিত হয়ে হল ডি এইচ ৪ বি। এই সামান্য পরিবর্তনের ফলে যেই বিমানকে বলা হত আগুন কফিন তাই হয়ে গেল বিমান ডাকের তেজি ঘোড়া।

আর এক পাইলট ডটি ১৯১৮র ৬ ডিসেম্বর যোগ দিয়েছিল ডাক বিভাগে। ডিসেম্বর ২৮ তারিখে নিউইয়র্ক শহর থেকে ফিলাডেলফিয়া যাচ্ছিলেন ডাক নিয়ে, বিমানটি ছিল ডি এইচ ৪। মাঝ আকাশে বিমানটি গণ্ডগোল শুরু করায় কাছাকাছি বেলমন্ত অবতরণক্ষেত্র নামার চেষ্টা করেন। কিন্তু নামার সময় বিমানের এক্সেল ও লেজ ভেঙে যায়। মারাত্মক ভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন ডটি। বিমানে থাকা চিঠিপত্র বের করে এনে ট্রেনযোগে পাঠানো হয় ফিলাডেলফিয়ায়। কয়েক মাস পরে সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে আবার কাজে যোগ দেন ডটি। ১৯১৯ সালের অক্টোবর মাসের এক কুয়াশা ঢাকা দিনে বিমান নিয়ে নিচু দিয়ে ওড়ার সময় একটি লম্বা গাছের মাথায় ধাক্কা খেয়ে মাটিতে আছড়ে পড়েন, আগুন লেগে বিমানের সাথে পুড়ে মারা যান তিনি।

১৯১৮ থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত প্রায় ২০০ জন বৈমানিক ছিল ডাক বিভাগের। তারপর মার্কিন ডাক বিভাগ প্রাইভেট বিমান কোম্পানিকে বিমান চালানো ও দেখভাল করার দায়িত্ব দিয়ে দেয়। ১৯১৮ থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত মার্কিন ডাক বিভাগ - বৈমানিক নিয়োগ থেকে শুরু করে, তাদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ , বিমান কেনা , তাদের রক্ষণাবেক্ষণ, বিমান চলাচলের পথনির্দেশ তৈরি করা, বিমান ওঠা নামার জায়গা তৈরি করা এই সব কাজে ব্যস্ত ছিল। সে সময় বিমান চালান খুব বিপজ্জনক ছিল। বিমানে ওঠার পর আগে কী হবে সেটা অনুমান করা খুব দুঃসাধ্য ছিল। সে সময় কিছু রসিক বৈমানিকরা এই বিপজ্জনক কাজটিকে কী রকম আনন্দে উপভোগ করতেন শোনা যাক।

১৯১৯ সালে সামুয়াল ইটন নামে এক বৈমানিক ফিলাডেলফিয়ায় নামার আগে প্রচণ্ড কুয়াশায় নিচু দিয়ে ওড়ার সময় গাছে ধাক্কা খেয়ে বিমান নিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়লেন। বিমানটি তো গেল, তিনি রিপোর্ট করলেন যে তিনি চিঠিগুলো এক 'ব্রাঞ্চ' (গাছের ডাল) অফিসে ডেলিভারি করেছেন।

১৯২৭ সালে এক বৈমানিক হেগ বারকার আচমকা খুব তুষারপাত শুরু হওয়ায় এক খোলা মাঠে নেমে পড়েছিলেন। তারপর তুষারপাত থামার পর, এক ট্রাক ড্রাইভারকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে কিছু টাকা দিয়ে প্লেনে দড়ি বেঁধে বরফে ঢাকা পড়া বিমানটিকে টেনে বের করেছিলেন বরফের তলা থেকে এবং ট্রাক ড্রাইভারকে দিয়ে ট্রাক চালিয়ে চালিয়ে বরফের মাঝে কাজ চালানো গোছের রানওয়ে বানিয়ে নিয়েছিলেন। শুধু তাই নয় তিনি দীর্ঘ লড়াই করেছিলেন ডাক বিভাগের থেকে তিনি যে অর্থ খরচ করেছিলেন সেই অর্থ ফিরে পেতে। কারণ ডাক বিভাগ হেগকে তিনি যে ভাবে কাজটা করিয়েছেলেন সেটা প্রথমে অনুমোদন করেন নি।

বৈমানিক ফ্রাঙ্ক ইয়াগের ঘন কুয়াশাতে উড়তে না পেরে রেগে গিয়ে, প্রায় ৩৫ কি মি রাস্তা বিমানকে রাস্তা দিয়ে গাড়ির মত চালিয়ে নিয়ে গেছিলেন। সে সময় বিমানগুলো খুব ছোট হত, একটু সমতল জায়গা পেলে নেমে যেতে পারত!

সে সময়কার এক বৈমানিক মার্শালের এক অদ্ভুত ব্যামো ছিল। সে মাঝে মাঝে আকাশ পথে উড়তে উড়তে সমতল জায়গা দেখলে নেমে পড়ে একটু হাত পা ছাড়িয়ে সিগারেট খেয়ে আবার উড়ে যেত গন্তব্যর দিকে। যদিও এটা ছিল সম্পূর্ণ নিয়মবিরুদ্ধ। একবার মার্শাল এক চাষের ক্ষেতের পাশে সমতল জায়গা দেখে নেমে সবে বিমানের বাইরে বেরিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়েছে , ওমনি একটি ষাঁড় ক্ষেত থেকে উঠে এসে শিং বাগিয়ে আক্রমণ করতে এল বিমানটাকে। পেছনে পেছনে দৌড়ে আসতে লাগল ষাঁড়ের মালিক। বিপদ বুঝে একটা পাথর কুড়িয়ে মার্শাল ছুঁড়ে মারল ষাঁড়টাকে লক্ষ করে। পাথর লাগল গিয়ে ষাঁড়ের মালিকের

মাথায়। ব্যস। মার্শাল আর কোনদিন চিঠিপত্রসহ বিমান নিয়ে যে কোন জায়গায় নামে নি। ব্যামো ঠিক হয়ে গেছিল তার।

১৯২০ সনে আমেরিকার এয়ারমেল-এর যাত্রাপথের মানচিত্র।

বিমান চলাচলের প্রথম দিকে বৈমানিকদের গন্তব্যে পৌঁছোতে নদী , রাস্তা , রেলপথ, এসব দেখে এগোতে হত। একটু বেখেয়াল হলে আকাশ পথ চিনে গন্তব্যে পৌছনো মুশকিল হত।

১৯১৮ থেকে **১৯২৬**এর মধ্যে প্রায় ২৫০ বৈমানিক কাজ করেছিলেন , আবেদন করে অপেক্ষা করছিলেন হাজারেরও বেশি বৈমানিক। আর এই সময় এর মাঝে ৩৫ জন বৈমানিক মারা গেছিলেন, বৈমানিক পেশায় আসতে চাওয়া সকলের কাছে সেই সময় ডাক বিভাগের বৈমানিক মানে ছিল 'সুইসাইড ক্লাবের' সদস্য। তবু দেশের তরুণ বৈমানিকরা ডাক বিভাগে যোগ দিতে উৎসুক ছিলেন।

ফ্রেডরিক রবিনসন ১৯১৯ সালের ১৬ অগাস্ট এয়ার মেল পরিষেবাতে যোগ দেয়। তার আগে তিনি ছিলেন সান ডিয়েগো সহরের রক ওয়েল ফিল্ড এর বিমান চালানো প্রশিক্ষক। রবিনসনের কাজ ছিল নিউইয়র্ক , বেলফন্ট আর পেনসিলভ্যানিয়ার মধ্যে ডাক বিমান চালান। ১৯২০ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর বেলফন্ট থেকে পেনসিলভ্যানিয়া আসার পথে রবিনসন পড়লেন ঘন কুয়াশার মধ্যে। আগেই বলেছি, সেই সময় বৈমানিকদের এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পৌঁছোতে জমির বিভিন্ন চিহ্ন, যেমন নদী , রেললাইন , রাস্তা এসব আকাশ থেকে দেখে দিকনির্দেশ পেতে হত। রবিনসন উড়ছিলেন সুসকুএহান্না নদীর স্রোত অনুসরণ করে, প্রচণ্ড কুয়াশার জন্যে নদীকে নজরে রাখতে উড়তে হচ্ছিল খুব নিচু দিয়ে। কাম্বারল্যান্ড ভ্যালি টেলিফোন কোম্পানির নদীর ওপর দিয়ে যাওয়া উঁচু লম্বা লোহার টাওয়ারে লাগানো তারে রবিনসনের ছোট বিমানের চাকা আটকে যায় আর রবিনসন বিমান নিয়ে সোজা গিয়ে পড়েন নদীর জলে। নদীতে জল কম ছিল, কিন্তু পতনের প্রবল ধাক্কায় রবিনসন মারা যান। তাঁর বয়স হয়ে ছিল মাত্র ২৪।

১৯২২ সালের ১৫ ডিসেম্বর, মার্কিন ডাক বিভাগের তরুণ বৈমানিক হেনরি বুন্সত্রা সকাল ৭.৩০ মিনিটে ডাক বোঝাই বস্তা নিয়ে আকাশে ওড়েন সল্ট লেক সিটি থেকে। গন্তব্য রক স্প্রিং। আকাশে ঘন মেঘে ঢাকা ছিল। হেনরি উড়ছিলেন মেঘের নিচু দিয়ে, উড়ছিলেন কলোরাডোর বরফ ঢাকা পাহাড়ি অঞ্চল দিয়ে। চেষ্টা করছিলেন জমি থেকে অন্তত ২০০ ফুট ওপর দিয়ে উড়তে। আচমকা ওঠা এক ঝড়ো হাওয়া হেনরির বিমানটিকে নিয়ে আছড়ে ফেলল কোলসভেলির দক্ষিণ পূর্ব দিকের পরকুপাইন নামের পাহাড়ি ঢালে। বিমান চাকা ভেঙে পেটের ওপর ভর করে বরফের ওপর দিয়ে ঘষটে একবারে খাদের ধারে গিয়ে থেমে গেল। ৯৪০০ ফুট উচ্চতায় জনমানবহীন অঞ্চলে অক্ষত শরীরে বিমান থেকে বেরিয়ে ২৪ ঘণ্টা ধরে প্রায় এক কোমর বরফ ভেঙে নামতে নামতে হেনরি একটি বনবিভাগের কুটিরের খোঁজ পেলেন। সেখানে আশ্রয় পেলেও হেনরি বাইরের কারো সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারলেন না , কারণ কোন টেলিফোন ছিল না ওই কুটির বা তার আশেপাশে। ওদিকে দু দিন ধরে আকাশ পথে অভিযান চালিয়ে বিমানের কোন খোঁজ না পেয়ে , ডাক বিভাগ ধরে নিয়েছিল যে হেনরি পাহাড়ের কোন বরফের খাদে বিমানসহ হারিয়ে গেছেন চিরকালের জন্যে। হেনরি বহু কষ্টে এক লোকালয়ে পৌঁছে ডাক বিভাগের সাথে যোগাযোগ করতে পারলেন, তারপর চলল আর এক অভিযান। বিমানটিকে খুঁজে বের করে সেই ভাঙা বিমান থেকে সব চিঠিপত্র বের করে তা স্লেজ গাড়ি করে টেনে এনে প্রতিটি প্রাপককে পাঠানো হয়েছিল।

এইবারে বাকশালীর বইতে সহজে বর্গমূল করবার যেসব কৌশল বলা হয়েছে তার কথা বলে নিয়ে তারপর অন্য কথায় যাবো।

বর্গমূল কাকে বলে? যে কোন একখানা প্রদত্ত সংখ্যার জন্য যদি এমন একখানা ছোট সংখ্যার খোঁজ পাওয়া যায় যাকে সে সংখ্যা দিয়েই গুণ করলে গুণফলটা প্রদত্ত সংখ্যার সমান হয়ে তাহলে সেই ছোট সংখ্যাটা হল প্রদত্ত সংখ্যার বর্গমূল। ব্যাপারটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেশ সরল। যেমন ধরো ৪। এর জন্যে সহজেই দেখা যাবে যে ২ কে ২ দিয়ে গুণ করলেই ৪ হয়। তাহলে ৪ এর বর্গমূল ২। একইভাবে ৯ এর বর্গমূল ৩, ১৬র বর্গমূল ৪। এইযে লক্ষ্মীছেলে সংখ্যাগুলো, মানে এই ৪, ৯, ১৬, ২৫, ৩৬, , যাদের উৎপাদকে ভেঙে ফেললেই তাদের বর্গমূলটা টুক করে এসে ধরা দিয়ে ফেলে তাদের বলে পূর্ণবর্গ সংখ্যা। কিন্তু ধরো কেউ তোমায় বলল, ২১ এর বর্গমূল কতো হে? তখন তুমি কী করবে? সরাসরি উৎপাদকে ভেঙে তো এর সমাধান হবে না। তাহলে?

তোমরা যারা ক্লাস সিক্সে উঠেছো তারা এ ধরণের সংখ্যার বর্গমূল করবার পদ্ধতি শিখেছো ইশকুলে। দশমিক ব্যবহার কর লম্বাচওড়া ভাগযোগের সে এক বিটকেল কায়দা। সে কায়দা আগেকার দিনে ছিল না। ছিল না ক্যালকুলেটরও।

ফলে সে যুগে বর্গমূল বের করা প্রায় অসম্ভবই ছিল। বাকশালীতে বলেছে, কোন পূর্ণবর্গ নয় এমন সংখ্যার বর্গ বের করবে এইভাবে--

প্রদত্ত সংখ্যাটার সবচেয়ে কাছাকাছি যে পূর্ণবর্গ সংখ্যা রয়েছে সেটাকে নাও।--- (ক)

প্রদত্ত সংখ্যা আর সেই পূর্ণবর্গ সংখ্যার বিয়োগফল বের করো।------ (খ)
পূর্ণবর্গ সংখ্যাটার বর্গমূলটা উৎপাদকে ভেঙে বের করো।----- (গ)
গ- এর দ্বিগুণ দিয়ে খ- কে ভাগ করো।------------ (ঘ)
গ এবং ঘ যোগ কর--------- (ঙ)
ঘ- এর বর্গ করো-------- (চ)
ঙর দ্বিগুণ দিয়ে চ কে ভাগ করো।--- (ছ)
ঙ থেকে ছ বিয়োগ করো। বর্গমূল তৈরি---- (জ)

ধরা যাক প্রদত্ত সংখ্যা ১৮। এর বর্গমূল বের করতে হবে।
ক=১৬
খ=১৮- ১৬=২
গ=৪
ঘ=২/৮=০. ২৫
ঙ=৪. ২৫
চ=০. ২৫x০. ২৫= ০. ০৬২৫
ছ= ০. ০৬২৫/৮. ৫ = ০. ৭৩৫৩
জ=৪. ২৫- ০. ৭৩৫৩ =৪. ২৪৭৭→ এটা হবে ১৮- র বর্গমূল।
এর বর্গ করলে তা ১৮ র খুব কাছাকাছি মান দেবে। মানটা আসবে ১৮. ০৪২৫
বা বলতে পারো এই কায়দায় যেকোন সংখ্যার বর্গমূল বের করলে তাতে ভুল থাকবে একেবারেই সামান্যআর সে ভুলটাও তাহছে কারণ আমরা ভাগ করতে গিয়ে দশমিকের পরে চার ঘর অবধি ধরেছি। সেটা আরো বেশি ধরলে ভুলের পরিমাণ আরো কমে যাবে।

তোমরা যারা একটু বড় হয়ে উচ্চমাধ্যমিকের বীজগণিতের ও কলণবিদ্যার প্রথম পাঠ নিয়েছো এবং এক্সপ্যানশান অব ফাংশান ব্যাপারটার সঙ্গে পরিচিত হয়েছো তাদের বলি, আসলে এ কায়দাটার মধ্যে দিয়ে বাকশালিতে যে পদ্ধতিটা বলা হয়েছে তার পেছনে আছে তাঁদের আবিষ্কৃত ফাংশানের সম্প্রসারণের এই পদ্ধতিটা—

$$\sqrt{Q} = \sqrt{(A2 + b)} = A + b/2A - (b/2A)2/(2(A + b/2A))$$

যেখানে Q হল, যার বর্গমূল বের করতে হবে। A হল তার নিকটতম পূর্ণবর্গ সংখ্যার বর্গমূল, আর b হল Q এর নিকটতম পূর্ণবর্গ সংখ্যার সঙ্গে Q এর অন্তরফল। এ প্রসারণটাকে যত বাড়াবে ততই নিখুঁত ফল পাওয়া যাবে।

ভাবো কান্ডখানা। সেই কবেকার যুগে বসে এইসব অংক লেখা পুঁথি ছেড়ে গেছেন আমাদের পূর্বপুরুষেরা। কী কাণ্ড!

বাকশালীর কথা এইখানেই থামাবো। পরের বার শুরু করা যাবে নতুন অধ্যায়, এদেশের অংকের ইতিহাসের পরবর্তী যুগের গল্প।

ক্রমশ

প্রফেসর ট্যানজেন্টের গল্প

অংক না ম্যাজিক?

সূর্যনাথ ভট্টাচার্য

প্রফেসর ট্যানজেন্ট বললেন, “বলুন তো সাত হাজার ছ’শো একচল্লিশ থেকে এক হাজার চার শো সাতষট্টি বাদ দিলে কত হয়?”
আমি একটু থতমত খেয়ে বললাম, “ইয়ে, কেন বলুন তো?”
“আরে মশাই, ছ’হাজার একশ’ চুয়াত্তর। মজাটা বুঝলেন কি? বোঝেন নি। জানতাম আপনার দ্বারা হবে না।”
প্রফেসর ট্যানজেন্ট তাচ্ছিল্য দেখাতে ‘জ’ গুলোকে ‘z’ দিয়ে বলেন। মনে মনে বেজায় রাগ হল। তাও আমতা আমতা করে বললাম, “তা কেন? বিয়োগটা খুব বুঝেছি। কিন্তু মজাটা তো ঠিক..., তা আপনিই পুরোটা বুঝিয়ে বলুন না।”

“আপনাকে বোঝাবো? তাহলেই হয়েছে। একটু পড়াশোনা করুন দাদা। আচ্ছা, একটা সূত্র দিয়ে গেলাম—বিয়োগটাতে শুধু চারটে অঙ্কই ব্যবহার হয়েছে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। এবার আপনি ভাবুন—” তারপর চলে যেতে যেতে একটু অনুকম্পাভরে উপদেশ দিয়ে গেলেন, “একটু করে ব্রাহ্মী শাক খাওয়া শুরু করুন দেখি। আচ্ছা চলি...”
এতো অপমান সহ্য হয়? গিয়ে সত্যিই নেট খুলে বসলাম। আর পেয়েও গেলাম অনেক কিছু। যা দিয়ে এইবারের অঙ্ক নিয়ে জাদুর আসর বসানো যেতে পারে।

এক

প্রফেসর ট্যানজেন্টের অঙ্কটা ছিল এই, ৭৬৪১–১৪৬৭=৬১৭৪। সত্যিই ৬১৭৪ সংখ্যাটার অংকগুলোকে ঘুরিয়ে ফিরিয়েই বিয়োগটা তৈরি করা হয়েছে। ৬, ১, ৭, ৪ দিয়ে সবচেয়ে বড় সংখ্যা হল ৭৬৪১ আর সবচেয়ে ছোট সংখ্যা ১৪৬৭। বিয়োগ করলে পাচ্ছি ৬১৭৪। বেশ তো, কিন্তু এটা কি খুব একটা অবাক করা ব্যাপার? তাহলে এসো, আসল ম্যাজিকটা এবার দেখাই।

যে কোনও একটা চার অংকের সংখ্যা নিন। ধরুন **১১৯৩**। সংখ্যাটা উভয়মুখী অর্থাৎ প্যালিন্ড্রোম না হলেই চলবে। এর অংকগুলো দিয়ে সবচেয়ে বড় আর ছোট সংখ্যা কী কী? খুব সহজ, **৯৩১১** এবং **১১৩৯**। বিয়োগ করলে পাই ৮১৭২। তাতে কি হোল? হবে হবে। এই বিয়োগফলের ওপর একই প্রক্রিয়া আবার করা যাক। এবং ক্রমান্বয়ে করেই যাওয়া যাক।

৮৭২১–১২৭৮=৭৪৪৩ ⇒ ৭৪৪৩–৩৪৪৭=৩৯৯৬ ⇒ ৬৯৯৩–৩৬৯৯=৩২৯৪ ⇒ ৯৪৩২–২৩৪৯=৭০৮৩ ⇒ ৮৭৩০–০৩৭৮=৮৩৫২ ⇒ ৮৫৩২–২৩৫৮=৬১৪৭

আর করে লাভ নেই, কেননা এসে গেছে সেই ৬১৪৭! অর্থাৎ, যে কোনও চারটি অনুভয়মুখী অংকের সংখ্যা দিয়েই শুরু করা হোক না কেন, শেষে ৬১৪৭ এর অনন্ত চক্রে এসে পড়বে। তাহলে হোলো না ৬১৪৭ জাদুসংখ্যা?

এতেই শেষ নয়। যে কোনও চার অংকের সংখ্যার জন্য ৬১৪৭-এ আসতে বেশির বেশী মাত্র **সাতবার** এই বিয়োগ প্রক্রিয়া করতে হবে, তার বেশি কখনোই নয়। অংক কষে একথা প্রমাণিত হয়েছে, কিন্তু সেই প্রমাণে গিয়ে আর মজাটা নষ্ট করে কাজ নেই।

আর যে কোনও সংখ্যা নিয়ে চেষ্টা করেই দেখো না!

দুই

যে কোনও চারটে পূর্ণসংখ্যা নিয়ে এই খেলাটা শুরু করা যেতে পারে। ১৭, ২৫, ৪৭, ৫৫ দিয়ে পদ্ধতিটা নীচে দেখানো হল—

	৮					১৪					০					১৬		
৩৮	১৭	২৫	২২	⇒	৩০	৮	২২	১৪	⇒	১৬	১৪	১৪	১৬	⇒	১৬	০	১৬	১৬
	৫৫	৪৭				৩৮	৮				৩০	৩০				১৬	০	
	৮					৩০					০					১৬		

চারটি সংখ্যা জোড়ায় জোড়ায় বিয়োগ করা হয়েছে, বড়টি থেকে ছোটটি। এই প্রক্রিয়া যথেষ্টসংখ্যক বার চালিয়ে গেলে অবশেষে চারটি একই সংখ্যায় এসে শেষ হবে। এখানে যেমন এসেছে ১৬। হ্যাঁ, যে কোনও চারটে সংখ্যা দিয়ে শুরু করা হোক না কেন। ব্যাপারটি প্রথম চোখে পড়ে ইতালিয়ান গণিতজ্ঞ অধ্যাপক ই ডাকির, গত শতাব্দির ত্রিশের দশকে।

ভাবছ, সুবিধে মতো সংখ্যা নিয়ে দেখানো হয়েছে? হ্যাঁ, তা ঠিক। সুবিধেজনক এই হিসেবে যে চারটে ছোট ছোট সংখ্যা নিয়ে দেখানো হয়েছে। তা শুধু পরিশ্রম কম করতে। যে কোনও বড় সংখ্যা নিয়ে শুরু করলেও ফলাফল একই হবে, শুধু অনেকগুলো ধাপ কষে যেতে হবে।

বিশ্বাস না হলে কষে দেখো।

তিন

প্রাকৃতিক সংখ্যাদের মধ্যে যে কতো রকমের সম্পর্ক থাকে, বিশেষ ভাবে সাজালে তা বেশ অদ্ভুত ভাবে প্রকাশ হয়। যেমন এবারের এই সংখ্যাবিন্যাসের খেলাটা দেখা যাক। এখানে প্রাকৃতিক সংখ্যাগুলি, মানে ১, ২, ৩, ৪, ... ইত্যাদিকে প্রথম সারিতে যথাযথ লিখে যাও। এইবার প্রথম থেকে প্রতি চতুর্থ সংখ্যাটি বাতিল করো। তারপর দ্বিতীয় সারিতে উপরের সংখ্যাগুলির নীচে প্রথম সারির ঐ সংখ্যা পর্যন্ত আংশিক সমষ্টিগুলি লেখো। আংশিক সমষ্টিতে বাতিল সংখ্যাগুলি উপেক্ষা করবে।

এবার দ্বিতীয় সারির প্রতি তৃতীয় সংখ্যাটি বাতিল করে একইভাবে আংশিক সমষ্টি গুলি লিখুন তৃতীয় সারিতে। একই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করো তৃতীয় সারির সংখ্যাদের সাথে, এবার প্রতি দ্বিতীয় সংখ্যাগুলি বাতিল করে।

নীচের সারণীতে পুরো প্রক্রিয়ার পরে সংখ্যাগুলির স্থিতি দেখানো হল। বাতিল সংখ্যাগুলি ধূমিল করে দেওয়া হয়েছে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	…
১	৩	৬		১১	১৭	২৪		৩৩	৪৩	৫৪		৬৭	৮১	৯৬		১১৩	১৩১	১৫০		১৭১	১৯৩	…
১	৪			১৫	৩২			৬৫	১০৮			১৭৫	২৫৬			৩৬৯	৬০০			৭৭১	৯৬৪	…
১				**১৬**				**৮১**				**২৫৬**				**৬২৫**				**১৩৯৬**		…

চতুর্থ সারিতে যে সংখ্যাগুলো পেয়েছ সেগুলো কী বলো দেখি? হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ। প্রাকৃতিক সংখ্যাগুলির চতুর্থ ঘাত, অর্থাৎ, $১^{৪}$, $২^{৪}$, $৩^{৪}$, $৪^{৪}$, $৫^{৪}$, $৬^{৪}$... ইত্যাদি! তোমরা ভাববে, হঠাৎ চতুর্থ ঘাত এসে গেল কেন? এর কি কোনও বিশেষ তাৎপর্য আছে? তাহলে নীচে দেওয়া দুটি সারণী দেখো। প্রথমটিতে প্রতি পঞ্চম পদটি বাতিল করে শুরু করা হয়েছে এবং দ্বিতীয়টিতে, প্রতি তৃতীয় পদটি—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	…
১	৩	৬	১০		১৬	২৩	৩১	৪০		৫১	৬৩	৭৬	৯০		১০৬	১২৩	১৪১	১৬০		১৬২	…
১	৪	১০			২৬	৪৯	৮০			১৩	১৯	২৭			৩৭৬	৪৯৯	৬৪			৮০১	…

										১	৪	০					০				
১	৫				৩১	৮০				২১১	৪০৫				৭৮১	১২৮০				২০৮১	…
১					৩২					২৪৩					১০২৪					৩১২৫	…
$১^{৫}$					$২^{৫}$					$৩^{৫}$					$৪^{৫}$					$৫^{৫}$	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	…
১	৩		৭	১২		১৯	২৭		৩৭	৪৮		৬১	৭৫		৯১	১০৮		১২৭	১৪৭		১৬৯	১৯২	…
১			৮			২৭			৬৪			১২৫			২১৬			৩৪৩			৫১২		…
$১^{৩}$			$২^{৩}$			$৩^{৩}$			$৪^{৩}$			$৫^{৩}$			$৬^{৩}$			$৭^{৩}$			$৮^{৩}$		

আশা করি এইবার ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। প্রাকৃতিক সংখ্যাগুলির যততম সংখ্যাগুলি বাতিল করে শুরু করা হবে, শেষ সারিতে প্রাকৃতিক সংখ্যাগুলির তততম ঘাত পাওয়া যাবে! হ্যাঁ, ম্যাজিকের মতো লাগলেও এটাই প্রতিপাদ্য।

এটির আবিষ্কর্তা আলফ্রেড মেসনার ছিলেন বিনোদন গণিতের একজন সুখ্যাত গবেষক। ১৯৫১ সালে নেহাতই কাকতালীয় ভাবে ওপরের ঘটনাটি তাঁর গোচরে আসে। তিনি পঞ্চম ঘাত দিয়ে প্রক্রিয়াটি প্রকাশ করেছিলেন। আশ্চর্যজনক সাধারণীকরণটি তার পরে হয়েছে। গাণিতিক ভাবে এটির প্রমাণ পেতেও দেরি হয় নি। আবিষ্কারের বছর পনেরোর মধ্যেই বিভিন্ন গণিতজ্ঞ দ্বারা নানান উপায়ে এটির সত্যতা সাব্যস্ত হয়েছে। তার মধ্যে এইন্ডহোভেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কারেল পোস্ট একটি অভিনব সরল পদ্ধতিতে এটিকে প্রমাণ করেছেন। তা সেই ‘সরল’ প্রমাণটিও আসলে যথেষ্ট জটিল। এই জায়গা তার উপযুক্ত হবে না।

চার

আসর শেষ করছি এরকমই আর এক সংখ্যাবিন্যাসের খেলায়। নীচের সারণীতে প্রাকৃতিক সংখ্যাদের পর পর সাজানো হয়েছে প্রথম স্তম্ভে একটি, তারপর তিনটি, তারপর পাঁচটি, এইভাবে যেমন দেখানো আছে। আর কোনই কায়দা নেই। তাইতেই কিন্তু সারণীটাতে বেশ কিছু বিশেষত্ব এসে গেছে। এখানে প্রত্যেক স্তম্ভের মধ্যবর্তী সংখ্যাগুলি (স্থূলাকারে দেখানো) নিয়ে যে সারিটি কোণাকুণি নেমে গেছে তাঁকে সারণীর মধ্যমা বলা যাক। স্বভাবতই মাধ্যমিক সংখ্যাগুলি তাদের স্তম্ভের সংখ্যাগুলির গড়।

এইভাবে সাজানো প্রাকৃতিক সংখ্যাগুলো কী জাদু দেখায় দেখা যাক।—

স্তম্ভ সংখ্যা⇒	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	…
যাচাই করে দেখুন,	**১**	২	৫	১০	১৭	২৬	৩৭	৫০	৬৫	৮২	১০১	১২২	১৪৫	…
(১) প্রত্যেক স্তম্ভের শেষ		**৩**	৬	১১	১৮	২৭	৩৮	৫১	৬৬	৮৩	১০২	১২৩	১৪৬	…
সংখ্যাটি ঐ স্তম্ভ সংখ্যার		৪	**৭**	১২	১৯	২৮	৩৯	৫২	৬৭	৮৪	১০৩	১২৪	১৪৭	…
বর্গ। যেমন, ৪=২^{২},			৮	**১৩**	২০	২৯	৪০	৫৩	৬৮	৮৫	১০৪	১২৫	১৪৮	…
৪৯=৭^{২} ইত্যাদি।			৯	১৪	**২১**	৩০	৪১	৫৪	৬৯	৮৬	১০৫	১২৬	১৪৯	…
(২) প্রতি স্তম্ভের				১৫	২২	**৩১**	৪২	৫৫	৭০	৮৭	১০৬	১২৭	১৫০	…
মাধ্যমিক সংখ্যাটির				১৬	২৩	৩২	**৪৩**	৫৬	৭১	৮৮	১০৭	১২৮	১৫১	…
সাথে ঐ স্তম্ভ সংখ্যা যোগ					২৪	৩৩	৪৪	**৫৭**	৭২	৮৯	১০৮	১২৯	১৫২	…
করলে পরের স্তম্ভের প্রথম					২৫	৩৪	৪৫	৫৮	**৭৩**	৯০	১০৯	১৩০	১৫৩	…
সংখ্যাটি পাওয়া যায়।						৩৫	৪৬	৫৯	৭৪	**৯১**	১১০	১৩১	১৫৪	…
যেমন, পঞ্চম স্তম্ভের জন্য,						৩৬	৪৭	৬০	৭৫	৯২	**১১১**	১৩২	১৫৫	…
২১+৫=২৬, ষষ্ঠ স্তম্ভের							৪৮	৬১	৭৬	৯৩	১১২	**১৩৩**	১৫৬	…
প্রথম সংখ্যা। (৩) প্রত্যেক							৪৯	৬২	৭৭	৯৪	১১৩	১৩৪	**১৫৭**	…
স্তম্ভের সংখ্যাগুলির								৬৩	৭৮	৯৫	১১৪	১৩৫	১৫৮	…
সমষ্টি, ঐ স্তম্ভসংখ্যা ও								৬৪	৭৯	৯৬	১১৫	১৩৬	১৫৯	…
তার পূর্ব স্তম্ভসংখ্যার									৮০	৯৭	১১৬	১৩৭	১৬০	…
ঘনের									৮১	৯৮	১১	১৩	১৬১	…

যোগফল।											৭	৮		
যেমন, চতুর্থ স্তম্ভের										৯৯	১১৮	১৩৯	১৬২	…
সংখ্যাগুলির যোগফল										১০০	১১৯	১৪০	১৬৩	…
৯১=$৩^{৩}$+$৪^{৩}$ ইত্যাদি।											১২০	১৪১	১৬৪	…
(৪) প্রতি স্তম্ভের প্রান্তিক											১২১	১৪২	১৬৫	…
দুটি সংখ্যার অন্তর আগের												১৪৩	১৬৬	…
স্তম্ভসংখ্যার ঠিক দ্বিগুণ।												১৪৪	১৬৭	…
যেমন, অষ্টম স্তম্ভের জন্য,													১৬৮	…
৬৪−৫০=১৪=													১৬৯	…
২×৭।														…
(৫) মধ্যমায়														…
৩-এর পরে প্রতি তৃতীয় সংখ্যাটি তিনের গুণিতক, ৭-এর পর প্রতি সপ্তম সংখ্যাটি সাতের গুণিতক, ১৩-এর পর প্রতি তেরোতম সংখ্যাটি তেরোর গুণিতক, ইত্যাদি। (৬) মধ্যমার পরপর যে														

কোনও দুটি সংখ্যার গুণফল মধ্যমাতেই পরে পাওয়া যাবে। যেমন, ৭×১৩=৯১, দশম স্তম্ভের মধ্যমায়। (৭) গুণফলটি যে স্তম্ভে থাকবে তা ছোট সংখ্যাটির স্তম্ভের শেষ সংখ্যার চেয়ে এক বেশী। যেমন, ৭ আছে তৃতীয় স্তম্ভে। তৃতীয় স্তম্ভের শেষ সংখ্যা ৯। অতএব, ৯১ পাওয়া যাবে (৯+১) অর্থাৎ দশম স্তম্ভে।														

এগুলো সবই সহজ বীজগণিতের দ্বারা প্রমাণযোগ্য। তার মধ্যে আর যাবো না। উৎসাহী পাঠক চেষ্টা করে দেখতে পারেন। খুঁজলে সারণীতে আরও কিছু বিশেষত্ব পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু যা দেওয়া হল তাই বা কম কি?

* * *

আজকে এই পর্যন্ত। এখনি আমাকে যেতে হবে। প্রফেসর ট্যানজেন্টের সাথে বোঝাপড়াটা বাকি আছে যে!

—o—

সব পদার্থ অণু দিয়ে গড়া, সংখ্যা তাদের গোটা।
কতগুলো অণু, এই নিয়ে অ্যাভোগাড্রো প্রকল্পটা।
মাল যত হোক ভারী বা হাল্কা, শুষ্ক অথবা আর্দ্র
এক মোলে সমসংখ্যক অণু, বললেন অ্যাভোগাড্রো।
হিসেব তাদের অঙ্কের মত, গড়বড় করা মানা।
অণু আছে কটা? ছশো দুই, পাশে শূন্য একুশখানা।
অক্সিজেনের ষোল গ্রামে যত, হাইড্রোজেনের দুই –
জলের বেলাতে আঠারো গ্রামেও এত্তগুলো অণুই।
বুঝতে পেরেছ?গুড, ভেরি গুড। এবার বলোতো পুত্র,
পি ভি আর দিয়ে কী ইকুয়েশন চার্লস্‌বয়েলের সূত্র -?
চুপ কেন? এই এখুনি বললি বুঝেছিস, সব জল!
কী বললি? পি ভি আর তো মাল্টিপ্লেক্সে সিনেমা হল?
ওরে বাছা, হেথা পি মানে প্রেশার, ভিতে হয় ভলিউম -
সিনেমা টিনেমা রসায়নে নেই, হ্যারি পটার বা ধুম!

আর হল এক কন্‌স্ট্যান্ট, যাকে বলছে গ্যাস ধ্রুবক –
পি ভি ইকুয়াল্‌স্‌ এন আর টি শুনে খাচ্ছিস যেন শক!
এন নাম্বার অফ মোল্‌স্‌ আর টি মানে টেম্পারেচার –
(লাফাস নে অত পাটা ভেঙে গেলে লাগবে আবার স্ট্রেচার!)
এবার বলতো জৈব যৌগে থাকে কোন মৌলটা?
শুনেই হ্যাঁচ্চো! ইস,হতভাগা! ঝেড়ে ফেল সব পোঁটা
অর্গানিকে কি আর্গন থাকে? না রে, থাকে কার্বন।
রাম, রাম, রামায়ণ শেষ করে সীতা হল তার বোন?
জীব থেকে আসে জৈব কথাটা, বিশেষণ এটা, ঠিক?
প্রাণী- উদ্ভিদ থেকে যে যৌগ, সে সব অর্গানিক।
বলি নি এ সবে কার্বন থাকে, মেমরি কি সব গন?
লম্বা লম্বা চেন বাঁধে তারা, সেটাই ক্যাটিনেশন।
ওরে না, ক্যাট না, মাথা নাড়ে শুধু, কী যে এর হবে ছাই
আমি পড়াচ্ছি, তুই ঢুলছিস আর তুলছিস হাই!

ছবিঃ ইন্দ্রশেখর

আকাশ ছোঁয়া বাড়ি

কিশোর ঘোষাল

সারা বিশ্ব জুড়ে এখন আকাশছোঁয়া বাড়ি তৈরির প্রতিযোগিতা চলছে। আসলে জনসংখ্যা যে হারে বেড়ে চলেছে, সেই অনুপাতে পৃথিবীতে বাসযোগ্য জমির পরিমাণ তো আর বাড়ছে না, কাজেই আমাদের এখন উঠে যেতে হচ্ছে বহুতল বাড়ির সীমিত পরিসরে। একটা গ্রামের বা একটা ছোটখাটো শহরের অনেক জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে বাস করতে থাকা সকল মানুষকে একটা বাড়ির মধ্যে যদি ঢুকিয়ে ফেলা যায়, অনেকটা জায়গাই বেঁচে যায়, তাই নয় কি? আর সেই চিন্তাভাবনা থেকেই বিশ্বজুড়ে এই বহুতল বাড়ির এতো জনপ্রিয়তা।

এখনও পর্যন্ত বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু বাড়িটি আছে আরব আমির শাহির দুবাই শহরে। আজ পর্যন্ত মানুষের বানানো যাবতীয় নির্মাণের মধ্যে এটি সবচেয়ে উঁচু, কাজেই এই বাড়িটি যে আধুনিক বিজ্ঞানের একটি অসাধারণ নিদর্শন, তাতে আর সন্দেহ কি?

বুর্জ খলিফাঃ

আরব আমির শাহির দুবাই শহরে এই বাড়ির নির্মাণকার্য ২০০৪ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর শুরু হয়ে শেষ হয়েছিল পয়লা অক্টোবর, ২০০৯, যদিও ব্যবহারের জন্যে খুলে দেওয়া হয় ২০১০ সালের ৪ঠা জানুয়ারি।

আরব আমিরশাহির অর্থনীতি প্রধানত খনিজ তেলের উপর নির্ভরশীল। সে দেশের সরকার চাইছিলেন এই একমুখী অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল না থেকে দেশের পর্যটন শিল্পকেও চাঙ্গা করে তুলতে। সেই ভাবনা থেকেই সিদ্ধান্ত হয়েছিল দেশের রাজধানী দুবাইতে এমন কিছু একটা বানাতে হবে, যা হবে সারা বিশ্বে অদ্বিতীয় এবং অবশ্যই দর্শনীয়। সেই ভাবনারই রূপ এই বুর্জ খলিফা।

বাড়িটি বানানো হয়েছে মিশ্র ব্যবহারের জন্য। এতে থাকার জন্যে আবাসিক ফ্ল্যাট আছে, হোটেল আছে, অফিসের জায়গাও আছে বিস্তর। মোট ১৬৩ তলা এই বাড়ির উচ্চতা ৮২৮ মিটার বা ২,৭১৭ ফুট, বেসমেন্টে আছে দুই তলের গাড়ি রাখার জায়গা। সবকটি তলা মিলে মোট জায়গার পরিমাণ ৩,০৯,৪৭৩ বর্গ মিটার বা ৩৩,৩১,১০০ বর্গ ফুট।

এই বাড়ির ভিতরে অনেকগুলি হোটেলের মধ্যে, ৩০৪ ঘর

বিশিষ্ট আর্মানি হোটেল সবচেয়ে বিখ্যাত। ৪৩ আর ৭৬ তলায় আছে দুটি সুইমিং পুল। ০ থেকে ১০৮ তলার মধ্যে মোট ৯০০টি আবাসিক অ্যাপার্টমেন্ট আছে। শোনা যায়, ঘোষণা হবার আট ঘন্টার মধ্যে সব কটি ফ্ল্যাটই চটপট বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। এ ছাড়াও আছে অজস্র অফিসের জায়গা, রেস্তোঁরা। এই বাড়িতে ১৬০ তলা পর্যন্ত ওঠার জন্যে মোট ২৯০৯ টি সিঁড়ি রয়েছে। তার সঙ্গে আছে ৫৭টি এলিভেটার আর ৮টি এসকালেটার। এসকালেটারের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১০ মিটার, তার মানে প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ৩৬ কিমি। অফিসের সময় আমাদের কলকাতা শহরের বাসগুলোও এর চেয়ে অনেক আস্তে চলে।

আজকাল বড়ো বড়ো বাড়ির ভিতের মাটিতে গভীর গোল গর্ত করে ঢালাই করে দেওয়া হয় কংক্রিট আর তার মধ্যে থাকে ইস্পাতের রড। এই ঢালাই ঠিক গোল স্তম্ভ বা থামের মতো বাড়ির সমস্ত ভার চালান করে দেয় নীচের ভূস্তরে আর ধরে থাকে বাড়ির আসল কাঠামোটিকে। এই স্তম্ভগুলোর কারিগরি নাম পাইল। এই বাড়িটি এইরকম মোট ১৯২টি পাইলের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এই পাইলগুলি মাটির নিচে পাথরের মধ্যে ৫০ মিটারেরও বেশি ঢুকিয়ে দেওয়া আছে।

সাংহাই টাওয়ারঃ

চিনের সাংহাই শহরের লুজাজুই, পুডং অঞ্চলে পাশাপাশি তিনটি উঁচু বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে উঁচু বাড়িটি সাংহাই টাওয়ার বা সাংহাই সেন্ট্রাল টাওয়ার নামে বিখ্যাত। এখনও পর্যন্ত এই বাড়িটি চিনের সর্বোচ্চ এবং বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বাড়ি।

বাড়িটির নির্মাণ শুরু হয়েছে ২০০৮ সালের নভেম্বর মাসে। ২০১৪ সালে নির্মাণ কাজ শেষ করে আশা করা যায় ২০১৫ সালে বাড়িটি সাধারণের ব্যবহারের জন্য খুলে দেওয়া হবে। বাড়িটি ৬৩২ মিটার (২০৭৩ ফিট) উঁচু আর মোট ১২১টি তলা আছে। সব কটা তলা মিলে মোট জায়গার পরিমাণ প্রায় ৩৮০,০০০ বর্গ মিটার (৪০,৯০,০০০ বর্গ ফিট)। পাশাপাশি অন্য বাড়ি দুটির একটির নাম জিন মাও টাওয়ার ১৯৯৮ সালে সম্পূর্ণ হয়েছিল, আর অন্যটি সাংহাই ওয়ার্ল্ড ফিনান্সিয়াল টাওয়ার। এটি ২০০৮ সালে শেষ হয়েছিল। ৮৮টি তলা নিয়ে জিন মাও টাওয়ার ৪২১ মি উঁচু, আর ১০১টি তলা

নিয়ে সাংহাই ওয়ার্ল্ড ফিনান্সিয়াল টাওয়ারের উচ্চতা ৪৯২ মিটার। পাশের ছবির বাঁদিকে নির্মীয়মাণ বাড়িটি সাংহাই টাওয়ার, পাশেই ডানদিকে সাংহাই ওয়ার্ল্ড ফিনান্সিয়াল টাওয়ার আর একটু দূরে পিছনে জিন মাও টাওয়ার।

যে কোন আকাশ ছোঁয়া বাড়ি নির্মাণের প্রধান উপকরণ পাইল, ঢালাই এবং ইস্পাতের রড এবং বিম। কিন্তু সাংহাই টাওয়ারের বিশেষত্ব হল এর অদ্ভুত কারিগরি। বিশাল সাইজের সিলিণ্ডার বা নলের কথা যদি চিন্তা করো, এরকম নটি নল একটার ওপর একটা চাপিয়ে বাড়িটা গড়ে তোলা হয়েছে। গোল আকারের জন্যে বাড়ির দেওয়ালে আসা বাতাসের তীব্র চাপ অন্ততঃ শতকরা ২৪ ভাগ পর্যন্ত কমানো সম্ভব হয়েছে। তাছাড়াও দুটি স্তরে বিশেষ ধরণের কাচ দিয়ে বানানো হয়েছে এই নলের দেওয়াল। ইট, পাথর বা অন্য যে কোন জিনিসের থেকে কাচের ওজন হাল্কা হওয়ায়, বাড়ির দেওয়ালের ওজন অনেক কমে গেছে। তার জন্যে অন্য বাড়ির তুলনায় শতকরা ২৫ ভাগ ইস্পাতের রড কম খরচ হয়েছে। তাছাড়াও দেওয়ালে দুই স্তরের কাচ থাকার জন্যে, রোদের তাপে ঘরের ভিতর গরম হয় অনেক কম, তাতে ঘর গরমকালে ঠাণ্ডা কিংবা শীতকালে গরম রাখতে অনেক কম খরচ হয়। এই সব কারণে, এই উচ্চতার অন্য যে কোন বাড়ির চেয়ে এই বাড়ি নির্মাণের খরচও অনেকটাই কমে গিয়েছে।

এই বাড়ির আরেকটি বিশেষত্ব হল, এর এলিভেটরের গতি। বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতগামী এলিভেটর। মোট ১০৬টি এলিভেটরের মধ্যে তিনটি এলিভেটরের গতি হবে প্রতি সেকেণ্ডে ১৮ মিটার, তার মানে প্রায় ৬৪.৮০ কিমি প্রতি ঘন্টায়! ভাবতে পারো? আমরা যে লোকাল ট্রেনে চড়ি তার গতিও এর কাছাকাছিই থাকে। ২০১4 সালের জানুয়ারি পর্যন্ত এই বাড়ির ৬০০ মিটার পর্যন্ত নির্মাণ শেষ হয়ে গেছে। বাকি আছে শেষ ৩২ মিটার আর ভিতরের সাজসজ্জা। ষোল হাজারেরও বেশি মানুষের ব্যবহারের জন্যে এই বাড়িতে আছে থাকার জায়গা, অফিস, ৩০২ ঘরের বিশাল হোটেল, রেস্তোরাঁ, সাঁতারের জায়গা, বেড়ানোর জায়গা, বাগান, ১৮০০ গাড়ি রাখার মতো জায়গা এবং আরো অনেক অনেক কিছু।

এই বাড়ি দুটোর কথা শুনে কি মনে হচ্ছে, পুরো একটা শহরের চেয়ে কম কিছু?

বিদেশ ছেড়ে এবার দেশের কথা বলি।

দি ইম্পিরিয়ালঃ

আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশী আকাশছোঁয়া বাড়ি আছে আমাদের মুম্বই শহরে। দক্ষিণ মুম্বইয়ের সমুদ্রের ধারে তারদেও অঞ্চলের এই জোড়া বাড়ির নাম দি ইম্পিরিয়াল। এখনও পর্যন্ত মুম্বই এবং ভারতের সবচেয়ে উঁচু এই আবাসিক বাড়ির উচ্চতা ২১০ মিটার, আর

ছাদের উপর অ্যান্টেনার টাওয়ার ধরলে মোট উচ্চতা ২৫৪ মিটার। প্রত্যেকটি বাড়িতে ৬০টি করে তলা নিয়ে দুটো বাড়িতে মোট জায়গার পরিমাণ ২,৪০,০০০ বর্গ মিটার (২৫,৮২,০০০ বর্গ ফুট)।

বন্ধ কারখানা আর তার আশেপাশে বেড়ে ওঠা বস্তি অঞ্চলের জমিতে এই বাড়ি দুটির নির্মাণ শুরু হয়েছিল ২০০5 সালে আর শেষ হয় ২০১০ সালে। বস্তিবাসীদের সুস্থ পুনর্বাসন করে এবং শহরের মধ্যে পড়ে থাকা জমির সদ্ব্যবহার করে মুম্বইকে সুন্দর করে গড়ে তোলার সরকারি পরিকল্পনার এটাই ছিল প্রথম উদ্যোগ।

ওয়ার্ল্ড ওয়ানঃ

বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু সম্পূর্ণ আবাসিক বাড়ির নির্মাণ চলছে আমাদের এই মুম্বাই শহরেই। মুম্বাইয়ের আপার ওরলিতে বন্ধ হয়ে যাওয়া শ্রীনিবাস মিলের ১৭.৫ একর (প্রায় ৭০,৮২০ বর্গ মিটার) জমিতে এই বাড়ির নির্মাণ কাজ শুরু হয়ে গেছে ২০১১ সাল থেকে আর অনুমান করা যায় ২০১৬ সালে এটি সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। মোট ১১৭ তলা এই বাড়ির উচ্চতা ৪৪২ মিটার আর ওঠা নামার জন্যে মোট ২৫টি এলিভেটার বাড়ির মধ্যে সর্বদা দৌড়ে বেড়াবে। ২০১৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত এই বাড়ির ৫০টি তলা (প্রায় ২২০মি) সম্পূর্ণ হয়েছে। এই বাড়ি নির্মাণের খরচ ধরা হয়েছে প্রায় ২০০০ কোটি টাকা। সবচেয়ে কমদামের অ্যাপার্টমেন্টের দাম ধরা হয়েছে ৭.৫০ কোটি টাকা আর সবচেয়ে দামি অ্যাপার্টমেন্টের দাম ৫০ কোটির কম নয়।

এটি সম্পূর্ণ হলে শুধুমাত্র আবাসিক বাড়ি হিসেবে এটিই হবে বিশ্বের উচ্চতম।

- ০-

আমাদের বৈজ্ঞানিক

ভূবিদ্যা চর্চায় ভারতীয় পথিকৃৎ

প্রমথনাথ বোস

সংহিতা

আধুনিক যুগে ইউরোপের দেশগুলো বিজ্ঞান চর্চায় খুব উন্নতি করেছিল। ভারত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশ হলে সেই উন্নতির ঢেউ লাগে ভারতের গায়েও। সেই সময়ের যে কয়েকজন ভারতীয় ইউরোপের আধুনিক বিজ্ঞান শিখতে ও তার চর্চা করতে উৎসাহী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন প্রমথনাথ বোস। তিনি ইংলন্ডে গিয়ে ভূবিদ্যা শিখেছিলেন। পৃথিবীর পাথরের রকমসকম, পাথরের উপাদান, পাথর তৈরির ইতিহাস নিয়ে ভূবিদরা চর্চা করেন। তাই তাঁরা সন্ধান দিতে পারেন মানুষের সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে এমন সব খনিজের, ধাতুর আকরিকের। প্রমথনাথও সে রকম একজন অনুসন্ধানী হয়ে উঠেছিলেন আর ভারতের গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদের সন্ধান দিয়েছিলেন।

১৮৫৫ সালের ১২ই মে তখনকার নদীয়া জেলার গজগ্রামে জন্মেছিলেন প্রমথনাথ। তাঁর বাবা ছিলেন তারাপ্রসন্ন ও মা শশীমুখী। গ্রামেরই ইশকুল বঙ্গ বিদ্যালয়ে তাঁর পড়াশোনার শুরু। হাইস্কুলে পড়ার জন্য পরে তিনি কৃষ্ণনগরে গিয়েছিলেন।

কৃষ্ণনগরে থাকার সময়ে তিনি কেশবচন্দ্র সেনের সংস্পর্শে এসেছিলেন। কেশবচন্দ্র ছিলেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ও সে সময়ের ভারতের আধুনিক মানুষদের একজন। তাঁর আধুনিক চিন্তায় অনুপ্রাণিত হয়ে প্রমথনাথ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে তিনি ইংলন্ডে গিয়ে আধুনিক পাঠক্রমে পড়াশোনা করবেন। সে সময়ে প্রতিভাবান ভারতীয় ছাত্রদের বৃত্তির জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার চল ছিল। সেই রকম এক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রথম হয়ে গিলক্রিস্ট বৃত্তি পান প্রমথনাথ। এই বৃত্তি তাঁকে দেওয়া হয়েছিল পরবর্তী পাঁচ বছরের পড়াশোনার খরচ চালানোর জন্য।

১৮৭৪- এর সেপ্টেম্বরে ইংলণ্ড পাড়ি দেন প্রমথনাথ। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা, জীববিদ্যা, ভূবিদ্যা, প্রাকৃতিক ভূগোল আর তর্কশাস্ত্র পড়তে শুরু করেন। ১৮৭৭ সালে ভূবিদ্যায় তৃতীয় স্থান অধিকার করে স্নাতক হন তিনি। তারপর তিনি কিছুদিনের জন্য যোগ দেন রয়্যাল স্কুল অব মাইন্স- এ। সেই সময়ে আবার ভারতে প্রবলভাবে জাগছিল জাতীয়তাবাদি

আন্দোলন। প্রমথনাথ ইংলন্ডে থাকাকালীনই অংশ নিয়েছিলেন এই আন্দোলনে। তাঁর এই রাজনৈতিক সক্রিয়তার কারণে ব্রিটিশ প্রশাসন তাঁকে ভারতে ফেরাতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিল। শোনা যায় যে, সেক্রেটারি অব স্টেট তাঁর বিশেষ বিবেচনায় প্রমথনাথকে ভারতের ভূতাত্ত্বিক নিরীক্ষণ বা জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়াতে নিয়োগ করেছিলেন। এইভাবে জিওলজিক্যাল সার্ভেতে প্রথম কোনো উচ্চপদে কোনো ভারতীয় নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই সংস্থায় তিনি কাজ করেছিলেন ১৮৮০ সাল থেকে শুরু করে টানা তেইশ বছর।

জিওলজিক্যাল সার্ভেতে কাজ করার সময় তিনি এই সংস্থার গবেষণামূলক কাজের পদ্ধতিতে প্রচুর পরিবর্তন এনেছিলেন যাতে আখেরে ভূতত্ত্বচর্চার মানেরও সামগ্রিক উন্নতি হয়েছিল। তেমন একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হলো পাথরের পাতলা অংশ পেট্রোগ্রাফিক মাইক্রোস্কোপে পরীক্ষা করে তার বিবরণ প্রোগ্রেস রিপোর্টে লেখা। এই পদ্ধতির প্রচলন প্রমথনাথই শুরু করেছিলেন। এই সংস্থায় কাজ করার সময় তাঁর পর্যবেক্ষণের এলাকায় ছিল তখনকার রেওয়া রাজ্যের অন্তর্গত নর্মদা উপত্যকা। তাছাড়া মধ্য ভারতের রায়পুর, বাস্তার, বালাঘাট এবং মান্ডলা জেলাগুলি এবং শিলং- এর মালভূমি। তাঁর অতি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারের মধ্যে রয়েছে দার্জিলিং- এর কয়লা, সিকিমের তামা এবং জব্বলপুরের ম্যাঙ্গানিজ। নর্মদা উপত্যকায় ট্র্যাকাইট নামে গুরুত্বপূর্ণ পাথর তিনিই প্রথম খুঁজে পান। ল্যামেটা ও বাঘ নামে দুটি পলি স্তরের কথা তিনিই প্রথম বর্ণনা করেন। পরে এই দুই পলিস্তরের নিরিখেই অন্যান্য পলিস্তর বা ভূতাত্ত্বিক সংস্থানকে বর্ণনা করেছিলেন তিনি। পদোন্নতির প্রশ্নে বঞ্চনার স্বীকার হয়েছিলেন বলে তিনি জিওলজিক্যাল সার্ভে থেকে পদত্যাগ করেছিলেন মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে।

এর পরে পরেই ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের মুখ্য ভূতাত্ত্বিকের পদে তিনি যোগ দেন। সিংভূম এলাকায় লোহার আকরিক তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন। টাটা ইস্পাতের কর্ণধার জামশেদজি নৌরজি টাটা- কে তিনি ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে তাঁর ইস্পাত শিল্প সরিয়ে আনার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাই জামশেদপুরের টাটার খনির মুখে প্রমথনাথ বোসের আবক্ষ মূর্তি রাখা আছে।

বিজ্ঞানচর্চা করা ছাড়াও তিনি সক্রিয় জাতীয়তাবাদী ছিলেন। আজকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, যা শুরু হয়েছিল বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট নামে, তার স্থপতিদের একজন ছিলেন প্রমথনাথ। এছাড়াও “বৃটিশ রাজত্বে হিন্দু সভ্যতার বিকাশ” নামে তিনখন্ডে একটা বইও তিনি লিখেছিলেন।

শেষ জীবনে তিনি রাঁচিতে থাকতেন। সাম্প্রতিক ঘটনা নিয়ে তিনি নিয়মিত খবরে কাগজে আর্টিকল লিখতেন। ১৯৩৪ সালের ২৭শে মার্চ তাঁর দেহাবসান হয়। এশিয়াটিক সোসাইটি তিন বছর অন্তর ভূতাত্ত্বিক প্রমথনাথ বোসের নামে একটি পদক দিয়ে সম্মানিত করেন সফল ভারতীয় ভূতাত্ত্বিকদের যাঁরা এশিয়ার ভূতত্ত্বের বিষয়ে গবেষণা করে জ্ঞানের সেই ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছেন।

ছবিঃ ইন্দ্রশেখর

বোষ্টমগাছের কথা

তার নাম অ্যামপুলারিয়া।
বাস থাইল্যান্ড থেকে নিউ গিনি অবধি বিস্তীর্ণ এলাকার জঙ্গলে।
তার জ্ঞাতিগুষ্টি সবাই মাংসখেকো গাছ। কিন্তু সে নিজে কলসপত্রী গাছ হলেও, রসে ভরা কলসিপাতার ভেতর পোকাদের ফাঁদে ফেলে মোটেই সে তাদের খেয়ে নেয় না।

বড়ো বড়ো গাছের তলায় কলসি পেতে বসে থাকে অ্যামপুলারিয়া, আর বড়ো গাছেদের থেকে মরা পাতা, জল যা ঝরে পড়ে তাদের কলসিতে তাই খেয়ে বেঁচে থাকে সে।
আর পোকামাকড়? তাদের বেজায় বন্ধু এই অ্যামপুলারিয়া। অন্তত পঞ্চাশ জাতের পোকামাকড় তার কলসিতে বাসা করে থাকে।
তাছাড়া তার কলসিকে বাচ্চা দেবার জন্যে কাজে লাগায় মাইক্রোহাইলা নেপেনথিকেলা নামের ব্যাঙেরা।

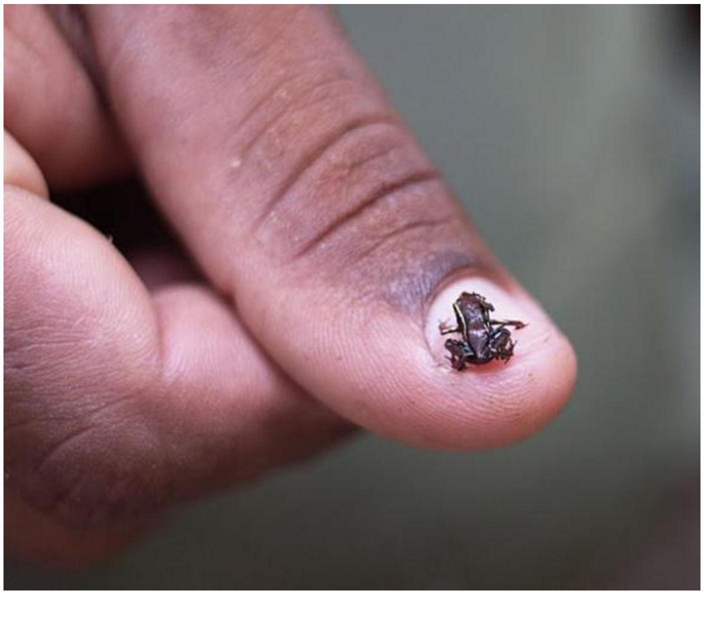

পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট প্রজাতির এই ব্যাঙদের ২০১০ সালে আবিষ্কার করা হয়েছে। দ্যাখো সে কী দারুণ দেখতে! শুধু কি খুদেদের বন্ধু? মোটেই না। সে যেখানে গজায় তার কাছাকাছি এলাকার মানুষজন তার কলসিকে শুকিয়ে নিয়ে ভাতের হাঁড়ি বানায়। ভাবো কান্ড!

দোয়েল

কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সাদা কিংবা ধূসর বর্ণের সঙ্গে কালো বর্ণের পালকে ঢাকা থাকে এই পাখির। আকারে ছোট, কিন্তু লেজ লম্বা হয়। জনবসতিতে ছাড়াও উন্মুক্ত বনাঞ্চলেও দেখতে পাওয়া যায়। পোকামাকড় খেয়েই বেঁচে থাকে। সুরেলা কণ্ঠস্বরের জন্য এই পাখির সুনাম আছে। আমাদের প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের জাতীয় পাখি হল এই দোয়েল পাখি।

ছবি--লেখক

প্রতিবেশী গাছ

লাল জামরুল

অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়

এবার একটি স্বল্পখ্যাত গাছের কথা লিখছি। আমরা সকলেই রসালো মিষ্টি ফল জামরুল খেতে অভ্যস্ত। বছরের বেশ কিছুটা সময় বাজারে বা লোকাল ট্রেনে বেশ বড় বড় সাদা রঙের জামরুল বিক্রি হয়।

তবে টুকটুকে লাল রঙের জামরুল খুব কম মানুষই দেখেছেন। এই লাল জামরুল ফলটি আকার আকৃতিতে সাদা জামরুলের তুলনায় কিছুটা ছোটো। তবে দেখতে বড়ই সুন্দর। গাছে যখন লাল জামরুল ফল ধরে তা দেখতে বড়োই মনোরম। দূর থেকে লাল ফুল বলেই মনে হয়।

এই লাল জামরুল গাছটির বৈজ্ঞানিক নাম **Syzygium samarangense**। বাংলায় লিখলে সাইজাইজিয়াম সামারানজেনস। তবে বাংলায় লেখা সঠিক নয়। প্রাণী বা গাছপালা এক এক দেশে এক এক নামে পরিচিত। তাই বিজ্ঞানীরা সকলের বোঝার জন্য বিজ্ঞানসম্মত নাম প্রচলন করেছেন। এটি ইংরিজি হরফের বক্রলেখায় বা ইটালিক্স্- এ লেখার নিয়ম।

এই স্বল্পখ্যাত গাছটি একটি সপুষ্পক উদ্ভিদ। এই গাছটি এখনও আমাদের দেশে কমই দেখা যায়। বেশ কয়েক বছর আগে বর্ধমান- হাওড়া মেন লাইনের আদি সপ্তগ্রাম রেল স্টেশন- সংলগ্ন গুরুপুর নার্শারি থেকে একটি লাল জামরুলের চারা এনে বাগানে লাগিয়েছিলাম। আজ সেটি দশ- বারো ফুটের মত লম্বা হয়েছে। বছরে তিনবার ফল ধরে। বর্ষার সময় ফলের সংখ্যা বেশি হয়, দুশো আড়াইশোটির মতন ফল ধরে। তবে হনুমানের উৎপাতে সেগুলি পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না। পবন নন্দনরা দল বেঁধে এসে ফলাহার সারেন সকালে। বর্ষার ঠিক আগে এবং দুর্গাপূজার পূর্বে আরও দু বার জামরুল ফল ধরে। তবে ফলের সংখ্যা কিছু কম হয় তখন।

লাল জামরুল ফলটি প্রাথমিক অবস্থায় সাদা রঙের। তারপর ফলের ডগার দিকে লাল রঙের আভা দেখা যায়। পরে ফলটি বড়ো হওয়ার সাথে সাথে পুরো ফলটিই লাল রঙের হয়ে যায়। পরিপক্কতা লাভের সাথে সাথে লাল রঙ আরও গাঢ় হয়। সেই সময় দেখতে খুবই ভালো লাগে।

এই গাছটির আদি বাসস্থান দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়ার মালয় দেশ এবং ভারতবর্ষের আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। তবে আজ পৃথিবীর বহু দেশে, বিশেষত গ্রীষ্মমন্ডলের দেশগুলিতে এই গাছটি দেখা যায়। চিরহরিত পাতাগুলি চার- পাঁচ ইঞ্চি লম্বা। ছোটো অবস্থায় পাতাগুলি হালকা সবুজ। বড় হওয়ার পর গাঢ় সবুজ বর্ণের হয়ে যায়। সাদা ফুলগুলি ছোটো, চারটি পাপড়িযুক্ত। ফল ঘন্টাকৃতি। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, গাছের কান্ডের যে কোন অংশে ফুল ফোটে এবং পরে সেগুলি ফলে রূপান্তরিত হয়। বড়ো গাছে পাঁচ- সাতশো ফল ধরতে পারে।

এ দেশের জামরুল গাছ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহে বিভিন্ন নামে পরিচিত। ইন্দোনেশিয়ায় জাম্বু এয়ার, থাইল্যান্ডে চ্যাম্পু, তাইওয়ানে লেম্বু বা লিয়ান- উ। অন্যত্র ওয়াক্স অ্যাপল, লাভ অ্যাপল, জাভা অ্যাপল, বেল ফ্রুট, ওয়াটার অ্যাপল, মাউন্টেন অ্যাপল, ক্লাউড অ্যাপল, ওয়াক্স জাম্বু বা রোজ অ্যাপল।

সব দেশেই জামরুল ফল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তবে দক্ষিণ- পূর্ব এশিয় দ্বীপপুঞ্জের কিছু স্থানে স্যালাডে এই ফলটি ব্যবহার করা হয়। এছাড়া তাইওয়ানে এই গাছের ফুল জ্বর এবং ডায়ারিয়া রোধে ব্যবহৃত হয়।

মহাশ্বরোহ জাতক

নন্দিনী চট্টোপাধ্যায়

রাজা মহাশ্বারোহ ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছেন। কোনদিকে যাচ্ছেন নিজেই বুঝতে পারছেন না, শুধু জানেন বিদ্রোহীদের হাত থেকে পালাতে হবে যতদূর সম্ভব। সঙ্গের লোকজন কোথায় ছিটকে গেছে কে জানে।

কিন্তু কেন এমন হলো? তিনি তো যথাসম্ভব সুশাসনে দেশ চালাতে চেষ্টা করেন। বুক দিয়ে রক্ষা করেন প্রজাদের। লোকে তাঁকে বীর, বিচক্ষণ,প্রজাপালক বলেই মানে। তবে কী এমন হলো যে সীমান্ত প্রদেশের প্রজারা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল? সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে সারারাত ধরে রাজা ঘোড়া ছোটাচ্ছিলেন।

ভোরবেলা দূরে একটা গ্রাম দেখা গেল। যাওয়া কি উচিত হবে ওখানে? কিন্তু ক্লান্তিতে রাজার সর্বাঙ্গ ভেঙে আসছে। যা হয় হবে মনে করে রাজা ঘোড়া ছোটালেন সেই দিকে। দূর থেকে দেখলেন জনা তিরিশেক লোক কিছু করছে। রাজা কাছে আসতেই সবাই ভোজবাজির মতো মিলিয়ে গেলো। বাকি থাকলো শুধু একজন।

‘এরা কারা? বিদ্রোহীদলের কেউ কিনা কে জানে?’শংকার কালো মেঘ ছায়া ফেলে রাজার মনে।

‘তুমি কে হে? সাজপোশাক দেখে তো মনে হয় যুদ্ধ-টুদ্ধ করো বুঝি। সীমান্তে তো শুনি আবার যুদ্ধ লেগেছে, রাজামশাইও নাকি যুদ্ধে গেছেন। আমাদের এমন রাজা, তারও শত্রু!’-- কৌতূহলী লোকটির বিষণ্ন মুখ রাজাকে ভরসা জোগায়।

‘ঠিকই ধরেছ, আমি একজন সৈনিক।’

‘তা তো বুঝলাম; কিন্তু তুমি কোন দলের---রাজার না বিদ্রোহীদের?’

লোকটির প্রশ্নের উত্তরে রাজা এবার নির্ভয়ে জানান যে তিনি রাজার দলেরই একজন। রাজার কথা শুনে লোকটি ব্যস্ত হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি নিয়ে চলল নিজের বাড়িতে। তার আর তার বউ-এর সেবাযত্নে কদিনের মধ্যেই সেরে উঠলেন তিনি। কদিনের ভেতরেই দুজনের মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেল। রাজামশাই বলেন যুদ্ধের কথা, রাজধানীর খবর, তাঁর বাড়ি, দুই ছেলে, স্ত্রীর কথা। শুধু বলেন না তাঁর আসল পরিচয়। লোকটির কাছে গ্রামের খবর পান রাজা। জানলেন, গ্রামে আছে তিরিশ জন লোক,যারা রাজার হয়ে গ্রামের সব রকম উন্নতির কাজকর্ম করে, লোকটিও তার মধ্যে একজন। রাজার প্রশ্নের উত্তরে সে জানালো, ‘দুঃখের কথা কি বলি বন্ধু, রাজামশাইকে একবার চোখের দেখাও দেখলাম না।’ রাজা বললেন, ‘রাজামশাইকে দেখবে তো চল আমার বাড়িতে।’

এর কদিন বাদে বিদ্রোহ দমন হল। খবর পেয়ে রাজামশাই বিদায় নিয়ে চলে গেলেন তাঁর রাজধানীতে। যাবার সময় বারবার করে বন্ধুকে বলে গেলেন, ‘রাজধানীর দক্ষিণ দরজার দ্বারীকে আমার নাম করে বলবে মহাশ্বারোহের বাড়ি যাব, তাহলেই সে তোমাকে আমার বাড়িতে পৌঁছে দেবে।’

রাজা রাজধানীতে গিয়ে দক্ষিণ দরজার দ্বারীকে জানিয়ে রাখলেন যে কেউ যদি মহাশ্বারোহের বাড়ির খোঁজ করে তবে অবশ্যই যেন রাজবাড়িতে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু দিন যায়, কেউ আর আসেনা। রাজা তখন একটা ফন্দি আঁটলেন। ভাবলেন গ্রামের কর বাড়িয়ে দিলে নিশ্চয়ই লোকটি তাঁর কাছে আসবে। কিন্তু রাজার বোঝায় কিছু ভুল হয়েছিলো। তিনবার কর বাড়ানোর পরেও কেউ এলোনা তাঁর কাছে।

এদিকে ওই গ্রামের লোকেরা তো অবাক। খোঁজ নিয়ে জানা গেলো আশেপাশের কোনো গ্রামের কর তাদের মতো বাড়ছে না। তবে কি তাদের নামে রাজার কাছে মিথ্যে করে কেউ কিছু লাগিয়েছে? মহাশ্বারোহই কি তবে.....!তারা গেলো মহাশ্বরোহ যার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল সেই লোকটির কাছে, খুলে বললো তাদের সন্দেহের কথা।

বিশ্বাস করতে মন চায়না। তবু গ্রামের সকলের কথা ভেবে সে রাজি হলো বন্ধুর বাড়ি যেতে। আসল ঘটনাটা হয়তো জানা যাবে। তাছাড়া একটা সুরাহাও করা দরকার, বন্ধু যদি কিছু সাহায্য করতে পারে।

কিন্তু বারাণসী শহর জায়গা, সেখানে বন্ধুর বাড়ি যাবে; কিছু তো উপহার-টুপহার নিয়ে যাওয়া উচিত। গ্রামের মর্যাদার প্রশ্নও এটা। তাই গ্রামের লোকেরা তাদের যথাসাধ্য কাপড়-চোপড়, গয়নাগাঁটি জোগাড় করে দিলো মহাশ্বারোহ, তাঁর বৌ-ছেলেদের জন্যে। লোকটি তার বন্ধুর জন্যে তার বাড়িতে তৈরি মিষ্টি এবং নোনতা পিঠে নিতেও ভুললো না। তারপর একটা শুভদিন দেখে রওনা হলো বারাণসীর উদ্দেশ্যে।

যখনকার কথা বলছি তখন না ছিলো ট্রেন, না ছিলো বাস। লোকজন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেত পায়ে হেঁটে নয়ত গরুর গাড়িতে চেপে,কিম্বা নৌকোয়। আর যারা খুব বড়োলোক তারা যেত ঘোড়ায় চেপে বা পালকিতে। আমাদের এই লোকটি তো তত বড়োলোক নয়, তাই সে রওনা দিলো গরুর গাড়িতে। প্রায় মাসখানেক পরে সে পৌঁছলো বারাণসীর দক্ষিণ দ্বারে। বন্ধুর কথামতো সে মহাশ্বারোহর বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করতেই দ্বারী তাকে নিয়ে গেলো রাজার কাছে।

রাজা তখন অন্তঃপুরে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। দ্বারীর কাছে লোকটির আসার খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি এলেন তার কাছে। তার হাতদুটি ধরে বললেন,‘এতদিনে সময় হোলো বন্ধু!’

রাজ অন্তঃপুরের জাঁকজমকে লোকটি এতটাই অবাক হয়ে ছিলো যে তার মুখ থেকে কোনো কথাই সরলো না। সে অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে তার আনা জিনিসগুলো বের করলো। রাজামশাই সেগুলো পেয়ে এত খুশি হলেন যে লোকটি সেটা ভাবতেই পারেনি।

‘বন্ধু তুমি এখন খাওয়াদাওয়া করে বিশ্রাম নাও, পরে আবার দেখা হবে।’ রাজামশাই বিদায় নিলেন।

লোকটি ভাবলো তার এই বন্ধুটি রাজদরবারের হোমড়া-চোমড়া কেউ হবে। একে বললে কর কমাবার কিছু সুরাহা হলেও হতে পারে। পথশ্রমে আর অমন আতিথেয়তা পেয়ে লোকটি

অচিরেই ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম থেকে উঠে তৈরি হতেই একজন তাকে নিয়ে চললো মহাশ্বারোহের কাছে।

রাজসভায় পৌঁছে সে অবাক। এ কাকে সে দেখছে রাজ সিংহাসনে! চোখ কচলে ভালো করে তাকায় সে - মহাশ্বারোহই তো বসে আছেন ওখানে। পাশে মহারানি। নিজের চোখকে বিশ্বাস হয়না তার।

মহাশ্বারোহ নেমে আসেন সিংহাসন থেকে। হাত ধরে তাকে নিয়ে বসান তাঁর পাশের আসনটিতে। বলেন, 'আমার দুঃসময়ে তুমি আমার পরিচয় না জেনেও আমায় জায়গা দিয়েছিলে, সেবা করে সুস্থ করে তুলেছিলে আমায়। আজ থেকে তাই আর তুমি আমার প্রজা নও। আমার রাজ্যের একটি অংশ তোমাকে দিলাম,তুমি সেখানে রাজত্ব করো।' মহারাজ গ্রাম থেকে তার স্ত্রী-পরিবারকে আনানোর ব্যবস্থা করলেন।

রাজামশায়ের পুরোনো মন্ত্রী-অমাত্যেরা কিন্তু এই ব্যাপারটাকে ভালোভাবে নিল না। তারা নিজেদের মধ্যে ঘোঁট পাকাতে লাগল। হঠাৎ একটা লোক কোত্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসল এ কি তাদের ভালো লাগে? কুমারকেও তারা দলে টানল। বড় কুমার রাজাকে এই অসন্তোষের কথা জানালে রাজা সভা ডাকলেন। সভায় তিনি সব কথা জানিয়ে বললেন, 'আপনাদের বিচারে কী মনে হয় ,উনি কি আমার পরম মিত্র নন? আমি কি ওঁকে খুব বেশি কিছু দিয়েছি?'

সভার সকলের মাথা নিচু ।

বুদ্ধদেব তাঁর পূর্বজন্মের এই ঘটনা বলে শিক্ষা দিলেন---দুঃসময়ের বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু। সে জন্মে তিনি ছিলেন সেই রাজা আর তাঁর প্রধান শিষ্য আনন্দ ছিলেন সেই বন্ধু। আনন্দ সে জন্মেও তাঁর প্রকৃত বন্ধুই ছিলেন।

ছবিঃ অনুপম

আমি আর অজগর

স্বপ্না লাহিড়ী

ডিসেম্বর মাস প্রায় শেষের দিকে। কনকনে ঠান্ডা হাওয়া হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে। আমি ক্লাশের ফাঁকে রোদে দাঁড়িয়ে হাতপাগুলো একটু গরম করার চেষ্টা করছিলাম, তখন পেছন থেকে আওয়াজ এলো, ‘‘এ দিদি।’’

পেছন ফিরে তাকাতেই একমুখ হাসি নিয়ে সমারু এগিয়ে এসে আমাকে প্রণাম করে বলল, “দিদি তুহর বর কুছ লানে হঁ।” অর্থাৎ, তোর জন্যে কিছু এনেছি।

এই আদিবাসী ছেলেটি সাপ, ব্যাঙ, পাখি, খরগোশ, সজারু যা পেত তাই নিয়ে আসতো আমার কাছে।আমি সেগুলো ওর কাছ থেকে কিনে নিতাম ।কিছু আমার মিউজিয়মে রাখতাম বা অন্য কোন কাজে লাগাতাম, আর যেগুলো কাজে লাগতো না তাদের জঙ্গলে ছেড়ে দিতাম ।

আমি নব্বই দশকের প্রথম দিকের কথা বলছি। তখনো সরকারের এত নজর পড়েনি আদিবাসীদের শিক্ষা, সুখসুবিধার প্রতি। অন্তত আমাদের এই পাহাড়ি গ্রামটিতে নয়ই। তাই, হয়তো ক’টা টাকা ওর কাজে লাগতে পারে ভেবে , যা আনতো তাই কিনে নিতে চেষ্টা করতাম।

এত ঠান্ডাতেও শুধুমাত্র একটা হাফ হাতা টি শার্ট সামরুর পরণে। পিঠের ঝোলাটা বেশ বড়। দেখে মনে হল ভারীও হবে।

জিজ্ঞেস করলাম, ‘‘কী আছে রে এতে?’’

ও ঝোলাটা নামিয়ে মুখের বাঁধনটা খুলতে যাচ্ছিল, এমন সময় আমার কিছু উঁচু ক্লাশের ছাত্রছাত্রী এসে আমাকে ঘিরে দাঁড়ালো। আমরা প্রায় চার বছর ধরে 'এথনো মেডিসিন' বা 'লৌকিক ওষুধ' (মানে স্থানীয় আদিবাসী মানুষজনের মধ্যে প্রচলিত প্রাকৃতিক ওষুধ) বিষয়টির ওপর কাজ করছিলাম। আদিবাসী গ্রামগুলিতে গিয়ে সেখানকার বাইগা, যাঁরা আদিবাসীদের চিকিৎসাও করেন আবার পুজোপার্বনে পৌরহিত্যও করেন, তাঁদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে তাঁদের কাছ থেকে তাঁদের ওষুধপত্র ও চিকিৎসাপদ্ধতি সম্বন্ধে বিশদভাবে জানতে চেষ্টা করতাম।এঁরা বনেজঙ্গলে ঘুরে ঘুরে নানা রকম ফুল লতা পাতা গাছের ছাল শেকড় ইত্যাদি সংগ্রহ করে, তার থেকে ওষুধ বানিয়ে চিকিৎসা করেন।কখনো কখনো কিছু কিছু পশু পাখির রক্ত মাংস দিয়েও ওষুধ বানান।আমি এঁদেরকে নানারকম অসুখ সারাতে দেখেছি। সে প্রসঙ্গে আর এক দিন আসা যাবে।

আমি আমার ছাত্রদের বললাম, "দাঁড়া আগে সামারুকে ছেড়ে দিই।" ওরাও সবাই সামারুকে চিনতো। হইহই করে ঘিরে ধরলো ওকে কী এনেছে দেখার জন্যে।

ঝোলার মুখের বাঁধনটা খুলে দিতেই রোদে ঝক ঝক করে উঠলো কুন্ডলি পাকিয়ে থাকা বেশ বড়ো মাপের একটা অজগর সাপ।সাদা বাদামি হালকা ধূসর রঙের ওপর বড়ো বড়ো কালো কালো ছোপ, মাথাটা ঈষৎ তুলে নিষ্পলক চোখে আমাদের দেখছে।

সামারুকে জিজ্ঞেস করলাম, "এত বড় সাপটাকে তুই পেলি কোথায়? ধরলি কী করে? উত্তর পেলাম, এখান থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে দুটি পাহাড়ের মাঝে পাথরের একটা প্রাকৃতিক সেতু আছে। সাপটা সেখানেই লম্বা হয়ে রোদ পোহাচ্ছিল। ও আর ওর মা মিলে গিয়ে ধরেছে।

ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট রামচরণ সেদিন ছুটিতে ছিল, আর আমাদের পক্ষে অত বড় সাপটা সামলানোও সম্ভব ছিল না। শেষমেষ তাই সামারুকে কিছু টাকা দিয়ে পরের দিন এসে ওর ঝোলা ফেরৎ নিয়ে যেতে বললাম। সবাই মিলে সাপসহ ঝোলাটা আমার অফিসের দেয়ালে পোঁতা একটা শক্তপোক্ত পেরেকে টাঙিয়ে দিলো। আমাদের সাপ তার পেরেকে ঝোলানো হ্যামকে সারা রাত ধরে ঘুমোলো হয়তো।

পরের দিন সকালে ল্যাবে পৌঁছে দেখলাম রামচরণ আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। ছেলেরাও সবাই এসে গেছে। রামচরণকে বললাম ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করার ড্রামটা আনতে।

সে ড্রাম আসতে এবারে সাপটাকে সবাই মিলে ধরে ঝোলা থেকে ড্রামের মধ্যে ফেলে দিলাম। রামচরণ তাড়াতাড়ি বেশ খানিকটা তুলোতে ক্লোরোফর্ম দিয়ে ড্রামটা ঢেকে দিল। আধঘন্টা পরে দেখা গেল সাপটা তখনো ভাল করে অজ্ঞান হয় নি । কাজেই আরও আধ ঘন্টা সময় সাপটাকে দেওয়া হল।

সাপটা মাটিতে লম্বা হয়ে নিথর পড়েছিল। সবাইকে বললাম যে খোলা হাওয়াতে এত বড় সাপের ক্লোরোফর্মের ঘোর কাটতে কতটুকু সময় লাগতে পারে, তার আন্দাজ আমার একেবারই নেই। তাছাড়া অজগর বিষাক্ত না হলেও এর কামড় খুব কষ্টকর। এরা শিকার চিবিয়ে খায় না, আস্ত গিলে খায়। শিকারকে পেঁচিয়ে ধরে ওর শক্তিশালী পেশি দিয়ে নিরন্তর চাপ দিতে থাকে, তাতে পশুটির হৃৎপিন্ড, ফুসফুস কাজ করা বন্ধ করে দেয়। অবশেষে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে শিকার মরে যায়। এদের চোয়ালের গঠনটিও অন্যরকম। অনেকগুলি হাড় নেই অথবা তাদের গড়ণ বদলে গেছে। একটা ডান্ডার মত মতন কড্রেট নামের হাড়টি ওপর নিচের চোয়াল দুটিকে

হাল্কা ভাবে ধরে রাখে ও ঠোঁট দুটির মাঝামাঝি দুটি স্থিতিস্থাপক ঝিল্লি ওর মুখের হাঁ টিকে ওর থেকে তিনগুণ বড় শিকার আস্ত গিলতে সাহায্য করে।কাজেই সাবধান! আমরা তাড়াতাড়ি সাপটার মাপ নিলাম। লম্বায় সাড়ে ছ ফিটের একটু বেশি, আর প্রায় পৌনে দু ফিটের মতন মোটা ছিল আমাদের অজগর। পেটের মাঝখানটা একটু বেশি মোটা, হয়তো কিছু খেয়েছিলো যেটা তখনও হজম হয়নি। নীচের দিকটা হাল্কা লালচে ঘিয়ে রঙের।

স্থির করলাম সাপটাকে জঙ্গলে ছেড়ে আসাই ভালো, তবে যেখান থেকে এসেছিল সেখানে নয়, কারণ ঐ প্রাকৃতিক সেতুটি দিয়ে লোক জন রাতবিরেতেও যাতায়াত করে, বাচ্চারা খেলা করে, বউ ঝিয়েরা জল আনতে যায়।

মাইলতিনেক দূরে একটা পাহাড়ি ঝর্ণা আছে। তার নাম কেরা তুর্রা (এখানকার ভাষায় এরা ঝর্ণাকে তুর্রা বলে) ।সেখানেই সাপটাকে ছাড়া হবে ঠিক করা হল। ছুটির পরে অজগরকে থলের মধ্যে ভাল করে বেঁধে স্কুটারে আমার দু পায়ের মাঝখানে রেখে, রামচরণকে নিয়ে চললাম কেরা তুর্রায়। তখন রাস্তাঘাট এখনকার মতন এত ভালো ছিল না। ভাঙাচোরা উঁচুনিচু রাস্তা, কিন্তু তা সত্ত্বেও দু'পায়ে লেগে থাকা হিমশীতল স্পর্শ স্কুটারের গতি দ্বিগুণ করে দিলো।

কেরা তুর্রায় পৌঁছে নিজেকে ধাতস্থ করতে একটা পাথরের ওপর বসে পড়লাম। শাল, মহুয়া, অর্জুন, আমলকি গাছে ঘেরা জায়গাটি অতি মনোরম। পাহাড়ের গা থেকে মোটা ধারায় বেরিয়ে আসছে স্বচ্ছ শীতল জল, যা পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে নিচে চট্টানের ওপর আছড়ে পড়ছে। চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে ছোট বড় অনেক পাথরের ঢিবি। অন্য সময় হলে হয়তো এই অপরূপ সৌন্দর্যে মন ডুবিয়ে দিতাম। কিন্তু তখন আমার সে অবসর নেই। রামচরণ ততক্ষণে থলেটাকে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে তার বাঁধন খুলে দিয়েছে। সাপটা ছাড়া পেয়ে এ পাথর

ও পাথরের মধ্যে দিয়ে সরসর করে নিচের দিকে নেমে গেল। শীতের বেলা, ঝপ করে অন্ধকার নেমে আসে। ফেরার পথে দু ধারের গাছে ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকির সবুজ আলো, কালচে নীল আকাশে এক ফালি চাঁদ, আর দূরের কিছু তারা আমার সাথে সাথে চললো ।

ছবিঃ পিয়ালী মুখার্জি

ভারতের মানুষ ও না মানুষদের গল্প

জন লকউড কিপলিং
অনুবাদ পিয়ালী চক্রবর্তী

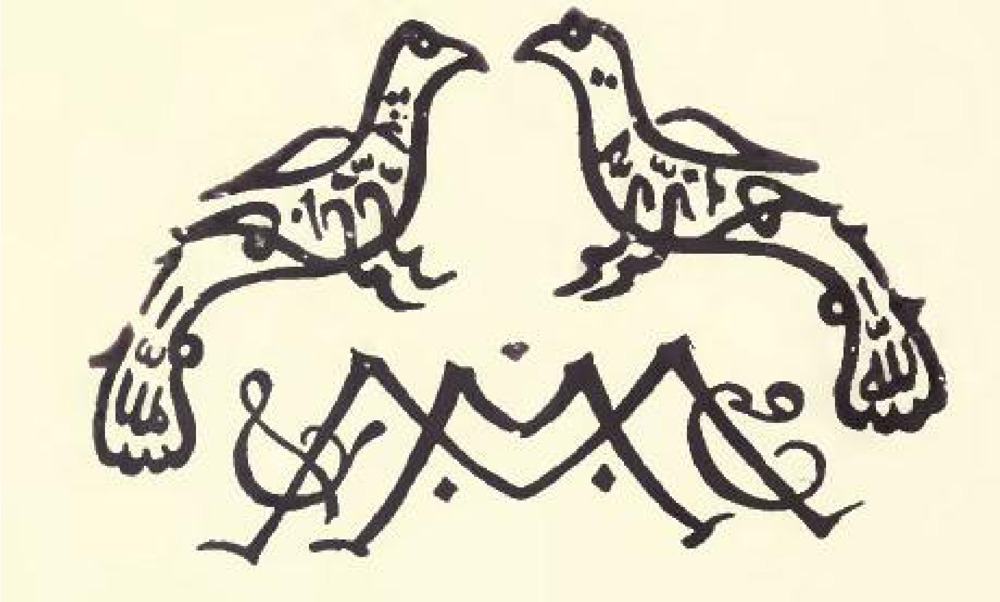

আমাদের দেশটা ভারী মজার। এ দেশে একদিকে যেমন বনের পশুপাখিকে নির্বিচারে মারা হয় আবার তেমনি অন্যদিকে তাদের সঙ্গে মানুষদের ভারী আত্মীয়তা। তাদের কাউকে সে ভগবান বলে পুজো করে, কাউকে আবার পুষ্যি বানিয়ে আদর করে, আবার কাউকে সে আবার বন্ধু বানিয়ে নিজের রুজিরোজগারের কাজে তার সাহায্যও নেয়।

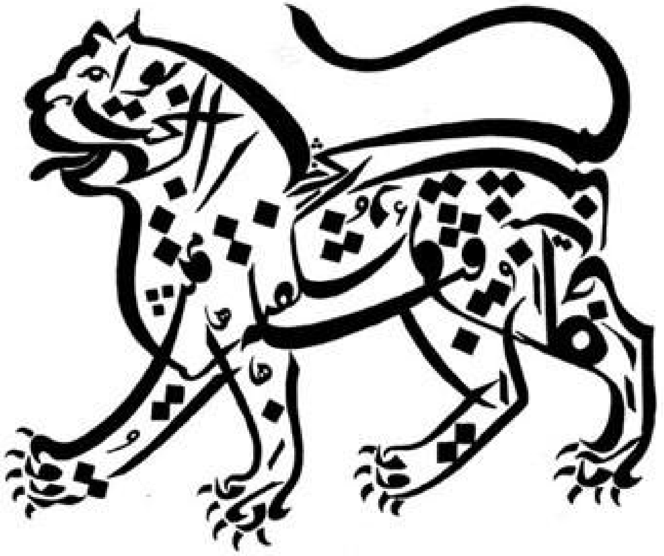

মানুষে ও পশুতে এই যে নানারঙের ভাবসাব এ দেশে, তাই নিয়ে ১৮৯১ সালে জন লকউড কিপলিং ভারী চমৎকার এক বই লিখেছিলেন। তার নাম "বিস্টস অ্যান্ড মেন ইন ইন্ডিয়া।" বনের ডায়েরির পাতায় এইবারে তা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করল।

প্রথম অধ্যায়

পাখির কথা

টিয়া পাখিঃ

কোন কোন ধর্মে এই বিশ্বাস আছে যে, স্বর্গ থেকে মানুষকে ঠোঁটে করে শস্য, বীজ এনে দেয় এক পাখি। সে মানুষের পরম বন্ধু। সবুজ রঙের শরীর, লাল টকটকে তার ঠোঁট। কোন পাখি বলত? ঠিক, টিয়া পাখি। যদিও অনেক রূপকথা, উপকথায় একে ঘাতক পাখি বলা হয়েছে, তবুও এই পাখি আমাদের ঘরের একজন। সবচেয়ে প্রিয় 'খাঁচার পাখি'।

শুধু কি এদেশের রূপকথা? বিদেশের কত গল্পগাথাতেও টিয়াপাখির উজ্জ্বল উপস্থিতি। লর্ড উইলিয়ম, মে কোলভিনের ব্যালাড, স্যার জনের অ্যাডভেঞ্চারে আছে টিয়াপাখি, সে বিদেশের বইতেও স্থান পেয়েছে। আমাদের দেশে অবশ্য বইয়ের পাতা ছেড়ে টিয়াপাখি আমাদের বাড়িরই এক সদস্য। যার বাড়িতে থাকা খুবই শুভ। সে কথা বলতে পারে, চিন্তা করতে পারে। আবার সে কি শুধুই এক সাধারণ পাখি? ভারতের ভালবাসার দেবতা কামদেবের বাহনও।

কিন্তু ভাবো একবার, আমরা কেমন নিষ্ঠুর। টিয়াপাখি ওর শক্ত ঠোঁট দিয়ে কাঠের খাঁচা ভেঙে ফেলতে পারে, তাই আমরা ওকে লোহার খাঁচায় আটকে রাখি। প্রচন্ড গরমে, খাঁচা তেতে ওঠে, ভিতরটা হয়ে যায় জ্বলন্ত উনুনের মত। পাখিগুলো ছটফট করতে থাকে, যেন বলতে চায় 'আমাদের ছেড়ে দাও'। আর আমরা শুধুই হাসি। আচ্ছা বল তো, আমাদের ভালো লাগার জন্য আমরা কি ওদের এতখানি কষ্ট দিতে পারি?

ভারতবর্ষে কত ভগবানের নাম শেখানো হয় টিয়াকে, রাম, গঙ্গারাম, শ্রী ভগবান আর টিয়া তাড়াতাড়ি শিখেও নেয়। আবার মুসলমানের ঘরের টিয়া বলে মিঞা, মিট্টু। আবার উত্তর ভারতে হিন্দু বাড়ির টিয়া ছড়া কাটে

'লতপত পঞ্ছী,
চতুর সুজন,
সব কা দাদা শ্রী ভগবান,
পড়ো গঙ্গারাম'

ছোট্ট মেয়েদের আদর করে বলে ছোট্ট টিয়া আবার দুই বাড়ির বউতে মিলে ঘাড় নেড়ে নেড়ে মিষ্টি মিষ্টি গল্প করলেও বলে টিয়া পাখির মত কথা বলছে।

কিন্তু যেই বলে 'টিয়াপাখির চোখ', উঁহু, সেটা কিন্তু মোটেই ভাল উপমা নয়। ভাবা হয় খুব অকৃতজ্ঞ, স্বার্থপর লোকেদের চোখ নাকি এমন হয়। কারণ ধর তুমি টিয়াপাখিকে খেতে দিয়ে, ভুল করে খাঁচার দরজা খুলে রেখে চলে গেছ, ওমনি সেও ফুরুত করে পালাবে, মনেই রাখবে না তুমি তাকে কত কথা শেখাও, গান শেখাও, ভালবাস। আসলে তুমি যখন টিয়াপাখির সাথে কথা বল, ওর স্বভাবই হল তোমার দিকে না তাকিয়ে অন্যদিকে তাকানো। মানে ভীষণ অন্যমনস্ক। আবার এই গান গল্পের নায়ক টিয়াপাখিই কিন্তু পরিবারের অনেক শিক্ষা- সহবতের অংশ হয়ে ওঠে। মা বাদামের কিছুটা তার সন্তানকে দিয়ে কিছুটা টিয়াপাখিকে দেয় যাতে করে ভাগ করে খাবার অভ্যেসটা তৈরি হয় বাচ্চার মধ্যে। আবার দরজার ওপর ঝোলানো টিয়াপাখির খাঁচার তলা দিয়ে বর- বৌ গেলে সেটা খুব শুভ, কিন্তু অন্য কেউ গেলে সেটা আবার অশুভ ধরা হয়।

একবার হল কি, পাহাড়ি এক রাজ্যের এক সরকারি হোমরাচোমরা গোছের লোকের বিয়ে ঠিক হল। বিয়ের দিন, তখনও বর যাত্রা শুরু করেনি, কি এক কাজে সে গেল অন্তঃপুরে তার এক পরিচিত মহিলার সাথে দেখা করতে। অমনি সেই মেয়ের সঙ্গী সাথীরা করল কি, দরজার ওপর দিল টিয়াপাখির খাঁচা ঝুলিয়ে। এইবার তো আর বিয়ের পাত্র সেই ঘর থেকে বেরোতে পারেনা, অন্য দরজাও নেই। এদিকে বিয়ের দিন। খাঁচার তলা দিয়েও বেরোনো যাবে না। সবার সে কি চিন্তা। তবে কি ছাদ ফুটো করে বের করা হবে? এবার তো পারিষদেরা অনেক উপায় করে শেষমেশ এল এক বুড়ো উজিরের কাছে। উজির বলল 'কই আমার আবার দৃষ্টি খাটো, কিন্তু তবুও তো আমি কোন খাঁচা দেখতে পাচ্ছিনা। তখন আবার সকলে ফিরে গিয়ে দেখে সত্যি তো খাঁচা নেই। ব্যাস রাজাকেও উদ্ধার করা হল।

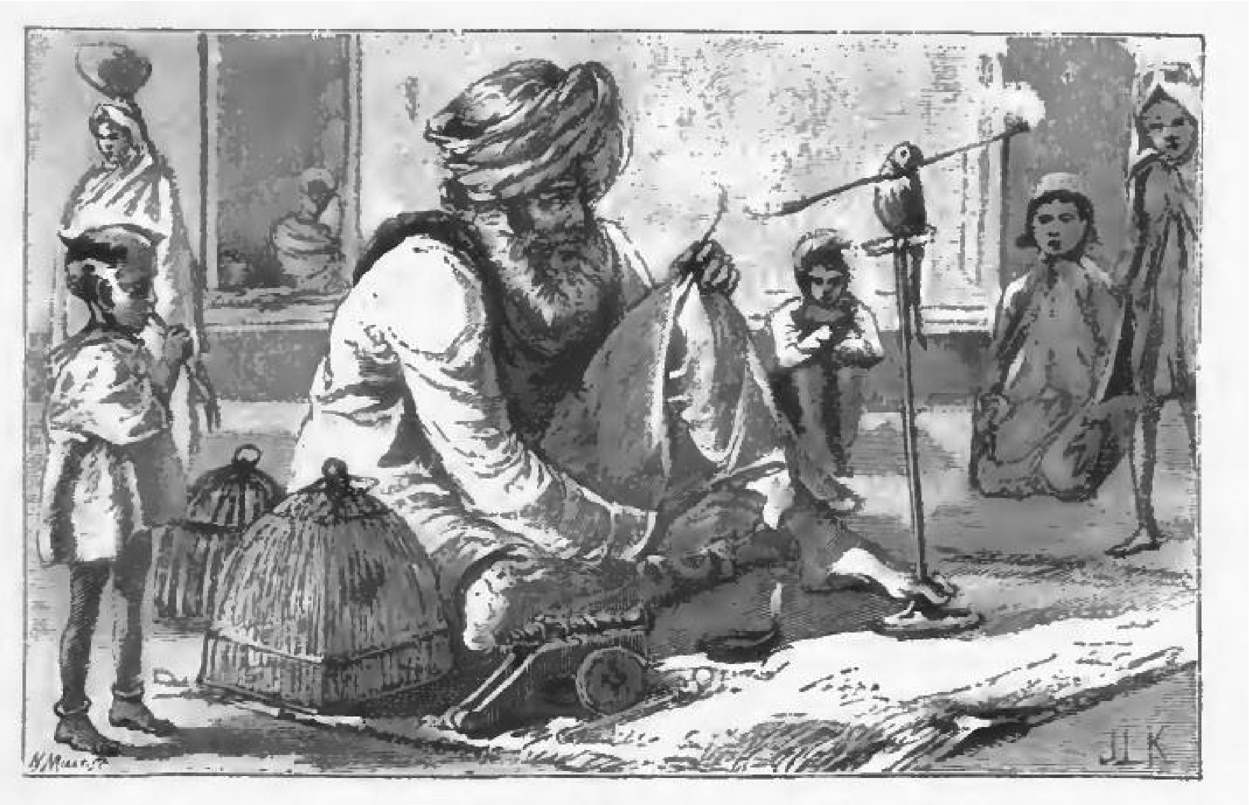

টিয়াপাখিরা কিন্তু আবার জিমন্যাস্টিক করে। আর লোকজনকে করেও দেখায়। এমনটা দিল্লীর রাস্তায় প্রায়ই দেখা যায়। সে মিলিটারিদের মত ব্যায়াম করছে, ছোট টর্চ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জ্বালিয়ে দিচ্ছে। কামানের পিছনে বারুদ ভরে, আগুন লাগিয়ে তোপ দেগে দিল। দিয়েই অমনি নিজে মরে গেল, আবার বেঁচে উঠল, ভারি মজার খেলাগুলো। কিন্তু ভারতের টিয়াপাখিদের বলার ক্ষমতা নাকি বাইরের দেশের টিয়াপাখিদের থেকে কম হয়।

ভারতবর্ষে কাজ করতে আসা ইংরেজ সৈন্যরা অবসরে প্রজাপতি ধরে জমায় বা পাখি ধরে ফাঁদ পেতে। আবার কেউ কেউ বুলি শেখায় টিয়াপাখিকে। এটা ভাবা হয় যে অন্ধকার নিঝুম ঘরে নিয়ে গেলে টিয়া নাকি তাড়াতাড়ি কথা বলে। তাই সেই সময় সৈন্যরা একটা কুয়োর মধ্যে খাঁচাটাকে অর্ধেক ঝুলিয়ে রেখে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে কথা বলা শেখায়। কারণ তাদের নিজেদের ব্যারাকে এমন কোন ঘর নেই। এটা খুবই ধৈর্যের কাজ। কোনদিন এদেশের কোন দেশি লোককে একাজ করতে দেখা যায়নি।

পরের সংখ্যায়ঃ আরো সব পাখির খবর

ছবিঃ মূল গ্রন্থ

নাগাল্যান্ডের জীববৈচিত্র

মণিপুরের মতো নাগাল্যান্ড সম্পর্কেও কোনো উল্লেখ নেই যে এই বন ইন্দো-বার্মা বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের অন্তর্গত কিনা। তবে নাগাল্যান্ডের উত্তর-পুর্ব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বিস্তৃত শৈলশিরা মূলত মায়ানমারে আরাকান ইয়োমা পর্বত হিসেবে পরিচিত।

নাগাল্যান্ডের ভূভাগের অর্ধেকের বেশি নথিবদ্ধ বনভূমি। তার পরিমাণ ৯২২২ বর্গ কিলোমিটার। কিন্তু সংরক্ষিত বনাঞ্চলের মাত্র ০.৯৩ শতাংশ রিজার্ভ ফরেস্ট এবং ৫.৫১ শতাংশ প্রোটেক্টেড ফরেস্ট। এর মধ্যেই আছে নাগাল্যান্ডের একমাত্র জাতীয় উদ্যানটি আর তাছাড়া আছে তিনটে অভয়ারণ্য। আবার উপগ্রহ থেকে পাওয়া তথ্যানুসারে অতি ঘন বন আছে রাজ্যের ১২৯৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকায়, মাঝারি ঘনত্বের বন আছে ৪৯৩১ বর্গ কিলোমিটার এলাকায়। মুক্ত বনাঞ্চল আছে ৭০৯৪ বর্গ কিলোমিটার এলাকায়। সব মিলিয়ে মোট বনাঞ্চল রাজ্যের মূল ভূভাগের আশি শতাংশেরও বেশি। তবুও আয়তনে এই বন বিস্তৃত নয়। ফলে এই এলাকার গাছপালা আর পশুরাও এই বনের উপযোগী আবহাওয়ায় সীমাবদ্ধ। তাই সেই সমস্ত প্রজাতির গাছপালা আর পশুদের জীবন সংরক্ষণের জন্যই এই বনের সংরক্ষণ জরুরি।

এখানে আবহাওয়া ক্রান্তীয় থেকে উপক্রান্তীয়। কারণ সমুদ্রতল থেকে ভূভাগের উচ্চতা ১৯৪ মিটার থেকে ৩৮২৬ মিটার। আবার গড় বৃষ্টিপাত ২০০০ মিলিমিটার। দিন-রাতের তাপমাত্রায় বিশেষ তফাত হয় না তবে শীত-গ্রীষ্মের তাপমাত্রার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সীমার ব্যবধান বেশ বড়ো। যেমন বেশি উচ্চতায় শীতকালে বরফ না পড়লেও জলীয় বাষ্প এবং নদী জমে যায়। ফলে বেশি উচ্চতার গাছপালা এমন হয় যা তাদের পাতায় কাণ্ডে মূলে থাকা কোষের জলীয় অংশের জমাট বাধা ও গলনের সাথে যুঝতে পারে।

তাই এখানে কম উচ্চতার এলাকার বনাঞ্চলে যেমন ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বনের মেহগনির ঢল দেখা যায়, তেমনই ঝুকৌ (ডুকৌ?) উপত্যকায় দেখা যায় উপক্রান্তীয় দীর্ঘপত্রী পার্বত্য রডোডেন্ড্রন। শীতে ঝুকৌ (ডুকৌ?) নদীটা জমাট হয়ে যায়। তবে বনবিদ চ্যাম্পিয়ন ও শেঠের বিবরণ অনুসারে এখানে মূলত সাত রকমের বন পাওয়া যায়, যেমন, নিরক্ষীয় আর্দ্র চিরহরিৎ বন, ক্রান্তীয় প্রায় চিরহরিৎ বন, ক্রান্তীয় আর্দ্র পর্ণমোচী বন, উপক্রান্তীয় দীর্ঘপত্রী পার্বত্য বন, উপক্রান্তীয় পাইন বন ও পার্বত্য আর্দ্র নাতিশীতোষ্ণ বন। তাছাড়া এখানে নানান ধরণের বাঁশও পাওয়া যায়।

ইন্টাঙ্কি জাতীয় উদ্যান নাগাল্যান্ডের একমাত্র জাতীয় উদ্যান। সংরক্ষিত পশুর মধ্যে মুখ্য হলো হুলক গিবন নামের বাঁদর, বাঘ, স্লথ ভালুক, সুবর্ণ বানর, ভাম, কালো সারস, সাদা বুক মাছরাঙা, অজগর সাপ এবং গোসাপ। তিনটি অভয়ারণ্য হলো পাবলি- বাদঝে অভয়ারণ্য, রাঙাপাহাড় অভয়ারণ্য এবং ফাকিম অভয়ারণ্য। কোহিমার কাছে ৯.২৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় পাবলি- বাদঝে অভয়ারণ্য গুরুত্বপূর্ণ ট্র্যাগোপ্যান আর কালিজ নামে পেখমওয়ালা রঙিন দুই পাখির জন্য। ডিমাপুরের কাছে ৪.০৭ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে থাকা রাঙাপাহাড় অভয়ারণ্যে ট্র্যাগোপ্যান ছাড়াও বাঘ, ভালুক আর হরিণ আছে। টুয়েনসাং জেলার ফাকিম অভয়ারণ্যে ৬. ৪২ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে আছে বাঘ, হুলক গিবনের বাস।

ট্র্যাগোপ্যান

পুরো রাজ্যের নানা বনেই দেখা মেলে কুকুর জাতীয় প্রাণীর, হাতির, চিতার, প্যাঙ্গোলিনের, সজারুর, ভালুকের আর সাম্বারের। আবার মিথুন বা গয়াল নামের একজাতীয় প্রায় গৃহপালিত গাউরের দেখাও পাওয়া যায় এখানে। এখানে ছাড়া এদের পাওয়া যায় বাংলাদেশে, মায়ানমারের উত্তরে আর চিনের ইউনান প্রদেশে। নাগাল্যান্ডে আর পাওয়া যায় আশ্চর্য পাখি হর্নবিল। এই পাখিও ট্র্যাগোপ্যান বা ব্লাইথ্স ট্র্যাগোপ্যানের মতোই ভারতের সংরক্ষিত পাখিদের তালিকায় জায়গা পেয়েছে এর সংখ্যা কম হওয়ার কারণে। সারা পৃথিবীর মাত্র আড়াই হাজার ব্লাইথ্স ট্র্যাগোপ্যানের এক হাজারই দেখা যায় নাগাল্যান্ডে।

আবার ঝুকৌ (ডুকৌ?) উপত্যকার বুনো ফুলের প্রজাতি বৈচিত্র বিস্ময়কর। কিন্তু তাদের বাস এই এলাকাতেই সীমাবদ্ধ। কপৌ ফুল বা রিঙ্কোস্টিলিস রেটুসা নামে অর্কিডের ফুল এই এলকায় খুবই জনপ্রিয়। নাগাল্যান্ডে তিনশ ছিয়ানব্বই প্রজাতির অর্কিড পাওয়া যায়। এদের মধ্যে চুয়ান্ন প্রজাতির অর্কিডের ভেষজ এবং অর্থকরী গুরুত্ব প্রমাণিত।

নাগাল্যন্ডে অবশ্য অতিঘন বনের পরিমাণ ও মাঝারি ঘন বনের পরিমাণের তুলনায় উন্মুক্ত বন কমছে। তার কারণ মূলত ঝুম চাষে ক্রমশ বেশি বেশি উন্মুক্ত বন ব্যবহারের প্রচলন বাড়ছে। তাই উন্মুক্ত বনের পরিমাণে ঘাটতি দেখা দিয়েছে।

স্পুকবুক

আবু হোসেন

সময়টময় বদলে গেছে দিন এসেছে খাসা
স্কাইস্ক্র্যাপারের লোহার বিমে ভূতপেত্নীর বাসা
জানলা দিয়ে দেখেন তাঁরা হিউম্যানিটির সুখ
ইচ্ছে হলেই স্কাইপে কথা অথবা ফেসবুক
এমন সময় মহান আত্মা কবীন্দ্রনাথ রবি
দেখে এলেন ' ভূতের ভবি ষ্যৎ' নামে এক ছবি
সেখান থেকেই ইনস্পিরেশান জুটলো যতটুক
তৈরি হল জাল সোসাইটি, দুরন্ত স্পুকবুক
স্টিভ জোবসের প্রোগ্রামিং আর সাইট চালান যম
ঠিকানা চাও? তিন ডবলু স্পুকবুক ডট কম

দুগ্‌গা মাগো, সত্যি বলো

অচিন্ত্য সুরাল

দুগ্‌গাপুজোর একটা পিঠে রঙের আঁকিবুঁকি
কিন্তু যখন ঢাকের আওয়াজ থামে
উল্টোপিঠে গিয়ে আমি একটুকু দিই উঁকি
তখন দেখি আবছামত সারি সারি মুখ,
চোখগুলো সব ভিজে
আমার দিকে তাকিয়ে থাকে
কী যে হয় তখন আমার ঠিক জানি না কী যে
আবছামত ওদের কথা বলব আমি কাকে

ঢাকগুলো ফের বাজতে থাকে
পা দুটো ফের নাচতে থাকে
নাচের তাল- বেতালে
উল্টোপিঠের আবছামত মুখগুলো যাই ভুলে
বন্ধুরা সব নতুন সাজে
পুজোর রঙিন আলোয় আলো ফেলে
ঘুরতে থাকি খুশির ডানা মেলে

রাতের বেলায় যখন আমি
গা এলিয়ে নরম বিছানাতে
আবছামত মুখগুলো ফের ঘরের জানালাতে
উঁকি দিয়ে চেয়ে থাকে, নিজের কাছেই ধরা পড়ি
আমার তখন ছটফটানি, কী যে আমি করি
মনখারাপের নানান ভাঁজে
ঘোরাফেরা করতে থাকি, ঢাকের আওয়াজ
মাথার ভেতর ভিন্নসুরে বাজে

তুমি এলে সবাই ওঠে মেতে
সবাই নাকি থাকে আনন্দেতে
তবে তোমার এত আলো, শিউলি কাশের
এমন এ উৎসবে
আবছামত যারা তাদের মুখগুলো সব
আবছা কেন হবে
দুগ্‌গা মা গো, সত্যি বলো সবার ঘরেই
তোমার আসন পাতা?
তুমিই সর্বমঙ্গলা আর তুমিই জগৎ মাতা
সবাই যদি তোমার আপন সবাই তোমার চেনা
তবে তোমার ঝলমলানো আলোয় মাখা পিঠে
আবছামত ওরা কেন একবারও আসছে না?

ছবিঃ অন্তরা

গুগলি

আশুতোষ ভট্টাচার্য

গুগলি খেতে হুগলী যাবার পথে
কাতলা মাছে মাতলা নদীর পাড়ে
ট্যাংরা কেন খ্যাংরা কাঠির সাথে
রাগবি খেলে রাতের অন্ধকারে।।

ফড়িং বলে বোরিং যখন লাগে
আকাশ পানে তাকাস দুএক বার
পারশে ছোটে জোরসে সবার আগে
নামতা পড়ে শোনায় বারংবার।।

চিংড়ি ভাবে ইংরিজিতে কথা
বিদেশ গেলে বলতে হতেই পারে
সাহেব,   সুবো কায়দা কানুন প্রথা
গ্রামার তবে শিখবে পরের বারে।।

পাবদা সে তো জাবদা খাতায় লিখে
রাখছে দেখি অঙ্ক ভূগোল ছড়া
ইলিশ ঘুমে স্বপ্ন সাঁতার শিখে
ছুটির দিনে খাচ্ছে ডালের বড়া।।

ভাবছ বুঝি এসব ভীষণ সোজা
চিতল মাছে পিতল কানের দুল
মৌরলা ঠিক হাজার কাজের বোঝা
নিয়েই বলে আবার হিসেব ভুল।।

মাগুর শিঙি এলিট কেলাস বটে
ইচ্ছে মতো বেড়ায় তেপান্তরে
মিলছে নাতো এখন যেসব ঘটে
ঘুমিয়ে থাকে নেহাত পাতাল ঘরে।।

আগেই বলি সত্যি এসব খাঁটি
ভেজাল আমি মেশাই নিতো কোন
নইলে দেখ আনন্দটাই মাটি
মিথ্যে কথা বলবে না কক্ষনো।।

ছবিঃ সৌভিক

পুজোর ছুটি

প্রকল্প ভট্টাচার্য

পুজোর ছুটিতে কেউ উটি যেতে চায় না।
কাকিমারা কাকিনাড়া যাবে, কি আনন্দ,
ছোটকাকা বলে ফাঁকা জায়গা পছন্দ;
মাসিমারা হাসিমারা যাবে বলে বায়না।
মামা যাবে পুরী, সাথে হামাগুড়ি বাচ্চা।
মামী বলে 'আমি একা নেব কত ঝক্কি!'
হাতে হাতে সামলাতে সাথে যাবে লক্ষ্মী,
তাতেও হয়নি রাজি, শেষে বলে 'আচ্ছা!'
পাহাড়ে বেড়ালে বাড়ে ছোড়দির সর্দি।
এই শুনে দাদা একগাদা সাদা রাংতা
মুড়ে পাহাড়ের চুড়ো করে (কী ফ্যাচাং তা!)
বলে 'দ্যাখ, এহি পর হিমালয় কর দি!'

এইতালে জুটি বেঁধে চল মোরা দুটিতে,
ছুটি পেলে স্কুটি নিয়ে ঘুরে আসি উটিতে!!

ছবি সংঘমিত্রা

আকাশ

রুচিস্মিতা ঘোষ

পিঁপড়ে বলে, হাতীদাদা চড়ব তোমার পিঠে
হাতী বলে, পিঠটা আমার নয়কো মোটে মিঠে।
পিঁপড়ে বলে, পিঠটা তোমার অনেক উঁচু তাই
মাটি ছেড়ে সেই উঁচুতে দেখব আকাশটাই।
হাতী বলে, আকাশ দেখার সাধ হয়েছে তোর?
আমার পিঠে চড়তে গেলে রাত হবে যে ভোর।
সূয্যিমামা রঙের খেলা খেলবে আকাশ জুড়ে
বিভোর হয়ে দেখিস তখন, নয় সে বেশি দূরে।
পিঁপড়ে বলে,অনেকদিনের সাধ মেটাব ভাই
হাতীদাদা বড্ড ভাল, তোমার জুড়ি নাই।
ছোট্ট পায়ে পিঁপড়ে হাঁটে, চড়ছে হাতীর পিঠে
সুড়সুড়িতে হাতীদাদার ঘুমটি হবে মিঠে।

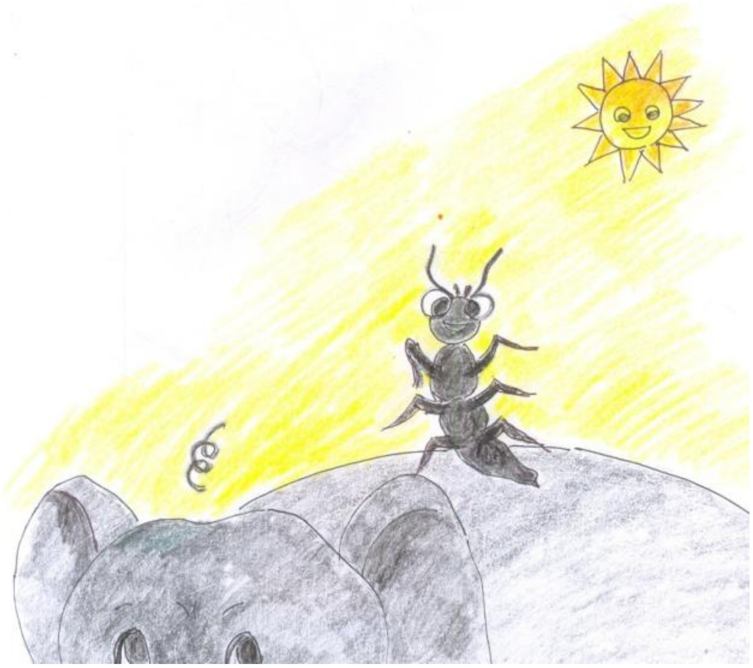

ছবিঃ সংঘমিত্রা

আইন জারি

তরুণকুমার সরখেল

গাঁয়ের মোড়ল সবকে ডেকে আইন জারি করে
ভুলেও যেন আখের পানা খাবে না পেট ভরে
কেউ যদি খায় ফাইন হবে রাখুন সবাই জেনে
(কেউ খাবেনা মোড়লকে সব হাড়ে হাড়েই চেনে)
বুদ্ধি কমে ওজন বাড়ে অকালে চুল পড়ে
গ্যাস অম্বল লেগেই থাকে দাঁত ক'পাটি নড়ে
সেই মত সব গাঁয়ের লোকে খায়না আখের পানা
আর কেউ নয় মোড়ল ভায়ার স্বয়ং যখন মানা

ছবিঃ সৌভিক

আদর পেয়ে

তোফায়েল তফাজ্জল

আদর পেয়ে একরোখা মন বানর সেজে গেছে
সুযোগ পেলেই সময় কাটায় গাছে নেচে নেচে।
পেয়ারা খায়, পটল ছেঁড়ে কলা কাড়ে পথে
খেলনা কাড়ে ঝুড়ি থেকে রুপুর উল্টো রথে।

ডালে বসে ভেংচি কাটে ফেরত দিতে বললে
রুটি বা ডাল হাতিয়ে নেয় কেউ একাকি চললে।
মুড়ি চিঁড়ে মুড়কি নিয়ে করে কাড়াকাড়ি
খামচিয়ে দেয়, চুল ছিঁড়ে নেয় করলে বাড়াবাড়ি।

চানাচুরের প্যাকেট নিয়ে করে টানাটানি
বক দেখিয়ে, ফোড়ন কেটে লাগায় হানাহানি।

ঢিল দিলে মন এমন ভাবে মাত্রা ছেড়ে যায়
এদিক সেদিক খেতে খেতে নিজের কপাল খায়।

ছবিঃ ইন্দ্রশেখর

সোনামোতি মেয়ে

ইন্দ্রাণী সরকার

সোনামোতি সোনার মেয়ে বল্ দেখি তুই কার ?
কাজল কালো মেঘের নাকি কুসুম আকাশটার ?
সাত রঙা ওই রামধনুর না দূরের পাহাড়টার ?
রূপসা রুপো চাঁদের নাকি ওই নীহারিকার ?
তিরতিরে ওই ঝর্নার, না জংলি ঝোরাটার ?
পদ্ম ফুলের পাপড়ির না দুষ্টু ভোমরাটার ?

সোনামেয়ে বললো হেসে,   মেঘের কাজল পরি,
চাঁদ পাহাড়ে পৌঁছিয়ে যাই খেলতে লুকোচুরি |
রামধনু রঙ গায়ে মেখে যাই তারাদের বাড়ি ,
কুসুম আকাশ পেরিয়ে দিই নীহারিকায় পাড়ি |
ঝর্নাজলে গা ভিজিয়ে জংলি ঝোরায় খেলি
পদ্মফুলের পরাগ মেখে ভোমরা- পাখা মেলি ||

ছবিঃ সংঘমিত্রা

সোনামণির দুর্গা দেখা

তাপস শংকর ব্রহ্মচারী

সরস্বতীর বাহন রাজহাঁস, হাতে থাকে বীণা
বলতে পারেন উনিই তোমার বিদ্যা হবে কি না।
লক্ষ্মীঠাকুর সুখেই থাকেন প্যাঁচা নিয়ে পাশে
টাকাপয়সা মনে রেখো ওঁর দয়াতেই আসে
কাঁধে রেখে তীরের বোঝা ধনুক নিয়ে হাতে
কার্তিকেয় যুদ্ধ করেন দুষ্টু লোকের সাথে
গণেশদাদার পেটটি নাদা নাকে বিরাট শুঁড়
পেল্লায় ওই গণেশদাদার বাহনটি ইঁদুর
দুর্গাঠাকুর এই চারটি ছেলেমেয়ে নিয়ে
অসুরটাকে বেজায় মারেন দশখানা হাত দিয়ে
দুর্গামায়ের দশখানা হাত বিশ্বাস না হলে
চন্ডীতলার মন্ডপেতে এক্ষুণি যাও চলে
এক এক করে হাতগুলো সব গুণে গুণে দেখো
সিংহটা খুব রাগী কিন্তু ওকে দূরেই রেখো
বদমায়েশি করলে পরে ফলখানা কী হয়
অসুরটাকে দেখে তুমি বুঝেছ নিশ্চয়
লেখাপড়া করব আমি হবই ভালো মেয়ে
সবকিছুতেই সেরা হব অন্য সবার চেয়ে
এসব কথা দুগ্‌গা মাকে বলো প্রণাম করে
মাথার থেকে দুষ্টুমিটা যায় মা যেন সরে
"বুঝেছি সব" মিষ্টি হেসে বলল সোনামণি
"দেরি হয়ে যাচ্ছে দাদু চলো না এক্ষুণি
বলছ যা সব বলব সবই ভুলব নাকো জেনো
সবার আগে এখন তুমি ক্যাডবেরিটা কেনো।

ছবিঃ সংঘমিত্রা

রাতের ঘোরা

মনসুর আজিজ

মধ্যরাতে
আমার হাতে
গোলাপকুঁড়ি
পথের নুড়ি
মাথার পরে
চাঁদের হাসি
গলির মোড়ে
ফুঁ দেয় বাঁশি
তড়াক করে
আমায় ধরে
নাম পরিচয়
অজানা নয়
ছাড়লো তবু
আবার কভু
রাত দুপুরে
আসলে দূরে
নালিশ দেব
তোমার মাকে
আরেক দেব
সেজান দা'কে
পাহারাদার
বলে আবার
ভয় না করে
জলদি যা রে
সেদিন ঘরে
আসলে পরে
ঠাসঠাস ঠুস
মেরে বেহুঁশ
করলো মোরে
বলেও যা তা
মায় আমারে
গেছিস কোথা
ভয় পেয়ে যে
বিষম লাজে
মনটা হলো
ভীষণ কড়া
বাতিল হলো
রাতের ঘোরা।

ছবি মলয়চন্দন সাহা

পল্টুদার ধাঁধা

জয় মুস্তাফী

এক:

আবার পল্টুদা... একমাস পরে দেখা হল। "কী খবর পল্টুদা? এখন নাকি কোলকাতায় খুব গরম?" জিজ্ঞেস করায় বলল - "নিঃশ্বাস নেওয়ার সময় নেই... এক মিনিটের মধ্যে একশ'টা আলাদা আলাদা ইংরেজি শব্দ বল দেখি, যার একটার মধ্যেও কিন্তু 'এ' 'বি' 'সি' 'ডি' থাকতে পারবে না... তার পর বাকি কথা!"

কি মুশকিল... আমি তো ভেবে চিন্তে বলে দিলুম! তোমরাও চেষ্টা করে জানিও তাহলে...

দুই:

পল্টুদা গাড়ি কিনেছে... তার জন্য আগেই নাকি "টেস্ট ড্রাইভ" দিয়ে হিসেব করে নিয়েছে গাড়ির "অ্যাভারেজ স্পিড"। বিকেলবেলায় ঘন্টায় তিরিশ কিলোমিটার বেগে, একটু দুরে একটা জায়গায় গিয়ে, ঘন্টায় ষাট কিলোমিটার বেগে সন্ধেবেলায় ফিরে এল। "মানে, আপনার গড়পরতায় ৪৫ কি.মি. প্রতি ঘন্টা পড়ল!" - এ কথা পল্টুদা মানতে নারাজ... তোমরা মানছ?

তিন:

"শুধু দুটো কাঠিতে হাত দিতে পারবে... আর এই বলটা গ্লাসের বাইরে আনতে হবে! বলটা কিন্তু ছোঁয়া চলবে না..." মনে করিয়ে দিল পল্টুদা!

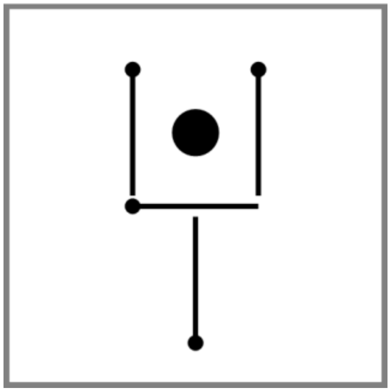

কুইজ

কত সাহসী তুমি? মিথ্যে কথা বলো? তুমি কি সাবধানী মানুষ? তিনটে প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে এই কুইজটা করে ফেলো।

১। ঝড়বৃষ্টির রাতে একলা বাড়িতে ভূতের সিনেমা দেখে ফেলবার পর তুমি ঘুমোতে পারো?
(ক) না। (খ) হ্যাঁ। মাথায় কম্বল মুড়ি দিয়ে (গ) ঘুমুই না , আরেকটা ভূতের ছবি দেখি

২। রাতে পাশের খালি ঘরে ক্যাঁচকোঁচ শব্দ পেলে তুমি কী ভাবো?
(ক) জ্বালালে দেখছি। ঘুমুই কীকরে? (খ) মোবাইলে মাকে পাশের ঘরে ফোন করি (গ) উঠে দেখতে যাই

৩। বাবার সঙ্গে শুয়ে আছো। পাশের ঘরে ক্যাঁচকোঁচ। কী করবে?
(ক) বাবাকে ডাকবো, তারপর চুপ করে শুয়ে থাকবো (খ) কে রে তুই বলে চিৎকার করব (গ) উঠে দেখতে যাবো

৪।একা থাকলে লাইট জ্বেলে শোও নাকি?
(ক)হ্যাঁ (খ) না (গ) ভূতের সিনেমা দেখলে তবেই

৫। একটা ভূতুরে বাড়িতে গেছ দুই বন্ধু মিলে রাত কাটাতে। সন্ধের পর বন্ধু ঘুরে আসছি বলে পালিয়ে গেল। তুমি কী করবে?
(ক) পালাবো (খ) থেকে যাবো (গ) মাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করব কী করা উচিৎ

৬। রাতে অন্ধকার ঘরে ঢুকলে কী মনে হয়
(ক) এই বুঝি কেউ হাত ধরল (খ) ধুস , কী অন্ধকার (গ) চোর নেই তো?

৭। "এ মন্দিরে ভূত আছে," বেড়াতে গিয়ে গাইড তোমায় বলল সন্ধের মুখে। কী করবে?
(ক) বাইরে একা দাঁড়িয়ে থাকবো (খ) ঢুকে একটু দেখেই এক দৌড়ে বেরিয়ে আসবো (গ)রামরাম বলতে বলতে ঢুকে পড়ব।
৮। বাবা নতুন ফ্ল্যাট কিনছে বেজায় সস্তায়। ভারী সুন্দর ফ্ল্যাট। তোমার মনোমত। তবে সস্তা কারণ কদিন আগে ওখানে একটা সুইসাইড হয়েছে আর তাই কেউ কিনতে চাইছে না। তুমি কি রাজি?
(ক) রাজি। তবে ওঝা ডেকে ভূত তাড়াবো। (খ) একদিন কাটিয়ে দেখে নেবো (গ) সস্তায় যখন পাচ্ছি তখন—
৯। রাতে একা একা বাড়ি ফিরতে হলে কী মনে হয়?
(ক) উপায় নেই। যেতেই হবে (খ) একটু গান গাই (গ) ডাইনে বাঁয়ে পেছনে তাকাতে তাকাতে আসি

জানো কী?

১। শতকরা ১১ ভাগ মানুষ বাঁ হাতি
২। আগস্ট মাসে সবচেয়ে বেশি মানুষ জন্মায়
৩। লালার সঙ্গে না মেশা অবধি খাবারের স্বাদ পাওয়া যায় না।
৪। শোয়ার পর থেকে ঘুম আসতে একজন মানুষের গড়ে সাত মিনিট সময় লাগে
৫। ভালুকের বেয়াল্লিশটা দাঁত হয়
৬। অস্ট্রিচের চোখ তার মস্তিষ্কের চেয়ে আয়তনে বড়
৭। কোন দুখানা কর্ন।ফ্লেকের টুকরো এক চেহারার হয় না।
৮। শতকরা আট ভাগ মানুষের একটা অতিরিক্ত পাঁজর থাকে
৯। শতকরা ৮৫ ভাগ গাছ সামুদ্রিক
১০। হাওয়াইএর বর্ণমালায় বারোটা অক্ষর।

ড্রুডল

বলোতো এটা কীসের ছবি?

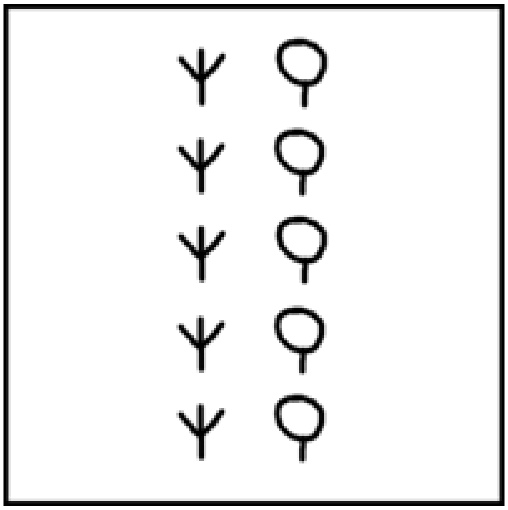

কীসের ফটো

এটা কীসের ফটো?

শব্দখেলা

১। ইবাবু অল্প লালে বু ১০০০০০- এ O না।

২। হা১৩ ওয় ভা১৩

৩।মাফারবডি উপাসনা

৪। আ বোল

৫। গ

আশ্চর্য উলকি

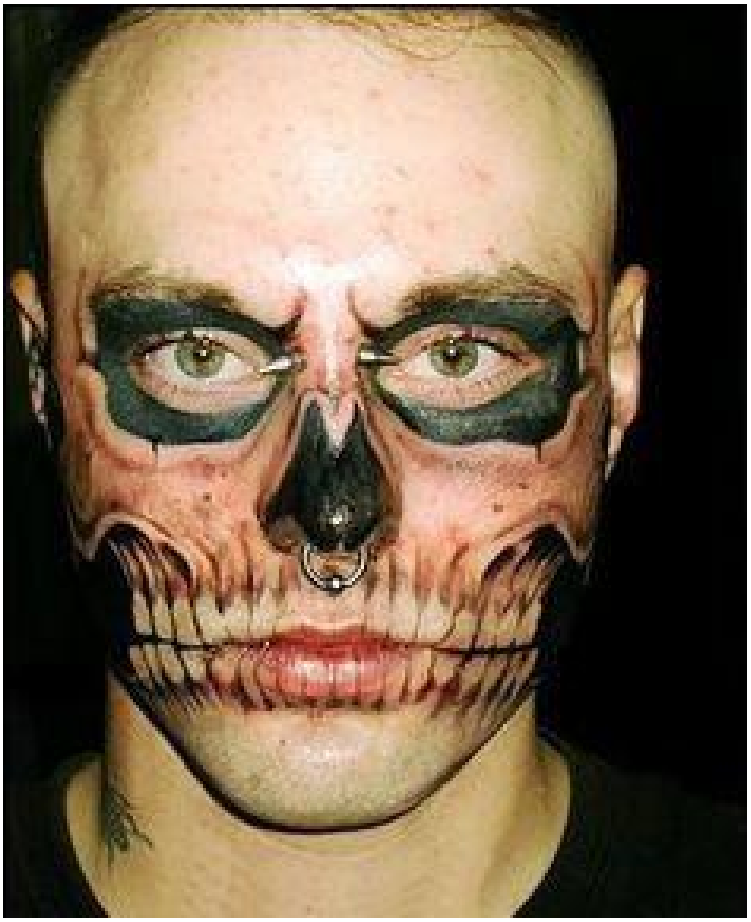

অবিশ্বাস্য

আগের সংখ্যার উত্তরঃ

ধাঁধার উত্তর

প্রথম ধাঁধাঃ “শূন্যবার। “মাস”- এ “ন” নেই।”
দ্বিতীয় ধাঁধাঃ কল্পনা করাটা বন্ধ করে দাও।
তৃতীয় ধাঁধাঃ স্টুডিও
চতুর্থ ধাঁধাঃ চারটে। সবগুলোই একটা করে আছে।
পঞ্চম ধাঁধাঃ বোবা লোকটা কাউন্টারে দুখানা পাঁচ টাকার নোট দিয়েছিল।

কুইজের উত্তরঃ

ঘ,ঘ,ক,গ,গ,গ,ক,ক,গ,ঘ
এর যত পার্সেন্ট তুমি ঠিক উত্তর দিয়েছ তুমি তত পারসেন্ট ভ্যাম্পায়ার

শব্দখেলাঃ

টিয়ার বিয়ে
টিয়ার বিয়ে
-- বাকিটা নিজে করো

কীসের ফটোঃ

চৈত্র সংক্রান্তির দিনে শিবের বিয়ের উৎসব। নৈহাটির মন্দিরে।

ঢালু মেঝেতে পেরেক পুঁতে দড়ি আটকে তাই ধরে ধরে নিচের দিকে এগোতে হল বেশ কিছুক্ষণ। তারপর ঢালটার নতি খানিকটা কমে আসতে পেরেক থেকে দড়ি খুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন প্রফেসর। জিষ্ণু একপাশে দুহাতে হাঁটুদুটো জড়িয়ে ধরে বসে ছিল।

"ক্লান্ত লাগছে?"

"একটু একটু," তাঁর দিকে মুখ তুলে হাসল জিষ্ণু, "তবে চলতে অসুবিধে নেই। যাবে?"

প্রফেসর একটু সামনে এগিয়ে গিয়ে পথটাকে দেখছিলেন। হেডল্যাম্পের আলোয় চারপাশের পুরু, এবড়োখেবড়ো দেয়ালে ভৌতিক সব ছায়া নড়াচড়া করছে। চারপাশে কানে তালা ধরানো নৈঃশব্দ।

রাস্তাটা এইবারে একেবারে সমতল হয়ে এঁকেবেঁকে উঁচু হয়ে এগিয়ে গেছে সামনের দিকে। সেইদিকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত চোখে তাকিয়ে দেখছিলেন প্রফেসর বোস। ওপরের দিকে এগোচ্ছে পথটা। হাতের যন্ত্র দেখাচ্ছিল গভীরতা প্রায় তিনশো মিটার। নিচের দিকে না গিয়ে ফের ওপরের দিকে অন্য কোন ফোকর দিয়ে বাইরের দুনিয়ায় বের হয়ে যাবে না তো রাস্তাটা? তাহলে--

"কোমরের দড়িদড়াগুলো খুলে ফেলি বাবা?" জিষ্ণু কোমরের ধাতব ক্ল্যাম্পে হাত দিচ্ছিল।

"উঁহু। এখনই নয়। চলো এগোনো যাক।"

এ পথটা দিয়ে দূর অতীতে কখনো জল বয়ে গিয়েছিল। পাথরগুলো মসৃণ। তাদের গায়ে প্রাচীন শ্যাওলাদের ধুলিধূসরিত অবশেষচিহ্ন লেগে আছে। উঠতে উঠতে গভীরতা কমে এখন দুশো সত্তর মিটারে দাঁড়িয়েছে।

দেয়ালের পাথরগুলোকে হাত দিয়ে ছুঁতে ছুঁতে চলেছিল জিষ্ণু। হঠাৎ এক জায়গায় আলো পড়তে সেদিকে তাকিয়ে সে উত্তেজিত গলায় বলল, "বাবা, ফুল!"

"ফুল? এখানে? বলতে বলতে এগিয়ে এসে প্রফেসর জিষ্ণুর হেডল্যাম্পের আলোর বৃত্তে ধরা গুহার দেয়ালের ওপরের দিকে একটা জায়গার দিকে তাকালেন।

ভালো করে দেখে তাঁর মুখে একটু হাসি ফুটে উঠল, "ফুল বটে , তবে গাছের নয়। ও হল স্টোন ফ্লাওয়ার। পাথরের ফুল। চুণাপাথরের পাহাড় তো। ক্যালশিয়াম কার্বোনেট জমে জমে প্রকৃতির খেয়ালে ওরকম গোলাপ ফুলের পাপড়ির মত হয়েছে।"

সত্যিকার ফুল না হলেও জিনিসগুলো দেখতে সত্যিই আকর্ষণীয়।

"উঠে একটু ছুঁয়ে দেখবো বাবা?"

চেষ্টাটা বিপজ্জনক হতে পারে। চুণাপাথর গ্রানাইটের মত শক্ত নয়। কোথায় কী নড়বড়ে হয়ে রয়েছে কে জানে। কিন্তু, জিষ্ণুর কৌতুহলভরা মুখটার দিকে তাকিয়ে আপত্তি করতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলেন প্রফেসর বোস। তারপর বললেন, "বেয়ে উঠতে পারবে তো?"

"পারবো। দেয়ালের গায়ে কত খোঁচা খোঁচা পাথর বেরিয়ে রয়েছে দেখছো না?" বলতে বলতেই হেলমেটটা খুলে রেখে জিষ্ণু গিয়ে দেয়ালের অমসৃণ গা থেকে মুখ বাড়িয়ে থাকা পাথরের ধারালো টুকরোগুলোকে আঁকড়ে ধরে তার হালকা শরীরটা ওপরের দিকে টেনে তুলতে শুরু করে দিল, আর তারপরেই কোন আগাম সতর্কতা না দিয়ে হুড়মুড় করে তাকে নিয়ে উল্টোদিকে ভেঙে পড়ল দেয়ালের খানিকটা অংশ। কালো গহবরটা একটা আদিম জন্তুর মত তাকিয়ে ছিল প্রফেসরের দিকে।

'মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে'—নিঃশ্বাস বন্ধ করে বারংবার এই কথাটাই নিজেকে বোঝাচ্ছিলেন প্রফেসর বোস। গহ্বরের ওপাশে জিষ্ণু পড়ে গেলেও তার কোমরে বাঁধা দড়িটা

এখনও তাঁর কোমরের সঙ্গে আটকানো রয়েছে। সন্তর্পণে নিজের কোমর থেকে দড়িটা খুলে নিয়ে একখন্ড বড় পাথরের সঙ্গে সেটাকে আঁটোসাঁটো করে বেঁধে নিলেন তিনি প্রথমে। তারপর সন্তর্পণে পাথরের গা বেয়ে বেয়ে উঠে এলেন গহ্বরটার মুখের কাছে। অন্ধকারের মধ্যে নেমে যাওয়া দড়িটাকে অনুসরণ করে নিচের দিকে হেডল্যাম্পের আলো ফেলে দেখা গেল বেশ খানিকটা নিচে দড়ির অন্যপ্রান্তে জিষ্ণুর শরীরটা দোল খাচ্ছে।

"জিষ্ণু, শুনতে পাচ্ছো?"

তাঁর গলার শব্দে হঠাৎ করে গমগম করে উঠল গোটা এলাকাটা।

দড়িতে মৃদু ঝাঁকুনি এল না একটা? আবার একটা ডাক দিলেন প্রফেসর বোস। এবারে দড়িতে মৃদু ঝাঁকুনির সঙ্গে ক্ষীণ একটা শব্দও ভেসে এল তলা থেকে। স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেললেন প্রফেসর। সাড়া দিচ্ছে যখন তখন জ্ঞান আছে ছেলেটার। তার মানে বেশি চোট লাগেনি আশা করা যায়। ধীরে ধীরে , খুব সাবধানে দড়ি ধরে টেনে তাকে ওপরে তুলতে শুরু করলেন তিনি।

একটু কেটেছড়ে যাওয়া ছাড়া বিশেষ কোন চোট লাগে নি জিষ্ণুর। ভয়ে একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিল এই যা। খানিক ধাতস্থ হবার পর সে বলল, "পায়ের নিচে থেকে জলের শব্দ আসছিল বাবা। বেশি নিচে থেকে নয় বলেই মনে হল।"

সামনের রাস্তাটার দিকে একবার চেয়ে দেখলেন প্রফেসর। খসে পড়া পাথরের স্তুপে পথটা প্রায় সম্পূর্ণ ঢেকে গিয়েছে। ওদিক দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে গেলে ওই পাথরের স্তুপ সরাতে হবে। খানিক বাদে কী মনে হতে এক খন্ড পাথর হাতে নিয়ে ফের গহ্বরটার মুখের কাছে গিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। গহ্বরের ভেতর থেকে গুমগুম করে একটা ক্ষীণ শব্দ আসছিল সত্যিই। কান পেতে সেই শব্দ খানিক শুনে তারপর মণিবন্ধে বাঁধা ঘড়িটার স্টপ ওয়াচ চালু করে দিয়ে পাথরটাকে তিনি ফেলে দিলেন নিচের দিকে। খানিক বাদে তলা থেকে পাথরটা আছড়ে পড়বার শব্দটা পেতে স্টপওয়াচের সময়টা দেখে নিয়ে কিছু হিসেব করে তাঁর মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। জিষ্ণুর দিকে ফিরে বললেন, "গুহাটার গোলকাকার ছাদের ওপর দিয়ে আমরা ঘুরে চলেছিলাম জিষ্ণু। এইবারে একটা সিধে পথ পাওয়া গেছে। আর চিন্তা নেই। এইখান থেকে বড়োজোর সত্তর মিটার নিচে গুহার মেঝে।"

দড়ির মাথায় বাঁধা মালপত্রের বড়ো পুঁটুলিটা সাবধানে নিচের দিকে ঠেলে দিয়ে আস্তে আস্তে দড়ি ছাড়তে ছাড়তে হিসেব রাখছিলেন প্রফেসর বোস। পুঁটুলির সঙ্গে একটা ছোট্ট আণবিক ব্যাটারির সঙ্গে একটা উজ্জ্বল আলো আটকে দিয়েছেন। তার তীব্রতায় চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

উজ্জ্বল আলোকখন্ডটি দুলতে দুলতে নিচে নামতে নামতে চারপাশে আলো ছড়াচ্ছিল। সেইদিকে তাকিয়ে জিষ্ণু একটু ভীত গলায় প্রশ্ন কর, "কিছু দেখা যাচ্ছে নাতো চারপাশে বাবা!"

"সেটাই ভালো জিষ্ণু। তার মানে গুহাটা বিশাল বড়ো। এর দেয়ালগুলো অনেক দূরে দূরে। ছাদটা অন্তত এই জায়গায় সত্তর মিটার উঁচু। একাগ্নিকে বানিয়ে দাঁড় করাবার জন্য এইরকমই একটা জায়গার প্রয়োজন আমাদের ছিল। ভগবান সে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আজ তুমি অ্যাক্সিডেন্টটা না ঘটালে এর খোঁজ আমরা আদৌ পেতাম কি না কে জানে। "

আলোশুদ্ধ পুঁটুলিটা ততক্ষণে একেবারে নিচে গিয়ে পৌঁছেছে। দড়ির হিসেব দেখে প্রফেসরের মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল, "পঁচাত্তর মিটার। খুব বেশি ভুল হয় নি হিসেবে জিষ্ণু।"

মালপত্রের পুঁটুলিগুলো একে একে নামানো হয়ে গেলে জিষ্ণুকে দড়ি বেঁধে নিচে নামিয়ে দিয়ে সবার শেষে নিজে নিচে নেমে এলন প্রফেসর বোস।

জিষ্ণু গুহাটার চারপাশে তাকিয়ে দেখছিল। মিটার পঞ্চাশেক ব্যাসার্ধের একটা বৃত্তাকার এলাকা আলোকিত হয়ে আছে বাতিটাতে। খানিক দূর দিয়ে বয়ে চলা জলধারাটাতে স্রোত তত তীব্র নয়। তার উজানে গভীর অন্ধকারের ভেতর থেকে গুমগুম করে জল আছড়ে পড়বার শব্দ আসছে। জলের ধারাটা গুহার কোন এক প্রান্তে উঁচু থেকে আছড়ে পড়ছে।

"ঈশ্বরের আশীর্বাদ জিষ্ণু। বিদ্যুতের অভাব হবে না আমাদের এখানে," বলতে বলতে ধারার থেকে খানিক জল তুলে এনে একটা ছোট যন্ত্রের মুখে তার ক ফোঁটা রাখলেন প্রফেসর। একটা তীব্র লাল আলোর রশ্মি গিয়ে পড়ল জলের ফোঁটাটার ওপরে। সামান্য ফেনা তুলে বাষ্পীভূত হয়ে গেল জলটা। যন্ত্রের পর্দায় কিছু তথ্য ভেসে উঠছিল। সেইদিকে একবার দেখে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে আঁজলা করে জল তুলে নিয়ে প্রাণভরে জল খেলেন প্রফেসর। তারপর জিষ্ণুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "হাতমুখ ধুয়ে জল খাও। চমৎকার স্বাদ। এ জলে কোন ক্ষতিকর কিছু পাওয়া যায়নি বিশ্লেষণে।"

জিষ্ণু জলের দিকে এগিয়ে গিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল তার পাশে। জলধারাটা অগভীর। আঁজলা করে জল তুলে মাথায় দিতে দিতে হঠাৎ কী মনে হতে জলের মধ্যে একবার পা বাড়িয়ে দেখল সে। তারপর পেছন ফিরে বলল, "জলের নিচে পরিষ্কার বালি বাবা। নেমে স্নান করি?"

"করো, কিন্তু সাবধানে। উজানের দিকে বেশিদূর এগিও না। বিপদ হতে পারে-- " বলতে বলতে আলোটা হাতে নিয়ে জলধারার ধার ধরে তার উজানের দিকে এগিয়ে চললেন প্রফেসর বোস।

বিচিত্র কিছু পাতাবিহীন গাছ ছড়িয়ে আছে এদিকওদিক। তাদের ফাঁকে ফাঁকে গজিয়ে থাকা অজস্র জাতের ছত্রাকের সমারোহের দিকে তাকিয়ে তিনি নিজের মনেই বলছিলেন, "যতদিন না কৃত্রিম আলোয় হাইড্রোপনিক ক্ষেত গড়ে তুলতে পারি বা অন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করতে পারি ততদিন খাদ্যের অভাব আমাদের এখানে হবে না জিষ্ণু। এদের মধ্যে অন্তত তিনটে প্রজাতি আমার এখনই চোখে পড়ছে যেগুলো সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। তাছাড়া-- "

বলতে বলতেই হঠাৎ তাঁর কথাটা থেমে গেল জিষ্ণুর দিক থেকে ভেসে আসা একটা আওয়াজে। দু হাতে কিছু একটা ধরে নিয়ে সে জল ছেড়ে উঠে আসছিল দ্রুত। তাড়াতাড়ি তার কাছে ফিরে গিয়ে জিনিসটা হাতে নিয়ে ভালো করে দেখলেন প্রফেসর। একটা ধারালো পাথরের ফলা। জিষ্ণুর পায়ের নিচেটা একটু কেটে গিয়েছে ফলাটা লেগে।

জিনিসটা হাতে নিয়ে মনোযোগ দিয়ে দেখে প্রফেসরের মুখটা একটু গম্ভীর হয়ে উঠল। ফলাটা সরু। ঘসে ঘসে তীক্ষ্ণ করে তোলা হয়েছে। গোড়ার দিকে খাঁজ কাটা। বোঝা যায় কোন লাঠির সঙ্গে তাকে আঁটোসাঁটো করে বাঁধবার বন্দোবস্ত সেই খাঁজগুলো।

"জিনিসটার গায়ে শ্যাওলা ধরেনি। তার মানে বেশিদিন জলের তলায় পড়ে নেই এটা।"

"জিনিসটা কী বাবা?"

"এটা একধরণের আদিম অস্ত্র জিষ্ণু। প্রাচীন পৃথিবীতে এই অস্ত্র দিয়েই মানুষ শিকার করত। এটা সম্ভবত এই জলধারায় মাছ শিকারের কাজে কেউ ব্যবহার করেছিল এখানে।"

"কিন্তু এইখানে কেউ এসে এমন আদিম জিনিস দিয়ে—"

"কেন? সেটাই তো ধাঁধা। প্রথমত এখানে অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে এমন মানুষ এল কোথা থেকে? আর দ্বিতীয়ত, তারা এমন আদিম অস্ত্র ব্যবহার করেছে তার অর্থ একটাই হয়, বাইরের দুনিয়া থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। সভ্যতা যে এগিয়ে গেছে তার খবর তারা এখনো পায় নি। আমাদের একটু সাবধান হতে হবে জিষ্ণু—"

জিষ্ণু একটু সচকিত হয়ে চারদিকটা একবার চেয়ে দেখল। মাঝখানে জ্বলতে থাকা আলোটা বাদে চারপাশে নিরন্ধ্র অন্ধকারের বেষ্টনী ঘিরে রয়েছে তাঁদের। হাতের ঘড়িতে সময় দেখাচ্ছিল রাত দুটো।

"ফিরে যাবে বাবা? এখানে আমরা দুজন মিলে একা একা -- "

প্রফেসর মৃদু হাসলেন। চিন্তাটা তাঁরও মাথায় এসেছে। যে আবিষ্কারটা এইমাত্র করেছে জিষ্ণু তার থেকে সে চিন্তার জবাবও একটা গড়ে উঠছে তাঁর মনে। এই গুহার রাজত্বে তাঁরা একলা নন। আরো কেউ আছে এখানে। কেমন মানুষ তারা? কীভাবে নেবে তারা তাঁদের দুজনকে? তাঁদের উপস্থিতি টের পেয়েছে কি তারা? খানিক দূরে ঝুলন্ত দড়িটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন তিনি। বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে উপস্থিত ওই একটাই যোগসূত্র তাঁদের। কিন্তু সেখানে যারা তাঁদের জন্য ওঁত পেতে অপেক্ষায় আছে , এখানকার অজানা, পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করা বাসিন্দাদের মারণাস্ত্র অন্তত তাদের চেয়ে কম শক্তিশালী হবে।

মুখে সে সব কিছু না বলে একটু হাসি টেনে এনে বললেন, "সে সব নিয়ে এখন ভেবো না। এখন প্রথমে তুমি কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নাও। তারপর তোমাকে তুলে দিয়ে আমি শুতে যাবো। বিপদ আপদের কথা এখন না ভাবলেও চলবে জিষ্ণু। উপস্থিত খাওয়া ও বিশ্রাম। এসো তোমার পা'টাকে পরিষ্কার করে দিই প্রথমে।

ক্রমশ

ছবিঃ মৌসুমী

চিত্ত ঘোষাল

মামা আর আমি এক বাক্স সন্দেশ আর পাঁচটা টাকা নিয়ে গেলাম গোপাল ডাক্তারের বাড়িতে। পঞ্চা ভাল হয়ে গেছে শুনে মহা খুশি ডাক্তার। আমাদেরও সন্দেশ না খাইয়ে ছাড়ল না। ওষুধের দাম নিতে আজ আর কোনো আপত্তিও করল না।

“দেখলে তো ন'কড়ি, আমার হোমিওপ্যাথি ওষুধের ক্ষমতা,” হাসতে হাসতে বলল ডাক্তার।

“অসুখ- বিসুখ হলে, সে তোমাদেরই হোক কি তোমাদের ভালুকের, সোজা চলে আসবে আমার কাছে। আমার বিদ্যেয় না কুলোলে কোথায় যেতে হবে তা আমিই বলে দেব। তোমরা বোধহয় গিয়েছিলে ওই জলহস্তী ভববন্ধু পোদ্দারটার কাছে, তাই না? হা- হা”

“হ্যাঁ,” মামা বলল, “তবে যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, আর ওমুখো হচ্ছি না। আপনি থাকতে ভয় কী আমাদের?”

আরো খানিক গল্পগাছা করে চলে এলাম গোপাল ডাক্তারের বাড়ি থেকে।

রাস্তায় দেখি বদ্যিনাথদাদুকে। আমাদের দেখেইনি এমন ভাব করে চলে যাচ্ছিল একদিকে। আমার মজা করতে ইচ্ছে হল, গিয়ে দাঁড়ালাম তার সামনে।

“তুমি তো আর এলেই না দাদু পঞ্চার পিঠে চড়তে। আমরা রোজ ভাবি তুমি আসবে, আসোই না তুমি! আমাদের খুব মন খারাপ করে। চলো না দাদু, আজ চড়বে,” আমি আদুরে গলায় আবদার ধরলাম।

“না, না, আজ সময় হবে না, আমি ভয়ানক ব্যস্ত,” আমাকে কাটাতে পারলে বাঁচে বদ্যিনাথদাদু, “তা ছাড়া আমার হাঁটুর ব্যথাটা না কমলে আমি ভালুকের পিঠে চড়ব না। সে পর্যন্ত তোমাদের অপেক্ষা করতেই হবে।”

“আচ্ছা দাদু, পরাণদাদুর তো হাঁটতে ব্যথা হয় না। ওকে একবার জিজ্ঞেস করে দ্যাখো না ও কী করে হাঁটু ভালো রেখেছে।”

"ওই তো কঞ্চির মতো চেহারা, তার হাঁটুই বা কী আর হাঁটুতে ব্যথাই বা কী! হেঃ" বলে আমাকে প্রায় ধাক্কা মেরে সরিয়েই থপথপ করে হাঁটতে লাগল বদ্যিনাথদাদু।

সে খানিকটা দূরে যেতে মামা মিটিমিটি হেসে বলল, "তুই মহা ডেঁপো হয়েছিস দশা। ওকে খোঁচালি কেন?"

"ওর মনে অত হিংসে কেন? পরাণদাদু তো কখনো কাউকে হিংসে করে না।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে। চল, বাড়ি যাই, কাল থেকে পঞ্চাকে নিয়ে বেরোব খেলা দেখাতে," আমার কাঁধে হাত রেখে মামা বলল।

ব্রাইয়োনিয়া থার্টির অদ্ভুত কাজ দেখে আমার ধারণা হল, এটা এমন ওষুধ যে সবারই সব অসুখ এ দিয়ে সারানো যায়। যারই শরীর খারাপ হয়েছে শুনি, বলি, ব্রাইয়োনিয়া থার্টি দু'ফোঁটা খেয়ে নাও। সত্যি সত্যি খায় কি আর কেউ? কিন্তু আমি বলিই।

একদিন কাকে যেন ব্রাইয়োনিয়া থার্টি খেতে বলেছি, মামা ছিল সেখানে, আমাকে বলল, "এই দশা, চিত্ত- পিসের রোগে ধরল নাকি তোকে? সবাইকে ব্রাইয়োনিয়া থার্টি খাওয়াচ্ছিস? "

আমি কোনমতে পাশ কাটালাম। কথায় কথায় ন'কড়ি মামার চিত্ত- পিসের মানে আমার দূর সম্পর্কের এক দাদু, চিত্তদাদুর নামটা যখন এসেই গেল, তার গল্প তোমাদের একটু বলি। ভারি মজার। তার সঙ্গে আমার কিছু কিছু মিল আছে বলেও মনে হয়। এই তো সেদিন চিত্তদাদু মারা গেছে। একা থাকত। অদ্ভুত খেয়ালি লোক ছিল ভাই। ভালো লেগেছে বলেই বেঘতা সাইজের আঠেরোটা বেগুনি খেতে হবে আশি বছর বয়সে? পেট ফুলে হার্টে চাপ লেগে মরে গেল সেই রাতেই। চেয়ারে বসে মরেছে। টেবিলের ওপর একগাদা ভিটামিন সি- এর বড়ি। মুখেও দু'চারটে। এই অবস্থায় তাকে পাওয়া যায়।

শুনেছি চিত্তদাদুর মাথায় একবার একটা তাল পড়েছিল ঝড়ের সময়। সেই থেকে মাথাটা যেন কেমন হয়ে যায়। দিস্তে দিস্তে হাবিজাবি কীসব বসে বসে লিখত। ছাপাও হত নাকি সেসব! জানি না বাবা কোন পাগলা গারদের মালিকরা ছাপত। বড়োরা বলত মাথায় তাল পড়ার পর থেকে চিত্তদাদু মোটা মোটা ডাক্তারি বই কিনে পড়তেও শুরু করে। শক্ত শক্ত অ্যালোপ্যাথি ডাক্তারির বই। রুগি পেলেই সে ওষুধও বাতলে দিত। একটাই ওষুধ- ভিটামিন সি। কয়েক লাখ ওষুধের মধ্যে কেন এই একটা ওষুধই তার সব অসুখে লাগসই মনে হয়েছিল, জানি না।

তা, এই চিত্তদাদুর সঙ্গে আমার কিছু কিছু লক্ষ করার মতো মিল আছে। চিত্তদাদুর মাথায় তাল, আমার মাথায় গুন্ডার গাঁট্টা। চিত্তদাদুর একটাই ওষুধ - ভিটামিন সি, আমারও একটাই-- ব্রাইয়োনিয়া থার্টি। চিত্তদাদু বই লিখত, আমিও লিখতে শুরু করেছি। কে জানে বাবা, শেষ পর্যন্ত কী হবে!

যা হবার হবে, পঞ্চার গল্পটা তো লিখি।

হ্যাঁ, যে কথা হচ্ছিল, পরের দিন পঞ্চাকে নিয়ে মামা বেরোল খেলা দেখাতে। প্রথমদিন। আমার ইস্কুল ছিল, যেতে পারিনি। খুব মন খারাপ। বিকেলে ইস্কুল থেকে ফিরে খেলতেও গেলাম না।

সন্ধে নাগাদ মামা ফিরল পঞ্চাকে নিয়ে। হাতে শালপাতার ঠোঙা, মুখে মস্ত হাসি।

"মন্দ হল না রে দশা, তিপ্পান্ন টাকা পঞ্চাশ পয়সা। যা যা, হাত ধুয়ে আয়, গরম গরম কচুরি।"

"পঞ্চার জন্য এনেছ?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"এনেছি রে বাবা এনেছি," মামা হাসল, "আমাদের জন্যে দুটো করে, ওর জন্যে তিনটে, মোট সাতটা। এই দ্যাখ, ঠিক আছে? যা।"

হাত পা ধোয়ার জন্যে একটুও দেরি না করে আমি ছুটলাম কলতলায়।

আরাম করে কচুরি খেলাম আমরা। কচুরিটা যে পঞ্চারও বেশ পছন্দসই সেটা বোঝা গেল তার টপাটপ খাওয়া দেখে। মনে হল আরও বিশ- পঁচিশটা পেলে ওর জুত হত। তা আর কী করে হবে?

মামা রোববারে আমাকেও নিয়ে যাবে খেলা দেখাতে। শোনা ইস্তক আমার যে কি উত্তেজনা কী বলব। তর আর সয় না। এখনো তিন দিন বাকি। সব সময় শুধু নতুন নতুন প্ল্যান আঁটতে থাকি -- কী করে খেলাটাকে আরও সুন্দর করা যায়। মামা ভাগনেতে মিলে এমন খেলা দেখাব যে একেবারে তাক লেগে যাবে লোকের।

সেই রোববার তো এল। সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে চান- টান করে আমি তৈরি। মামা বাজার করে ফিরতেই আমি তাড়া দিতে লাগলাম , "চলো মামা, যাবে না?"

"যাব তো। রান্না করি আগে। খেয়ে- দেয়ে বেরোব।"

"তুমি চান করে এসো, আমি রান্না করছি।"

"দূর পাগলা, মামা হেসে বলল, তোর রান্না পঞ্চাও খেতে পারবে না।"

"একদিন চান্স নিয়েই দ্যাখোই- না, খারাপ রান্না হবে না দেখো।"

"বেশ বেশ, তাই মানলাম। কিন্তু এত তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে কোনো লাভ নেই রে। সকাল সাতটায় কে বেরোবে ভালুকের খেলা দেখতে? বাচ্চারা ঘুম থেকে উঠবে, হাতমুখ ধোবে, খাবে, ইস্কুলের পড়া করবে, তবে না বেরোবে বাড়ি থেকে। এই দ্যাখো, প্যাঁচার মতো মুখ করছিস কেন? ঠিক সময়ে বেরোব।"

পঞ্চাকে খেতে দিল মামা। তারপর রান্না করতে বসে গেল।

ন'টা নাগাদ ডাল আর মুলো- ছেঁচকি দিয়ে ভাত খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম খেলা দেখাতে। সামনে মামা, তার কাঁধ থেকে ঝোলানো একটা থলে। তাতে খেলা দেখানোর জিনিসপত্তর, হাতে ডুগডুগি। পেছনে আমি, পঞ্চার গলার দড়ি আমার হাতে।

চুপচাপ হেঁটে চলেছি। এ কী রে বাবা,আমি ভাবছি, এমনি করে হেঁটে গেলেই চলবে? ডুগডুগি বাজিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ছড়া বলে লোক ডাকতে হবে না? শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললাম, "মামা, আমরা ডুগডুগি বাজাচ্ছি না কেন? ছড়া বলছি না কেন?"

"শোন, সব কাজেই প্ল্যানিং জিনিসটা খুব জরুরি। প্ল্যানিং মানে জানিস তো?"

"একটু একটু।"

“প্ল্যানিং মানে হচ্ছে পরিকল্পনা। ঠিকঠাক পরিকল্পনা না করে এগোলে কোনো কাজেই সফল হওয়া যায় না। এই যে আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষ স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরেও এত গরিব, আরো গরিব হয়ে যাচ্ছে তারা, তার মূল কারণ হচ্ছে প্ল্যানিংয়ের অভাব।”

“আমাদের দেশে তো অনেক বড়ো বড়ো পন্ডিত আছে। এই তো সেদিন অমর্ত্য সেন নোবেল প্রাইজ পেলেন। এদের দিয়ে এমন প্ল্যানিং করানো হয় না কেন যাতে আমরা আর গরিব থাকব না?”

“দেশ যারা চালায় তারা চায় না বলে।”

“সে কী! মানুষের ভালো তারা চায় না?”

“চায় তো। একশো জনের মধ্যে পেটমোটা দশ জনের ভালো তারা চায়, যা- কিছু করে তাদেরই পেট আরো মোটা করার জন্যে।”

“তাহলে কী হবে মামা?” আমি ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়ি।

“ভাবিস না, ভাবিস না, মানুষ একদিন ঠিক সব পালটে ফেলবে। সেদিন একটাও গরিব থাকবে না দেশে, একটা মানুষও না খেয়ে বিনা চিকিৎসায় মরবে না, সবাই লেখাপড়া শেখার সুযোগ পাবে- ” একটু চুপ করে থেকে মামা আবার বলল, “কী থেকে যেন এত কথা এসে পড়ল?”

“প্ল্যানিং।”

“হ্যাঁ, প্ল্যানিং। আমি ভেবে দেখেছি দশা, বোকার মতো এলোমেলো ঘুরে লাভ নেই। আমি অনেক ভেবে শহরের তিরিশ- বত্রিশটা এলাকা বেছে নিয়েছি। এক এক দিনে একটা বা দুটো এলাকায় আমরা যাব। এতে হবে কি, আজ যেখানে যাব, এক মাসের মধ্যে আর সেখানে যাব না। তাতে মোটামুটি আমাদের খেলা দেখানোর বাজারটা ঠিক থাকবে। তবে হ্যাঁ, কেউ যদি ডেকে কনট্রাক্টে মানে চুক্তিতে খেলা দেখাতে চায়, এই ধর রামবাবু বলল, ‘এসো হে, আমার বাড়িতে, খেলা দেখাবে,’ দরে বনলে যাব।”

মামার জ্ঞানবুদ্ধি দেখে আমি অবাক, “সত্যি মামা, তুমি চেষ্টা করলে নামকরা অর্থনীতিবিদও হতে পারতে।”

“আবার পাকামো?” মামা আলতো করে চাঁটা মারল আমার মাথায়, “আচ্ছা, ‘অর্থনীতিবিদ’টা শিখলি কোত্থেকে?”

“সেদিন দেয়ালে সাঁটা খবরের কাগজে দেখলাম না, বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন নোবেল পুরস্কার পেলেন- ”

“গুড, আমরা রাখতে পারি না, কিন্তু যেখানে পাবি খবরের কাগজটা পড়ে নিবি। সব কাগজে সব কথা সত্যি লেখে না। তবে পড়তে পড়তে বুঝে যাবি কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যে।”

“খবরের কাগজেও মিথ্যে লেখে?”

“অবাক হচ্ছিস কেন? লেখে। কাগজ চালাতে অনেক টাকা লাগে। পেটমোটারাই টাকা দেয়। যেসব খবর ছাপলে ওদের অসুবিধে সেগুলো হয় ওরা ছাপেই না, ছাপলেও উলটোপালটা

করে ছাপে। সত্যি কথাটা জানতে হলে কয়েকটা কাগজ পড়তে হয়। বড়ো হ, তখন নিজেই বুঝতে পারবি কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যে। এখন যা পড়বি আমাকে বলবি, আমি বুঝিয়ে দেব সত্যি- মিথ্যে।”

গল্প করতে করতে আমরা চলে এসেছি ঘোষপাড়ায়। এ পাড়ায় মাঝখানে ছোট্ট একটা পার্ক। পার্ক ঘিরে বাড়ি।

সেই পার্কে ঢুকে পড়ল মামা। ডুগডুগিটা আমার হাতে দিয়ে বলল, “নে, বাজা। আজ এখানে খেলা দেখাব।”

আমার হাত বেশ তৈরি। ডুগডুগি আওয়াজ তুলল -- ডুগ ডুগ ডুগ ডুগ, ডুগ ডুগ ডুগ ডুগ- ডুগা ডুগা ডুগ-

মামাও শুরু করল সুর করে-

ভালুক ভালুক ভালুক
কাম অন হ্যাভ এ লুক

আমার ডুগডুগি তাল দেয়-- ডুগ ডুগ ডুগ ডুগ
মামা গলা আরো তোলে--

খেল দেখানে আয়া বাংলা মুলুক
কাঁহা থা পুরানা তালুক
কোই নেহি জানতা
লেকেন সব কোই মানতা

ডুগডুগি বলে- ডুগ ডুগা ডুগ ডুগ- ডুগা ডুগা ডুগ

রাস্তায় একজন দু’জন করে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, পার্কেও ঢুকছে। বাড়িগুলোর জানলায় জানলায় মুখের উঁকিঝুঁকি। বারান্দায়ও এসে দাঁড়িয়েছে অনেকে।

উৎসাহ পেয়ে মামার গলা, আমার ডুগডুগি আরও জোরে বেজে ওঠেঃ

এই কথাটা মানবে সবাই মানবে
এখন খেলা কোন ভালুক দেখাতে না পারবে
ডুগ ডুগা ডুগ ডুগুর ডুগুর ডুগ
ভালুক ভালুক ভালুক
কাম অন হ্যাভ এ লুক
ডুগ ডুগ ডুগ ডুগ
মানুষ হতে হতে
একটুর জন্যে
ভল্লুক গেল হয়ে
আমাদের পঞ্চা
কথাটা বুঝতে হলে
দেখুন নিজের চোখে

সামান্য বিনিময়ে
এক দুই তিন চার টংকা--
ডুগ ডুগ ডুগ ডুগ ডুগুর ডুগুর ডুগু ডুগ

ছেলেবুড়ো কচিকাচা বেশ জড়ো হয়ে গিয়েছে আমাদের ঘিরে।
মামা বলল, "সবাইকে নমস্কার করো পঞ্চা, হ্যাঁ এইবার সেলাম করো।"
হাততালি দিয়ে কিচিরমিচির করে উঠল বাচ্চারা।

ক্রমশ

ছবিঃ মৌসুমী

অলোকপর্ণার বিড়াল

রোহণ কুদ্দুস

প্রায় দশ সেকেন্ড অলোকপর্ণা কোনও কথা বলতে পারল না। ফ্রিজের মধ্যে একটা ছোটখাটো সাইক্লোন বয়ে গেছে। জুতোটা শু- র‍্যাকের ওপর রেখে দু- পা এগিয়ে গলা বাড়িয়ে রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে সেখানেও প্রায় একই দৃশ্য দেখল সে। থালা- বাটি ছড়িয়ে পড়ে আছে। তার সাধের কফি মাগটাও কয়েক টুকরো হয়েছে। মাথাটা যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাচ্ছে, তার ওপর বাড়ি ফিরে এই উপদ্রবের বহর দেখে অলোকপর্ণা বিহ্বল হয়ে পড়ল। মুখেচোখে জল দিয়ে একটু ধাতস্থ হতে সে পা বাড়াল বাথরুমের দিকে। বাথরুম শোওয়ার ঘরের লাগোয়া। তাই বাথরুমে আর যাওয়া হল না। তার আগেই বিছানায় এবং বালিশে বিড়ালের কালো থাবার ছাপ চোখে পড়ে গেল।

ড্রয়িংরুম আর রান্নাঘরের অবস্থা দেখে অলোকপর্ণা ভেবেছিল, এক- দেড় ঘন্টা ঘুমিয়ে নিয়ে ওগুলো পরিষ্কার করবে। কিন্তু বিছানার এই অবস্থা দেখে রাগে ফেটে পড়ল সে। মিনিমিনি তখনও ফ্রিজের সামনে আতঙ্কিত মুখে বসেছিল। অলোকপর্ণা ছুটে গিয়ে তার একটা কান ধরে হিড়হিড় করে তাকে শোওয়ার ঘরে নিয়ে এল, "বদমাশ ম্যাও। কতবার বলেছি আমার বিছানায় উঠবি না। তার ওপর এই কাদা পায়ে চাদর বালিশের ওয়াড় সব ময়লা করেছিস? এগুলো এবার কাচবে কে?" কাচার জন্যে অলোকপর্ণা আগের মাসেই একটা ঝাঁ- চকচকে ওয়াশিং মেশিন কিনেছে। কিন্তু এখন রাগের মাথায় যুক্তি- বুদ্ধি সব তার লোপ পেয়েছে। ঠাস করে মিনিমিনির পিঠে একটা চাপড় দিল সে।

মার খেয়ে 'ঘ্যাঁও' শব্দে মিনিমিনি একছুটে রান্নাঘরের জানালায় গিয়ে হাজির হল। কিন্তু পাশের দোতলা বাড়ির ছাদে লাফ দিতে গিয়েও কী ভেবে সে থমকালো একটু। উঁকি মেরে দেখল শোওয়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে অলোকপর্ণা ঠান্ডা বাক্সের দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করল। তারপর দু হাতে মাথা চেপে ধরে গিয়ে বসল সোফার ওপর। মিনিমিনির মায়া হল। সে পায়ে পায়ে গিয়ে হাজির হল অলোকপর্ণার কাছে। তারপর পায়ে একটা থাবা দিয়ে ডাকল, "অলোকপর্ণা।" অলোকপর্ণা মুখ তুলে তাকাল না। মিনিমিনি একটু চুপ করে থেকে বলল, "এগুলো আমি করিনি।" বলেই তার মাথায় এল খেটে খাইয়ের নামটা। কিন্তু খেটে খাইকে সে- ই ডেকে এনেছিল অলোকপর্ণার ফ্ল্যাটে। তাই তার ঘাড়েই পুরো দোষটা চাপানো ঠিক হবে কিনা সে বুঝল না। তার ওপর ফ্রিজটা লণ্ডভণ্ড করার সম্পূর্ণ কৃতিত্বও খেটে খাইয়ের একার নয়। ঐ কাজে মিনিমিনির অবদান প্রায় অর্ধেক। তাই আবার সে থাবা দিয়ে অলোকপর্ণার পায়ে আলতো টোকা দিয়ে তাকে বোঝাতে চাইল, "পুরোটা আমি একা করিনি।

বিছানাতেও উঠিনি।” কিন্তু অলোকপর্ণা তার এই স্বীকারোক্তির একটা বর্ণও বুঝল না। সে যা শুনল, তা অনেকটা এইরকম, “মিউ মিউ ম্যাও... ম্যাও মিউ ম্যাও... ম্যাও ম্যাও ম্যাও মিউ...” সে বিরক্ত হয়ে পা তুলে নিয়ে গুটিশুটি হয়ে সোফার ওপর শুয়ে পড়ল। মাথার যন্ত্রণার কষ্টে আর ফ্ল্যাটের এই বেহাল অবস্থায় তার পোষ্যের কুকীর্তির কথা মনে করে অভিমানে চোখ থেকে একফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। এরকম সময় মাকে দারুণ মনে পড়ে যায়।

অলোপর্ণার চোখের জল মিনিমিনিরও নজর এড়াল না। বিষণ্ন মনে সে কিছুক্ষণ সোফার পাশে বসে থেকে আস্তে আস্তে রান্নাঘরের জানালা গলে গিয়ে হাজির হল পাশের বাড়ির ছাদে। সেখানে তখন আধশোয়া হয়ে মাঝারি থাবা চাটছিল। মিনিমিনিকে দেখেই মাঝারি সোজা হয়ে বসল, “তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? কোন আক্কেলে তুই খেটে খাইকে বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলি? ওর মত বিশ্ববখাটে আর দুটো আছে?” মিনিমিনি একটু অবাক হল। এইটুকু সময়ের মধ্যেই খবরটা মাঝারি জানল কী করে? বিড়ালদের মধ্যে মানুষদের মতই দ্রুতগতিতে খবর ছড়ায়। এতকাল মানুষের সঙ্গে বসবাস করার ফল আর কী। খেটে খাই তার কুকীর্তির কথা বলেছে গদাইকে। তার থেকে জেনেছে কেলো। কেলো এসে বলেছে মার্জারকে। মার্জারের পাশে পাশেই সবসময় ঘোরে হোঁতকা। সে এসে জানিয়েছে মাঝারিকে। মোটামুটি এ পাড়ার সব বিড়াল জেনে গেছে মিনিমিনির বাড়ি গিয়ে খেটে খাই একটা দক্ষযজ্ঞ বাধিয়ে এসেছে।

মাঝারি জিজ্ঞাসা করল, “এবার যদি তোর মানুষ তোকে তাড়িয়ে দেয়, তাহলে কী হবে ভেবে দেখেছিস? কোথায় থাকবি তখন? ঐ খেটে খাইয়ের মতই পাঁচিলে পাঁচিলে ঘুরে বেড়াতে হবে।” মিনিমিনির মাথায় এই আশঙ্কা এর আগে আসেনি। এখন মাঝারির কথায় সে বেশ দুর্ভাবনায় পড়ল। ওহ! কী যে হবে এখন! সে যদি অলোকপর্ণাকে বুঝিয়ে বলতে পারত আসল কী ঘটেছিল, তাহলে হয়ত সে বেঁচে যেত। তার নিজের আস্তানাছাড়া হওয়ার আশঙ্কার পাশাপাশিই তার কাজে অলোকপর্ণা কষ্ট পেয়েছে, সে কেঁদেছে, এটাও মিনিমিনির জন্যে বেশ পীড়াদায়ক হয়ে উঠল।

কিন্তু অলোকপর্ণাকে সে এত কথা বুঝিয়ে বলবে কী করে? সে কি মানুষের মত কথা বলতে পারে? বিড়ালরা কথা বলার সময় মর্সকোডের মত শুধু ‘মিউ’ আর ‘ম্যাও’ শব্দ দুটো ব্যবহার করে। বিভিন্ন ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই দুটো শব্দ দিয়েই তারা বাক্য গঠন করে একে অন্যের সঙ্গে কথা বলে। কিন্তু সেসব তো আর অলোকপর্ণা বুঝবে না।

মিনিমিনি ছাদের একদিকে গিয়ে চুপ করে বসে চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা করল, “হে ঈশ্বর! আমায় তুমি মানুষের সঙ্গে কথা বলার শক্তি দাও। আমি যেন অলোকপর্ণাকে সব কথা বুঝিয়ে বলতে পারি।”

ঈশ্বর তখন এক কাপ চা আর প্লেটে গোটা পাঁচেক পেঁয়াজি নিয়ে আই পি এল- এর সেমি ফাইনাল দেখতে বসেছেন। কলকাতা জিতবে কি হারবে তার ঠিক নেই, আর তার মধ্যে এক বিড়ালের একি অন্যায় আবদার! তবুও কোনও বিড়াল কিছু চাইলে ঈশ্বর এড়িয়ে যান না সাধারণত। সৃষ্টির আদিতে একবার বেচারিদের ভোকাল কর্ড নিয়ে গণ্ডগোলটা তিনিই পাকিয়েছিলেন, সেই থেকেই তিনি বিড়াল দেখলেই সামান্য অপরাধবোধে ভোগেন। আর তাই কোনও বিড়াল কিছু চাইলেই তিনি ঝটপট মঞ্জুর করে দেন। আজ আবার ক্রিকেট ম্যাচ দেখার

তাড়া। তাই রিমোটটা হাতে তুলে চ্যানেল ঘোরাতে ঘোরাতে তিনি বললেন, "তথাস্তু! তবে বাছা তুমি শুধুমাত্র অলোকপর্ণার সঙ্গেই কথা বলতে পারবে। মানুষদের মধ্যে একমাত্র সে- ই তোমার কথা বুঝতে পারবে।"

মিনিমিনি ঈশ্বরের এই উত্তর শুনতে পেল না বটে, কিন্তু একটা অদৃশ্য স্পর্শ টের পেল, কে যেন তার পিঠের লোমে আঙুল বুলিয়ে দিল। শিউরে উঠে চোখ খুলে সে দেখল ছাদে সে একা, মাঝারি কখন যেন চুপিসাড়ে চলে গেছে। বিকালের ম্লান আলো মুছে গিয়ে রাস্তার ধারের আলোগুলো জ্বলে উঠছে এক এক করে। মিনিমিনি দুরুদুরু বুকে অলোকপর্ণার ফ্ল্যাটের দিকে পা বাড়াল।

রান্নাঘরের জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকে মিনিমিনি মুখ বাড়িয়ে দেখল ড্রয়িংরুমে সোফার ওপর অলোকপর্ণা নেই। গুটিগুটি শোওয়ার ঘরের দিকে গিয়ে দরজা ফাঁক করে উঁকি দিল সে। নাহ! এখানেও নেই। তাহলে গেল কোথায়? মিনিমিনি চিন্তিত হয়ে পড়ল। তার এই উপদ্রবে অস্থির হয়ে অলোকপর্ণা ফ্ল্যাট ছেড়ে পালায়নি তো?

হঠাৎই কোথা থেকে একটা ক্ষীণ কাতরানির আওয়াজ ভেসে এল। মিনিমিনি কান খাড়া করে শুনতে চেষ্টা করল। কে যেন মৃদু গলায় বলছে, "আহ!" অলোকপর্ণা। কিন্তু কোথায় সে? আওয়াজ শোওয়ার ঘর থেকেই আসছে। মিনিমিনি মাথা দিয়ে দরজাটা ঠেলে খুলল। শোওয়ার ঘরের লাগোয়া বাথরুমের দরজা সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। সেখান থেকে একটা পায়ের পাতা নজরে এল। ব্যাপারটা এক নিমেষে বুঝে গেল মিনিমিনি। অলোকপর্ণা বাথরুমের মধ্যে পড়ে আছে। কিন্তু কী করে? হয়ত পা পিছলে। হয়ত চোট পেয়েছে। কিন্তু এখন উপায়? মিনিমিনি ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করার চেষ্টা করল। সে অলোকপর্ণাকে ওখান থেকে টেনে বের করতে পারবে না। দু- এক মুহূর্ত চিন্তা করে হাসি ফুটে উঠল মিনিমিনির ঠোঁটে।

অলোকপর্ণাকে পাশ কাটিয়ে সে গিয়ে ঢুকল বাথরুমে। অলোকপর্ণার মাথাটা শাওয়ারের প্রায় নিচেই আছে। তিড়িং করে একটা লাফ দিয়ে সে গিয়ে উঠল শাওয়ারের নবগুলোর ওপর। কোনওমতে ঐটুকু জায়গায় দাঁড়িয়ে সে সামনের ডান থাবা দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শাওয়ারটা চালিয়ে দিল।

জলের ছিটে চোখেমুখে পড়তে অলোকপর্ণা ধড়মড় করে উঠে বসে দেখে তার সামনেই শাওয়ারের নব ধরে প্রায় ঝুলে আছে তার বিড়ালটা। গায়ে দু- চার ফোঁটা জলের ছিটে লেগেছে বলে কোনও মতে নেমে পালানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু শাওয়ারটা চালাল কে? বিড়ালটাই কি? শাওয়ারটা বন্ধ করে তোয়ালেটা টেনে নিয়ে মুখ মুছতে মুছতে সে মনে করার চেষ্টা করল। সোফা থেকে উঠে সে মুখ- হাত ধোওয়ার জন্যে বাথরুমে ঢুকেছিল। হঠাৎই মনে হল কে যেন তার চুলের মধ্যে আঙুলে বুলিয়ে দিল। শিউরে উঠে ঘুরতে গিয়েই পা পিছলে পড়ে গিয়েছিল বাথরুমের মেঝেতে। চুল মুছতে গিয়ে সামান্য ব্যথা টের পেল। মাথার পেছনে বেশ ফুলেছে।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে জামাকাপড় পালটে অলোকপর্ণা প্রথমেই তার বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় তুলে নিয়ে গিয়ে ওয়াশিং মেশিনে ঢোকাল। তারপর আলমারি থেকে অন্য একটা চাদর বের করে বিছানায় মেলছে, এমন সময় তার বিড়াল এসে হাজির হল আবার। অলোকপর্ণা ঠিক করে রেখেছিল দু- তিনদিন একদমই সে কথা বলবে না ম্যাও- এর সঙ্গে।

বিড়ালরা মানুষের শীতলতা টের পায়। মনিব পাত্তা না দিলে তার পোষা বিড়ালের মন খারাপ হয়ে যায়। এই কুকাজের জন্যে সেটাই কার্যকরী দাওয়াই হবে। এমনটা আবার করার আগে অন্তত দুবার ভাববে বদমাশটা।

এদিকে মিনিমিনি ভাবছিল, মানুষের ভাষা তো তার জানা নেই। তাই আজ কী ঘটেছিল তা সে বুঝিয়ে বলতে পারবে না অলোকপর্ণাকে। তবু অন্যান্য দিনের মতই তার নিজের ভাষাতেই কথা বলা যেতে পারে। অন্তত মনিবের রাগ যদি কমে কিছুটা। তাই সে বলতে চাইল, “মিউ মিউ ম্যাও...” কিন্তু তার মুখ থেকে বের হল, “কী খবর? এখন ভালো?”

অলোকপর্ণা হাঁ হয়ে তাকিয়ে রইল তার বিড়ালের দিকে। বিড়ালটা প্রায় স্পষ্ট স্বরে তার সঙ্গে বাংলায় কথা বলছে। ওদিকে মিনিমিনির অবস্থাও তথৈবচ। সে মিউ আর ম্যাও ছেড়ে মানুষের ভাষায় কথা বলছে, যেমন করে আলোকপর্ণা বলে।

অলোকপর্ণা নিজের অজান্তেই অস্ফুটে বলে উঠল, “ম্যাও! তুই কি আমার সঙ্গে কথা বলছিস?” মিনিমিনিও ভয়ার্ত গলায় বলল, “তুমি বুঝতে পারছ?” মিনিমিনির উত্তরে ‘মাগো’ বলে অলোকপর্ণা এক লাফে গিয়ে উঠল খাটের ওপর। কে জানে তার বিড়ালের ওপর কোন অশুভ আত্মা ভর করেছে। অলোকপর্ণার রকমসকম দেখে মিনিমিনিও ‘বাবাগো’ বলে ছুট দিল ড্রয়িংরুমের দিকে। এসব কী অদ্ভুত জিনিস শুরু হল? বিড়ালের ভাষা ছেড়ে তার মুখ থেকে এসব কী বের হচ্ছে? মিনিমিনির চিৎকারে ফ্রিজের তলা থেকে নিশুম্ভ বেরিয়ে এল তড়িঘড়ি, “কী ব্যাপার বিনিবিনি? চ্যাঁচাও কেন?” সে সারাদিনের ঘুমের শেষে সবে উঠেছে, তাই ছোট একটা হাই তুলে হাত- পা ছাড়াতে ছাড়াতে বলল,“আজ মেঝেতে বেশ ভালো মন্দ খাবার পড়েছে দেখছি। রাতটা ভালোই কাটবে।”

ফ্রিজ থেকে ছড়িয়ে পড়া খাবারের মধ্যে একটা পাকা কাঁঠালি কলা ছিল। ওপর থেকে পড়ে সামান্য থেঁতলে গিয়েছিল তার একদিক। নিশুম্ভ যেই সেদিকে শুঁড় বাড়িয়েছে, মিনিমিনি থাবার এক ধাক্কায় সেটা একদিকে সরিয়ে দিল। তারপর চোখ পাকিয়ে নিশুম্ভকে বলল, “মাথার ওপর দারুণ বিপদ। এটা খাওয়ার সময় নয়।” এই কথাগুলো অবশ্য মিনিমিনি মিউ আর ম্যাও সহযোগেই বলল। নিশুম্ভ বেচারি সারাদিন না খেয়ে ঘুমোচ্ছিল। তাই কলাটার দিকে জুলজুল করে তাকিয়ে হতাশ সুরে বলল, “তোমার বিপদের সঙ্গে আমার খাওয়ার সম্পর্ক কী? আর তাছাড়া পেটে কিছু না গেলে আমার মাথা খোলে না।” মিনিমিনি আর একটা ধমক দিতে মুখ খুলেছে কি খোলেনি, হঠাৎ অলোকপর্ণা বেরিয়ে এল শোওয়ার ঘর থেকে। হাতে ধরে রাখা মোবাইল ফোনটাকে পিস্তলের মত বাগিয়ে ধরে সে মিনিমিনিকে বলল, “আমার কাছে একদম ঘেঁষবি না।” ইতিমধ্যে সে তার অফিসের এক বন্ধু রেশমিকে ফোন করে ঠিক করেছে তার ফ্ল্যাটে রাত কাটাবে। পায়ে পায়ে অলোকপর্ণা ড্রয়িংরুম পেরিয়ে ফ্ল্যাটের দরজার দিকে এগোচ্ছিল, এমন সময় মিনিমিনি জিজ্ঞাসা করল, “তুমি কোথায় যাচ্ছ?” মিনিমিনির এই প্রশ্নে অলোকপর্ণা ভয়ে দিশেহারা হয়ে দৌড়তে চাইল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আওয়াজ এল, দমাস! ঘটাং!

কী দমাস? মিনিমিনি যে থেঁতলে যাওয়া কলাটা থাবা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে নিশুম্ভকে ধমকাচ্ছিল, তাতে পা পড়ে অলোকপর্ণা ড্রয়িংরুমের মেঝেতে আছাড় খেয়ে পড়ল। কী ঘটাং? পড়ে গিয়ে অলোকপর্ণার মাথাটা গিয়ে লাগল কাঠের সেন্টার টেবিলে। মাথায় আবার লাগার

সঙ্গে সঙ্গেই অলোকপর্ণা চোখে সর্ষে ফুল দেখল। আস্তে আস্তে তার চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে এল।

ঘটনাটা এমন চটজলদি ঘটল যে মিনিমিনি আর নিশুম্ভ দুজনেই হাঁ। প্রথমে নিশুম্ভই মুখ খুলল, "তুমি মানুষের ভাষায় কথা বলছিলে?" মিনিমিনি কোনও উত্তর না দিয়ে ঘাড় নাড়ল। তারপর অলোকপর্ণার দিকে এক পা এগিয়ে বোঝার চেষ্টা করল ঠিক কী ঘটেছে। নিশুম্ভর দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে ত্রস্ত গলায় বলল, "মরে গেল নাকি?" মৃত্যুর বাস্তব অভিজ্ঞতা নিশুম্ভ আর মিনিমিনির এর আগে একবারই হয়েছে। নিশুম্ভের বাবা শুম্ভ কায়দা করে অলোকপর্ণার চটির তলায় আটকে থাকা বাবল গাম খেতে গিয়ে পদপিষ্ট হয়েছিল। শুম্ভ পুট করে মারা গিয়েছিল, কোনও কথাবার্তা না বলেই বা কোনও নড়াচড়া না করেই শান্তির ঘুম। অলোকপর্ণাকে নিথর পড়ে থাকতে দেখে মিনিমিনির তাই মৃত্যুর কথাই প্রথম মাথায় এসেছে। নিশুম্ভ টুপুক করে গিয়ে উঠল অলোকপর্ণার পেটের উপর। তারপর চোখ বন্ধ করে শুঁড় দুটো তার পেটে ঠেকিয়ে রাখল। পাঁচ সেকেন্ড পর চোখ খুলে পাকা ডাক্তারের মত সে রায় দিল, "নাহ! মরেনি। পেট ওঠানামা করছে। ঘুমোচ্ছে বোধহয়।" পরীক্ষা- নিরীক্ষা সেরে আবার সে মিনিমিনির পাশে নেমে এল। থেঁতলে যাওয়া কলাটা অলোকপর্ণার পায়ে পড়ে আরও উপাদেয়ভাবে চটকে গেছে। সেটা থেকে একটুখানি শাঁস মুখে তুলে নিশুম্ভ চোখ বুজে চিবোতে চিবোতে প্রশ্ন করল, "তুমি মানুষের মত কথা বলতে শুরু করলে কখন? কাল রাতেও তো দেখছিলাম তুমি অলোকপর্ণার সঙ্গে মিউ আর ম্যাও দিয়েই কাজ সারছিলে।"

মিনিমিনি চিন্তিত মুখে বলল, "সেটাই তো বুঝতে পারছি না। অলোকপর্ণা আজ অফিস থেকে ফিরে ফ্ল্যাটের এই বেহাল অবস্থা দেখে রেগে গিয়েছিল। আমায় একটু বকাবকি করতে আমি রাগ করে পাশের বাড়ির ছাদে গিয়ে বসেছিলাম। তারপর সেখান থেকে ফিরে এসে দেখছি আমি মানুষের ভাষায় কথা বলছি।" বিড়ালরা সাধারণত মিথ্যা কথা বলে না, তবুও মিনিমিনি তার মার খাওয়ার কথাটা বেমালুম চেপে গেল। সে অলোকপর্ণার পোষ্য। কিন্তু নিশুম্ভ অলোকপর্ণার মাথাব্যথা, নিশুম্ভকে দেখতে পেলেই কখনও চটি, কখনও ঝাঁটা, হাতের কাছে যা পায়, তা- ই ছুঁড়ে মারে সে। তাই এই আরশোলাটার কাছে আত্মসম্মান বজায় রাখাটা জরুরি।

নিশুম্ভ কলার আর একটা খাবলা মুখে চালান করে দারোগার মত প্রশ্ন করল, "মানে তুমি পাশের বাড়ির ছাদে গিয়েই মানুষের ভাষা শিখে গেলে? ওখানে এমন কী ঘটেছিল শুনি?" মিনিমিনি এবার রহস্যের উত্তর খুঁজে পেল। কিন্তু ব্যাপারটা সে নিজেই বিশ্বাস করতে পারছে না। তাই একটু ইতস্তত করে বলল, "আমি ঈশ্বরকে বলেছিলাম, আমি যেন মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারি।" নিশুম্ভ এই উত্তরে একটু থমকাল। গোল গোল চোখে প্রশ্ন করল, "সত্যি?" তারপর উত্তরের অপেক্ষা না করেই রেগে দাঁত কিড়মিড় করে বলল, "এসব ঈশ্বরের একচোখামি। আমি কতদিন ধরে বলছি আমার পিঠে একটা জেটপ্যাক লাগিয়ে দিতে, যাতে আমি যখন তখন হুশ করে উড়ে গিয়ে বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসতে পারি। এই ফ্ল্যাটের বাইরের পৃথিবী দেখাই হল না এ জীবনে।"

মিনিমিনি প্রশ্ন করল, "জেটব্যাক কী?" নিশুম্ভ জ্ঞান দেওয়ার ভঙ্গিতে বলে, "ব্যাক নয়, প্যাক। জেটপ্যাক।" কিন্তু জেটপ্যাক কী, সেটা বিশদে বলার আগেই কলিং বেল বেজে

উঠল। এমন সময় কে হতে পারে? কলিংবেলটা আবার বাজল। সঙ্গে দরজায় ধাক্কা, "অলোকপর্ণা। আছিস?" মিনিমিনি সন্ত্রস্ত গলায় জিজ্ঞাসা করল, "এবার কী হবে?" নিশুম্ভ ব্যাজার মুখে বলল, "কী আর হবে? অলোকপর্ণা ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলে দেবে। আর আমায় আবার ফ্রিজের তলায় গিয়ে সেঁধোতে হবে।" ফ্রিজের দিকে হাঁটা শুরু করে সে মিনিমিনির দিকে ঘুরে তাকাল, "দুটো কথা। এক, এখন মানুষের ভাষায় আর কথা বোলো না। তোমার কথা শুনলে গোলমাল আরও বাড়বে। আর দুই, কলাটা পা দিয়ে ফ্রিজের নিচে ঠেলে দাও প্লিজ। আজ রাতটা বেশ আরামে কাটবে।"

বারবার দরজায় ধাক্কার আওয়াজে আর কলিংবেলের ডাকাডাকিতে অলোকপর্ণার আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। মাথায় সূচের মত কী একটা যেন বিঁধে আছে। তীক্ষ্ণ যন্ত্রণায় মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে উঠে বসে সে শুনল দরজার বাইরে রেশমির গলার আওয়াজ, তার নাম ধরে ডাকছে। মেঝে থেকে উঠে দাঁড়াতেই মাথাটা বোঁ করে ঘুরে গেল। দেওয়াল ধরে কোনও রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে অলোকপর্ণা দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

ক্রমশ

ছবিঃ লেখক

১।

দুঃখের গল্প

তিন বন্ধু এক শহরে এসেছে মিটিং করতে। উঠেছে একটা ছ'শো তলা হোটেলের ছ'শো নম্বর তলাতে। সেদিন সন্ধেবেলা কাজকর্ম সেরে ক্লান্ত হয়ে হোটেলে ফিরে দেখে লিফট চলছে না। এতটা পথ কী করে ওঠে? শেষে ঠিক হল প্রথম দুশো তলা ওঠবার সময় প্রথমজন ক্লান্তি তাড়াবার জন্যে মজার মজার গল্প বলবে। দ্বিতীয় দুশোটা তলা ওঠবার সময় দ্বিতীয়জন ক্লান্তি তাড়াবার জন্য কিছু অ্যাডভেঞ্চারের গল্প বলবে। আর শেষ দুশোতলা ওঠবার সময় তিন নম্বর বন্ধু কিছু দুঃখের কাহিনী শোনাবে।

প্রথম চারশো তলা তো গল্প শুনতে শুনতে উঠে যাওয়া গেল। এইবার তিন নম্বর বন্ধুর দুঃখের গল্প শোনাবার পালা। সে মন দিয়ে কিছু ভাবছিল। ভাবতে ভাবতে আরো যখন পঞ্চাশ তলা তারা উঠে গেছে তখন তিন নম্বর বন্ধু বলল, "এইবারে একটা বেজায় দুঃখের গল্প মনে পড়েছে। ছোট্ট গল্প। কিন্তু শুনলেই তোমাদের চোখ ফেটে জল আসবে।"

"আহা বলো, বলো," অন্য দুই বন্ধু কান খাড়া করে বলল।

"গল্পটা হল, আমাদের ঘরের চাবিটা গ্রাউন্ড ফ্লোরে লিফটের সামনের টেবিলে ফেলে এসেছি।"

২।

ভুল মেসেজ

রমেশবাবু আর তাঁর গিন্নি সুরবালা ছত্তিশগড়ের জঙ্গলে বেড়াতে যাবেন। আগের বছরেও গিয়েছিলেন। তবে মুশকিল হল যাবার দিন কত্তার অফিসের বড়কর্তা আসছেন। অতএব তিনি গিন্নিকে বললেন, "তুমি চলে যাও, গতবারের হোটেলটাই ঠিক করা আছে। গিয়ে উঠে পড়ো। আমি পরের দিন আসছি। পৌঁছে একটা খবর দিয়ে দিও।"

গিন্নি তো চলে গেলেন। হোটেলে উঠে দেখেন সে এক এলাহি ব্যাপার। হোটেলে আমূল বদল এসেছে। দারুণ সুন্দর ব্যবস্থাপনা। কাছেই নতুন মোবাইলের টাওয়ার বসেছে ফলে ফোনের

যোগাযোগও করা যায়। ঘরে এসে উঠে তাড়াতাড়ি মোবাইলটা খুলে কত্তাকে একটা মেসেজ পাঠিয়ে দিলেন—

"ওগো, শুনছো। আমি পৌঁছে গেছি ভালোভাবে। এখানে ব্যবস্থাপনা বেজায় ভালো। আজকাল মোবাইলের টাওয়ারও বসেছে। আর কী যে সুন্দর লাগছে চারপাশটা কী বলব। স্বর্গ যে কেমন হয় তা বুঝতে পেরেছি এইখানে এসে। তুমি তাড়াতাড়ি চলে এসো গো। এখানে সবকিছু সুন্দর। আমাদের ওখানকার মত বিশ্রি নয়। খুব আনন্দ করা যাবে।"

মেসেজ পাঠাতে গিয়ে তাড়াহুড়োয় কত্তার নম্বরের শেষ সংখ্যাটা তিন লেখার বদলে যে চার লিখেছিলেন তিনি তা গিন্নি খেয়াল করেন নি।

ফোন রেখে তিনি স্নান করতে চলে গেলেন। ফিরে এসে দেখেন সেখানে একটা মেসেজ এসে অপেক্ষা করছে। তাতে লেখা, "প্রিয় হেমলতা। কাল তুমি যখন হাসপাতালে মারা গেলে তখন ভেবেছিলাম সব শেষ হয়ে গেল। কিন্তু এখন তোমার মেসেজ পেয়ে বুঝতে পারছি স্বর্গ কত সুন্দর। তুমি এরই মধ্যে নতুন ফোনও পেয়ে গেছ। বাঃ। শোনো, আমি এই মেসেজটা লিখতে লিখতে এক কাপ পোকা মারবার ওষুধ খাচ্ছি চুমুক দিয়ে দিয়ে। ভেবোনা গো, এক্ষুণি আমি পৌঁছে যাবো তোমার কাছে। ইতি সতীশ ।"

কে ফিসফিস করছে?

ঋত্বিক
ক্লাস ফাইভ, এপিজে স্কুল

খাবার খেতে শুরুই করছিলাম, হঠাৎ বাবা বলল, "চল একটা জায়গাতে নিয়ে যাবো, সেখানে বেশ ভাল পুরোনো খোদাই করা মহল টহল আছে। জায়গাটা হল মধ্যপ্রদেশে। একটা ভাল হোটেলে থাকব!"

রওনা দিলাম হাওড়া থেকে, অনেক ঘন্টা রাস্তা। সন্ধে নামল আর আমরাও ট্রেন থেকে নামলাম। কিছু খেলাম। হোটেলে গিয়ে দেখি পুরো হোটেল ভর্তি। আমরা একটা লোককে বললাম যে আমরা তো রুম বুক করেছিলাম, তাহলে এটা কী করে হলো?

"মাপ করবেন সার। হোটেল তো ফুল হৈ। অওর এই নিন আপনার টাকাহ...........আর পাসমে এক হাবেলি হৈ। এই ইঁহা থেকে পাঁচ মাইল হি দুরি মে জঙ্গল মে, বঁহা পর আপনারা রহিয়ে।"

কথা বলতে বলতে হয়ে গেল রাত আর তারপর পৌঁছোলাম ওই হাবেলিতে। বেশ ভদ্রস্থ কিন্তু একটু পোকামাকড় আছে। সব কাল সকালের জন্য তৈরি রাখলাম আর গেলাম ঘুমাতে।

ঘুমটা ভাঙলো রাত ৩টেতে একটা শব্দে। কেউ যেন ফিসফিস করছে। বাবাকে ডাকলাম, বাবা বলল ঠিক আছে। বলে আবার শুয়ে পড়ল। সেই রাত আর ঘুম এল না। পরদিন সকালে বেরোলাম। ছবি তোলার আর শক্তি ছিল না। আগের রাতে ঘুম হয়নি।

ফিরলাম হাবেলিতে এই সন্ধে ৬টা নাগাদ। খাবার আনালাম আর খেয়ে গেলাম শুতে ভাবতে ভাবতে, কী জায়গা রে বাবা। কারা ফিসফিস করে?

ঠিক রাত তিনটেতেই আবার ওই ফিসফিসানি। ভয়ে গা ঠাণ্ডা হতে শুরু করল। দেখি জানলা দিয়ে দুটো সাহেব। জিজ্ঞেস করলাম, "আপনারা কি এই আওয়াজটা করছেন? (আমি জানি না যে আমি ওদের বাংলাতে কেন বল্লাম)

ওরা যেই মুখ উঁচু করল, দেখি ওদের দুজনের মুখে নাকচোখ কিচ্ছু নেই!

সকালে যখন জ্ঞান ফিরল দেখি খাটে শুয়ে আছি। বাবা বলল, “অজ্ঞান হলি কেন?”

আমি বললাম কিচ্ছু না! তারপর ফিরলাম বাড়ি আর কম্পুটারে এ সার্চ করে দেখলাম যে ওখানে ১৯২২ সালে রাত্তিরে দুটো সাহেব কথা বলছিল একটা বড় প্ল্যান নিয়ে। তখন একজন ভারতীয় (বিপ্লবী) ওদের চোখনাক সব ছিঁড়ে দিল সেই দিন থেকে সেই দুটো সাহেবের ভূত এখনো ওখানে ঘুরে ঘুরে সেই প্ল্যানটার বাপারেই কথা বলে।

শমীকের গল্প আর তানুষ্কার ছবি

সাক্ষাতকারঃ ইন্দ্রশেখর

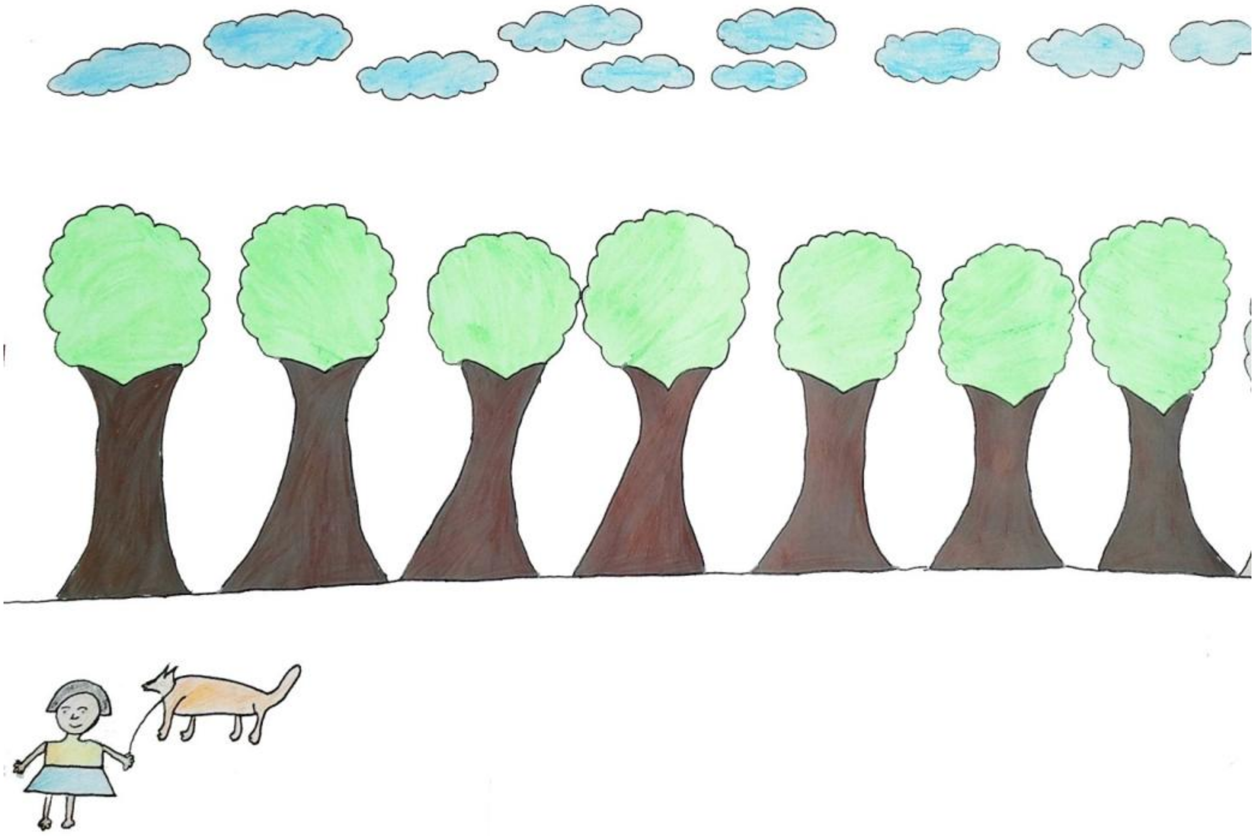

______পাঁচ বছুরে শমীকদের ইশকুলে গিয়েছিলাম অনেক লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে আর পাহাড় জঙ্গল ছাড়িয়ে। সে ইশকুলের বিরাট উঠোন। তাতে বড়ো বড়ো গাছ। শমীক তার দাদার সঙ্গে সেখানে তীরধনুক নিয়ে খেলে আর আকাশবাতাসের সঙ্গে কথাবার্তা বলে।
তার সাথে তার ঠাম্মার কথাবার্তা শুনতে শুনতে অনেক গোপন তথ্য জানা গেল তার গোটাকয়েক তোমাদের সঙ্গে ভাগ করে নিলাম: →

এক ঝড়ের দিনে মস্তো উঠোনে হাওয়ার সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে শমীক বলে, “জানো ঠাম্মা, সুপুরি গাছের পাতাগুলো না ঘুরে ঘুরে আমায় বাই বাই করছিল।

আবার এক মেঘলা দিনে যখন তাদের পাহাড়ি ইশকুলের মাঠে মেঘেরা নেমে এসেছে তখন মাঠ থেকে একপাক ঘুরে এসেই তার ঘোষণা, “জানো ঠাম্মা আজকে না মেঘ নেমে এসে আমার হাতটা আর মুখটা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিল।”

একদিন তাকে জিজ্ঞেস করলাম, “যাবি নাকি আমাদের সঙ্গে?
শুনে সে তার ছোট্ট তীরধনুকটা হাতে নিয়ে বলে, “ উঁহু। আমি আজ তীর দিয়ে আগে যাবো মেঘের কাছে, তারপর –আকাশে—”
নিশ্চয় যাবে। মেঘগুলো ওর বন্ধু কি না!
তার সেই গাছে ভরা শকুলের মাঠ আর মেঘেদের ছবি এঁকে দিয়েছে তার ক্লাশ ফাইভের বড় দিদি তানুষ্কা বেহেরা।

মন্দারমনি ভ্রমন

লেখা ও ছবিঃ অনন্যা বসু
ক্লাস ৬
এপিজে স্কুল, কলকাতা

অনেক জিনিস আমরা বইতে পড়ি ও লোকমুখে শুনি। কিন্তু নিজের চোখে সেটা দেখতে পাই না। তাই সেটা দেখার জন্য আমরা ভ্রমণ করি। ভ্রমণ করলে অনেক কিছু জানা যায়। এখানে মন্দারমনি ভ্রমন দেওয়া আছে।

এপ্রিল মাসে আমরা মন্দারমনিতে ভ্রমণ করতে গেছিলাম। আমার মা, বাবা, বোন(ছোট) এবং আমি নিজে এখানে ভ্রমণ করতে গেছিলাম। তাছাড়াও আমাদের সঙ্গে বাবার এক বন্ধু, তার স্ত্রী এবং তার এক পুত্র ছিল। আমরা চারজন আমাদের গাড়িতে এবং ওরা তিনজন ওদের গাড়িতে। সেদিন রাস্তায় খুব ভিড় ছিল। তারপর আমরা সেখান্‌কার হীরক- জয়ন্তী নামের একটা হোটেলে ছিলাম। বিকেল বেলায় আমরা সমুদ্রের ধারে গিয়েছিলাম, সেখানে পা ডুবিয়েছিলাম। আমরা সাতজনেই ওখানে গিয়েছিলাম। তারপর আমরা সবাই হোটেলে ফিরে এলাম। সন্ধে বেলায় আমরা সবাই গল্প করেই কাটালাম। পরের দিন সকালে সমুদ্রে চান করতে গেলাম সাতজন মিলে। খুব আনন্দ করলাম, তারপর আমরা বরবটি চেপে আমরা রোজ ভেলির কাছে সমুদ্রের ধারে অনেক কাঁকড়া দেখলাম। তারপর সমুদ্রে গিয়ে আনন্দে চান করলাম। সেদিন বিকেলে আমরা সমুদ্রের ধারে ক্রিকেট খেলাম, কিছুক্ষণ পর ডাব খেলাম। পরের দিন বাড়ি ফিরে গেলাম।

ঋকের সমুদ্র

ব্যাঙ্গালোর থেকে আমাদের জয়ঢাকের রান্নাঘরের খুদে ইনচার্জ ঋকবাবু সমুদ্রের ছবি এঁকে পাঠিয়েছেন। এইখানে সেটা দেয়া রইল

শিশুপাল বধ

চেদীরাজ শিশুপাল কুরুরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞসভায় ভয়ানক অশান্তি ঘনিয়ে তুলেছিলেন। তাঁর তীব্র আপত্তি ছিল যে যজ্ঞসভায় উপস্থিত মহা মহা বীর রাজাদের ছেড়ে সিংহাসনবিহীন রাজপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ কেন পাবেন প্রথম অর্ঘ্য। তাঁর ক্ষোভের সপক্ষে তিনি হাজির করেন শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় সংহারের খতিয়ান এবং চেষ্টা করেন সেই যুক্তিতে শ্রীকৃষ্ণকে এক সাধারণ ঘাতক হিসেবে প্রতিপন্ন করতে। তখন কুরুকুলজ্যেষ্ঠ ভীষ্ম বলেন শিশুপালের নিয়তির কথা।

শ্রীকৃষ্ণের পিসি ছিলেন চেদীরাজ্যের রানি। তাঁর সন্তান শিশুপাল। জন্মের সময় শিশুপালের ছিল চারটে হাত আর তিনটে চোখ। তার ওপর তিনি কেঁদেছিলেন এমন গাধার মতো হেঁড়ে গলায় যে তাঁর মা, বাবা ভয় পেয়েছিলেন বুঝি কোনো পিশাচ এসেছে তাঁদের ঘরে। ফলে তাঁরা সদ্যোজাত শিশুপালকে পরিত্যাগের ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই সময়ে দৈববাণী হয়েছিল, “হে রাজা, আপনার এই পুত্রসন্তান ভাগ্যবান ও কালক্রমে শক্তির পরিচয়ও দেবেন। তাই এঁর থেকে আপনাদের ভীত হওয়ার কোনো কারণ নেই। বরং এঁকে লালন করুন যত্নে। এঁর মৃত্যুর সময় এখনও আসে নি। এঁর হন্তাও ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছেন।”

সন্তানের প্রতি স্নেহবশত উৎকন্ঠিত হয়ে মা জানতে চেয়েছিলেন যে কে সেই হন্তা। দৈবকন্ঠ কোনো নাম নেয় নি। শুধু জানিয়েছিল, “শিশুটি যার কোলে বসা মাত্রই শিশুটির অতিরিক্ত দুটি হাত খসে পড়বে আর খসে যাবে তার তৃতীয় নয়নও তিনিই তার হন্তা।”

এই খবর দেশে দেশে রাষ্ট্র হতে দেরি হয় নি। হাজার হাজার রাজন্য হাজির হয়েছিলেন চেদী রাজসভায়। সবার কোলেই শিশুপালকে তুলে দিয়েছিলেন তাঁর মা-বাবা। কিন্তু দৈববাণী সত্য হয় নি। সবশেষে উপস্থিত হয়েছিলেন শিশুপালের মামাতো ভাইয়েরা, বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের কোলে রাখা মাত্রই শিশুপালের দুটো অতিরিক্ত হাত আর তৃতীয় নয়ন খসে পড়েছিল। হন্তাকে চিনতে পেরে শিশুপালের

মা কৃষ্ণের কাছে বর চান যে সর্বশক্তিমান কৃষ্ণ যেন শিশুপালের যাবতীয় অপরাধ ক্ষমা করে দেন। শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালের মায়ের প্রার্থনায় সম্মত হন তার একশোটি অপরাধ মার্জনা করে দিতে।

এদিকে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞসভায় শ্রীকৃষ্ণের অপমানে যারপরনাই রেগে গিয়েছিলেন ভীম। শিশুপালও তাঁকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। ভীমকে যুদ্ধ থেকে নিরস্ত করতে ভীষ্ম বললেন যে, "শিশুপাল সর্বেশ্বর কৃষ্ণেরই শক্তির এক রূপমাত্র। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে নিজের মধ্যে আত্মস্থ করবেন যথাকালে।" এর জবাবে শিশুপাল ভীষ্মকে ভুলিঙ্গা পাখির সাথে তুলনা করলেন। ভুলিঙ্গা হলো সেই পাখি যে কখনও কারুর সাথে খারাপ ব্যবহার করে না। সে সিংহের খাওয়া হলে পরে, সিংহের দাঁতের ফাঁকে লেগে থাকা মাংসের টুকরো খেয়ে জীবন কাটায়। এর জন্য তাকে সিংহের হাঁ মুখে মাথা গলাতে হয় বারবার। ফলে সে পাখির বাঁচা মরা নির্ভর করে সিংহের মর্জির উপর, দয়ার উপর। শিশুপালের মতে ভীষ্মও যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের দয়াপুষ্ট, তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে ভালো ভালো কথা বলছেন।

সব শেষে শ্রীকৃষ্ণ জানালেন যে শিশুপালের পাপের তালিকাও নেহাৎ ছোটো নয়। শ্রীকৃষ্ণ ও বৃষ্ণিকুলের অন্যান্য রাজপুরুষেরা সবাই প্রাগজ্যোতিষে গিয়েছিলেন যখন, তখন শিশুপাল দ্বারকা নগরী পুড়িয়ে খাক করে দিয়েছিলেন। যখন ভোজ রাজা রৈবতক পাহাড়ে শিকারে গিয়েছিলেন তখন তাঁর অনুচরদের হত্যা করেছিলেন শিশুপাল। আবার অনুচরদের কাউকে কাউকে বন্দী করে নিজের রাজ্যেও ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। তিনি শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেবের অশ্বমেধ যজ্ঞের উৎসর্গের ঘোড়াটিকেও চুরি করেছিলেন। দ্বারকা থেকে সৌবিরে যাওয়ার পথে তাঁর হাতে নিগৃহীতা হন ভব্রুপত্নী। শিশুপালও নিজের মামার ঘাতক, তার ওপর সেই হত্যা তিনি করেছিলেন কারুশের রাজার বেশে। তাছাড়াও তিনি বিশাল রাজ্যের রাজকন্য ভদ্রাকে লাঞ্ছনা করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণেরই ক্ষমার বরে শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণেরই ক্ষতি করেছিলেন সব থেকে বেশি, তাও সবই শ্রীকৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে। এইসব কারণেই শিশুপালের মা সত্বত জাতির কন্যা হলেও শিশুপালই শ্রীকৃষ্ণের স্বজাতি সত্বতদের সব থেকে ঘৃণিত শত্রু।

এরপর শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রী রুক্মিণীর সাথে তাঁর নিজের বিয়ের সম্বন্ধের কথা তুলে মোক্ষম অপমানটি করলেন শ্রীকৃষ্ণকে। আর এতেই একশোটি ক্ষমার যোগ্য অপরাধের সীমা তিনি পেরিয়ে গেলেন। সুদর্শনের চক্রের আঘাতে শ্রীকৃষ্ণ ছিন্ন করলেন শিশুপালের ধড় ও মুণ্ড। সে দৃশ্য ছিল পাহাড়ের উপর বজ্রপাতের মতন উজ্জ্বল। যদিও আকাশে মেঘ ছিল না, তবুও অঝোর ধারায় বৃষ্টি নামল, দিকদিগন্ত ছেয়ে গেল বজ্রনাদে। ভূকম্প শুরু হল। কেউ কেউ তাতে রেগে গিয়ে হাতের তালুতে তর্জনী ঘষলেন, কেউ কামড়ে ধরলেন নিজেদের অধরোষ্ঠ। কেউ কেউ জনান্তিকে প্রশস্তি করলেন বৃষ্ণিকুলশ্রেষ্ঠের। কেউ কেউ প্রকাশ্যে সহর্ষে বাজালেন তালি।

এরপর পান্ডব ভাইয়েরা যুধিষ্টিরের নির্দেশে তড়িঘড়ি মিটিয়েছিলেন শিশুপালের অন্ত্যেষ্টি। রাজসূয় যজ্ঞও সমাধা হয়েছিল। বিদায় নিয়েছিলেন নিমন্ত্রিত অভ্যাগতরা।

ছবিঃ ইন্দ্রশেখর

ইয়েডোর ওটোকোডেটের গল্প

(গোমপাচি ও কোমুরাসাকির গল্পের একটি পরিশিষ্ট)

সংহিতা

প্রথব পর্ব

ওটোকোডেটে হলো বীর যোদ্ধাদের সঙ্ঘ। এই সঙ্ঘের সদস্যরা সবাই একে অপরের সুখে দুঃখে পরস্পরের পাশে দাঁড়ানোর জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতেন। এর জন্য প্রাণের ঝুঁকি নিতেও তাঁরা দ্বিধা করতেন না। এমনকি এর জন্য তাঁরা একে অপরকে ঝুঁকি কেন নিতে হবে তাও জিজ্ঞেস করতেন না। তবে কোনো দুষ্কৃতি যদি এমন সঙ্ঘের সদস্য হতেন তো তাঁকে দুষ্কর্মের স্বভাব ত্যাগ করতে হোতো। কারণ সঙ্ঘ সমস্ত উৎপীড়ককেই তাদের শত্রু বলে মনে করতেন এবং সঙ্ঘের সদস্যরা শপথ নিতেন সব দুর্বলকেই রক্ষা করার, যেমন পিতা রক্ষা করেন শিশুকে। এঁদের অর্থও এঁরা দিয়ে দিতেন অভাবি দরিদ্রকে। ফলে এঁরা সাধারণের মনে শ্রদ্ধার বিশেষ আসনটিতে জায়গা করে নিয়েছিলেন।

সঙ্ঘের প্রধানকে ডাকা হতো "পিতা" বলে। তাঁর শিক্ষানবিশদের মধ্যে কেউ গৃহহীন হলে সে সঙ্ঘপ্রধানের সাথেই বাস করত ও তাঁর হয়ে কাজ করত। বদলে শিক্ষানবিশ সঙ্ঘপ্রধানকে কিছু প্রণামীও দিত, যাতে তিনি বিপদে- আপদে, অসুখে- বিসুখে শিক্ষানবিশকে সাহায্য করতে পারেন।

সঙ্ঘপ্রধান বা পিতার বৃত্তি ছিল দাইমিও ও অন্যান্য বিশিষ্টজনের ইয়েডোতে আসার জন্য বা সেখান থেকে অন্যত্র যাওয়ার জন্য প্রয়োজন মতো কুলির যোগান দেওয়া, বদলে তিনি নিতেন নির্দিষ্ট পরিমাণ চাল। যখন শেষতম সো গুনের আগের সো গুন, তোকুগাওয়া ইয়েমোচি, ইয়েডো থেকে কিয়োটো গিয়েছিলেন, তখন তাঁর যাত্রার দেখভাল করেছিলেন সিম্মন তাৎসুগোরো নামে একজন ওটোকেডেটে প্রধান। এই যাত্রার তিন- চার বছর আগেই তিনি তাঁর কুশলতার জন্য বিশ্বস্ত হয়ে উঠেছিলেন আর হাতামোতো পদে উন্নীত হয়েছিলেন। ফুসিমির যুদ্ধের পরে সো গুন

ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হলে, যখন শেষ সো গুনরা অবসর নিচ্ছিলেন তখন তাঁদের গন্তব্য পৌঁছানোর কাজ নিয়েছিলেন সিম্মন তাৎসুগোরো।

ইয়েয়াসুর আমলের গৃহযুদ্ধের পরে দেশব্যাপী শান্তির আবহাওয়া থাকলেও যোদ্ধা পুরুষদের মনের উত্তেজনার কমতি ছিল না কোনো। বরং তাদের কাছে বিশ্রামের একঘেয়েমি অসহ্য হয়ে উঠেছিল। তাই তখনও হাতামোতোদের ওটোকেডেটে ছিল কয়েকটা। সামুরাই গোত্রের যুবকদের মধ্যে দলাদলি আর গোষ্ঠীকোন্দল লেগেই ছিল। দেশজুড়ে শান্তি আরও ব্যপ্ত হলে এই সব গোষ্ঠী কোন্দলও থেমে গেল।

এমনকি নিচুতলার যোদ্ধাদের ওটোকাডেটের অস্তিত্বও অস্বীকার করা হতো, যদিও সেগুলো তখনও নামে মাত্র ছিল কোথাও কোথাও। তবে তাদের না ছিল ক্ষমতা না গুরুত্ব। তবুও ধিকি ধিকি জ্বলা প্রদীপের মতো একটা আধটা বিখ্যাত শহরের সমাজজীবনে জাঁকিয়ে ছিল ওটোকাডেটে। আর নম্র সামুরাই বা সাধারণ প্রহরী যেই নিজের পরিচয় দিতে পারতেন কোনো ওটোকাডেটের পিতার বন্ধু বলে, তাঁকে ভাগ্যবান বলে মনে করা হতো। এই শব্দগুচ্ছই পুরুষকার আর বীরত্বের অর্থ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ব্যান্ডজুইনের চোবেই ছিলেন ইয়েডোর ওটোকাডেটের প্রধান। তাঁর আসল নাম ছিল ইটারো। তিনি ছিলেন এক গ্রামের এক অখ্যাত রনিনের পুত্র। যখন তাঁর দশ বছর বয়স তখন একদিন তিনি এক বন্ধুর সাথে নদীতে স্নান করতে গিয়েছিলেন। খেলতে খেলতে ঝগড়া করতে করতে ইটারো তাঁর বন্ধুকে জাপটে ধরে একবার নদীতে ছুঁড়ে ফেললেন। বন্ধুটি নদীতে ডুবে মারা গেল।

তখন তিনি বাড়ি ফিরে বাবাকে বললেন, "আজ আমি নদীর ধারে খেলতে গিয়েছিলাম এক বন্ধুর সাথে। ও আমাকে খারাপ খারাপ কথা বলেছে। তাই আমি ওকে জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি আর মেরে ফেলেছি।"

বাবা বজ্রাহতের মতো স্থির হয়ে সব শুনে বললেন, "এ তো ভয়ানক কথা! বালক তুমি, তবুও তোমাকে তো তোমার কৃতকর্মের শাস্তি পেতেই হবে। তাই আজ রাতে তুমি গোপনে পালিয়ে যাও ইয়েডোতে। সেখানে কোনো মহৎ সামুরাইয়ের সেবায় লেগে যেও। হয়তো বয়স হলে তুমিও একজন যোদ্ধা হয়ে উঠবে।"

এরপর তিনি ইটারোকে কুড়ি আউন্স সোনা আর একটা তলোয়ার দিলেন। তলোয়ারটা রাই কুনিটোসি নামে এক বিখ্যাত কামারের বানানো। তারপর রাতের মধ্যে তড়িঘড়ি তাকে রাজ্যের সীমা পার করে দিলেন। পরের দিন সকালে মৃত শিশুটির মা- বাবা এসে দাবি জানালেন যে তাঁদের প্রতিশোধ চরিতার্থ করার জন্য ইটারোকে তাঁদের হাতে মরার জন্য তুলে দিতে হবে। কিন্তু ততক্ষণে করার আর কিছু ছিল না। তাঁরা নিজেদের সন্তানের মৃতদেহ সৎকার করে শোক যাপণ করলেন।

ইটারো দ্রুত পৌঁছোলেন ইয়েডোতে। সেখানে একটা দোকানে কাজ নিলেন। কিন্তু এই ক্লান্তিকর কাজে বালক ইটারোর শিগশিরই হাঁপ ধরে গেল। বিশেষত যোদ্ধা হওয়ার জন্য তাঁর রক্ত ফুটছিল টগবগ করে। তাঁর কপাল ভাল যে তিনি কাজ পেয়ে গেলেন সাকুরাই সোজায়েমন নামে এক মান্যগণ্য হাতামোতোর কাছে। তখন তিনি নিজের নাম বদলে সুনেহেই নাম নিলেন। সোনোসুকে ছিলেন সাকুরাই সোজায়েমনের ছেলে। তখন তাঁর বয়স ছিল সতের বছর। সুনেহেইকে তাঁর ভারি পছন্দ হলো। তিনি সুনেহেইয়ের সাথে নিজের সব কিছু ভাগ করে নিতে লাগলেন।

ফলে সোনোসুকে যখন তলোয়ার চালানো শিখতে যেতেন তখন সুনেহেইও তার সঙ্গে যেতেন। সাহস আর সক্রিয়তা তাঁকে খুব শিগগিরই ওস্তাদ তলোয়ারবাজ করে তুলল।

(চলবে)

লাল ফুলের গল্প

প্রচলিত রাশিয়ান গল্প
ইংরিজি থেকে বাংলায়
অনুবাদঃ ইন্দ্রশেখর

অনেককাল আগে অনেক দূরের এক দেশে এক সওদাগর চলেছিল বাণিজ্যে। সওদাগরের তিন মেয়ে। তাদেরকে সে ডেকে জিজ্ঞেস করল, “কী আনবো তোদের জন্যে দূরের দেশের থেকে তাই বল।”

শুনে বড় মেয়ে বলল, “আমায় তুমি একটা সোনার মুকুট এনে দিও বাবা।”

শুনে মেজ মেয়ে বলল, “আমায় তুমি একটা স্ফটিকের আয়না এনে দিও বাবা।”

শুনে ছোট মেয়ে বলল, “আমায় তুমি একটা টকটকে, ছোট্ট লাল ফুল এনে দিও বাবা।”

তারপর সওদাগর তো চলল বাণিজ্যে। দেশে দেশে ঘুরে ঘুরে মুকুট আর আয়না তো জোগাড় হল, কিন্তু ছোট্ট মেয়ের আবদারের ছোট্ট লাল ফুল তো আর সওদাগর পায় না। শেষে খুঁজতে খুঁজতে সে গিয়ে হাজির হল এক জাদুবনের ভেতরে। সে বনের একেবারে গভীরে ছিল এক রাজপ্রাসাদ। তার বাগানে নাকি এক আশ্চর্য ফুল ফোটে যা কিনা দুনিয়ার আর কোথাও ফোটে না। সেইখানে গিয়ে সওদাগর বাগানে ঢুকে দেখল, কি আশ্চর্য, এই তো সেই তার ছোট মেয়েটার বলে দেয়া ফুল। টুকটুক করছে লাল। হাওয়ায় দুলছে একটু একটু।

ফুলটা যেই না তোলা,অমনি কোত্থেকে একটা ভয়ানক দেখতে জীব এসে হাজির হল। সে কি তার রাগ! সে কি তার গর্জন। বলে, “আমার বাগানের ফুল তুললি কেন তুই?এবারে বাঁচতে হলে ফিরে গিয়ে তোর একটা মেয়েকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিবি আমার সঙ্গে থাকতে। নইলে তোর আর রক্ষা নেই।”

সওদাগর আর কী করে? ্জন্তুরর কথাতেই রাজি হয়ে গিয়ে ফুলটা নিয়ে দেশে ফিরে এল। তারপর তার কথা শুনে বড় মেয়ে বলল, “জন্তু তোমায় খেয়ে ফেললে আমার কী? আমি

কিচ্ছুতেই যাবো না।" মেজমেয়ে বলল, "জন্তু তোমায় খেয়ে ফেললে আমার কী? আমি কিচ্ছুতেই যাবো না।"

ছোট মেয়েটা মিষ্টি করে হেসে বলল, "আমি তোমায় বড্ডো ভালোবাসি বাবা।। তোমায় বাঁচাতে আমিই যাবো সেই জন্তুর বাগানে।"

এই বলে সে একলা একলা রওনা হল দূরদেশের সেই জাদুবনের দিকে। প্রাসাদে পৌঁছোতে তাকে দেখে জন্তু তো বেজায় খুশি। কিন্তু মেয়েকে সে দেখা দিল না। যদি সে তার ভয়ংকর রূপ দেখে ভয় পায়? আড়াল থেকে সে মেয়ের সেবাযত্ন করে। তাকে ভালো ভালো খাওয়ায় পরায়, দামি দামি জামাকাপড়, গয়নাগাঁটিতে মুড়ে দেয়।

আস্তে আস্তে মেয়ে তার না দেখা বন্ধুকে ভালোই বেসে ফেলল। রোজ সে তাকে বলে, "এইবার আমায় একবার দেখা দাও বন্ধু।" রোজ সেই জন্তু তাকে মানা করে। এমনি করতে করতে একদিন তার জেদের সামনে হার মেনে সে এল মেয়ের সামনে। অমনি তাকে দেখে ভয়ে কুঁকড়ে গেল মেয়ে। কি ভয়ানক তার চেহারা!

সেদিন রাতে মেয়ে স্বপ্নে দেখল তার বাবার ভারী অসুখ। বন্ধুকে সে বলল, "আমার বাবার ভারী অসুখ। আমার তাঁকে দেখতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে। তুমি আমায় তাঁকে দেখতে যেতে দেবে?"

জানোয়ারের মন গলে গেল। "যাও," সে বলল মেয়েকে, "তবে ঠিক তিন দিনের জন্য। তারপর ফিরে আসবে ফের আমার কাছে। ততদিনের জন্যে তোমার এই লাল ফুলটা আমার কাছে রইল তোমার চিহ্ন হয়ে।"

মেয়ে তো এলো বাড়িতে। বাবার সঙ্গে দেখা হল। বোনদের সঙ্গে দেখা হল। তার গায়ের দামি দামি পোশাক আর গয়নাগাঁটি দেখে বোনেরা লুকিয়ে লুকিয়ে এমন হিংসে করল যে কি বলব! তখন তারা করল কি, ঘড়িগুলো সব কাঁটা ঘুরিয়ে পিছিয়ে দিল। ছোট বোন কিছু টেরও

পায়নি। ঘড়ি দেখে সে যখন ভাবল তিনদিন হয়েছে তখন আসলে পেরিয়ে গেছে অনেক বেশি সময়।

বনের ভেতর প্রাসাদে ফিরে মেয়ে দেখে তার বন্ধু মাটিতে পড়ে মরে আছে। তার বুকের কাছে চেপে ধরা রয়েছে তার সেই লাল ফুলটা। সেই দেখে মেয়ের মন গলে গেল। কাঁদতে কাঁদতে বন্ধুর মরা শরীরটা জড়িয়ে ধরে সে বলল, "তোমায় যে আমি ভীষণ ভালবাসি বন্ধু।"

সেই বিশ্রি জন্তুটা আসলে ছিল একজন সুন্দর রাজপুত্র। ডাইনির অভিশাপে সে এমন হয়ে গিয়েছিল। ডাইনি বলে গিয়েছিল, কেউ তাকে সত্যিকারের ভালোবাসলে তবেই তার অভিশাপ কাটবে। মেয়ে যেই তাকে ভালোবাসল, অমনি তার অভিশাপ গেল কেটে, আর রাজকন্যার চোখের সামনে সেই ভয়ংকর জানোয়ার এক সুন্দর রাজপুত্রে বদলে গিয়ে আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসল, যেন কিচ্ছুটি হয় নি।

তারপর তাদের ধুমধাম করে বিয়ে হয়ে গেল আর তারা সুখেশান্তিতে ঘরকন্না করতে লাগল।

গভীর বন। সকালের আলো ফোটেনি এখনও। বনের বাসিন্দাদের ঘুম ভেঙে গেছে। পাহাড়ি ঝর্নাটার সাথে সুর তাল মিলিয়ে ছাতারে, মুনিয়া, দোয়েল, বৌকথাকও, বদর, টুনটুনির দল গলা সাধতে আরম্ভ করেছে। উদারা থেকে মুদারায় উঠেছে। অশত্থগাছের চৌতালার ফোঁকড় থেকে মস্ত ঠোঁটওয়ালা চঞ্চু বার করে চোখ মটকে চাইলো ধনেশগিন্নী।

'খুব তো আমায় গাইতে দেয়া হয়না,কন্সার্টে একটা সুর যে গোলমেলে সে খেয়াল আছে তো?'

বন মোরগদের বুড়ো মোড়ল হাই তুলতে তুলতে বললো, 'ঠিকই ধরেছো বিবিজান। আমার কানেও একটু কেমন অসুর ঠেকতেছে যেন। ওরে তোরা বরং ঠিকঠাক করে শুরু কর আবার।'

হাড়গিলে চাচা টাকমাথা পাকা পালকের বুড়োসুড়ো মানুষ, সংগীতের ব্যাপারে কদাচ কথা কয়না। কিন্তু সে পর্যন্ত ঝরনার জলে একখানা মাছ ফসকে ফ্যাক করে হেসে ফেললো।

ব্যাস! মুনিয়া চাইলো দোয়েলের দিকে, বৌকথাকও ঠোনা মারলো টুনটুনিকে, ছাতারেরা সাত ভাই বোন মিলে তাড়া করলো বেচারা ডাহুকদের। কনসার্ট হেঁচকি তুলে থেমে গিয়ে লেগে গেল বেদম ঝটাপটি।

প্যাঁচাদের কত্তা গিন্নীর মিশুকে বলে তেমন নাম ডাক নেই, তারা নিজেদের মধ্যেই চোখাচুখি করে বাঁকা হাসলো। একটা ভাড়াটে কোকিলের ছানা কাগের বাসা থেকে উড়ে এসে মজলিসের মাঝ মধ্যিখানটিতে জুড়ে বসে খুব বিজ্ঞের মতো বললো, 'সুর লাগে না তো স্বরলিপি দেখলেই পারো। নাও নাও সা লাগাও।'

ওর ক্যার্দানিতে তেমন খুশি না হলেও ঘরানার খাতিরে সবাই আবার বসলো গোল হয়ে। ফের শুরু হলো বুনো কনসার্ট। এবার সবাই সাবধান। এ ওর ঠোঁটের নড়ন চড়ন খেয়াল করে দিব্যি চলছে এমন সময় হঠাৎ আবার গোলমাল। কচি কোকিল ডানা ঝাপটে থামালো সবাইকে। মধ্যম হাফপর্দা নামিয়ে কে যেন একটা 'কোমল সা' বলে ফেলেছে!

'কে রে? কে রে? কড়ির জায়গায় কোমল গায়। হায় হায় হায় হায়'। ইদিকে আকাশের সূয্যিমামা গাছপালার ওপর থেকে রাঙ্গামুখ বাড়ায় আরকি। দিনটাই বুঝি বৃথা যায়। বেসুরো কেত্তন সক্কালবেলায়।'

সুঁ- ই- ই করে তিরের মতো নেবে এলো বাজবাড়ির সেজোখোঁকা। ফ্যাঁস ফ্যাঁসে গলায় বলতে বলতে এলো, 'তোমরা কিচ্ছু নজর করোনা কেন গো? চোখের যত্নটত্ন নাও এবার থেকে।'

জোড়া ডানার তিন ঝাপটায় উড়ে গেল, সাত বস্তা শুকনো পাতা। তার তলা থেকে বেরুলো বারোটা তেঁতুলেবিছে- তেতাল্লিশটা গুবরে পোকা, সতেরোটা শুঁয়োপোকা আর ভারী লাজুক একরত্তি এক অপরাধী। 'কোমল সা'র জোগানদার। ভয়ে বা লজ্জায় সারা গায়ের লোম খাড়া করে তুলোর গোলগাপ্পা হয়ে বসে আছে।

চক্ষুদুটি তার কাচের তোয়েরি টিপবোতামের মতো, ভেজা ভেজা কচি নাকের তলায় ফুলো ফুলো গালে আবার তিনটে তিনটে ছটা গোঁফ। ফ্যাঁকাশে তুলো তুলো গায়ে চমৎকার কালো ডোরা।

চুপ করে গেল সবাই। তারপর গোল হয়ে ঘিরে ধরে ভাল্লো করে দেখে টেখে মতামত জানিয়ে দিলো, 'না না অন্যায় কিছু তো করেনি। আলাদা করে শুনলে মোটেই তেমন মন্দ লাগছে না ওর কোমল মধ্যম, অর্থাৎ কিনা মিঁউ বলে যেটা বলছে। তবে একেবারে সকালবেলার কনসার্টের মতো ভারী আসরে নয়,আরও তালিম দরকার। তার চাইতেও বড় কথা, ছানাটি কাদের? বনের মধ্যে ঠিক এ রকমটি তো এর আগে দেখা যায়নি। তাছাড়া এলো কোত্থেকে? মতলোবটি কী? খোঁজ করো খোঁজ করো, খবর নাও খবর নাও।'

খোঁজ খবর করবার ব্যাপারে ছাতারেদের তুলনা নেই। সর্বক্ষণ দল বেঁধে বনের আনাচে কানাচে এটা ওটা খুঁজে বেড়ায়,জানেও তারা ঢের, তা, বুড়ি ছাতারেগিন্নী অনেক পুছ্তাচ্ করেও 'কোমল সা' ছাড়া আর কোন শব্দ বার করতে পারলো না ছানাটার পেট থেকে।

আরও মুশকিল হচ্ছে, স্বভাব ভালো নয় ওর। কাছে গেলেই চেটেপুটে অস্থির করে তুলছে। পাখিরা ওসব চাটাচাটি এক্কেবারে পছন্দ করে না। তাই মোটের ওপর ব্যাপারটা এই দাঁড়ালো যে, সুয্যিমামা লাল থেকে হলদে হয়ে যাবার পরেও কেউ কোন হদিশ করতে পারলো না।

গান গাইতে না পারলে কি হবে ধনেশগিন্নীর প্রাণে আবার দয়ামায়া একটু বেশি। উড়োকলের মতো থির ডানা মেলে চৌতালার বাসা থেকে নিচে নেবে হেলতে দুলতে অকুস্থলে পৌঁছে এক ধমক সবাইকে, 'দেখছিস সারা রাত্তির উপোস করে ওর গলা শুকিয়ে রয়েছে, কথা বলবে কী করে? আক্কেল বলে কিছু আছে তোদের! অ্যাই হাড়গিলেদাদা,ছোটখাটো একটা মাছ দিয়ে যাওনা গো এটাকে খাওয়াই। তালেগোলে গানের আসর আর বসতেই পেলো না আজ। নতুন অতিথি বলে কথা। তার ওপর বেজায় কচি অতিথি, কথা কইতেই শেখেনি, খেতেটেতেও জানেনা এতই ছোট! হাড়গিলে দাদুর এনে দেয়া মাছটাকে বার কয়েক চেটেপুটে মাথা ঝাঁকিয়ে মুখ ফিরিয়ে ওয়াক করেছে, চোখে দেখা দূরস্থান। তবে এটা খায় কী?'

ইদিক উদিক ছুটলো সবাই খাবার জোগাড় করে আনতে।

টুনটুনি আনলো মধু,
দোয়েল আনলো বটফল,
কাদাখোঁচা আনলো কাঁকড়ার ডিম,
কাকাতুয়া আনলো পাকা ডালিম,
ছাতারেরা আনলো মুথোঘাসের বীজ,

শামুকখোল আনলো শামুক,
বক আনলো চুনোমাছ,
মুনিয়া আনলো প্রজাপতি,
বাজপাতিয়া আনলো পিঁপড়ে,
বৌকথাকও আনলো কেঁচো,
বনমোরগ আনলো বনকড়াইয়ের দানা,
বদরী আনলো কাবলিচানা,
চড়ুই আনলো ধানের শীষ,
শালিক আনলো শুখা কিস্‌মিস্‌ ,
কোকিল আনলো কাগের ডিম ,
কাঠঠোকরা আনলো ঘুনপোকাদের কচি খোকা ,
চড়ুই আনলো জোনাকিপোকা ,
বাদুড় আনলো খেঁজুরের থোকা,
প্যাঁচাগিন্নী পর্যন্ত ভাঁড়ার খুঁজে আনলো একখানা মরা ইঁদুরছানা।

না, কিছুতেই কিছু না। ছানাটা কিছু মুখেই তুললো না। রোঁয়া টোয়া ফুলিয়ে বসে রইল চুপচাপ। শেষমেষ বনমোরগ বললো, ‘এ বাপু দু পেয়েদের কক্ষনো নয়। যাও চৌপায়াদের ডেকে আনো, তারা যদি নতুন কিছু বাতলাতে পারে।’

তাই হলো।

কুটুরে ব্যাঙ আর বুনো শুওরদের মেজোকর্তা আলোচনায় বসলো। ডাকা হলো হনুমিতেকে। বাঁদর ভাই, চিতাদিদি,আর বনবেড়ালদিদিকেও। হনুমিতে আর বাঁদরভাই ছানাকে উল্টে পাল্টে বেশ করে দেখে টেনে চোখ পিটপিট করতে করতে ব্যাঙকে ডাকলো। ব্যাঙ বারবার উঁচু হলে নিচু হল, তারপর দেখেশুনে ফোলাগাল চুপসে শুওরকে ডাকলো। শুওর ডাকলো চিতাদিদিকে। সেও মাথা নাড়তে থাকায় বনবেড়ালদিদি এলো, এসে হেসেই কুটিপাটি। ‘ওরে একে চিনিস নে? এ আমাদের জ্ঞাতভাই বেড়ালের বন্‌সের ছানা। দুধটি না পেলে খাবেই না কিছু। সবে এর চোখ ফুটেছে। কথা ফোটেনি, দাঁত ওঠেনি, নখ নুকুতে জানেনা কো, লাফিয়ে ছাড়া হাঁটতে পারে না। তা ছাড়া ন্যাজ নাড়া, শিকার ধরা, ফ্যাঁস্‌ রে-ফোঁস রে ইত্যাদি কোন বিদ্যেই নেই। একে বাঁচাবি কি পোকারে? ওরে ছানা, তুই এখেনে এলি কোত্থেকে?’

কিস্যুতেই কিস্যুনা। কাকস্য পরিবেদনা। অনেক আদর টাদর খেয়েও ছানা ‘কোমল মধ্যম’ বাজিয়ে দিলো ফের। এমনকি, গোলাপের পাঁপড়ির মতো অ্যাট্টুকুনি জিভ বার করে চেটেও দিল বনবেড়ালদিদিকে।

ধনেশগিন্নী কর্তাকে ডাকলো নিচ থেকে, ‘ওগো শুনছো? ’

চৌডালার ফোঁকর থেকে জবাব এলো, 'কী বলছো?'

'এখেনে এসো, কাজ আছে। '

বলতে না বলতে কর্তা নেবে এলো, পিছে পিছে তার পোলাপান এলো গুটি চার। যেন উড়োকলের ঝাঁক ওড়ার মহড়া দিচ্ছে। গিন্নী বললো, 'কে কী এনেছিস নিয়ে আয় একঠাঁই, ঠোঁটে পিষে দুধ বানাই। সেই দুধ খেয়েই বাঁচবে ছানা। রান্নাটা খুব একটা মন্দ হবে না, বলে রাখি।'

তাই হলো। ধনেশদের মস্তো মস্তো ঠোঁটের হামনদিস্তে চালু হয়ে গেল। নিমেষে তোয়ের হলো দুধ। ছানা খেলোও খুব তৃপ্তি করে ধনেশগিন্নীর ঠোঁট থেকেই। খেয়ে বড্ডো বুঝি ভালো লেগেছে, চাটাচাটি করতে করতে প্রায় গলার ভেতর সেঁধোতে চায় দেখে চিতামণিদিদি চট্ করে ওটাকে কোলে তুলে নিয়ে বললো, 'চলরে বাপু তোকে বেড়াতে নিয়ে যাই। বাকি পাড়া পড়শিরাও দেখুক তোকে। আলাপ পরচেয় হোক সবার সাথে।'

ধনেশগিন্নীর তোয়ের করা সেই দুধ বড় সাধারণ বস্তু ছিলো না। তোমরা তো জানোই কী কী জিনিসের মিশেল ছিলো তার মধ্যে। আবশ্যি কাকের ডিমটি কোকিলছানার কানমুলে ফেরৎ পাঠানো হয়েছিল, তবে ওটা বাদে যা ছিলো তাতেই কেল্লাফতে। পেল্লায় কখানি ঢেঁকুর তোলার পর ওই দুধের গুণে বেড়াল ছানার আন্‌তারা ফুস্‌কুলিয়ে উঠলো।

সবার চোখের সুমুখেই ছানাটা কেমন উজিয়ে উঠলো। যা যা বিদ্যে থাকবার একে একে সব ফুটে উঠতে লেগেছে তার ঐটুকু শরীরের মধ্যে। জ্ঞানচক্ষু ছানাবড়া। পুষি কি তখন কারো কোলে চুপটি করে বসে থাকবার লোক! এর পিঠে ,তার ল্যাজে, ওর মাথায় লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে অস্থির। হুলুস্থুল বেধে গেল চারদিকে। সে যতো লাফায় ততো হাসে। যতো হাসে ততো তার আহ্লাদীপনা উজিয়ে ওঠে, আর মুখেও নানা রঙবেরঙের বুলি ফোটে। হাড়গিলে দাদু গোল্লাচোখ টেরিয়ে ফস্‌ফস্ করে বললোবো'ধহয় বায়ু চড়েছে, ব্রহ্মতালুতে পুরোন শ্যাওলা মালিশ করলে কমতে পারে।'

আগ বাড়িয়ে চলেছে পুষি, পেছনে বনবেড়ালীর দল, যেন দিগ্বিজয়ে বার হয়েছে। পুষির কান্ড দেখতে আরও আরও লোকজন জুটে যাচ্ছে। হেনকালে, পথ জুড়ে দাঁড়ালো গৌরের দল, যেন পাহাড় পর্বত! তাদের বাঁকা শিং, কালো পায়ে সাদা হোস্। আর তাদের পিছু পিছু এলো এক দল বুনো মোষ। চেহারায় তারা গৌরের মেসোমশাই। মোটা গোড়া চোখা শিং এস্পার ওস্পার পায়ে পায়ে বন দুরমুশ। বড় বড় নাকের ফুটোয় দম বইছে ফোঁস্ ফোঁস্। আওয়াজ যেন বাজের নির্ঘোষ!

‘অতো হল্লা কিসের শুনি?’

‘এয়েছে অতিথি অ্যাট্টুকুনি’।

‘কই কই দেখি, কোথায়?’

‘আপাতত চিতেদিদির মাথায়’।

বারকতক চোখ পাল্টে মোষেদের সর্দার দেখতে পেল অবশেষে। লাল চোখ সব্জোট হল খুশিতে। ছানার নাচন কোঁদন আর মিঠে গলার ভুল ভাল কোমল বুলি শুনে বড় তো খুশি গৌর মোষের দল বেবাক। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে সবাই মিলে বললো, ‘ওমা কি সুন্দর আর কি ছোট্টমতো। যেন নিপ্পনি যন্তর! সাইজে ছোট, কাজে দড়ো, বা- বা- বা। বেঁচে থাকো বেঁচে থাকো।’

পুষিছানা ছুট্টে গিয়ে তুড়ুক করে লাফিয়ে উঠলো বুনোমোষের সর্দার জব্বর শিং- এর পিঠের ওপর। তারপর লাগলো দৌড়াদৌড়ি পিঠময় শিমুল তুলোর বীজের মতো ফুরফুরিয়ে। একবার লেজ ধরে দোল খায়। পর মুহুর্তেই মাথার ওপর উঠে ছোট ছোট থাবায় আঁচড় কেটে দেয়, এক শিঙের চুড়ো থেকে লাফিয়ে যায় আর এক শিঙের চুড়োয়। এমন কি আদিখ্যেতা করে চুমো পর্যন্ত খেয়ে দিলো একটা। তার আদরে আর সুড়সুড়ির আরামে বোজা চক্ষু দিয়ে জল বার করে ফেললো জব্বর শিং। আহারে! অমন আদর কেউ তাকে করেনি গো! জন্মের পর থেকে সবাই কেবল গুঁতোতে চায়। শক্ত গায়ের ভেতর তার একরকম মনটা উথলে উঠলো আহ্লাদে। অনেক আশির্বাদ করে তারা বনবেড়ালী দলের পথ ছেড়ে দাঁড়ালো।

চলতে চলতে গাছেরা ঘন হয়ে দাঁড়িয়েছে এক সময়। কাঁটা ঝোপের জ্বালায় পথ চলা দায়। হিমশীতল হাওয়া বইছে হিস্ হিস্। ঝোপে ঝোপে কারা যেন করে ফিস্- ফাস্- ফোঁস্- ফাঁস্। ভয়ে ভয়ে বুকের খাঁচায় প্রাণ করে নিস্ পিস্। হাড়গিলে দাদামশাই গা খাঁকড়িয়ে হাঁক দিলো, ‘সাবধান সবাই, এ বনে আছে বুকে হাটার দল। এর নাম নীল বন। এ বনের বাসিন্দেরা ক্ষেপলে ছাড়ান নাই কারো!’

দু পেয়েরা ও কথা জানে, অনেকেই ডানা মেল্লো আকাশে। গগনভেড়দাদা ছানাকে তার লম্বা ঠোঁটের ঝুলন্ত থলের ভেতর চড়ে বসতে বলতেই সে ফিক্ করে হেসে লাগালো দৌড়। থলের মধ্যে ভর্তি মাছ, সেধে ঐ বিট্কেল আঁশটে গন্ধ গায়ে মাখতে ছানার বয়ে গেছে। একটু তফাৎ থেকে বললো, ‘ভয় কী? আমি ডাঙাতেই যাবো। এই চললাম আগ বাড়িয়ে। তোমরা এসো পিছু পিছু। রাগ কোরনা গো গগনভেড়দাদা।’

অমনি নীলবনের ঝুপসি গাছের মাথা থেকে হিস্ হিস্ শব্দের ঝড় উঠলো।

‘সাব্বাশ! কেয়াবাত। কে রে তুই পুঁচকে বীর? আয় আয় চুমো খাই’। বলে মস্তো কুমড়োর মতো মুন্ডু বাড়ালো গাছ থেকে ঝুলন্ত সাপের রাজা ময়ালঠাকুর। ছানা দোল খেতে ভালোবাসে খুব, অমনি ঝুলে পড়লো মুন্ডুখানি দু থাবায় জড়িয়ে। ময়াল ঠাকুর ক্ষণে ক্ষণে জিভ বার করে দেখে চেটেও দিল জিভ, দুবারে দুখান। কি খুশি কি খুশি! ময়াল ঠাকুর আনন্দে

গদগদ। 'এমনটি আর দেখিনি কো! ওরে ,আয় সবাই, কারো ভয় নাই। সাপেদের তরফ থেকে সক্কলকে মাপ্। কক্ষনো যদি আরও তোদের কাউকে কামড়াই! কি ভালো কি ভালো! কতো সাহস এটার বল দেখি!'

রাজার কথা শুনেই হুস্ হাস্ করতে করতে ছুটে এসেছে রাজ্যির যতো সাপ। রঙিন হয়ে উঠলো চাদ্দিক। লাল- নীল- হলুদে- সবজে কালো, চকরা বকরা, ছিট ছিট। গায়ে রোদ পড়ে চিক্চিক্- ঝিকমিক। সাপেরা সবাই দেখতে ভালো, মানুষ হিসেবেও খারাপ নয়। বনবেড়ালীদের সাথে কোলাকুলি করতে কি আর বাকি থাকে সাপেদের কারো। সবাই চেচাঁয়, 'ভয় নাইরে ভয় নাই, আজ থেকে আমরা ভাই ভাই।' বনবেড়ালী দলের সাথে জুটেও গেল কেউ কেউ।

বনের মাঝমধ্যিখানে টল্টল্ জল। মস্তো সরোবর। গহন বনের কালচে সবুজ আঁধারের ফাঁকে ফাঁকে ঢেউয়ের ওপর রোদের ঝিলিক , হীরের মতো ঝিক্মিক্। সরোবরে পদ্মবন, সেখানে জল ছোঁড়াছুঁড়ি খেলা করছিল মত্ত হস্তির দঙ্গল। দেখে সবার প্রাণ আনচান্ , পুষির ছানাটা আহ্লাদে আটখান। এক ছুটে কাছে যেতেই হাতির শুড়ের ছুটন্ত জলে বেমক্কা ভিজে দেখতে হল ঠিক যেন কচি উদবেড়ালের ছানাটি। কোমল মধ্যমে বিসজ্ঞ লাগিয়ে হেঁচে ফেলতেই অবশ্য নাক সাফ হল বিলকুল । সেই শব্দ শুনে উঠে এলো জল থেকে একজন,

'কৌন হো তুম ইতনা ছোটা ওস্তাদ, মাফ কিজিয়ে গা মাফ'। বলতে বলতে শুঁড়ে আল্তো করে জড়িয়ে ছানাকে নিজের দু চোখের মাঝে কপালের ওপর বসিয়ে নিয়েছে হাঁথি মহারাজ, নইলে যে দেখা যায় না! ভালো করে দেখে টেখে ভারি অবাক- 'তুই কে রে বাপ'?

ছানা তখন শীতে কাঁপছে। দু চারটে বিসজ্ঞ তখনও বার হচ্ছে মুখ থেকে ছিটকে ছুটকে। কাঁপুনি থামবার পর ছানা তো মহারাজের কপাল বেয়ে সিধে মাথায় চড়ে বসেছে। খুব আমোদ পেয়েছে মহারাজ। বাকিরাও খেলা থামিয়ে ব্যাপারটা ভালো করে দেখবে বলে জল ছেড়ে উঠে এসে কাদা কাদা করে ফেললো জায়গাটা। কচি হাতিগুলোর বেশি মজা। বেঁটে বেঁটে শুঁড় দুলিয়ে তাদের কি নাচ! মহারাজের মাথার চুলের উকুনের বাসা। মাথায় উঠেই ছানা লেগে গেল উকুন শিকারে। দেখে শুনে এক ঝাঁক চড়াই আর বদরীও উড়ে এসে কাজে লেগে গেল চটপট। হাতির দল বেজায় খুশি সবার ওপর। উট আর গন্ডার এসে বলে আমাদেরও উকুন বেছে দাও। উড়ে গেল ফিঙে আর বুলবুলি। ওমা! সরোবর থেকে কুমির উঠে এলো দাঁত বার করে। দাঁতে নাকি পোকা লেগেছে, পোষ্কার করে দিক কেউ। উড়ে গেল এক ঝাঁক বাঁশপাতিয়া। লেগে গেল কাজে। সে এক ভারি মজায় মেতে উঠলো সব্বাই।

ছানাকে মাথায় বসিয়ে হাতিরাও চললে দলের সাথে সবাই মিলে। চলতে চলতে চলতে চলতে সুয্যিমামা উঠে এসেছে মাথার ওপর। খিদের কথা মনেই নেই কারো। কত কি দেখলো পুষিছানা, আলাপ হল কতজনের সাথে। দল এখন মস্ত বড়। প্রথমে হাঁথি মহারাজ ছানা মাথায়, তারপর সার সার ন্যাজায় শুঁড়ে ধরাধরি করে পরস্পর, মোষেদের জব্বর সিং দলবল নিয়ে,গন্ডার গন্ডারনিরা ছানা পোনা সমেত, গৌরের দলবল। তারপর ছোটকা ছুটকি চানা চুটকি- কেউ বাদ নেই।

বনের মাঝমধ্যিখানটিতে তখন অন্য কিছু ঘটছিল। সেখানে সবার যাবার হুকুম নেই। বনের রাজবাড়ি সেখানে। যেতে পারো, তবে জ্যান্ত থাকতে নয়। যাওয়া তবু যায় বটে, তবে ফেরার সন্দো আছে। রাজা রাজড়রার কারবার এখানে কারো খুলি , ওখেনে হাড়! এখানে পা রাখে এমন সাধ্য কার। বাঘ সিঙ্গির দৌলতে সব্বের পরাণ জেরবার।

দুপুরের রোদ্দুরও মাটি ছোঁয় না। এমন গহন এই বন। বনে এক পাথুরে টিলা, তার গায়ে মস্ত বড় এক গুহা। বনের রাজা স্বামী নখদন্তমর্মর মহারাজ তখন ঘুমিয়ে আছেন গুহার ভেতর। গুহার বাইরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছিল বাঘ সিংহের বংশের যতো ছোট বড় ছানা পোনারা আর প্রজার দল। বনের যুবরাজ সিঙ্গী বাহাদুর আর মন্ত্রী ব্যাঘ্রমল্ল বাবাজির বড়ছেলে বাঘ বাহাদুর পাশেই একটা ঢিপির ওপর বসে আপসে তরজা শুরু করেছিল। তাদের ওই সিধে আলাপেই ভরসা ফুরিয়ে অন্যান্য ছোটখাটো বাসিন্দাদের পিট্টান দিতে দেখে হায়নার দল হেসেই অস্থির!

'ছোঃ এই তোদের মনের জোর! দেখে আয়গে বনবেড়ালীদের দলটাকে। একটা কয়টুকুনি বিড়ালের ছানার কী কারেজ। সেটাই নাকি তাদের মাতব্বর, পাশে আছে মোষেদের বস জব্বর আর হাতীদের গব্বর!' শুনে উদ্বাস্তুরা ভয়ে ভয়ে চললো বনের আড়ালে নুকিয়ে উজিয়ে আসা দলটাকে দর্শন করতে। তাদের পরাণে আধা ভয় আধা কুতুহল। শ্যালের দল ফেউ ডাকতে ভুলে কেঁউ কেঁউ বলে ভুল ডেকে চুপসানো ফোলা ল্যাজ দুপায়ের ফাঁকে লুকিয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করতে চললো শ্বাপদদের হয়ে।

সুয্যিমামা উঠে এসেছে ততক্ষণে মাথার ওপর। ক্ষিদে তেষ্টার কথা ভুলেই গেছে সবাই। বনে আজ মহা উৎসব। সবাই দল বেধে চলতে পারার মজাই আলাদা। চলতে চলতে সবাই এলো বনের মধ্যিখানে।

বন এখানে সবচেয়ে গহন। পথ চলতে গা ছম ছম করে, মনে ভয় হয়। ভয়ে এখানকার গাছেরাও কোন শব্দ করে না, নড়ে না চড়ে না। বাতাসের গায়ে ভয়ে কাঁটা দেয়। চিতাদিদি ফিস্ ফিস্ করে বললো সাবধান, এখানে থাকে রাশভারী শ্বাপদের দলবল। তবে তাদের সবাই ভয় পেলেও আসল কথা হল ওদের নিজেদের মধ্যে তেমন মিলমিশ নেই। ওরা সবাই চায় রাজা হতে।

চিতাদিদি এদের দলের লোক হলেও অতোটা গায়েগতরে ভারী না হওয়ায় দলছুট, বাকি নিরিমিষিদের সাথেই থাকে কষ্টে সৃষ্টে। কিন্তু এখন এই নিরিমিষি দলটাও বেশ ভারী। সবাই মিলে বললে, 'চল যাই ভয় কিসের? আমাদের কিছু বললে আমরাও ছেড়ে দেব না।'

পিঁপড়েদের লাল কালো পিপিপিল্টন হুল ওঁচালো, 'কক্ষণো নয়।' ভিমরুলরা রুল উচিয়ে বৃন্দগান গাইতে লাগলো 'রুল ভিমরুলী ভিমরুলী রুলস দ্য ফরেস্ট'। এমন কি উইপোকার দলও বললো, 'উই শ্যাল ওভারকাম টুডে'!

হাতি আর মোষেরা ফোঁস ফোঁস করতে লাগলো, 'ওরে ভাই শোন, ওদের মনে ভয়, চৌপরদিন হাড় মাস চিবিয়ে চিবিয়ে দন্তক্ষয়, দল বেঁধে দাঁত আর নখ চালিয়ে বড় নাম কিনেছে। রাজা হয়েছে। আপনাদের তাড়া খেলে পালাবার পথ পাবেনা কো। চল্ যাই হয়ে যাক ইসপার কি উসপার!'

কদিন আগে বান্দররাজ দীর্ঘলাঙ্গুলীস্বামী কোন একদিন নিচুডালায় ধ্যানে বসে থাকাকালীন শ্যালের কামড়ে আধখানা ল্যাজ খুইয়ে মনে মনে বড় সুসরে ছিলেন। অনেক আইন আদালত মায় বানরাধিকার কমিশন বসিয়েও করেতে পারেননি কিছু। আধখানা ল্যাজের দরুণ তাঁর রাজ্যপাট যায় যায়, তিনি এখন অহিংসা নীতিতে বিশ্বাস করেন। বাদবাকিদের কথা বার্তায় মারপিটের গন্ধ পেয়ে চট্ করে বাকি আধখান ল্যাজ সামলে চড়ে বসেছেন উঁচু মগডালায়। বসে ইতি উতি চাইছেন আর চোখ পিটির পিটির করে বক বক করছেন, আহা উগ্রপন্থায় কাজ কি! কিবা লাভ কামড়াকামড়ি গুঁতাগুঁতিতে! বরঞ্চ একবার দূর

থেকে উঁকি মেরে দেখে আসা যায় না তারা কোথায় আছে টাছে? তা সেদিক না গিয়ে অন্য পথে গেলেই তো হয়! আপনাদের উদ্দেশ্য তো বনবেড়ানো, দরকার কি মিছিমিছি কিচিমিচি খিচিমিচিতে!

অমনি দলের এক জায়গায় লেগে গেল হট্টগোল। প্যাঁচা পেঁচী, ছুঁচো ছুঁচী, চামচিকে চামচিকানিনী, বাদুর বাদুরানী ইত্যাদি ইত্যাদি রাতচরা প্রাণী। অন্যান্যদের মধ্যে দিনের বেলায় কোনঠাসা লোকেরা হঠাৎ সমবেতভাবে খস্‌খসে গলায় বলতে লাগলো, 'ভাই সব, মোটেও আমরা শুধু হাওয়া খেতে বার হইনি। আমরা সংসারীলোক কাজ কর্ম আছে। বনের ভেতর আমাদের অবস্থা মাথামোটা মানুষগুলোর মত। ওদের মতো আমাদেরও সকল সময়ে সকল জায়গায় চলে ফিরে বেড়াবার উপায় নেই,এ খামচাচ্ছে ও কামড়াচ্ছে ইত্যাদি। বোকা গাঁ শহরে থাকা দুপেয়েরা এখেন থেকে ওখেনে যায় টিকিট কেটে। বেড়া আর দেয়াল টেয়াল তুলে নিজেরাই নিজেদের খাঁচায় পুরে রাখে। আজ হঠাৎ আমরা এই বন বেড়াতে এসে বুঝতে পারলাম, ভালবেসে সবাই একত্তর হতে পারলে আমরা নিজেদের ইচ্ছেমতো চলতে ফিরতে পারবো। সেই জন্যেই রাতচরারা আজ দিনচরাদের সাথে মিশতে পারছি। তেমন খোঁচাখুঁচি না করেও। আমরা চাই চলো সবাই, বাঘ সিঙ্গীরাও এই দলে আসুক, তবেই সবার ভালো হবে।' পাকা কোকিলের বাচ্চাটা টুনটুনিকে ডেকে বলল, 'কথাগুলো ঠিক,কিন্তু বলার ভঙ্গীটা দ্যাখ্‌। গলায় একটু সুর নেই তাল নেই, ওমনি বললেই হল নাকি।' এর টিপ্‌পুনী অবশ্য অন্যদের শোরগোল চাপা পড়ে গেল।

গুহার ভেতর স্বামী নখদন্তমর্মর মহারাজের তখন সবে ঘুম ভেঙেছে। কেশর টেশর ফুলিয়ে হাত পা জোড় টান টান করে ম- স- তো বড় এক হাই তুলে হরিণের ছালের বিছানার ওপর উঠে বসেছেন। মুখের চারপাশে মাছি ভন্‌ভন্‌ করে বন্দনা গাইছে। তিনি নিজে গতকালকের ভুড়িভোজনটা আর দু সুতো কম হলে ভাল হত কিনা ঠাহর করবার চেষ্টা করছেন, এমন সময় গুপ্তচর শেয়াল দূর থেকে পেন্নাম করে দাঁড়ালো। ভয়ে তার কথাবার্তা আগোছালো শোনাচ্ছে। এটিকেট ভুল ভাল হচ্ছে।

'তারা আসতেছেন মন্মহারাজ!'

'তারা কারা'?

'কার বা নাম করি আলাদা করে!'

'মানে?'

'মানে কথা,কে বা কার, সবাই মিলেমিশেই আসতেছেন আজ্ঞা। শুওর বাঁদর পাখপাখালি সাপখোপ ইয়ে টিয়ে সব একাক্কার। আপনার দর্শন চান বলে মনে লয় যেন'।

'কেন, তাদের কি ভয় ডর নাই কোন!'

'মনে হয় যেন তাই'।

'হঠাৎ একি দুর্লভ, বেয়াদব আতি! রোগা বোকা লোকেদের এতো দুঃসাহস!'

'ইয়ে, দলে আছে সার সার হাতী,জল হাতী , বরা, গন্ডার আর বুনো মোষ!'

'নালিশটা কী?'

'ঐটুকু জানা আছে বাকি!'

গুহার ভেতর একরকম কথাবার্তা চলছে , এর মাঝে বনবেড়ালীরা এসে গেছে কাছে পিঠে। দলের আড়ম্বহর দেখে বাঘ সিঙ্গীদের ছানা পোনারা তরজা ভুলে ল্যাজ নামিয়ে সিংহরাজার গুহায় ঢোকার তোরজোড় করছে। নেকড়ে,শেয়াল, হায়না, ভাল্লুক তারাও আসছে

পিছে পিছে। কে আর তেজ দেখাতে গিয়ে গলা বাড়িয়ে থাপ্পর খায়। নিমেষের মধ্যে গুহার ভেতর শ্বাপদেরা দমসম হয়ে লুকিয়েছে, বাইরের উঠোন শুনশান পরিষ্কার।

বনবেড়ানো দল গোল হয়ে সবাই বসলো গুহার মুখ মাঝখানে রেখে। বাচ্চা বেড়াল গুহার মুখের কাছে গিয়ে কোমল গলায় ডাকলো;

'মেসোমশাই?'

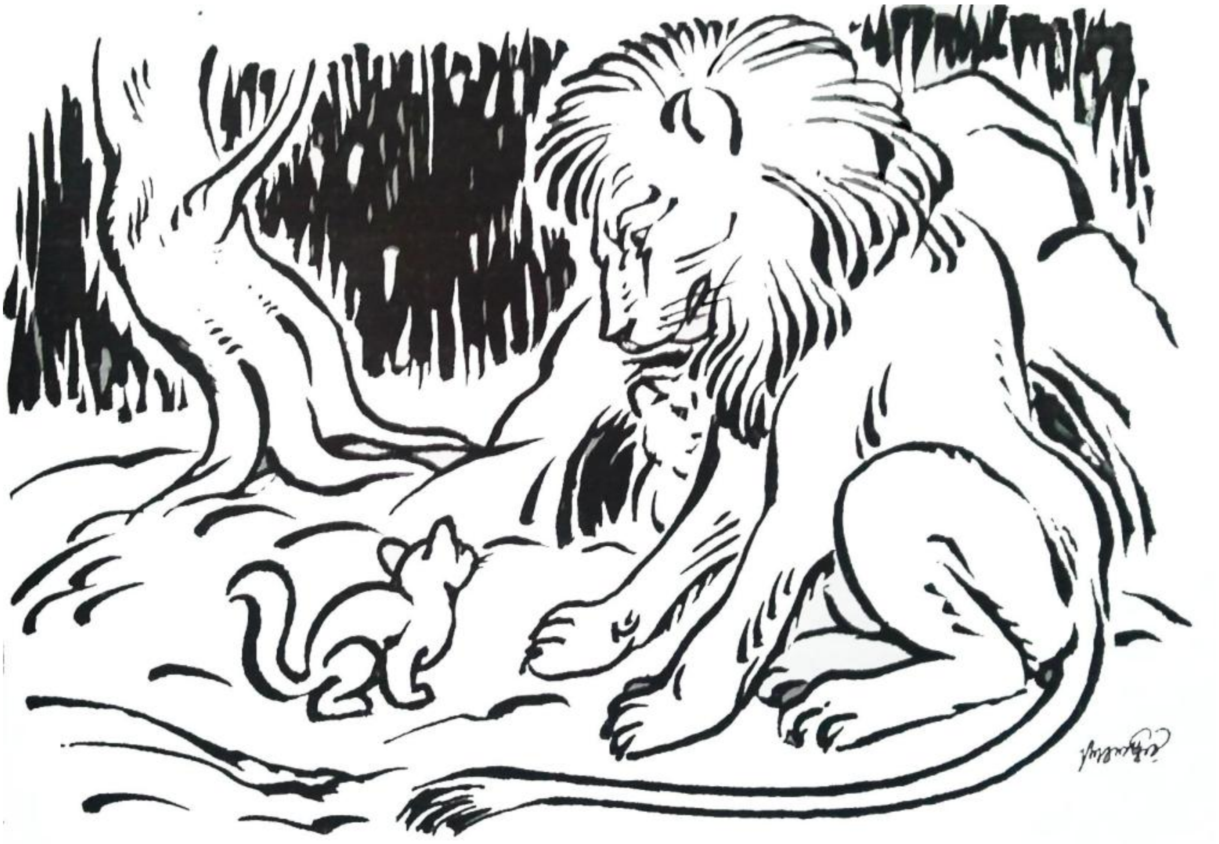

'কে ডাকে ভাই? ভয়ে ভয়ে অমন যে সিংহরাজা তার মুখেও ভাই ভাই, তেজের তিলমাত্র নাই। মধুর গলার স্বর!'

'মেসোমশাই, একটা কথা ছিল জানাবার।'

'বলে ফ্যালো বাপ আমার।'

'বনের সবাই এক ঠাঁই মিলে মিশে থাকতে চাই। ক্ষিদে পাওয়া বাদে ঝগড়াঝাঁটি আঁচড়কামড়ের চাই ছুটি।'

'এ আর কী এমন, সবে মিলে থাকো একজুটি।'

বলতে বলতে হাসি মুখে নখদন্তমর্মর মহরাজ গর্ত ছেড়ে সবার মাঝে প্রকাশিত হলেন। ধারাবাহিক বার হল বাঘ, ভালুক, হায়েনা নেকড়ে আর খ্যাঁকশেয়ালরা একে একে। ভয়ে ভয়ে তখনও তাদের ল্যাজ রয়েছে লুকিয়ে দুপায়ের ফাঁকে।

তারপর তো বুঝতেই পারো সবাই মিলে কী ভীষণ আনন্দটাই না করলো। লম্ফ ঝম্প ভুমিকম্প, ধুলোর ঝড় উঠলো আকাশে। সেই লালচে মেটে ধুলোর আবির সর্বাঙ্গে মেখে সব্বাই, এমনকি বুড়োর বুড়ো হদ্দবুড়ো হাড়গিলে চাচা অবধি খোঁড়া পায়ে ঠ্যাঙঠেঙি নাচ দেখালো, ধনেশ গিন্নীও চাঁছা গলায় ধ্রুপদ গেয়ে শোনালো। তাছাড়া শেয়ালের হুক্কা গান। নেকড়ের ঐকতান। মোষের দুন্দুভি। হাতির ট্রামপেট। হরিণের তবলা। কুমিরের গিটকিরি,

বাঘসিঙ্গির গরগর্জন। বাঁদরের কিচিমিচি রাগের নিপ্পনি সঙ্গীত, যা নয় তাই। গানের কোন ইচ্ছেই কারো বাকি রইলো না। আজ আর স্বরলিপির তোয়াক্কাই করলে না কেউ। গাছপালারা পর্যন্ত বোকার মত সর্বাঙ্গে ফুল ফুটিয়ে দুলতে লাগলো আনন্দে।

পরদিন সকালে বনের বাইরে গাড়ির হর্ন বাজতে শোনা গেল। গাড়ি এসে থামলে তা থেকে নেবে এলো এক খোকা আর এক খুকি। দুজনের মুখ দুঃখে চিন্তায় শুকনো। গুপ্তচর শেয়াল কান পেতে শুনতে পেল খোকা বলছে খুকুকে;

'এখানেই তো এসেছিলাম কাল পিকনিক করতে?'

'হ্যাঁ, ওই তো আমাদের উনোনের গর্ত। এখানেই তো।'

'তা হলে এখানেই গাড়ি থেকে নেবে পালিয়েছে । চল খুঁজতে যাই বনের ভেতর।'

'তার চেয়ে ডাকি আয় কে গলার জোরে দুজনে মিলে।'

খোকা আর খুকু বনের ধারে গিয়ে ডাকতে লাগলো, পু- ষ- ই- পু- ষি- ই- রে- এ- এ- এ! কোথায় গেলি তুই? সে ডাক বনের গাছে গাছে ধাক্কা মেরে ফিরে ফিরে এলো। অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করে কোন সাড়া না পেয়ে দুজনে চোখের জল মুছতে মুছতে গাড়িতে গিয়ে বসলো পুষির আশা ছেড়ে। খোকাখুকুর বাবা মাও ছিল গাড়িতে বসে। তাঁরা বললেন, 'দুঃখ কোর না , এনে দেব আর একটা বেড়ালছানা যত্ন করে রেখো। ও কি আর বেঁচে আছে? অতবড় বনে ঐটুকু বেড়ালছানা বাঁচবে কি করে। ওতো নিজে নিজে খেতেই শেখেনি। কতবার বললাম ওকে নিয়ে পিকনিকে যেও না। চলো এবার ফিরে যাই।'

চলে যাবার আগে খোকাখুকু আরও কয়েকবার গলার শির ফুলিয়ে ডাকলো পুষিকে। তারপর একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে গাড়ি চলে গেল শহরমুখো।

ধনেশগিন্নীর কাছে দুধ খেতে খেতে সে শুনতে পেল সেই ডাক। শুনে তারও টিপবোতাম চোখ জ্বল জ্বল ছল ছল করে উঠলো। একবার ভাবলো সাড়া দেব। তারপর চিতাবাঘিনীদিদির সাথে চলে গেল বনের ভেতর, যেখানে ওর সত্যিকারের আপনজনেরা থাকে।

পুরোনো সন্দেশ থেকে। লেখকের অনুমতিক্রমে প্রকাশিত

কাঙাল হরিনাথ

উমা ভট্টাচার্য

সত্যজিত রায়ের “পথের পাঁচালি” সিনেমাটি খুব বিখ্যাত হয়েছিল সবাই জানে। সুন্দর কাহিনী, স্নিগ্ধ সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী যেমন সবার ভাল লেগেছিল, তেমনি সেই সিনেমার একটি গান খুব জনপ্রিয় হয়েছিল । অপু আর দুর্গার পিসিমার গাওয়া একটি গান, একা বসে গাইছিলেন তিনি, “হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল পার কর আমারে”, অনেক দিন মানুষের মুখে মুখে ফিরত সেই গান। সেই গানটি সত্যজিত রায় কোথা থেকে পেয়েছিলেন? সেটি কার লেখা? সেকথা আমরা অনেকেই জানিনা।

সেই গানটি যে অসামান্য মানুষটি লিখেছিলেন তাঁর কথাই থাকছে ‘স্মরণীয় যাঁরা’র এই পর্বে। তিনি হলেন বাংলার অখ্যাত গ্রামের দরিদ্র পরিবারের এক প্রতিভাধর সন্তান কাঙাল হরিনাথ। তিনি ছিলেন একাধারে শিক্ষক, সাংবাদিক,কবি, সাহিত্য রচয়িতা, বাউল সঙ্গীত রচয়িতা, বাউল গান, পাঁচালি লেখক ও গায়ক। উপরন্তু ছিলেন প্রকৃত দেশপ্রেমিক,ও প্রজাদরদী এক নীরব বিপ্লবী। আসল নামটি ছিল হরিনাথ মজুমদার। দারিদ্র্যের সঙ্গে ছোট্টবেলা থেকেই তাঁর যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ছিল, সেই অবস্থাকে ব্যঙ্গ করে তিনি নামের আগে বসিয়েছিলেন ‘কাঙাল’ বিশেষণটি।

কাঙাল হরিনাথ এই নামেই নিজের পরিচয় দিয়েছেন তাঁর বিভিন্ন লেখায়। অবিভক্ত বঙ্গের নদীয়া জেলার জেলার কুমারখালি গ্রামের এক মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান হরিনাথ মজুমদার জন্মেছিলেন ১৮৮৩ সালে। এখন অবশ্য সেই গ্রাম চলে গেছে বাংলাদেশের কুষ্ঠিয়া জেলায়।

তাঁর জন্মের এক বছরের মধ্যেই মা মারা যান। বাবা হলধর মজুমদারের জমিজমা থাকলেও বিশেষ আয় ছিলনা, সংসারেও তাঁর বিশেষ মন ছিলনা। ফলে দেখার লোকের অভাবে সব জমিজমা বেদখল হয়ে যায়। বাবার এক কাকিমা তাঁকে কোলে তুলে নেন, মায়ের দুধের অভাব পূরণ করেন, কিন্তু ভালোভাবে খাইয়ে পরিয়ে রাখার মত আর্থিক অবস্থা তাঁর ছিলনা।

ইতিমধ্যে বাবার মৃত্যু হলে দাহ করে এসে খাওয়ার সংস্থানও তাঁর ছিলনা। ঠাকুমার এক আত্মীয়ের আর্থিক সাহায্যে বাবার শ্রাদ্ধ করলেন। তাঁর অর্থ সাহায্যেই সামান্য খাবার জুটতো। বাবা বেঁচে থাকতে ছোটবেলায় গ্রামের পাঠশালায় খানিকটা অক্ষর পরিচয় হয়েছিল। লিখতে আর পড়তে শিখেছিলেন সামান্য। আর শিখেছিলেন ধারাপাত,শুভঙ্করী আর্যা,সুদকষা ,মনকষা, প্রভৃতি গণিতের বিষয়, যে বিষয়গুলি তখনকার দিনে পড়ানো হত গ্রাম্য পাঠশালায়। বাবার মৃত্যুর পরে অর্থাভাবে স্কুল ছেড়ে দিতে হল। তখনকার দিনে হাতের লেখা একটু সুন্দর হলেই যাহোক একটা কাজ জুটতো। সেই বিদ্যাটাই একবার তাঁর কাজে লেগেছিল।

এসময় তাঁদের গ্রামের কৃষ্ণধন মজুমদার নামে একজন বিদ্যোৎসাহী, স্বচ্ছল ব্যক্তি একটি ইংরেজি স্কুল স্থাপন করেছিলেন। হরিনাথের ইচ্ছা হল সেখানে পড়াশুনা করেন। ভর্তিও হলেন। তাঁর এক কাকা ইংরেজ কুঠিতে কাজ করতেন। তাঁর কাছে আবেদন করে স্কুলের বেতন জোগাড় করলেন। বইপত্রের অভাব মিটতো চেয়েচিন্তে, হাতে লিখে নিয়ে। অবসরে সহপাঠীদের কাছ থেকে বই নিয়ে মুখস্থ করে নিতেন স্কুলে বসেই। ঠাকুমার আবেদনে হরিনাথের মেজ- জ্যাঠামশাই দুবেলা দুটি ভাতের ব্যবস্থা করে দিলেন।

মেধাবী হরিনাথের শিক্ষা চলছিল দ্রুত। আর সেইসঙ্গে চোখ খুলে যাচ্ছিল সমাজের অবস্থার দিকে। হরিনাথ চোখের সামনে দেখতেন গ্রামের গরিব প্রজাদের দুর্দশা। সমাজে তাঁর নিজের নিরুপায় অবস্থা থেকেই বুঝেছিলেন পরাধীন ভারতের গরীব মানুষদের শিক্ষা আর অর্থের প্রয়োজন কতটা বেশি। একদিকে জমিদার অন্যদিকে ইংরেজ নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে চাষীদের প্রাণান্তকর অবস্থা দেখেছেন আর তার প্রতিকারের চিন্তায় মন চঞ্চল হয়েছে। পরাধীনতাই এই অবস্থার জন্য দায়ী একথা উপলব্ধি করে তিনি একটু একটু করে মনে মনে তৈরি হতে লাগলেন। বড়ো হয়ে দেশের গরিব

খেটেখাওয়া মানুষদের পক্ষে আওয়াজ তুলেছিলেন তিনি তাঁর শাণিত লেখনীর মাধ্যমে। তবে তার তখনও দেরি আছে।

তাঁর নামের সঙ্গে তিনি যে কাঙাল উপাধিটি লাগিয়েছিলেন তা সত্যিই সার্থক। স্কুলে কয়েকমাস পড়ার কিছুদিনের মধ্যেই কাকার কুঠির কাজটি চলে গেলে, পড়ার জন্য যে অর্থসাহায্য পেতেন তা বন্ধ হয়ে গেল। স্কুল ছাড়তে বাধ্য হলেন হরিনাথ। এ সময় তিনি পরবার পোশাকের অভাবে বাইরে বেরুতে পারতেন না।

এই সময় সুন্দর হাতের লেখা ফের তাঁর কাজে এল। গ্রামের এক ধনী মানুষের একখানি বই তিনি একরাত্রে নকল করে দিয়ে পারিশ্রমিক নিলেন একখানি ধুতি। শতছিন্ন ,মলিন ধুতিটির এমন অবস্থা হয়েছিল যে, সেটি পরে তিনি বাইরে বেরুতে পারছিলেন না। জামা তো নেই, তাই নতুন ধুতির খুঁটটি গায়ে দিয়েই তিনি বাইরে যেতেন কাজের সন্ধানে।

একবার এক মহাজনের দোকানে খাতা লেখার কাজও পেলেন তিনি, কিন্তু মহাজনের ইচ্ছামত হিসাব খাতায় কারচুপি করতে না চাওয়ায় মহাজন অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে তাড়িয়ে দিলেন। কাজটি চলে যাওয়ায় জ্যাঠামশায়ও তাঁকে দুবেলা যে দুমুঠো খেতে দিতেন তাও বন্ধ করে দিলেন। এবার প্রকৃত অর্থেই কাঙাল হলেন তিনি। বৃদ্ধা ঠাকুমা তাঁকে নিজের খাবার থেকে কিছুটা দিতেন। সেটাও যে কী তা তাঁর ডায়েরি থেকেই জানা গেছে। পান্তাভাত,জামিরের(গন্ধ লেবুর)পাতা আর লবণ। মাঝে মাঝে ঠাকুরবাড়ির প্রসাদ জুটে যেত।

কিছুকাল বাদে লোকনাথ কুণ্ডী নামে গ্রামের এক দাদা তাঁকে রাতের খাবারটুকু দিতে লাগলেন। মাঝে মাঝে কোনও বইপত্র নকল করে কিছু উপার্জন করতেন। মাঝে কয়েকদিন নীলকুঠিতেও কাজ করেছিলেন, সততার জন্য সে কাজও করতে পারেননি। এভাবে যা আয় করতেন তা দিয়েই কোনমতে চলতো, কিন্তু কিছু কিছু তিনি জমাতেন তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য।

স্কুলে অল্প কদিন যা পড়েছিলেন সেই পাঠ তাঁর বিশেষ জ্ঞানলাভের সহায়ক হয়নি। বিদ্যার জন্য কাঙাল হয়ে উঠলেন তিনি। জ্ঞানের আলো পাওয়ার সুযোগ এল কিছুদিনের মধ্যেই ।তখন ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে কলকাতায়। ঠাকুর পরিবারের জমিদারী ছিল বাংলাদেশের বিস্তৃত এলাকা জুড়ে। কুমারখালি গ্রামের কাছেই শিলাইদহে ছিল তাঁদের কুঠিবাড়ি। ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁদের জমিদারীর এলাকায় কুমারখালিতে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য পাঠালেন পণ্ডিত দয়ালচাঁদ শিরোমণি মশাইকে। এইসময় হরিনাথ এলেন শিরোমণি মশায়ের সান্নিধ্যে, শিরোমণি মশাইয়ের কাছে তিনি ব্যাকরণের পাঠ নিতে লাগলেন। হাতে পেলেন সেইসময়ে প্রকাশিত ব্রাহ্মধর্মের কিছু বইপত্র,আর কলকাতায় প্রকাশিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার কিছু সারগর্ভ লেখা। এগুলি পাঠ করে তাঁর ভাষাজ্ঞান শাণিত হল।

অর্থাভাবে ছেলেবেলায় নিজে ভালোভাবে স্কুলে পড়ার সুযোগ পাননি, সেই আক্ষেপ থেকে গ্রামের দুঃস্থ বালকদের শিক্ষার জন্য নিজের বাড়িতেই একটি বাংলা পাঠশালা স্থাপন করলেন দুঃসাহসী হরিনাথ। সময়টা ছিল ১৮৫৪ সালের ১৩ই জানুয়ারি। তখনও গ্রামেগঞ্জে আধুনিক বাংলাশিক্ষার প্রচলন হয়নি, সেই অভাব পূরণ করলেন হরিনাথ। সে এক অসাধ্যের সাধনা।

শিরোমণি মশাইয়ের কাছ থেকে বইপত্র নিয়ে পড়ে তিনি বুঝেছিলেন তখন পরিবর্তনশীল সমাজের উপযুক্ত করে নিজেদের গড়ে তোলার জন্য আধুনিক পদ্ধতিতে নানা বিষয়ে শিক্ষার প্রয়োজন গ্রামের ছেলেদের। অতএব তিনি ইংরেজদের শিক্ষণপদ্ধতি অনুসারে তাঁর স্কুলে সাহিত্য, ব্যকরণ,ভূগোল, ইতিহাস,অঙ্ক প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন। শিক্ষার ভার প্রথমে তিনি নিলেন। বিনা পারিশ্রমিকে পড়ানোর মত শিক্ষক তিনি কোথায় পাবেন? কারণ তাঁর স্কুল ছিল সম্পূর্ণ অবৈতনিক। নিজে যেসব বিষয় আগে পড়েন নি সেগুলি তিনি অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র বাবা, হরিনাথের বাল্যবন্ধু

মথুরানাথ মৈত্রেয়র বাড়িতে গিয়ে তাঁর কাছে জেনে নিতেন ও মুখস্থ করে নিয়ে পরদিন ক্লাসে ছাত্রদের পড়াতেন।

যে সময় শিক্ষক শিক্ষণের জন্য সরকার ২/১ টি মাত্র নর্মাল স্কুল স্থাপন করেছেন সবে, তখন সুদূর পল্লিগ্রামের এক অর্ধশিক্ষিত যুবক নুতন শিক্ষাপদ্ধতিতে গ্রামের ছেলেদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন, এ খবর ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগেনি। হরিনাথের শিক্ষাপদ্ধতির উপকারিতা বুঝতে পারলেন স্থানীয় কিছু শিক্ষিত মানুষ। তখন স্কুল পরিদর্শক নিযুক্ত করতে শুরু করেছিলেন সরকার। পরিদর্শকরূপে যিনিই তাঁর স্কুলে এসেছেন তিনিই কাঙাল হরিনাথের শিক্ষাপদ্ধতির প্রশংসা করে গেছেন।

হরিনাথ যে কাজের শুরুতে ছিলেন একেবারে একা ,স্কুলের নামডাক হওয়ার পরে সে কাজে এগিয়ে এলেন স্থানীয় গণ্যমান্য মানুষজন। স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন তাঁরা। স্থানীয় এক ধনী ব্যক্তিকে স্কুলের সম্পাদকের পদে বসালেন। নিজেরা মাসিক চাঁদা তুলে শিক্ষক হরিনাথের জন্য মাসে ছয় টাকা করে জলপানির ব্যবস্থা করে দিলেন।

স্কুলে ছাত্রসংখ্যা ক্রমে বাড়তে লাগলো। এই সময় কিছু সরকারি সাহায্য পাওয়ার ফলে স্কুল কমিটি তাঁর ভাতা মাসে বারো টাকা করে দিলেন। স্কুলে আরও শিক্ষক নিয়োগ করা হল নিচের শ্রেণীর জন্য। এর পরে সরকারি পর্যবেক্ষকের সুপারিশে সরকার থেকে এই নিরলস উদ্যোগী হরিনাথের ভাতা বাড়িয়ে মাসে কুড়ি টাকা স্থির হল। কিন্তু হরিনাথ পনেরো টাকা নিজের জন্য নিতে রাজি হলেন। বাকি টাকায় অন্যান্য শিক্ষকদের মাইনে বাড়িয়ে দিলেন।

এখানেই না থেমে থেকে তাঁর আয় থেকে সংবাদ প্রভাকর, এডুকেশন গেজেট প্রভৃতি সংবাদপত্র আনাতে লাগলেন কলকাতা থেকে। গ্রামের যে সব ছেলেরা পড়াশোনা না করে বখে যাচ্ছিল তাদের জন্য কিছু করার চিন্তাও ছিল তাঁর মনে। বন্ধু মথুরানাথের সহায়তায় তাঁর চণ্ডীমণ্ডপে একটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

আর একটি মৌলিক কাজ করেন তিনি। কলকাতায় নানা আলোচনা সভার আদলে একটি ‘পঠনসমিতি’ স্থাপন করেন তাঁর গ্রামে। প্রতি শনিবারে সন্ধ্যায় বসতো পঠনসমিতির আসর, পাঠ করা হত বিভিন্ন পত্রপত্রিকা আর বিভিন্ন বিষয়ে ছাত্রদের দিয়ে লেখানো প্রবন্ধ সংশোধন করে তাদের দিয়েই পাঠ করানো হত।

একই সঙ্গে হরিনাথেরও বাংলাভাষার উপর দখল বাড়তে লাগলো। মথুরানাথের কাছে ইংরাজিও শিখতে লাগলেন একান্তে। নৈশ স্কুলের ছাত্রদের ইংরাজি পড়াতে লাগলেন মথুরানাথ আর গোপালচন্দ্র সান্যাল। হরিনাথ নিজে পড়াতেন বাংলা। তাঁর এই প্রচেষ্টার সুফল পাওয়া গেল,যখন অনেক বখাটে ছেলে এই স্কুলে পড়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় সফল হয়ে ভবিষ্যতে অর্থ উপার্জন করার উপযুক্ত হয়ে উঠল। হরিনাথের ইচ্ছা ছিল গ্রামের অন্য ছেলেদের যেন তাঁর মত কাঙালের জীবন কাটাতে না হয়। তাঁর এই প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল।

শুধু ছেলেদের কথা ভেবেই থেমে থাকেন নি তিনি। বিদ্যাসাগর প্রমুখরা যখন কলকাতায় বাল্যবিবাহ রোধ করতে, মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হিন্দুসমাজের নীতিবিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছেন,সেই আলোকের বিচ্ছুরণের রেশ লেগেছিল হরিনাথের মনে। ধর্মান্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামীণ সামাজিক পরিবেশের মধ্যেই সাহস করে তিনি নিজের বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপেই গ্রামের মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন। এই স্কুলের প্রথম ছাত্রী ছিলেন,হরিনাথের শিষ্য পন্ডিত জলধর সেনের বড়দিদি।

সেই সময় নদীয়া জেলার নানাস্থানে নীলকরদের কুঠী ছিল। হরিনাথ যখন কিছুদিনের জন্য নীলকুঠিতে কাজ করেছিলেন,তখন কাছ থেকে দেখেছিলেন কুঠীর কর্মচারীদের অসচ্চরিত্রতা, ঘুষ নেওয়া, প্রজাপীড়নের ঘটনা আর দেখেছিলেন চাষীদের অসহায় দুরবস্থা। বিতৃষ্ণায় কুঠীর কাজে ইস্তফা

দিয়েছিলেন তিনি। ইতিমধ্যে ১৮৬০ সালে দীনবন্ধু মিত্রের “নীলদর্পণ” নাটক প্রকাশিত হলে নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠতে লাগলো। হরিনাথ দেখলেন নাটকের সব ঘটনাই সত্য, নীলকুঠিতে কাজ করার সময়ই তিনি সেসব দৃশ্য চোখের সামনে দেখেছিলেন। তাঁর মন আকুল হয়ে উঠল সেইসব অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে।

উপযুক্ত স্কুলশিক্ষা না পাওয়ায় প্রতিবাদ জানাবার মত ভাষাজ্ঞান তাঁর ছিলনা। তাই তিনি অবসর সময়ে কলকাতা থেকে সংগ্রহ করা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় গুণীজনের লেখা প্রবন্ধগুলি পাঠ করতেন বারবার, পড়তেন ঈশ্বরচন্দ্রের লেখা ‘বেতাল পঞ্চবিংশতি’, নীলদর্পণ নাটক, সংবাদ প্রভাকর আর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে কলম ধরতে হলে চাই ধারালো ভাষা। উদ্দেশ্য অত্যাচারী জমিদার আর কুঠিয়ালদের কুকীর্তির কথা সভ্যজগতের সামনে তুলে ধরা,অত্যাচারিত প্রজাদের প্রতিবাদী করে তোলা।

এদিকে তাঁর বন্ধু শিক্ষিত মথুরানাথ মৈত্রেয় তাঁদের জেলার ও আশেপাশের নানা গ্রামের নীলকরদের অত্যাচারের কথা ইংরেজিতে জ্বালাময়ী ভাষায় লিখে সম্পাদক হরিশচন্দ্রের পত্রিকা ‘হিন্দু পেট্রিয়টে’ পাঠাতে লাগলেন আর সযত্নে তা সেই পত্রিকায় ছাপা হতে লাগলো। হরিনাথ ব্যাকুল হলেন বিদেশী নীলকরদের অত্যাচারের সঙ্গে সঙ্গে নিজের প্রজাদের প্রতি দেশীয় জমিদারদের হৃদয়হীন শোষণ আর অমানবিকতার কাহিনী লিখে জনসমক্ষে তুলে ধরতে।

সেই ব্যাকুলতা থেকেই রাস্তাও বের হল একটা। একদিন দেখা হয়ে গেল ‘সংবাদ প্রভাকর’ পত্রিকার(প্রথম প্রকাশ ১৮৩৯ সাল) সম্পাদক কবি ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে। হরিনাথ নিজের গ্রামের আর জেলার প্রজাদের অভাব, অভিযোগ,স্থানীয় জমিদারদের প্রজা উৎপীড়নের বিবরণ গুপ্তকবির সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় বাংলায় লিখে পাঠাতে লাগলেন, প্রভাকরের সংবাদদাতা হিসাবে জীবনের আরেক অধ্যায় শুরু হল তাঁর। বাংলাদেশের স্বল্পশিক্ষিত গ্রামীণ মানুষদের পাঠযোগ্য হবে, হৃদয়ঙ্গম হবে সহজে. এভাবেই লিখতেন হরিনাথ।

এইভাবে সুদূর গ্রামবাংলার স্থানীয় অধিবাসীদের অভাব অভিযোগ আর নিপীড়ণের বিবরণ হাতে পেয়ে গুপ্তকবি তা সযত্নে প্রকাশ করতে লাগলেন তাঁর প্রভাবশালী সংবাদপত্রে। সঙ্গে এই উৎসাহী, নির্লোভ,জ্ঞানান্বেষী,দেশহিতৈষী যুবককে প্রবন্ধ রচনাপদ্ধতি নিয়ে নানা উপদেশ দিতেন। শৈশবে পিতামাতার স্নেহবঞ্চিত ঈশ্বরগুপ্ত কাঙাল হরিনাথের ব্যথা বুঝে তাঁকে সহায়তা করলেন এভাবে, ঠিক যেভাবে ঈশ্বর গুপ্তের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন কলকাতার পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়ির যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর।

এইভাবে ঈশ্বরগুপ্তের সস্নেহ সহায়তায় সম্পাদনার কাজে হরিনাথ অভিজ্ঞ হয়ে উঠলেন। এবার তিনি নিজেই একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করতে মনস্থ করলেন। সে সময় কলকাতা থেকে যে সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় সেগুলির দাম দিয়ে কিনে আনা ও পড়া গরিব মানুষদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। গ্রামাঞ্চলে সে অভাব মেটাবার জন্যে একা হাতেই কাজ শুরু করলেন হরিনাথ। ১৮৬৩ সালে প্রকাশ করলেন “গ্রামবার্তা প্রকাশিকা” নামে একটি মাসিক পত্রিকা।

কিছুদিনের মধ্যেই সেটি পাক্ষিক পত্রিকা হয়ে গেল, আর তারপর চাহিদা আর লেখকের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকায় কিছুদিনের মধ্যেই সেটি সাপ্তাহিক পত্রিকা রূপে বেরোতে লাগল।

তাঁর লেখার প্রধান বিষয় ছিল, কিভাবে কৃষকদের উপর অত্যাচার করছে জমিদার, আমলা,গোমস্তারা। এছাড়া আছে অত্যাচারী নীলকরদের দুরাচার। এই দুরবস্থা থেকে কীভাবে তাদের রক্ষা করা যায়, কিভাবে গ্রামের কৃষিজীবিদের উন্নতি করা যায়, সেসব সমাধানের উপায়ও থাকতো তাঁর লেখায়।(সেগুলি নিয়ে আজকাল গবেষণা হচ্ছে বাংলাদেশে)।

তাঁর প্রধান চিন্তার বিষয় ছিল জমির অধিকারহীন, জমিচ্যুত মহাজনের আর জমিদারের ঋণের ভারগ্রস্ত চাষীদের কীভাবে রক্ষা করা যায়? রায়তদের হারানো অধিকার ফিরিয়ে দিতে কীভাবে জমিদারদের বাধ্য করা যায়? তাঁর লেখায় জমিদারদের বিরুদ্ধে দৃপ্ত প্রতিবাদের ভাষা বেরিয়ে আসত, লেখার ভাষা কৃষকদের বিদ্রোহী হয়ে ওঠার ইন্ধন যোগাতো, নিজেদের অধিকার বুঝে নিতে শেখাতো তাদের।

তাঁর পত্রিকার মাধ্যমেই সাধারণ চাষী ও নীলচাষী রায়তদের অভিযোগগুলি সর্বসমক্ষে আনা সম্ভব হয়েছিল। চাষীরা, প্রজারা বিভিন্ন গ্রাম থেকে চিঠির মাধ্যমে নিজেদের দুর্দশার কথা ইংরেজ সরকারের কাছে আর জনগণের কাছে জানাতে সক্ষম হয়েছিল। এই পত্রিকা হয়ে উঠেছিল গরিব প্রজাদের এক সহায়।

কোনও আর্থিক সাহায্য ছাড়াই সুদূর গ্রামে বসে এমন একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে যে কতখানি নিষ্ঠা, একাগ্রতা আর সাহস লাগে তা এই সহায় সম্বলহীন, আত্মস্বার্থমুক্ত মানুষটি তাঁর কাজ দিয়েই প্রমাণ করেছেন। প্রথমে পত্রিকাটি কলকাতার "গিরিশ চন্দ্র বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্যের মুদ্রণযন্ত্রে" মুদ্রিত হত আর কুমারখালি থেকে প্রকাশিত হত। সাধারণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখার জন্য পত্রিকার মূল্য করেছিলেন ১ পয়সা। একই কাজ করেছিলেন কলকাতার অবস্থাপন্ন কেশবচন্দ্র সেনও,১ পয়সা দামের সুলভ 'সমাচার পত্রিকা' প্রকাশ করে, তবে তাঁর অনেক সুযোগ সুবিধা আর অর্থবল ছিল। এবারে সেই একই কাজ করে দেখালেন গ্রামবাংলার এক কাঙাল যুবক। ধর্মের ধ্বজা ধরার জন্য নয়,জীবন্ত দেবতা, অত্যাচারিত সর্বহারা মানুষদের কথা বলার জন্য।

তখনও রেলপথ চালু হয়নি, কলকাতার প্রেসে কাগজ ছাপানো, সেগুলি গ্রামে নিয়ে আসা, বিক্রি করা, আবার বকেয়া পয়সা আদায় করা সমস্তই তিনি একা করতেন। সময়াভাবে তিনি তখন স্কুলের চাকরিতে ইস্তফা দিলেন। সংসার চালানোর ও কাগজ চালানোর একমাত্র অবলম্বন ছিল স্কুলের বেতন, সেটি বন্ধ হয়ে গেল। তখন তিনি একটি পাঠ্য বইয়ের দোকান দিলেন খরচ চালানোর জন্য। এদিকে পত্রিকার মুদ্রক জানালেন বকেয়া টাকা না পেলে আর পত্রিকা ছাপাবেন না। সেদিনই পায়ে হেঁটে সারাদিন গ্রামে গ্রামে ঘুরে পত্রিকা বিক্রির বকেয়া টাকা কিছুটা আদায় করলেন।

এর পরে নিজের গ্রামেই পত্রিকা ছাপানো শুরু করলেন। সাহায্যে এগিয়ে এলেন সেই বাল্যসখা মথুরানাথ।তাঁর প্রেসের মুদ্রণ যন্ত্রটি দান করলেন হরিনাথকে। মথুরানাথের নামে প্রেসের নাম হল 'এম এন প্রেস'। গ্রামবার্তা প্রকাশিকায় নীলকরদের বিরুদ্ধে সরাসরি লিখতে লাগলেন বিদ্রোহী ভাষায়।

কাঙালের কিছুই ছিলনা তাই কিছু হারাবার ভয়ডরও তাঁর ছিলনা। যে কোনও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রতিবাদ জানাতেন তাঁর হাতিয়ার পত্রিকাটির মাধ্যমে। একবার এক গোয়ালিনীর একটি নধর গাইকে জবরদস্তি ধরে নিয়ে যায় পাবনার ইংরেজ ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। কয়েকদিন পরে খবর পৌছুল হরিনাথের কানে। পরদিনই তাঁর কাগজে. "গরুচোর ম্যাজিস্ট্রেট" শিরোনামে প্রবন্ধ বের হল।তীব্র ভর্ৎসনা করে প্রতিবাদ জানালেন সাহেবের এই দুষ্কার্যের। সাহেব ক্ষেপে গিয়ে এলেন হরিনাথের পাড়ায়, কিন্তু সেখানে এসে হরিনাথের সমর্থকদের সংখ্যা আর ক্ষোভ দেখে ফিরে যেতে বাধ্য হলেন। পরে অবশ্য তিনি স্বীকার করে বলেছিলেন,"বাঙালির মধ্যে হরিনাথ মানুষের মত মানুষ"।

পত্রিকার মাধ্যমে জমিদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক লেখার জন্য জমিদাররাও তাঁর উপর ক্ষুব্ধ ছিলেন। একবার তো এক জমিদার পাঞ্জাবী লাঠিয়াল পাঠালেন হরিনাথকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে। সে সময় তিনি প্রেসের ঘরে বসে অনেকের সঙ্গে সম্পাদনার কাজ করছিলেন। গ্রামবাসীদের ভয়ে আর হরিনাথের বন্ধু সাধক গীতিকার লালন সাঁইয়ের শিষ্যদের লাঠিহাতে সংহারমুর্তি দেখে লাঠিয়ালরা পালিয়ে যায়।

এই ঘটনার কিছুদিন আগেই হরিনাথের কথা শুনেছিলেন কুমারখালি গ্রামের অদূরে কালীগঙ্গার তীরের বাসিন্দা লালন ফকির। দেখা করতে এসেছিলেন হরিনাথের সঙ্গে তাঁর জীর্ণ কুটিরে, এক গ্রীষ্মকালের দুপুরবেলায়। সেদিন তিনি কিছু বাউল গান শোনান তাঁদের আপন মনের খেয়ালে। স্বভাবকবি হরিনাথ আপ্লুত হলেন তাঁর গান শুনে। মুখে মুখে আধ্যাত্মিক সঙ্গীত বানাতেন তিনিও। গাইতেন প্রাণ খুলে। এইভাবেই বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল দুই মহান মানবপ্রেমিকের, যা সারা জীবন অটুট ছিল।

হরিনাথের শাগরেদ, সেই গ্রামেরই বাসিন্দা অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, পন্ডিত জলধর সেন আরো অনেকে পড়াশুনা করতেন কলকাতায়, আর প্রতি ছুটিতেই গ্রামের বাড়িতে আসতেন। লালন সাঁইয়ের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর এঁদের সবার মনে হল একটা বাউলের দল গড়লে কেমন হয়! হরিনাথ কাঙাল তো গান লিখতে পারেন, সুর দিতেও পারে্ন, আবার পুঁথি লিখতেও পারেন।

শিষ্যরা সবাই ধরে পড়লো হরিনাথকে। কদিনের মধ্যেই (১৮৮০সালে) তাঁরা গড়ে তুললেন এক বাউল গানের দল,নাম দিলেন 'কাঙাল ফিকির চাঁদের ফকির দল'। এর পরের পর্বে চলল তাঁর বাউলজীবন- দল নিয়ে বিভিন্ন জনের আমন্ত্রণে বিভিন্ন জায়গায় বাউল গান গেয়ে বেড়ানো। এই গান নিছকই গান ছিল না, এই গানের ভাষার মধ্যে দিয়ে তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা আর মানবপ্রেমের বাণী বিলিয়ে গেছেন মানুষের হৃদয়ে। তাঁর দলের মর্মস্পর্শী গান সারা বাংলা দেশ, উত্তরবঙ্গকে একসময় আবেগের বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

১৮৮৩ থেকে ১৮৯৩ সালের মধ্যে তিনি তাঁর রচিত গানের ১৬টি খন্ড প্রকাশ করেছিলেন, নাম দিয়েছিলেন "কাঙাল ফিকিরচাঁদ ফকিরের গীতাবলী"।

এত কাজের ফাঁকেও চলছিল তাঁর লেখকজীবন। বিচিত্র সমস্ত বিষয়ের উপর ১৮টি বই রচনা করেছিলেন ১৮৫৯ সাল থেকে তাঁর মৃত্যুর বছর ১৮৯৬ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে। শত অভাব,অনটন, প্রতিকুলতা থামাতে পারেনি এই সাধকের সাধনা।

বিচিত্রকর্মা হরিনাথ যখন পত্রিকা নিয়ে খুবই ব্যস্ত,সেই সময় তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুলের অবস্থা অনুদানের অভাবে খারাপ অবস্থায় পৌঁছায়।কলকাতায় সংবাদপত্র চলে নানা কোম্পানির বিজ্ঞাপনের টাকাতেই। কিন্তু গ্রামের একপয়সা দামের কাগজের বিজ্ঞাপন জুটবে কোথা থেকে? ক্রেতারাই পত্রিকার দাম সময়মতো মেটাতো না। ফলে কাগজ চালাতে তিনি যখন প্রায় নিঃস্ব, অতিশ্রমে ক্লান্ত, অবসন্ন, বেশির ভাগ দিন অর্ধাহারে কাটাছে তাঁর, সেই সময় স্কুলের দায় এসে আবার পড়লো তাঁর উপর। সরকারী অনুদান অনিয়মিত হওয়াতে অর্থাভাবে বেতন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অনেক শিক্ষকই স্কুল ছেড়ে দিয়েছিলেন, আবার এসে হাল ধরলেন হরিনাথ।

তাঁর সাহিত্যিক শিষ্যরাও তখন উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতাবাসী। কাগজের ঋণভারের সঙ্গে পড়লো স্কুলের পরিচালনভার ও ব্যয়ভার। আর্থিক চিন্তার সঙ্গে শারীরিক দুর্বলতা ও মানসিক অবসন্নতা সত্ত্বেও তিনজন শিক্ষকের কাজ একাই চালাতে লাগলেন। মানসিক দৃঢ়তায় আর কার্যকুশলতায় পাঠশালাটি কিছুদিনের মধ্যেই ঋণমুক্ত হল। কিন্তু অপরিসীম পরিশ্রমে অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী রইলেন কিছুদিন। তারপর আবার শুরু করলেন স্কুল চালানোর কাজ আর পত্রিকা সম্পাদনার কাজ। দুই কাজ চালাতে গিয়ে প্রচুর ঋণের বোঝা চাপলো তাঁর উপর। ধার করতে লাগলেন তিনি। ঋণের দায় মেটাতে তিনি আক্ষরিক অর্থেই হয়ে উঠলেন কাঙাল- ইংরেজিতে যাকে বলে 'পেনিলেস ম্যান'। তবে পত্রিকাটি তিনি বাইশ বছর চালিয়ে যান।তারপরে সেটি বন্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু এই বাউল সাংবাদিক তাঁর পত্রিকার মাধ্যমে যে সব সামাজিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা লিখে গেছেন, তা আজও গবেষণার বিষয়।তাঁর বলিষ্ঠ সাংবাদিকতার জন্য অনেক ইংরেজ

সাহেবেরও প্রশংসা পেয়েছেন। বিস্মৃত এই মানুষটির উদ্দেশ্যে এই স্মৃতিচারণ করে শ্রদ্ধা জানালাম তাঁকে ।

ভাবতে অবাক লাগে গ্রামের এক সাধারণ মানুষ, যিনি আইনকানুন, রাজনীতির কোন পাঠই পাননি জীবনে, তিনি কত স্বচ্ছন্দে ধরতে পেরেছিলেন জমিদারদের অত্যাচার আর শোষণ থেকে প্রজাদের বাঁচাতে কী করা উচিত। ১৮৭২ সালের গ্রামবার্তা প্রকাশিকা পত্রিকার জুন সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর লেখা একটি প্রবন্ধেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। সেখানে তিনি লিখছেন—

"------ আমরা গ্রামবার্তার জন্মাবধি বলিয়া আসিতেছি, গবর্নমেন্টের সহিত জমিদারদের যেমন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে,তদ্রুপ জমিদারদিগের সহিত প্রজাদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্থ সর্বতোভাবে কর্তব্য,তাহা হইলে সকল গোলযোগ একেবারে শেষ হইবে। --- জমিদার প্রজার প্রতি এবং প্রজা জমিদারের প্রতি শত্রুতা ত্যাগ করিবে।--- এই নিয়ম যতদিন প্রবর্তিত হইবে তাবৎ গবর্নমেণ্ট যত প্রকার আইন কেন না করুন,কিছুতেই প্রজার দুঃখ দূর করিতে পারিবেন না"।

এ যেন এদেশের ভাগ্যবিধাতা হয়ে বসা ইংরেজ সরকারের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া এক চ্যালেঞ্জ। এই ছিলেন কাঙাল হরিনাথ।

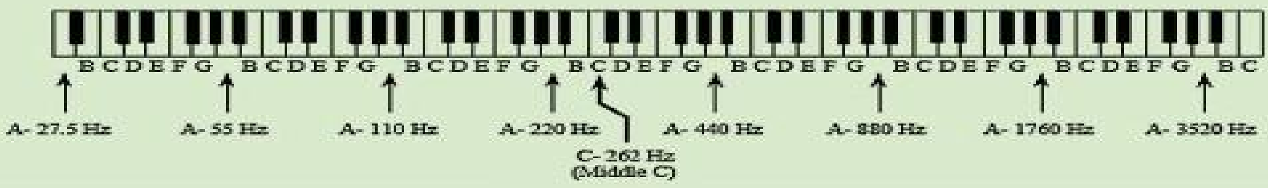

সুর ঢাক

৩ প্রদীপ মুখোপাধ্যায়

http://www.youtube.com/watch?v=scL927e4aug আমরা কিছুদিন মার্গ- সঙ্গীত নিয়ে আলোচনা করছিলাম। কিন্তু এর মধ্যে এমন একটা কান্ড হল যে অন্তত এবারটা একটু ভয়ে ভয়েই ওই মার্গ এড়িয়ে অন্য কথা বলি। কী কান্ড হয়েছে? আর বলো না। ওইসব রাগের বন্দিশ টন্দিশ পড়ে একজন তো হেঁড়ে গলায় তেড়ে ইমন রাগ সাধতে বসেছিল। দু- চারদিন পর সে জানাল -

চক্ষু দিয়ে ঝাপসা দেখে চশমা নিয়ে বাইফোকাল
পষ্টো দেখে 'জয়ঢাক' প'ড়ে ইমন রাগে গাই খেয়াল।
কিন্তু কপাল, পাশের বাড়ির
কর্তা বলল 'বাঁশের বাড়ি
তোমার মাথায় মেরে আমি নিজেই থানায় যাইব কাল'। (সংগৃহীত)

বলো - এরপর অন্ততঃ থানার ব্যাপার স্যাপার না মেটা অব্দি আর কি উচ্চ মার্গের সঙ্গীত নিয়ে নাড়াচাড়া করাটা নিরাপদ?

এবার তাই চলো সঙ্গীতের অন্য একটা দিক একটু দেখি।

একে তো এটা দুর্গাপুজোর সময়। বিশেষ করে বাঙালি বইমেলাতে বই কিনতে গিয়েও যখন খাওয়ার দোকানেই ভিড় করে বেশি- পুজোর সময়টায় তো কথাই নেই। সবার সাথে ঘুরতে বেরিয়ে মন্ডপ দেখার ফাঁকে ভাল ভাল খাবার চেখে না দেখলে পুরো মন্ডপ সাফারিটাই মাটি।

ভাবছ ভাল ভাল খাবার দাবারের সাথে সঙ্গীতের আবার কী সম্পর্ক? আবার অনেকেই হয়ত জান যে গত কয়েক বছর খুব গবেষণা চলছে জিভের বিভিন্ন অংশ শব্দ- তরঙ্গ দিয়ে উত্তেজিত করতে পারলে বা মনে কোন ধরণের আবেগ থাকলে খাবারের স্বাদের কীভাবে কেমন তফাৎ হয়ে যায় তাই নিয়ে। এই ব্যাপারটা বোঝার আগে জিভের কোন কোন অংশ কোন কোন স্বাদের জন্য দায়ী - অর্থাৎ জিভের মানচিত্র - একটু জেনে বুঝে নিলে সুবিধে হবে।

জিভের এই মানচিত্রটা অনেকেই স্কুল বইতে দেখে থাকবে। এইরকম একটা চিত্র নিয়ে কথা বলতে গিয়ে আর এক বিপদে পড়তে যাচ্ছিলাম সেদিন। যার সাথে কথা হচ্ছিল সে আবার একটু কট্টরপন্থী - মানে, হয় সাদা নয় কালো - ধূসর বলে তার অভিধানে কিছু নেই। সে শুনেই বলল আমি ঠিক করেছি এইসব বাতিল বস্তাপচা কথা যে বলতে আসবে তার মুখে ঘুসি মেরে মেরে ফাটিয়ে তারপর বলব বল এবার জিভের কোন জায়গা দিয়ে রক্তের স্বাদ আলাদা লাগছে - তারপর কালো চশমাটা পরে শিস দিতে দিতে চলে যাব।

(১) তেতো

(২) টক

(৩) লবণ (লোনা)

(৪) মিষ্টি

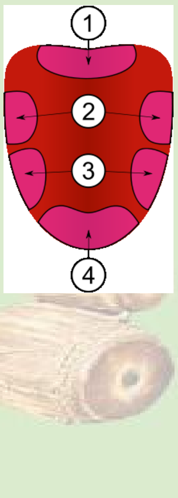

পাশের এই চিত্রটা একটু বেশি সরল করে দেখানো ঠিকই - কারণ জিভের সব স্বাদগ্রন্থিই সবরকম স্বাদ গ্রহণে সক্ষম। ছবিতে ১,২,৩,৪ করে যে জায়গাগুলো দেখানো আছে সেই অংশগুলোয় বিশেষ স্বাদগ্রাহী গ্রন্থিগুলির বেশি ঘনত্বের কারণে এই সব অংশে বিশেষ বিশেষ স্বাদ অন্য অংশের তুলনায় একটু বেশি পাওয়া যায়। ঘনত্ব ছাড়াও আরও কিছু কারণ আছে - সেসব নিয়ে বায়োলজি ক্লাস খুলে বসার এখন দরকার নেই। তবে প্রজ্ঞাদি মুখ ফাটিয়ে দেবার ভয় দেখানোর পর বলে গিয়েছিলেন যে সব স্বাদ- গ্রন্থিই সব রকম স্বাদ নিতে সক্ষম হলেও বিশেষ বিশেষ অংশের গ্রন্থিগুলোর স্বাদ নেবার অগ্রাধিকার বা প্রায়োরিটির ব্যাপার আছে। তাই মোটামুটি সহজ ভাবেই বোঝার জন্য ভয়ে ভয়ে এটাই ছাপিয়ে দিলাম।

http://www.youtube.com/watch?v=scL927e4aug জার্মান বৈজ্ঞানিক ডি. পি.হ্যানিং ১৯০১ সালে জিভের এই প্রধান চারটি স্বাদের কথা বলার পর হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির এডুইন বোরিং- এর করা স্বাদের গ্রাফ কিছুটা ভুল বুঝে এই ম্যাপ তৈরি হওয়ার পর এ নিয়ে কেউ খুব একটা ঝামেলা না পাকালেও ১৯৭৪ এ ভার্জিনিয়া কলিন্স দেখালেন যে ওরকম বাঁধাধরা জায়গা না থাকলেও জিভের কোন কোন জায়গা বিশেষ বিশেষ স্বাদ অন্য জায়গার তুলনায় প্রাথমিক ভাবে একটু বেশি গ্রহণ করতে সক্ষম। আবার জিভ ছাড়াও জিভের পিছন দিকে মুখের ছাদে, এমনকি আলজিভ বা মুখের অন্যান্য জায়গাতেও স্বাদগ্রন্থি থাকার ফলে সেসব জায়গায়ও স্বাদ অনুভব করা যায়।

প্রধান স্বাদ এই চারটিকেই বলা হয় কারণ CMYK (Cyan, Majenta, Yellow, Black) এই চারটি মূল রং দিয়ে যেমন সব রঙ তৈরি করা যায়, তেমনি তেতো, টক, লোনা আর মিষ্টি এই চারটি স্বাদই সব স্বাদের মূল কথা। তবে পঞ্চম একটি স্বাদ 'উমামি' - হ্যানিং সাহেবর গবেষণার দশকেই খুদে আইনস্টাইনের মত দেখতে জাপানি গবেষক কিকুনি ইকেডা আবিষ্কার করলেও ইংরেজী ভাষায় সেটি প্রকাশ না হওয়ায় এই স্বাদটির বিষয়ে অনেক পরে জানা যায়। এই পঞ্চম স্বাদটি হল MSG বা মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট - যাকে আমরা জানি অ্যাজিনোমোটো নামে। ওই যেমন গুঁড়ো সাবান মানেই সার্ফ, ফটোকপি মানেই জেরক্স - তেমনি অ্যাজিনোমোটো কোম্পানির নামেই MSG পরিচিত বেশি। এ ছাড়াও অবশ্য চর্বি বা মেদ ষষ্ঠ স্হান নেবে কি না তাই নিয়ে বাক- বিতন্ডা চলছে।

স্বাদ প্রথমিক অবস্হায় মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসে সাহায্য করেছে বেঁচে থাকার লড়াইয়ে। তেতো স্বাদ মানে প্রধানত বিষাক্ত ফল বা পচে যাওয়া মাংস, মিষ্টি বা লোনা স্বাদ মানে পুষ্টিকর খাদ্য। আবার গন্ধের ওপরও স্বাদ ভীষণভাবে নির্ভরশীল - প্রচন্ড সর্দির সময় নাক যখন পুরো বন্ধ, তখন ভাল খাবারের স্বাদও যে ঠিকমত পাওয়া যায় না এটা তো সবারই জানা।

মানুষের স্বাদের অনুভূতির সাথে তার বিভিন্ন আবেগেরও যোগ বেশ গভীর। মনে করে দেখ একই চাল, ডাল, ঘি দিয়ে একই রাঁধুনি রান্না করলেও পূজোর ভোগের খিচুড়ির একটা অন্যরকম স্বাদ পাওয়া যায়। আবার অঙ্কে ফেল করে বাড়ি ফিরে লুচি তরকারিও তেতো তেতো লাগে।

এই আবেগের বিভিন্নতার জন্য স্বাদের তারতম্যের কারণেই স্বাদ বাড়ানোর পিছনে সঙ্গীতের ভূমিকা নিয়ে কাজকর্ম চলছে। বেন অ্যান্ড জেরি (ওই যে যারা চেরি গার্সিয়া, চাঙ্কি- মাঙ্কি বানায়) বাজারে সোনিক রেঞ্জের আইসক্রিম আনছে কিউ.আর কোড (একরকম বারকোড) সমেত - খাওয়ার সময় স্বাদের সাথে মানানসই মিউজিকটা যাতে মোবাইল ফোনে শুনে নিতে পারো। অক্সফোর্ড- এ ক্রসমোডাল রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে কয়েকজনকে টফি খাওয়ানো হয়েছিল চড়া আর খাদের কম্পাঙ্কের শব্দ শুনিয়ে। তারপর জানা গেছে চড়া (উঁচু, তীক্ষ্ণ) কম্পাঙ্কের শব্দে তুলনামূলক ভাবে মিষ্টি ও খাদের শব্দে তেতো স্বাদ বেশি অনুভব করেছে তারা। লন্ডনের হাউস অফ উল্ফ রেস্তোরাঁ এক মাস ধরে চকোলেটের আস্তরণ দেওয়া তেতো- মিষ্টি চকোলেট পরিবেশন করেছে একটা টেলিফোন নম্বর সাথে দিয়ে। খাওয়ার সময় ঐ নম্বরে টেলিফোন করে ১ টিপলে চড়া আর ২ টিপলে খাদের কম্পাঙ্কের শব্দ শুনিয়েছে অপারেটর। অবাক কাণ্ড - হ্যাঁ, যারাই খেয়েছে তারা সবাই এই কথাটাই বলেছে।

তবে আর কী? পূজোর সময় কী কী খাবে ঠিক করে নিয়ে তার সাথে কী কী মিউজিক শুনবে সব গ্যাজেটে লোড করে নিয়ে তৈরি হয়ে যাও। অবশ্য যে পরিমাণ শব্দদূষণ থাকে ওই সময় তাতে এসব সুক্ষ্ম পরীক্ষা- নিরীক্ষা মাঠেও মারা যেতে পারে।

অনেক দিন আগে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে আমরা দুঃখের সময় নীচু স্বরে কথা বলি আবার আনন্দে উদ্বেল হলে চিৎকার করে আনন্দ প্রকাশ করি। আবার দেখ দুঃখ হলে খাবার তেতো লাগে, আনন্দ হলে লোকে মিষ্টি খাওয়ায়। এসব কিছুই একটার সাথে আরেকটার যোগাযোগের ইঙ্গিত দেয়। এইসব নিয়ে বিজ্ঞানের নতুন শাখা মলিক্যুলার গ্যাসট্রোনমি নিয়ে তোমাদের কেউ হয়ত বড়ো কোন কাজ করবে বড়ো হয়ে।

'সত্য' বা বাস্তব বলতে তো সেই সবই যা আমাদের অনুভবে ধরা পড়ে, যার স্বাদ বুঝতে পারি, যা চোখে দেখতে পারি, যা কিনা আসলে আমাদের মস্তিষ্কে কিছু তড়িৎ ইত্যাদি শক্তির সঙ্কেত বিশ্লেষণ করার ব্যাপার - মানে ঘুরে ফিরে সেই শক্তির রকমফের। আর তাই তো সেই আদি শক্তির পূজা দুর্গাপূজা করা - তাই না?

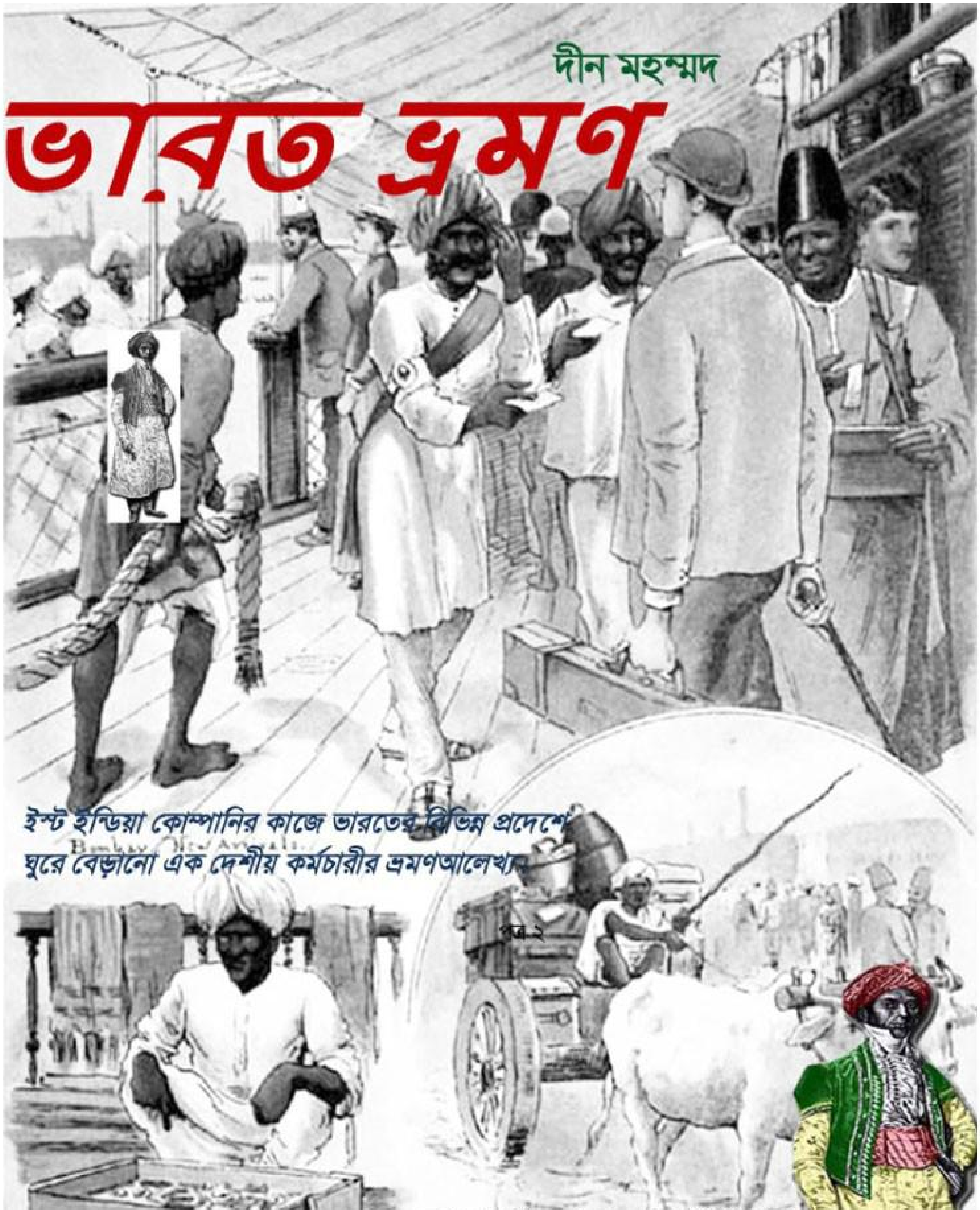
দীন মহম্মদ
ভারত ভ্রমণ
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাজে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে
ঘুরে বেড়ানো এক দেশীয় কর্মচারীর ভ্রমণআলেখ্য
অনুবাদ: শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়

পত্র ৬

ফুলওয়ারায় এক রাতও কাটেনি, আশপাশের গ্রামের একদল ছুটকো লোক নিঃশব্দে ছাউনি এলাকাতে মধ্যে ঢুকে পড়ে ব্যাপক ভাবে লুটপাট করল। অফিসার ও অন্যান্যদের তাঁবু থেকে যাবতীয় দামি জিনিসপত্র একেবারে ফর্সা করে দিল। মিস্টার বেকারের পাশের মালপত্র রাখার তাঁবুতে একটা পালকির মধ্যে আমি শুয়ে ছিলাম। পালকিটার ওপরের অংশে বাঁশের তৈরি বাঁকানো ছাত। মেঝেটা বেশ তাঁবুতে ব্যবহার করা খাটের মতো করে বানানো। দামি আসবাব দিয়ে সাজানো পালকিটা। ছাতে ফুল ফল পাতার নকশা। চারপাশে এবং ওপরে রূপোর পাত দিয়ে নানা রকম নকশার কারুকাজ। মোটের ওপর সেটা একটা বেশ দামি পালকি। শৌখিন আর পয়সাওয়ালা লোক ছাড়া ওরকম পালকি কেউ বড়ো একটা রাখত না। প্রত্যেক পালকির জন্য আটজন করে বেহারা, চারজন চারজন পালা করে সেটাকে বইত, ঠিক যেমন এদেশে, আয়ারল্যান্ডে, সেডান চেয়ার বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ফেরবার সময় ওই তাঁবুতে ঢুকে চোরেরা আমায় শুদ্ধ পালকিটা বয়ে নিয়ে আধ কিলোমিটার দূরে মাঠের মধ্যে এনে ফেলল। পালকি থেকে দামি অলঙ্কার তো খুলে নিলই, আমার কাছে যতটুকু টাকা পয়সা ছিল তাও কেড়ে নিল। মায় জামাকাপড় অবধি। পরণে রইল একখণ্ড কাপড়। লোকগুলো এতটাই নিষ্ঠুর ও বর্বর যে তাদের মধ্যে তর্কাতর্কি চলল যে আমাকে প্রাণে মেরে ফেলাই ঠিক হবে, পাছে আমি বেঁচে থাকলে পরে তারা ধরা পড়ে যায়! তবু ওরই মধ্যে একটু সহৃদয় যারা তারা বলল আমার বয়স অল্প, তাদের খুব একটা ক্ষতি করতে পারব না। ফলত আমি বেঁচে গেলাম। ছাড়া পেয়ে উর্ধশ্বাসে আমি এসে ঢুকলাম মিস্টার বেকারের তাঁবুতে। মিস্টার বেকার আমার অন্তর্ধানে যারপরনাই উদ্বিগ্ন ছিলেন। আমায় ঢুকতে দেখে ততোধিক আশ্চর্য হলেন। আমি যখন আমার প্রাণে বেঁচে যাবার গল্প বললাম এবং বললাম যে কীভাবে আমি ছাড়া পেলাম, তিনি ওই দস্যুদের মধ্যেও খানিক মানবিকতার লক্ষণ স্বীকার করলেন।

বদমাশগুলোর মধ্যে যারা পিছিয়ে পড়েছিল রক্ষীরা তাদের ধাওয়া করে ধরল। তাদের নিয়ে আসা হল ছাউনিতে। বাকিদের সূত্রও এদের থেকেই পাওয়া গেল। বেশিরভাগকেই ধরে ফেলে এমন জঘন্য ডাকাতির অপরাধের শাস্তি দেওয়া হল। নাক কান কেটে ছাউনি এলাকার মধ্যে ঘোরানো হল তাদের। এইসব ঝুটঝামেলায় ফুলওয়ারায়

আমাদের বেশি সময় থেকে যেতে হল। হামলার ধাক্কা প্রায় কাটিয়ে এনেছি, আবার শান্তিভঙ্গ। এবারে রাতের বেলা শেয়ালের উৎপাত। জানোয়ারগুলো যথেষ্টই হিংস্র, ইউরোপের শৃগালদের মতই। রাতের অন্ধকারে একদল শেয়াল এসে ছাউনিতে হামলা করে হাঁস মুরগি তো চুরি করলই, সামনা সামনি পড়ে যাওয়া বাচ্চাদেরও রেহাই দিল না। তাদের ধাওয়া করা বৃথা, ফলে এই ক্ষতিও হজম করতে হল।

কিছু লোককে রসদ সংগ্রহের জন্য বাজারে পাঠিয়ে আমরা ফুলওয়ারার পাট ওঠালাম আট দিনের দিন। এবারে গন্তব্য কর্মনাশা। নব্বই কিলোমিটার দূর। প্রথম দিন পৌঁছলাম তুরেরা। এখানে নদী পেরোতে হল। এত বড়ো দল বলে তিনদিন লেগে গেল এখানে। গরমকাল, ফলে আমরা ধীরে ধীরে চলছিলাম। গাছের ছায়ায় ঢাকা রাস্তা দিয়ে চলতে বেশ আরামই হচ্ছিল। বিশেষত চারপাশে যখন আম কলা তেঁতুলের ফলভর্তি গাছের ডালগুলো ঝুপ্পুস হয়ে আছে। গাছতলায় ঠান্ডা জলের ধারা, কোথাও কুয়ো। বিশ্বের সবচেয়ে সুস্বাদু জলের ভাণ্ডার। জনসাধারণের জন্য গভীর ভাবনার এক চমৎকার উদাহরণ। কাঠফাটা রোদ্দুরে একটু শীতলাতার ছোঁয়া। গরমের দেশে পথশ্রান্ত পথিকের শীতল আশ্রয় গড়ে দেওয়া। এসবই পথশ্রম দূর করার জন্য এখানকার প্রাচীন অধিবাসীদের দূরদর্শী চিন্তাভাবনা। যার ধারা আজও এখানকার কোনো কোনো জনজাতি বহন করে চলেছে। বছরের পর বছর ধরে জলের স্রোতগুলিকে তারা রক্ষা করেন, দূষণ থেকে বাঁচিয়ে রাখে, পবিত্র সম্পদের মতো, ধর্মিয় স্থানের মতো জলের কুয়োগুলোকে রক্ষণাবেক্ষণ করেন। এসবই নিঃসন্দেহে খুব ভালো কাজ, গভীর ও শ্রদ্ধাপূর্ণ। এ কারণেই অনেক পুরোনো হলেও এগুলি পরিষ্কার ও ব্যবহারযোগ্য রয়ে গেছে। আমাদের চলার পথে যেখানেই এমন কুয়ো দেখেছি আমরা এলাকার অধিবাসীদের সাহায্য নিয়ে জলের ভাণ্ডার ভরে নিয়েছি। চামড়ার ভিস্তিতে করে বলদের পিঠে, মানুষের কাঁধে বয়ে নিয়ে চলা জলের ভাণ্ডার।

ক্রমশ

।১৭।

টাকা গুনে মোহনদাসের হাতে দিতে তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বাবা বলল, “এইবারে আমাকে একটা রসিদ লিখে দিতে হবে যে মোহনদাস!”

সে সঙ্গে সঙ্গে পাগড়ি থেকে একটা কলম বের করে এনে বলে, “হুজুরের কাছে কাগজ আর কালি হবে?”

আমি কাগজ আর কালির দোয়াত এনে দিয়ে বললাম, “এই যে। লেখো।”

রসিদ লেখা শেষ হতে কাগজটা আমার হাতে দিয়ে টাকাক'টা ধুতির খুঁটে বেঁধে নিয়ে মোহনদাস বলল, “আমি তবে এবার যাই?”

বললাম, “দাঁড়াও হে। একটা কাজ বাকি রইল যে!” এই বলে আমি বাবাকে মোহনদাসের প্রস্তাবটার কথা খুলে বললাম। মোহনদাসের মুখটা দেখি ভয়ে সাদা হয়ে গেছে। বাবা তার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, “বেটা পাপী। তোর মুখে তোর পাপের চিহ্ন লেখা আছে দেখতে পাচ্ছি। মৃত্যুই তোর উপযুক্ত শাস্তি।”

“ম—মৃত্যু?কেন? আ-আমি কী এমন করেছি-”

“কী করেছিস?তোকে বিশ্বাস করে আমি ব্যবসা করলাম আর তুই আমার সর্বস্ব কেড়ে নেবার মতলব এঁটেছিলি। বিদেশ বিভুঁইতে আমাকে ভিখিরি বানিয়ে না খেয়ে মরবার রাস্তা দেখাচ্ছিলি। এখন তুই-ই বল, আর কোন শাস্তি তোর উপযুক্ত হতে পারে?”

মোহনদাস আমার বাবার পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ল এসে। বলে, “হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি সব পাপ স্বীকার করছি। আমি খুনি, চোর, ডাকাত, যা বলেন তাই, শুধু আমায় প্রাণে মারবেন না হুজুর। মারলে পরে কোতোয়াল জানতে পারবে, তখন হুজুরের ভারি বিপদ হয়ে যাবে--” বলতে বলতে সে তীক্ষ্ণ নজরে দেখে নিয়েছিল যে আমাদের হাতে কোন অস্ত্রশস্ত্র নেই। হঠাৎ সে একটা লাফ দিয়ে দরজার দিকে ছুটে পালাতে গেল। কিন্তু ঘরের দরজা তার আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। সে কোণঠাসা জন্তুর দরজাটা ধরে বারকয় বৃথাই টানাটানি করছে তখন আমি পেছন থেকে এসে তার গলায় আমার রুমালটা জড়িয়ে দিতে সে ঘুরে আমার দিকে তাকাল একবার। তার পরমুহূর্তেই তার মৃতদেহটা আমার পায়ের কাছে আছাড় খেয়ে পড়ল।

“একটা পুণ্যের কাজ হল,” বাবা মাথা নেড়ে বলল, “ব্যাটার পাপের ভরা পূর্ণ হয়েছিল। এটাকে টেনে ভেতরবাড়িতে নিয়ে রাখ আর লুগাইদের খবর দে। ভেতরের ছোটো উঠোনের কোণে এটাকে রাতের মধ্যেই গোর দিয়ে দিতে হবে।”

“সে হয়ে যাবে। ও নিয়ে তুমি ভেবো না। কিন্তু ভাগ্যিস টাকা আনতে তুমি আমায় পাঠিয়েছিলে। এর ওপর ভরসা করতাম যদি তাহলে আজ গোটা টাকাটাই খোয়া যেত আমাদের।”

“ওপরওলার দয়া। সব ভালোভাবে মিটল। একটু মজাও হল শেষমেষ।”

আমি মাথা নেড়ে বললাম, “মজার আর একটু বাকি আছে। আরো কিছু পাওনা রয়ে গেছে আমাদের।”

“মোহনদাসের গুপ্তভাণ্ডার?”

“হ্যাঁ।”

“যাও, তবে সাবধান এ ব্যাটার দলবল থাকতে পারে ওখানে।”

“ভেবো না। বদ্রীনাথ আর সরফরাজ খানকে সঙ্গে নেব।”

সরাইখানায় গিয়ে বদ্রীনাথের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে আমায় দেখে বলে, “বলো মীরসাহেব, আজ রাতে ক’টা শিকার করবার ইচ্ছে? লোকের অভাব নেই কিন্তু।”

বললাম, “আরে আমার হাতেই ভালো শিকার আছে। চাইলে সঙ্গে আসতে পারো।”

“ব্যাপারটা কী?”

আমি তাকে সব কথা খুলে বললাম।

সব শুনে আমার পিঠ চাপড়ে সে বলে, “আহা দারুণ, দারুণ। একেবারে ছবির মত কাজ হে! এবারে ব্যাটার গুপ্তধনগুলো নিয়ে আসতে যাবে এই তো?”

“হ্যাঁ। আজ রাতেই যাবো।”

“হুম,” বদ্রীনাথ আঙুলের কড় গুণছিলো, “ছ সাতটা ভালো লোক লাগবে। তার বেশি নিয়ে কাজ নেই। তুমি, আমি, পীর খান, মোতিরাম, আর চারজন, ব্যস। ওতেই হবে। সরফরাজ খান কখন ফেরে না ফেরে ঠিক নেই। ওর জন্য অপেক্ষা করার কোন দরকার নেই।”

আমি বললাম, “কেউ একজন ফকির সেজে একবার জায়গাটা গিয়ে দেখে আসুক না ঘন্টাখানেকের মধ্যে।”

“ভালো বুদ্ধি,” বদ্রীনাথ বলল, “শেখজিকে ডেকে পাঠাই।”

শেখজি খবর পেয়ে আমাদের ঘরে এলেন। বয়স্ক মানুষ। লম্বা, পাকা দাড়ি। রুমালের দক্ষতা অসাধারণ।

বদ্রীনাথ জিগাসা করল, “শেখজি, ফকির সাজতে পারবে?”

“পারব। হিন্দু না মুসলমান, কীরকম চাই?”

তাঁকে সংক্ষেপে কাজের ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল বদ্রীনাথ। তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করল, “যে ফকিরটাকে দেখিয়েছিল তোমায় মোহনদাস, সে কোন জাতের?”

“মুসলমান।”

“ঠিক আছে। আমি কাজে নেমে পড়ি, তাহলে,” বলতে বলতে শেখজি রওনা হয়ে গেল।

সে চলে যেতে আমি বদ্রীনাথকে জিজ্ঞাসা করলাম, “কাজটা এ ঠিকঠাক সামলাতে পারবে তো?”

“আরে কিচ্ছু ভেবো না। দেখতে বুড়ো হলে কী হয়, কাজের বেলায় এ একেবারে সিংহ। ছদ্মবেশ ধরতে ওর মত ওস্তাদ কম মেলে। কিছুদিন আগে ফকিরের ছদ্মবেশ নিয়ে পাঁচটা নানকশাহী ফকিরকে জালে ফেলেছিল ও একা। ভালো টাকাপয়সা মিলেছিল সেবার। ব্যাটারা সে টাকা দিয়ে নাকি কোথায় কুয়ো খোঁড়াতে যাচ্ছিল।”

কথাবার্তা বলতে বলতেই সরফরাজ খান এসে পড়ল। এসেই আনন্দে লাফাতে লাফাতে বলে, “দারুণ কাজ হয়েছে। সবকটাকে মেরেছি। অনেক মালপত্র পাওয়া গেছে। বাকি লোকজন মালপত্র নিয়ে আসছে।”

আমি বললাম, “ভালো খবর। তা নগদ কিছু আছে? নাকি শুধু মালপত্র?”

“দুই-ই আছে মীর সাহেব। কিন্তু তুমি আবার এসব জানতে চাইছ কেন? এই ক’দিন তো তোমার মুখটাও দেখতে পেলাম না। আরে আমরাও তো চাইলে গিয়ে পুন্টুরামের হাভেলিতে বসে মজা লুটতে পারতাম। এরমক আচরণ আমার মোটেই ভালো লাগে না।”

আমি রেগে উঠে একটা জুতসই জবাব দিতে যাচ্ছিলাম, তা বদ্রীনাথ আমায় থামিয়ে দিয়ে বলল, "থামো। গেঁজেল মাতালদের মত ঝগড়াঝাঁটি কোর না তো! সরফরাজ খান, তোমার মত অভিজ্ঞ লোক এরকম রেগেমেগে কথা বলবে সেটা মোটেই উচিৎ হয় না। এখন ঠাণ্ডা হয়ে বসে শোনো, আমাদের খোকা জেমাদার কী কাণ্ড করেছে। ভবানীর কিরে, তোমার মত অভিজ্ঞ লোকও লজ্জা পাবে।"

বদ্রীনাথের মুখে সব শুনে সরফরাজ খানের রাগটাগ একেবারে চলে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে আমায় জড়িয়ে ধরে বলে, "ভুল বলেছিলাম হে। এখন তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। আমিও যাবো তোমাদের সঙ্গে।"

"বেশ বেশ, তা সরফরাজ, এবারে তোমাদের শিকারের গল্পটা খুলে বলো দেখি," বদ্রীনাথ বলল।

"ও আর বলার কী আছে। লোকগুলোকে ভুলিয়ে ভালিয়ে মসলিপটনমের দিকে নিয়ে গেলাম, তারপর সুরোনগরের ওদিকটায় একটা ফাঁকামতো জায়গা দেখে সবকটাকে নিকেশ করে একটা পুরনো কুয়োর মধ্যে ফেলে দিয়ে অন্য রাস্তা ধরে ফিরে এলাম। শুভান আল্লা, জায়গাটায় এতো সহজে কাজকর্ম করা যায়! ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না হে! এখানেই থেকে যাবো ভাবছি।"

"সে তুমি থেকে যেতেই পারো। লুটের মাল সব ভাগবাঁটোয়ারা মিটে গেলেই তোমার যেখানে খুশি যাবার, থাকবার কোন বাধা নেই," আমি বললাম, "কিন্তু, তোমাকে ছাড়তে আমার দুঃখ হবে।"

কথা বলতে বলতে সন্ধে হয়ে এসেছিল। আমাদের আটজনের দলটা যখন শেখজির ফেরবার জন্য অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি তখন সে ফিরে এল। এসেই বলে, "রাস্তা সাফ। পাহাড়ের মাথায় গিয়ে ফকিরটার সঙ্গে দেখা হয়েছে। বেশ তাগড়া জোয়ান। প্রথমে তো আমায় বকেঝকে তাড়িয়েই দিচ্ছিল। তা আমি ইনিয়ে বিনিয়ে বললাম, 'হিন্দোস্তান থেকে সবে এসেছি। খিদেয়, ক্লান্তিতে নড়বার ক্ষমতা নেই। বারো ইমামের কিরে, আমায় একটু জলরুটি দাও।'শুনে ব্যাটা নরম হয়ে আমায় তার গুহায় ডেকে নিয়ে খাবারদাবার দিল কিছু। হুঁকোও সেজে দিল। তারপর এ কথা সে কথার পর আমি আমার আফিং-এর ডিবেটা খুলে তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে একফোঁটা আফিং মুখে দিতে সে-ও হাত পাতল। ব্যাটাকে তারপর এক ড্যালা আফিং খাইয়ে ঘুম পাড়য়ে রেখে এসেছি। সকালের আগে জাগবে না।"

"সকাল কেন, আর কোনদিনই জাগতে হবে না ব্যাটাকে। গুহাটা ভালো করে দেখে এসেছো তো? জিনিসপত্র কোথায় লুকিয়ে রাখতে পারে তার কোন আন্দাজ পেয়েছো?"

"গুহাটা বেশ অন্ধকার, কিন্তু পেছনের দিকটা একজায়গায় দেখলাম কাদা দিয়ে পাথর গেঁথে রাখা আছে। ব্যাটা বলল ওটা তার শোবার জায়গা। কিন্তু আমার মনে হয় ওখানেই জিনিসপত্র সব লুকোনো থাকবে।"

শুনে আমি লাফ দিয়ে উঠে বললাম, "তাড়াতাড়ি করো।এদের দলটা এই সময় বাজারে কাজকর্মের ধান্দায় ঘোরে। গুহা এখন ফাঁকা থাকবে। দেরি হলে সব যদি ফিরে আসে তাহলে ঝামেলা বাড়বে।"

অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে শেখজির পেছন পেছন চলতে চলতে পাহাড়ের গোড়ায় পৌঁছে আমরা সরু একটা পায়ে চলা রাস্তা পেলাম। এঁকেবেঁকে গুহার দিকে উঠে যাওয়া রাস্তাটা ধরে শেখজি আগে আগে উঠে গেল। তারপর দলের পাঁচজনকে নিচে রেখে আমি, বদ্রীনাথ আর সরফরাজ খান ওপরের দিকে রওনা হলাম। গুহার দরজায় শেখজি দাঁড়িয়েছিল। আমাদের দেখে ফিসফিস করে বলে, "ব্যাটা এখনো ঘুমোচ্ছে। তবে সাবধানে কাজ কোরো।"

লোকটা বেশ তাগড়া। আমি বদ্রীনাথ আর সরফরাজ খানকে বললাম, "এ আমার শিকার, দরকার হলে তোমরা হাতপাগুলো ধরবে একটু।"

কাছে গিয়ে একটা অন্য মুশকিল হল। লোকটা চিৎ হয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। গলায় রুমাল পরাবো কী করে। দেখেশুনে বদ্রীনাথ এগিয়ে গিয়ে তার তলোয়ারের চ্যাপটা দিকটা দিয়ে লোকটার পেটে ভীষণ জোরে এক ঘা মারল। ওমনি সে সটান উঠে বসে আমাদের দেখে বলে "একী? একী? চোর—চো- - "

কথাটা তার শেষ হল না আর। পেছন দিক থেকে আমার রুমাল তার গলাটা জড়িয়ে নিল। এক প্যাঁচেই কাজ শেষ।

"এবারে আলো জ্বালাও বদ্রীনাথ," আমার কথা শুনে বদ্রীনাথ তাড়াতাড়ি ফকিরের গায়ের কাপড়ের একটা টুকরো ছিঁড়ে নিয়ে সেটা পাকিয়ে সলতে বানিয়ে তার কাছে রাখা একটা তেলের কুপিতে পরিয়ে জ্বালিয়ে দিল। উজ্জ্বল আলোয় এইবার গুহার ভেতরটা পরিষ্কার দেখা গেল। শেখজির দেখিয়ে দেয়া সেই কাদায় গাঁথা দেয়ালটার কাছে গিয়ে দেখি সেখানে অনেকগুলো মাটির কলসি রাখা রয়েছে। তার প্রথম দুটো থেকে বের হল চাল আর ডাল। তিন নম্বরটা বেজায় ভারি। সেটার ভেতরে রুপোর টাকা আর তামার পয়সা পাওয়া গেল প্রচুর।

সেগুলো সাজিয়ে রাখতে রাখতে বদ্রীনাথ নিজের মনেই বলছিল, "ফকিরসাহেবের বুদ্ধি নেই একেবারে। তামার সঙ্গে রূপো মিশিয়ে রাখলে রূপোয় দাগ লেগে যায়। ঠিক আছে, আমরা সাফসুতরো করে নেবো'খন- - "

পরের কলসিটাতেও সেই একই জিনিস পাওয়া গেল। আসল জিনিস পাওয়া গেল শেষের কলসিটায়। সেটা দেখি দামি দামি সব সোনার গয়না দিয়ে একেবারে ঠাসা। তার বেশ কিছুর গায়ে রক্তের দাগ। সেগুলো দেখতে দেখতে আমি বললাম, "বদমাশের দল। কত লোকের সর্বনাশ করেছে এরা! খুনটুনও করেছে বোধ হয় অনেক। মোহনদাস নেহাত মিছেকথা বলে নি তাহলে। তা, তোমাদের একজন এ জিনিসগুলো নিয়ে নিচে নেমে যাও, আমরা দুজন আর একটু খুঁজেটুজে দেখি চারপাশটা।"

খুঁজেটুজে আর বিশেষ কিছু পাওয়া গেল না। হতাশ হয়ে বেরোবার উপক্রম করছি এমন সময় বাইরে থেকে সরফরাজ খানের গলা ভেসে এল, "এদিকে এসো তো একবার- - "

গিয়ে দেখি সে ঝোপঝাড়ের মধ্যে লুকনো একটা গর্তের মুখে দাঁড়িয়ে আমাদের ডাকছে। "দাঁড়াও, নেমে দেখি। ওর ভেতরে স্বয়ং শয়তান বসে থাকলেও আমি পরোয়া করি না।" বলে আমি গর্তটার মধ্যে নেমে গেলাম। "শয়তান থাকলে সমস্যা নেই। এদের দলের কেউ ওখানে লুকিয়ে না থাকলেই চলবে," ওপর থেকে বদ্রীনাথ ফোড়ণ কাটলো।

নেমে দেখি সেখানে বড় বড় পুঁটুলি ডাঁই করে রাখা। হাঁক দিয়ে বললাম, "নেমে এসো হে সবাই। শয়তান টয়তান কিছু নেই। অনেক মালপত্র আছে।"

বাকি দুজন ভেতরে নেমে এলে একে পুঁটুলিগুলো খুলে দেখতে লাগলাম আমরা। সেগুলোর মধ্যে নানারকমের বাসনপত্র, সোনারূপো ঠাসাঠাসি করে রাখা রয়েছে। একে একে সেসব খুলে দেখছি এমন সময় বাইরে থেকে কেউ একজন বিপদের সংকেত দিল। তাড়াতাড়ি করে বের হয়ে এসে দেখি নিচে থেকে আমাদের দলের একজন উঠে এসেছে। আমাদের দেখে বলে, "মালপত্র নিয়ে দুটো লোক আসছে।"

তাড়াতাড়ি করে বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে আমরা গুহার দরজায় ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করতে লাগলাম। দুজনের হাতে রুমাল তৈরি। অন্য দুজন তলোয়ার বের করে অপেক্ষা করছে। লোকদুটো খানিক বাদে মালপত্র নিয়ে গুহার ঠিক নিচে এসে দেখা দিল। সেখান থেকেই চ্যাঁচামেচি জুড়েছে, "কী হল সাঁই, নেমে এসে একটু ধরো। গাধার মতো মাল ঘাড়ে করে আসছি, একটু অন্তত আলোও তো দেখাবে?"

আমরা একেবারে নিঃশব্দে বসে রইলাম। খানিক বাদে গুহার ভেতর থেকে তাদের ফকিরের থেকে কোন সাড়া না পেয়ে লোকদুটো গালাগাল শুরু করল। বলে, “ব্যাটা মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে নিশ্চয়। দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি।”

একটু বাদেই তারা গুহার সামনে উঠে এসে কাঁধের পুঁটুলিদুটো আছড়ে ফেলল নিচে। তার থেকে ঝনঝন করে শব্দ উঠল। মালপত্র নামিয়ে রেখে তাদের একজন সেখানেই বসে পড়ে অন্যজনকে বলল, “যা তো ভেতরে গিয়ে দেখে আয় একবার-- ”

অন্যজন গুহার ভেতরে ঢুকতেই আমি আর সরফরাজ খান তার পেছনপেছন গিয়ে তাকে নিকেশ করে দিলাম। বাইরের লোকটা গুহার মধ্যে সেই ঝটাপটির শব্দ শুনে উঠে পালাতে গিয়ে নিজেরই পুঁটুলিতে পা বেঁধে আছাড় খেয়ে পড়তে পাথরের পেছন থেকে আমাদের আরেকজন গিয়ে তার মাথাটা কেটে ফেলল।

“অনেক হয়েছে। এখন চলো গর্তের মালপত্রগুলো একবার গুণেগেঁথে নিয়ে আমরা রওনা হই, ” আমি বললাম।

খানিক বাদে, বাসনপত্র, কাপড়চোপড় এইসব খেলো জিনিসপত্র বাদ দিয়ে দামি জিনিসগুলোকে বেছে নিয়ে আমরা সরাইখানায় ফিরে গেলাম।

।১৮।

ফিরে এসে বেশ একচোট হাসাহাসি চলল এই নিয়ে। দলের বাকি লোকগুলো যখন ফিরে এসে দেখবে তাদের সব দামি জিনিসপত্র লুঠ হয়ে গেছে আর দলের তিনজন মরে পড়ে আছে, তখন তাদের মুখগুলো কেমন দেখতে লাগবে সেই ভেবে সবাই আমরা খুব মজা পাচ্ছিলাম। তারপর লুটের মালের মধ্যে থেকে সোনারূপোর জিনিসপত্রগুলোকে নিরাপদে রাখবার জন্য আমি আমার সঙ্গে করে এনে আমাদের ভাড়াবাড়ির মালখানায় রেখে দিলাম।

বাবা তো দেখেশুনে খুব খুশি। আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে, "হিন্দুস্তানে আমাদের লোকজন তোর কীর্তিকলাপের খবর শুনুক একবার, দেখবি, জেমাদার কী রে, আজ অবধি খুব কম লোকই যে সম্মান পেয়েছে সেই সুবাদার পদবিও পেয়ে যেতে পারিস তুই।"

বাবার কথা শুনতে শুনতে আমিও মনে মনে প্রতিজ্ঞা করছিলাম, সে সম্মানটা আমাকে পেতেই হবে। সুবাদার পদবি আমি পাবই। আমার কীর্তি শুনে গোটা হিন্দুস্তান থরহরি কাঁপবে একদিন।

দিনদুয়েক বাদে পচা গন্ধ আর টিলার মাথায় শকুনের ভিড় দেখে শহরের লোকজন গিয়ে মৃতদেহগুলো আবিষ্কার করল। মালপত্র যা ছেড়ে এসেছিলাম আমরা তা থেকে শহরের বহু মানুষের খোয়া যাওয়া জিনিস উদ্ধার হল। তাড়াহুড়োয় খেয়াল না করে কিছু দামি জিনিসও ফেলে এসেছিলাম আমরা। সেসব জানা গেল শহরের এক নাম করা সাহুকারের খোয়া যাওয়া সম্পত্তি।

লোকজন ধরে নিল নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি করেই মরেছে লোকগুলো। খোয়া যাওয়া জিনিসপত্র ফেরৎ পেয়ে, আর চোরগুলো মরেছে দেখে শহরের লোকজন বেজায় স্বস্তি পেল। আমরাও ততদিনে দলের একজন স্যাকরার কাজ জানা লোককে দিয়ে লুটের সব সোনারূপো গলিয়ে তাল বানিয়ে ফেলেছি। হিসেবমাফিক তার দাম সাত হাজার টাকার কম হবে না।

এই অবধি আমাদের সমস্ত লুঠের মাল বিক্রি শেষ হতে দেখা গেল সবমিলিয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা পাওয়া গেছে। সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেয়া হল গ্রামে ফেরা অবধি টাকাটা বাবার হেফাজতেই থাকবে। উপস্থিত হাতখরচ বাবদ প্রত্যেক জেমাদারকে পঞ্চাশ টাকা আর বাকি সবাইকে কুড়ি টাকা করে দিয়ে দেয়া হল। এইবার বাবা হায়দরাবাদ ছেড়ে রওনা হবার কথা বলতে আমি আরো দিনদশেক সেখানেই থেকে যাবার একটা প্রস্তাব রাখলাম। আমার পরিকল্পনা ছিল গোটা দলটাকে চার ভাগ করে শহরের চার দিকে কাজ করিয়ে এই দশ দিনে এখান থেকে আরো যতটা সম্ভব রোজগার তুলে নেয়া।

বাবা দু একবার আপত্তি করে শেষে রাজি হয়ে গেল। ভাড়াবাড়ি ছেড়ে আমরা হিন্দুস্তানে ফিরে যাচ্ছি বলে বাড়িওয়ালাকে বুঝিয়ে, সঙ্গে কয়েকজন লোক নিয়ে আমি আর বাবা একেবারে শহরের উল্টোদিকে মীরজুমলা ঝিলের কাছে গিয়ে ঘাঁটি গাড়লাম। চাদরঘাট বাজারের কাছে রেসিডেন্টের বাঙলোর পাশেই ঘাঁটি গাড়ল বদ্রীনাথ। ওখানটার রাস্তাঘাটে অনেক ভিনদেশীর আনাগোণা লেগেই রয়েছে। সরফরাজ খানকে কারোয়ানের আশেপাশে কেউ বিশেষ চেনে না বলে সে আমাদের পউরোন এলাকাতেই রয়ে গেল আটজনের একটা দল নিয়ে। পীর খান আর মোতিরাম তাদের দলবল নিয়ে চলে গেল শহরের পশ্চিম পাশে সামসাবাদের দিকে।

হই হই করে কাজ চলছিল আমাদের, এমন সময়, আটদিনের দিন সকালে বদ্রীনাথ বেজায় উত্তেজিত হয়ে আমার কাছে এসে বলে, "মহা বিপদ হয়েছে। এক্ষুনি পালাতে হবে।"

বললাম, "কী হয়েছে?"

"ওই মাথা গরম সরফরাজ খান। ব্যাটা যদি একটু ভেবেচিন্তে চলতো তাহলে ওর মত দশপুরুষের ঠগিবংশের ছেলে আজ কতো ওপরে যেতে পারতো। কিন্তু এই মাথা গরম করেই লোকটা নিজের সর্বনাশ করল আজ। আমি- "

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, "বদ্রীনাথ, আসল কথায় এসো।"

হ্যাঁ। সে কথাই বলতে যাচ্ছিলাম। কাল বিকেলে সরফরাজ খান দুই সাহুকারকে পাকড়েছিল। তারা যাবে ঔরঙ্গাবাদ। সঙ্গে দামি জিনিসপত্র আছে অনেক। সরফরাজ খান তাদের দলে ভিড়ে গিয়ে তাদের নিয়ে গিয়ে একটা সরাইখানায় তোলে। আজ সকালে তাদের রওনা হবার কথা। কিন্তু সন্ধের মুখমুখ সাহুকারদের দু'তিনজন চেনা বন্ধু এসে সরাইতে হাজির। তারাও সপ্তাহখানেক বাদে ঔরঙ্গাবাদ যাচ্ছে। তাদের কথায় আমাদের দুই সাহুকারও আরও এক সপ্তাহ এখানে থেকে গিয়ে তারপর একসঙ্গে যাবে ঠিক করে ফেলল। সরফরাজ অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল যে এইভাবে দেরি

করা কোন কাজের কথা নয়। কিন্তু সাহুকাররা তাদের মত বদলালো না। বন্ধুদের তারা বলল, রাতটা সরাইতেই কাটিয়ে পরদিন সকালে তারা তাদের কাছে গিয়ে উঠবে, কারণ সঙ্গে যে দামি মালপত্র আছে সেগুলো রাতে তারা আর সরাই থেকে নাড়াবে না।

"শুনে সরফরাজের তো মাথা গরম হয়ে গেল। ঠিক করে ফেললো, সরাইখানাতেই এ দুটোকে নিকেশ করে ফেলতে হবে। এই অবধি সব ঠিকই ছিল। একটু অপেক্ষা করে ভোররাতের দিকে লোকদুটোকে মেরে তাদের জিনিসপত্রগুলো নিয়ে ঘুরপথে পালিয়ে আসতো যদি তাহলেই সব ঠিক থাকতো। তার জায়গায় আমরা কেউ তার এলাকাটা বাকি দুদিন দেখাশোনা করে নিতাম। কিন্তু ওসব ধৈর্য ধরা তার পোষায় না। সাহুকারদের বন্ধুরা সরাই ছেড়ে বেরোতেই সরফরাজ তার কাজ করে ফেলেছে। তারপর তার জিনিসপত্র নিয়ে ঘেঁটেঘুঁটে দেখছে এমন সময় সাহুকারদের এক বন্ধু কী একটা খবর দেবার জন্য সরাইতে ফিরে আসে। সরফরাজ তাদের প্রথমে বোঝায় সাহুকাররা বাইরে গেছে। খানিক বাদে ফিরবে। তখন তারা সেখানেই বসে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে। সেই ফাঁকে সরফরাজ আর তার দলবল শরীরদুটো নিয়ে ভেতরের উঠোনে পুঁতেও ফেলেছিল। কিন্তু শেষরক্ষা হলনা। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে সন্দেহ হওয়ায় লোকদুটো সাহুকারদের ঘরে ঢুকে পড়ে। তারপর ঘরের অবস্থা দেখে, আর সরফরাজের কাছে সাহুকারদের দু একটা জিনিস দেখতে পেয়ে তারা কোতোয়ালিতে খবর দিয়ে তাকে আর তার দলবলকে গ্রেফতার করিয়ে দিয়েছে। এই হয়, বুঝলে! দৈব সংকেত-টংকেত না দেখেই মাথা গরম করে গা জোয়ারি দেখাতে গেল, ফলও পেল হাতে নাতে- - "

"রাখো তোমার দৈব সংকেতের কথা," আমি ঝাঁঝিয়ে উঠলাম, "ভালো করে ভেবেচিন্তে ছক না কষে কাজ করলে বিপদ হতে বাধ্য। হয়েছেও তাই।"

বদ্রীনাথ মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "এই অবিশ্বাসের জন্য একদিন তোমায় অনেক দুঃখ পেতে হবে হে মীরসাহেব! দুনিয়া তো কম দেখলাম না। এমন অনেক অনেক ঘটনা আমার নিজের চোখে দেখা আছে। এই যেমন একটা ঘটে গেল। তোমার বাবা তো এখন দলের নেতাগিরির কাজটা মোটামুটি তোমার হাতেই ছেড়ে দিয়েছে। তা তুমি ভবানীর পুজোটুজো কিছু চড়ালে না, দৈব সংকেত টংকেত কিছু বিচার করলে না, সটান দলটাকে চার ভাগ করে দিয়ে কাজে লাগিয়ে দিলে। তার ফলটাও পেলে হাতে নাতে।"

"তা তুমি তো দলের নিশানবরদার," আমি তার দিকে চেয়ে একটু কড়া গলায় বললাম, "এ সব তো করবার কথা তোমার। তুমি কিছু করো নি কেন?" বলতে বলতে আমার রাগ আরও বেড়ে উঠছিল। এইবারে তার দিকে আঙুল তুলে আমি উঁচু গলায় বললাম, "আর একটা কথা। আমার বাবার নামে এরকম উদ্ধত কথা আমি যেন আর কোনদিন না শুনি। তাহলে, জানবে আমার গায়ে শক্তি যথেষ্ট আছে। বাবার অপমানের বদলা নিতে আমি- "

"ধীরে বন্ধু। তোমার এসব ছেলেমানুষী মাথাগরম অন্য লোকের জন্য তুলে রেখে দাও," শান্ত গলায় বদ্রীনাথ জবাব দিল, "ওতে আমার কিছু আসবে যাবে না। প্রথম অপরাধ, ভবানী তাই অল্প শাস্তি দিয়েছেন। কিন্তু অপরাধ আরো বাড়ালে, কবে যে মাথার ওপর খাঁড়া নেমে আসবে টেরও পাবেনা। এখান কাজের কথা বলি শোন। প্রথমে ভবানীর পুজো দাও ভালো করে, তারপর সবাই মিলে বসে এদের কীভাবে উদ্ধার করা যায় তার ফন্দি বের করা যাবে। "

"বেশ। তুমি আর বাবা মিলে যা পুজোটুজো করবার করে ফেল। আমার ওসব কিছু জানা নেই। জানবার ইচ্ছেও নেই। করতে গিয়ে আবার উল্টোপাল্টা কিছু করে বসবো হয়তো।"

"এই তো যুক্তির কথা বলছ। ভালো। তা তোমার বাবা আছে কোথায়?"

"ঘরে ঘুমোচ্ছে। যাও গিয়ে দেখা করো গে।"

এরপর বদ্রীনাথ আর বাবা মিলে কী পুজোটুজো করল সেসব নিয়ে আমি আর মাথা ঘামাইনি। সেসব সেরে তারা দুজন দেখি বেজায় খুশি। বলে “ভবানী তৃপ্ত হয়েছেন। মধ্যে আমরা তাঁকে একটু উপেক্ষা করেছিলাম বলে একটু ক্ষুণ্ন হয়েছিলেন, কিন্তু এখন সব ঠিক হয়ে গেছে। আর ভয় নেই।”

“তাহলে তো মিটেই গেলো,” আমি বললাম, “এবারে তাহলে একটু উদ্যোগ নিয়ে সরফরাজের উদ্ধারের কথা ভাবা যাক, নাকি?”

“মাঝরাত্রে, মাঝরাত্রে- -” বদ্রীনাথ জবাব দিল।

“হুঁ। তা ঠিক। দিনের বেলা কিছু করা যাবে না। ঘুষটুষ দিয়েও কাজ হবে না। কোতোয়াল হুসেন আলি তো শুনেছি খুব সৎ মানুষ। তা কোতয়ালের দরবারে সরফরাজদের পেশি কখন হবে?”

“আমি এক বুড়ো বানিয়াকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম,” বদ্রীনাথ বলল, “সে জানাল, রাতের দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রহরে কোতোয়ালের দরবার বসে।”

“হুম। গায়ের জোরেই এদের উদ্ধার করতে হবে দেখছি। যা করার আমাকেই করতে হবে,” আমি বললাম।

“অসম্ভব!” বাবা আর বদ্রীনাথ একসঙ্গে বলে উঠল।

“না অসম্ভব নয়। আমি করে দেখাবো। হিম্মত খান কোথায়? ওর সঙ্গে আর ছ’জন ভালো লড়িয়ে পেলেই চলবে আমার। এই কোতোয়ালের বাড়িটা কোথায়?”

দেখা গেল কোতোয়ালের বাড়ি কেউ চেনে না। আমি বললাম, “আমি গিয়ে জায়গাটা দেখে উদ্ধারের একটা ছক বানিয়ে নিয়ে আসছি।”

“আমিও যাই। আমার দলের কটা ছোকরাকে ডেকে আনি গিয়ে। দুপুরের আগেই চলে আসব,” এই বলে বদ্রীনাথও তাড়াতাড়ি রওনা দিল।

“ঢাল তলোয়ার নিয়ে আসতে বলো সবাইকে, কেউ যদি আমার সঙ্গে যেতে চায়- -”

“আরে সে তো আমি নিজেই তোমার সঙ্গে যাবো হে মীরসাহেব, তোমার বুদ্ধির ওপর আমার অনেক ভরসা- - ”

“তাহলে আমার ওপর আর রাগ নেই তোমার, তাই তো?”

“রাগটা করলামই বা কখন?” এই বলে হাসতে হাসতে সে বেরিয়ে গেল।

“কী ব্যাপার? ঝগড়া করেছিলি নাকি?” বাবা জিজ্ঞাসা করল।

“ও কিছু না,” আমি মাথা নাড়লাম, “যা হয়েছিল, সেসব চুকেবুকে গেছে।”

শহরে গিয়ে কোতোয়ালের ঘাঁটি খুঁজে বের করতে সমস্যা হল না বেশি। একটা লম্বা নির্জন রাস্তার একধারে বাড়িটা। রাস্তাটা দেখে আমি খুশি হলাম। পথে বেশি লোকজন থাকলে এসব কাজ হয় না। এই রাস্তা দিয়ে যখন ওদের নিয়ে আসবে তখন আচমকা আক্রমণ করলে কাজ হয়ে আবার কথা।

ঘাঁটিতে ফিরে বাবাকে আমার গোটা পরিকল্পনাটা খুলে বললাম। বাবা দেখি আমার নিরাপত্তা নিয়ে একটু ভয় পাচ্ছে। তারপর ভয়টয় ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বলল, “ছেলের জন্য বাপের মনে এইসব দুর্বলতা একটু আসবেই। কিন্তু তুমি ওসব নিয়ে ভেবো না। এগিয়ে যাও। ওপরওলা তোমার মদত করবেন।”

সন্ধের মুখমুখ বদ্রীনাথ আর আরও ছ’জন জওয়ানকে সঙ্গে নিয়ে আমি শহরের দিকে চললাম। আমাদের দলে দুজন ছিল রাজপুত। তারা কসম খেয়ে বলেছে প্রাণ দেবে কিন্তু সফল না হয়ে ফিরবে না। কোতোয়ালের ঘাঁটির সেই রাস্তাটার আশেপাশে বেশ কয়েকঘন্টা ঘুরতে ঘুরতে ধৈর্য থাকছিল না আমার। তাহলে কি বিচার টিচার না করেই জেলখানায় পাঠিয়ে দিলো এদের? তাহলে তো আর কোন উপায়ই থাকবে না!

এক পানওয়ালার দোকানের সামনে বসে বসে এইসব সাতপাঁচ ভাবছি এমন সময় হিম্মত খান এলো। তার মুখ দেখেই বুঝলাম, সময় হয়েছে। কাছে এসে সে চাপা গলায় উত্তেজতভাবে বলল, “আসছে। আধা রাস্তা এসে গেছে প্রায়। গলির এ মুখে আমি পাহারায় ছিলাম। অন্য মুখে খুশিয়াল সিং নজর রাখছিলো। আমার দিক দিয়ে আসছে।”

“সঙ্গে পাহারাদার কী আছে?”

“গোটাকুড়ি গাদাবন্দুকওয়ালা সেপাই। ও’রকম একশোটা সেপাইকে আমরা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পারি।”

“বন্দুকে বেয়নেট লাগানো আছে?”

“হ্যাঁ।”

“হুঁ। বদ্রীনাথকে গিয়ে বলো রাস্তার ওপাশ দিয়ে থেকে তার লোক নিয়ে এগোতে। আমি এ পাশ থেকে এগোব। ঠিক সময় এলে আমি ঝিরণি দেবো।”

নিঃশব্দে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। চারজন জওয়ান আমার সঙ্গে যোগ দিল, ওদিকে হিম্মত খান আর রাস্তার অন্য মুখ থেকে এগিয়ে আসা খুশিয়াল সিং গিয়ে বদ্রীনাথের সঙ্গে দাঁড়াল।

রাস্তার দু’পাশে দুটো দল নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। এই প্রথম আমি কোন মুখোমুখি যুদ্ধে নামতে চলেছি। ভেতরে ভেতরে ভয় না হলেও একটা তীব্র উত্তেজনা হচ্ছিল আমার। খানিক বাদেই বন্দিরা আর তাদের পাহারাদারের দলটা দেখা দিল। কাঁধের পাশে ঝোলানো ঢালগুলো আমরা সবার অলক্ষে চেপে ধরলাম। খাপের মধ্যে তলোয়ারগুলোর মুঠ শক্ত করে ধরেছি সবাই।

সরফরাজদের ভালো করে বেঁধেছেঁদে দড়ির একটা পাশ হাতে ধরে নিয়ে সেপাইরা আসছিল। তারা কাছাকাছি আসতেই আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম, “ভাই পান লাও।” এটাই ছিল আমাদের আক্রমণের সংকেত। সঙ্গে সঙ্গে আটটা তলোয়ার ঝলসে উঠলো। সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে তলোয়ারের এলোপাথারি কোপে দুটো লোককে শুইয়ে দিলাম আমি। অন্যরাও একই সঙ্গে আক্রমণ করেছে। দেখতে দেখতে বন্দিদের কাছে পৌঁছে তলোয়ারের কোপ মেরে তাদের বাঁধন কেটে দেয়া হল। বাকি সেপাইরা ততক্ষণে লড়াইয়ের ময়দান ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

“পালাও সব। যে যেদিক দিয়ে পারো পালাও। অন্ধকার অলিগলি দিয়ে যাবে।” বলতে বলতে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখলাম পাঁচটা সেপাই মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছে। সেই দেখে আমিও আর দাঁড়ালাম না। রক্তমাখা তলোয়ারটা খাপে ঢুকিয়ে ছুট দিলাম। তারপর অনেক ঘুরপথে চলে ঝোপজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে দিয়ে মীরজুমলা ঝিলের কাছে আমাদের আড্ডায় ফিরে এলাম।

বাবা রাতেই গোটা দলটাকে শহর ছাড়িয়ে আমাদের হুসেন সাগরের কাছের ঘাঁটিতে গিয়ে লুকিয়ে থাকতে বলল। অতদূরে কেউ আমাদের খুঁজতে যাবে না। তারপর গত দশদিনে যা জিনিসপত্র জড়ো হয়েছিল সেসব বিক্রিবাটা করে আমরা রওনা দেবার তোড়জোর শুরু করলাম। সোনারূপো যা ছিলো সেসব বলাই বাহুল্য গলিয়ে তাল বানিয়ে নেয়া হয়েছিলো।

ক্রমশ

ছবিঃ মৌসুমী

ইচ্ছেডানা

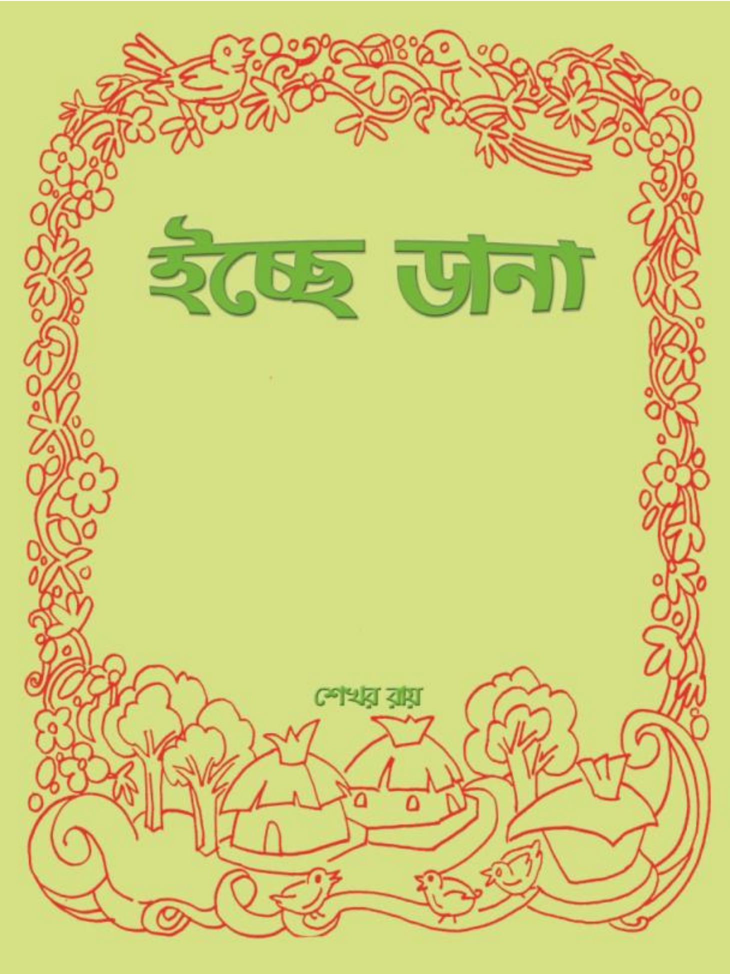

চারকোণা টেবিলের একজোড়া পায়া
সাজানো রয়েছে সেথা তবলা ও বাঁয়া
জানালাতে তীর্যক একফালি রোদ
নিশ্চুপ সেতার সরোদ
সুন্দর , নয়? কিংবা ধরো—
কী খেয়েছিস? হলুদবাটা?
জিভটা কি তাই হলদে?
কপাল চাপড়ে কী হবে আর,
গোল খেয়েছিস, গোল দে।

দু মলাটের মধ্যে এমনি অসাধারণ সুন্দর সুন্দর ষোলোটা ছড়া নিয়ে একটা ছোট্ট বই। পাতায় পাতায় তার ভারী সুন্দর সব হবি নিয়ে প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রী শেখর রায়ের ছুড়ার বই “ইচ্ছে ডানা”।

মন খারাপ হলেই আমি সে বইয়ের পাতা উলটে একখানা ছড়া পড়ে ফেলি মাঝেমাঝে। অমনি মনের আকাশে থেকে মেঘ উধাও। ঝলমলে রোদ এসে পড়ে সেখানে। শরতের রোদ। পুজোর আলো। নিজের মনেই পুজোর গান গাই—

তোমার পোষা দুষ্টু মেনি
নামটা কী তার? পুষি?
না, না লুসিই হবে
তারও জন্য কিনতে হবে
নতুন জামা নতুন জুতো-

তাই কিনো বরং পুজোয়। নিজের জিনিসপত্তরের সঙ্গে সনহে। সঙ্গে এই বইখানাও কিনে ফেলো। পড়তে বেজায় মজ। অন্যকে পুজোয় উপহার দিতেও।

ইচ্ছে ডানা
জয়ঢাক প্রকাশন
পরিবেশকঃ সুচেতনা
২০এ বলাই সিংহ লেন
কলকাতা ৯
৯৮৩৬০৩৭৬০১

কাওয়াইয়া হা- ও

হাওয়াই এর রূপকথা (মারি কাওয়েনা পুকুই- এর করা ইংরিজি অনুবাদ
(একটি হাওয়াইয়া সংবাদপত্রে প্রকাশিত) থেকে

ইন্দ্রশেখর

কেওয়ালোর ঝর্ণার পাহারাদারেরা একদিন দেখল, দুটো বাচ্চা ক্লান্ত পায়ে বনপথ ধরে হেঁটে আসছে। খানিক বাদে ছোট্ট মেয়েটা হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। তার দাদা তাকে তুলে দাঁড় করালো, তারপর তাকে ঝর্ণাটা দেখিয়ে যেন বলল, “তাড়াতাড়ি চল।”

এক পাহারাদার তাই দেখে বলল, “আহা রে, গায়ের জামাকাপড় ময়লা, দেখে মনে হয় খেতেও পায়না ভালো করে। কেউ বোধ হয় ওদের ভালোবাসে না।”

অবশেষে তারা ঝর্ণার কাছে এসে পৌঁছোতে ছেলেটা পাহারাদারদের জিজ্ঞাসা করল, “আমরা একটু জল খাবো? রাস্তায় খুব গরম তো! আমাদের জলের পাত্রটাও ফাঁকা।” তার ছোটবোনটা ততক্ষণে ঘাসের ওপরে শুয়ে পড়েছে। তার দাদা ঝর্ণা থেকে তাদের জলের পাত্রটা ভরে নিয়ে বোনের কাছে নিয়ে যেতে সে প্রাণভরে জল খেয়ে নিয়ে দাদার কোলের কাছে গুটিশুটি হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

পাহারাদারদের প্রাণে দয়ামায়া ছিল। বাচ্চাদুটোকে তারা পেট ভরে খাওয়ালো আর তারপর তাদের সঙ্গে করে নিয়ে গেল তাদের নিজেদের ঘুমোবার ঘরে। “এরা বোধ হয় খুব গরিব ঘরের ছেলেমেয়ে আর এদের বাড়ির লোক নিশ্চয় খুব কুঁড়ে,” তারা বলাবলি করছিল নিজেদের মধ্যে, “আহা, এইখানে এরা একটু বিশ্রাম করে নিক।”

পরদিন সকালে পাহারাদারেরা তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে বাগানে গাছেদের যত্ন করতে গেল। সূর্য উঠেছে তখন। পাহাড়ের মাথা থেকে সব কুয়াশারা সরে গেছে। আর, তাদের ঘুমের বাড়ির মাথায় ঝুলে ছিল একটা রামধনু।

“আরে, আমাদের ঘুমবাড়ির মাথায় একটা রামধনু যে! তার মানে একজন রাজা—” তারা অবাক হয়ে বলাবলি করল।

“বাচ্চাগুলো!” অবাক হয়ে বলল আরেকজন, “ওরা তাহলে কে?”

****

বেশ ক’দিন ভাইবোনেরা থেকে গেল সেখানে। দিনের বেশির ভাগ সময়টাই ঘুমুতো তারা। যতক্ষণ জেগে থাকত, সে- ও একেবারেই চুপচাপ। বোনটাকে দেখলে মনে হত সে একটু বেশি ক্লান্ত।

একদিন সন্ধেবেলা তারা দুজন ঘুমবাড়িতে ঢোকবার পর, ঝর্নার জল খেতে খেতে মাকিকি থেকে আসা এক চাষী আর সবাইকে বলল, “পথে আসতে আসতে খবর পেলাম, হা- ওর বাচ্চারা বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে। কোথায় গেছে তার কোন খোঁজ নেই।”

“মানে জমিদারবাবুর ছেলেমেয়েরা?”

“হ্যাঁ। কিছুদিন আগে ওদের মা মারা গেছেন। বাড়িতে সৎমা এসেছে। সে ওদের একেবারে ভালোবাসে না। তাদের বাপ হা- ও বাড়িতে না থাকলে সে তাদের উপোস করিয়ে রাখে আর ভীষণ বকে।”

“তাহলে তারা যে পালাবে তাতে আর আশ্চর্য কী?”

“হুঁ,” মাথা নাড়ল মাকিকির সেই চাষী, “হা- ওর বাচ্চারা ভারী ভালো। কিন্তু হলে কি হয়? কপালে যে দুঃখু লেখা। শুনছি নাকি সৎমা গুন্ডা পাঠাচ্ছে ওদের খুঁজে বের করবার জন্যে। এইদিকে আকাশে রামধনু দেখতে পেয়েছে নাকি। বলেছে, ও রামধনু যেখানে, তার সৎ ছেলেমেয়েও সেইখানে থাকবে। সৎ মা আরো বলেছে, যারা তাদের থাকতে দিয়েছে তাদেরও বেজায় শাস্তি পেতে হবে।”

ঝর্ণার পাহারাদারেরা একে অন্যের দিকে চাইল। তারপর তাদের একজন দৃঢ় গলায় বলল, "এমনও তো হতে পারে যে, যারা বাচ্চাদুটোকে আশ্রয় দিয়েছে তারা ওদের এইভাবে গুন্ডাদের হাতে ছেড়ে দেবে না?"

"জমিদারগিন্নির গুন্ডাদের সামনে কোন সাধারণ লোক দাঁড়াতেই পারবে না!"

মাকিকির সেই চাষী চলে যাবার পর পাহারাদারেরা অনেকক্ষণ ধরে শলাপরামর্শ করল বসে বসে। তারপর তারা ঘুমোতে গেল।

ওদিকে ঘরের ভেতর জেগে বসে দাদাটা কিন্তু সব শুনেছিল। সব্বাই ঘুমিয়ে পড়লে দাদা আস্তে আস্তে উঠে ছোটোছোটো হাতে ঘুমন্ত বোনটিকে কোনমতে কোলে তুলে নিয়ে টলোমলো পায়ে উঠোনে চাঁদের আলোয় এসে তাকে নামিয়ে দিল। ঘুম ভেঙে কাঁদতে লাগল বোনটা। দাদা তাকে ফিসফিস করে বলল, "চুপ, চুপ, ভয় পেলে চলবে নাকি? আয় আমার সঙ্গে আয়।"

"আমরা কোথায় যাচ্ছি দাদা? আমি যাবোনা। আমার ঘুম পায় যে!"

"ঘুমুবি, তবে একটু পরে। সৎমা আমাদের ধরবার জন্য গুন্ডা পাঠাচ্ছে। আবার সেই বকা খাওয়া আর শাস্তি পাওয়া—তুই কি তাই চাস? চল চল,আমাদের অনেক দূরে পালাতে হবে সব্বার চোখের আড়ালে।"

"বোন মাথা নাড়ল, "ঠিক। চল তাহলে।"

চাঁদের আলোছাওয়া পথ ধরে নু-আনু নদীর মোহানার দিকে চলে গেল তারা। ছোট্ট বোনটা মাঝেমাঝেই বলছিল, "আমার খুব কষ্ট হচ্ছে দাদা।" কিন্তু তারপর আবার বুকে বল এনে হাঁটছিল সে। কিন্তু খানিক বাদে সে একেবারে পথের ওপর বসে পড়ে বলল, "আমি আর পারছি না দাদা। আমায় একটু জল এনে দে।"

দাদা তাড়াতাড়ি জলের পাত্রটা নেড়েচেড়ে দেখল, তারপর বলল, "জল যে একফোঁটাও নেই বোন। পা চালিয়ে চল দেখি ,আরেকটা ঝর্ণা খুঁজে পাই নাকি।"

বোন কিন্তু নড়ে না। তার খুব তেষ্টা পেয়েছে। শেষমেষ উঠে দাঁড়াতে গিয়ে একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে সে মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়ে কান্না জুড়ল। দাদা তখন শুকনো ঘাসের একটা বিছানা বানিয়ে তাতে তাকে শুইয়ে চাপড়ে চাপড়ে ঘুম পাড়িয়ে দিল। কিন্তু তার নিজের চোখে ঘুম আসে কই? শরীর ভেঙে পড়ছে ক্লান্তিতে। তেষ্টায় তারও গলা শুকিয়ে কাঠ। মাথায় ঘুরছে নানান চিন্তা। এখন তারা পালিয়ে কোথায় যাবে? বোনের জন্যে একটু জলই বা পাবে কোথায়?

এইসব ভাবতে ভাবতে একগলা তেষ্টা নিয়েই সে একসময় বোনটির পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমের মধ্যে সে শোনে তার মায়ের গলা। মা ডাকছিল, "খোকা, খোকা রে।" ঘুমের মধ্যে তার মনে হল মা যেন সেই ছোট্টোবেলাকার মত তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, আর বলছে, "পায়ের কাছের ঝোপটা টেনে তোল, তাহলেই জল পাবি বাবা।" এই বলে মায়ের ছবিটা মিলিয়ে গেল।

অমনি চোখ খুলে উঠে বসল ছেলেটা। ভাবল, "মা এসেছিল স্বপ্নে। আমাকে জলের খোঁজ দিয়ে গেল। দেখি তো—"

পায়ের কাছে তার সত্যিসত্যিই একটা কাঁটাঝোপ দাঁড়িয়েছিল। তার ডাল ধরে টানতে প্রথমে তো কাঁটা ফুটে রক্তই বেরিয়ে গেল তার। তারপর কয়েকটা পাতা দিয়ে ডালটাকে ধরে প্রাণপণে টানতে ঝোপটা উপড়ে এল তার হাতে, আর তার গর্তটার ভেতর থেকে কলকল করে উঠে এল একটা ঝর্ণা।

তাড়াতাড়ি জলের পাত্রটা ভরে নিয়ে দাদা বোনকে ডেকে তুলে প্রাণভরে জল খাওয়ালো। তারপর নিজেও জল খেল আশ মিটিয়ে। তারপর বোনকে বলল, “আর ভয় নেই বোন। মা রয়েছে সঙ্গে। এখন আয় ঘুমুই।”

তাদের ঘুম ভাঙল যখন, তখন রোদে ঝলমল করছে চারিদিক। চোখ খুলে ভাইবোন দেখে তাদের বাবার লোকজনেরা তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে। সবার মুখে হাসি। দাদা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর তাদের রাতের সব কথা বলতে সবাই মিলে সেই ঝর্ণার জল খেল। তারপর লোকেরা বলল, “চলো চলো, তোমাদের বাবা তোমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছেন।”

“আর সৎমা?” বোন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল।

“কোনো ভয় নেই,” বলে উঠল একজন লোক, “তোমরা তো খুব ভালো, তাই ভগবান তোমাদের আসল মাকে পাঠিয়ে তোমাদের জলের খোঁজ দিয়েছেন। সৎমা তোমাদের কিচ্ছুটি করতে পারবে না দেখো।”

বহু বহু বছর ধরে সেই ঝর্ণাটা বয়ে গেল সেখান দিয়ে। অনেকদিন পরে একবার লোকজনেরা মিলে তার ওপরে একটা চানঘর বানালো তাদের রানিমার জন্যে। এই রানিমা ছিলেন হা- ও বংশের সেই ছোট্ট বোনটির নাতনীর নাতনী। সেই ঝর্ণার নাম সবাই রেখেছিল হা- ও- এর ধারা।

এখন ঝর্ণাটা আর নেই। সেইখানে একটা বড় শহর হয়েছে। লোকজন নল দিয়ে পাহাড়ের পেট থেকে জল বের করে নেয়। যেখানে ঝর্ণাটা ছিল সেখানে একটা মন্দির আছে। তার নাম কাওয়াইয়া হা- ও, মানে হা- ওএর ধারা।

ছবিঃ মৌসুমী

ক্যামেরুন ও তার বামিলেকি উপজাতি

উমা ভট্টাচার্য

ওপরের ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে কিছু মানুষ বিচিত্র পোশাক পরে মাথায় জয়ঢাকের মত একটা কিছু চাপিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের মুখ দেখা যাচ্ছেনা। তবে ঢাকগুলি নিশ্চয় খুব ভারী তাই দুপাশে ঝোলানো দুটি লটকন (সুন্দর করে বানানো দড়ির মত জিনিস) হাত দিয়ে ধরে রেখেছেন।

আসলে এগুলি হল মুখোশসুদ্ধ বিরাট বিরাট টুপি। এঁরা হলেন বামিলেকি উপজাতির মানুষ। এঁরা এখন এদের রাজবাড়ির উৎসব উপলক্ষে নাচের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। পরেছেন তাঁদের জাতির ঐতিহ্যময় পোশাক, যা তাঁরা নিজেরাই বানান পুঁতি, নানারঙের পাথর, কড়ি, রঙিন কাপড় আর সুতো দিয়ে। অপূর্ব সুন্দর পোশাক। বেশির ভাগ পোশাকের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হচ্ছে মুখোশ। মুখোশগুলি হয় প্রধানত হাতী,কুমীর,চিতা,বাঘ, সিংহ প্রভৃতি বলশালী জন্তুর আদলে।

রাজা অর্থাৎ ওঁদের এক একটি গোষ্ঠীর আঞ্চলিক প্রধান, যাঁকে ওরা বলেন 'ফন',তাঁদের বাড়ির নানা অনুষ্ঠান, উৎসব উপলক্ষেই এঁরা আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠেন।

মনে হয় যখন এঁরা যখন মিশরের দিক থেকে ধর্মান্তরিত হবার ভয়ে ক্যামেরুনের পশ্চিম অঞ্চলের সাভানা নামের ঘাসজমিতে এসে বসতি গড়েন তখন যেসব জন্তু এঁরা দেখেছিলেন সেগুলির ভীতি থেকেই তাদের আদলে মুখোশ বানিয়ে তাই পরে উৎসবে নাচগান করেন। দেশান্তরী হওয়ার সময়কার বিপদের দিনে যে সর্দাররা তাঁদের রক্ষা করেছিলেন, তাঁদের বংশধর পরবর্তী সর্দার বা প্রধানকে তাঁরা রক্ষক, সুবিচারক, আধ্যাত্মিক গুরু, সেনাপ্রধান হিসাবে মানেন। আর অনুষ্ঠান পরবে নাচগানের মধ্যে দিয়ে তাঁকে সম্মান জানান।

এই মুখোশ আর পোশাকের বর্ণিল আর বিচিত্র রকম দেখলেই বোঝা যায় এ ব্যাপারে নানা পরিবারের মধ্যে আর নানা গোষ্ঠীর মধ্যে বেশ প্রতিযোগিতা আছে। কার পোশাক আর মুখোশ কতটা সুন্দর হতে পারে সেটার প্রতিযোগিতা। [নীচে দেখ সেরকমই আরও দুটি

পোশাকের ছবি (দু দিকে), এবং পরের পাতায় ওঁদের একজন প্রধান (এনজি কামগা জোসেফ। বামিলেকিদের বানহুন গোষ্ঠীর ফন)- এর ছবি (তাঁর পোশাকটিও মজাদার)]।

এঁদের মধ্যে 'কুশোই' সমাজের মানুষরা প্রাচীন এক যোদ্ধা জাতির বংশধর, তাই এই মানুষদের তৈরি পোশাক আর মুখোশ আর নাচের মধ্যে থাকে বীরত্বের প্রকাশ। আর আছে 'কুফোই' সমাজ যাঁরা পুলিশের ভূমিকা পালন করেন। রাজ্যের মানুষদের নানা বিবাদের বিচার করে,মীমাংসা করে দেন। এঁদের ক্ষমতা এত যে এঁরা অপরাধের গুরুত্ব বুঝে শাস্তি বিধান করেন, এমনকি মৃত্যুদন্ডও দিতে পারেন। বিচারের সময় প্রধান বিচারক একটি বিশেষ মুখোশ ব্যবহার করে থাকেন।

এতক্ষণ যাঁদের পোশাক আর অনুষ্ঠানের কথা শোনালাম, তাঁদের আসল পরিচয়ই তো এখনও দেয়া হয়নি। আফ্রিকার একেবারে পশ্চিম দিকে অবস্থিত ক্যামেরুনের নাম সবাই জানি। এই ক্যামেরুনের পাহাড় ঘেরা পাথুরে অঞ্চলে আছে অনেক অরণ্য।

এখানকার পাঁচটি প্রধান অঞ্চলে বাস করে প্রায় ২৫০টি বিভিন্ন আদিম উপজাতির মানুষ। একসঙ্গে যাঁরা "বামিলেকি উপজাতি" নামে পরিচিত। পাঁচটি অঞ্চলের আলাদা সংস্কৃতি আর ভাষা। তবে সব ভাষারই উৎস এক – 'নাইজার- কঙ্গো'ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্গত।

ক্যামেরুনের পশ্চিমের হাইল্যাণ্ডের ঘন সাভানা তৃণভূমি অঞ্চলে বাস করেন বামিলেকি উপজাতির মানুষেরা, যাঁরা আফ্রিকার 'বান্টু' গোষ্ঠীর অন্তর্গত। এঁদের মধ্যে আবার বিভিন্ন এলাকার নামে ৩০টি শ্রেণী আছে। এঁরা কথা বলেন বান্টু ভাষায়, যাকে আবার এঁরা নিজস্ব চলিত রূপ দিয়ে নিয়েছেন ।এখন অবশ্য ইংরেজিও একটা প্রধান কথ্য ও লেখ্য ভাষা।

বামিলেকিদের বাসভূমির উত্তর,পশ্চিম দিক সুরক্ষিত রেখেছে ‘ব্যাম্বুওটস’ পর্বতশ্রেণী আর দক্ষিণ, পূর্ব দিক ঘিরে রেখেছে ‘নাউন’ নদী। মাঝখানের নীচু প্রায় সমতল অঞ্চলে এঁরা বাস করেন, তাই এঁরা নিজেদের বলেন ‘পিপল ডাউন দেয়ার’- নিচু তলার মানুষ।

এখানে ১০০টি ছোট ছোট অঞ্চলে আলাদা ১০০টি ছোট ছোট রাজ্য আছে। এইসব অঞ্চলের ‘আঞ্চলিক প্রধান’ই হচ্ছেন সেই অঞ্চলের রাজা। দলগুলি ছোট- বড় নানা আকারের হলেও এদের রীতিনীতি, আদবকায়দা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, খাদ্য, পালাপার্বণ, রাজনৈতিক আর সামাজিক কাঠামো প্রায় এক। এঁদের প্রধান বা রাজার নির্বাচন হত বংশপরম্পরায়। প্রধানের

জীবিত অবস্থাতেই পরের উত্তরাধিকারী নির্বাচন করা হত, কিন্তু প্রধানের মৃত্যু পর্যন্ত সেই ব্যক্তির নাম গোপন রাখা হত।

আদিম বামিলেকিদের এক একটি দল তাদের প্রধানের বাড়ির কাছাকাছি সারি সারি ঘর বানিয়ে বাস করে। মাঝখানে থাকে একটি প্রশস্ত প্রাঙ্গন, প্রাঙ্গনের দুইধারে সাধারণ মানুষদের কুটিরের মত ঘরগুলি তৈরি হয় বাঁশ আর কাঠের খুঁটির উপর। গোলাকার ছাউনি তৈরি হয় খড়জাতীয় জিনিস, পাতা এসব দিয়ে। দেওয়াল হয় মাটির তৈরি। দেখতে অনেকটা

গ্রামের ধানের গোলাবাড়ির মত। তবে এদের ঘরের কাঠের খুঁটিগুলি সুন্দর খোদাই কাজের অলঙ্করণ থাকে।

সাধারণের বাড়িগুলির শেষ মাথায় অপেক্ষাকৃত উঁচু আর ঢালু একটা জায়গায় তৈরি হয় প্রধানের বাড়ি। তাঁর বাড়িটির দেওয়াল, খুঁটি সব কারুকার্য করা, খুব সুন্দরভাবে সাজানো, সাধারণ মানুষদের ঘরগুলি থেকে আলাদা।

তবে আজকাল সব বাড়িঘরই আধুনিক হয়ে গেছে। পুরনো ঘরবাড়িগুলি যেগুলি আছে সেগুলি গুদাম ঘর, শস্যাগার,আর কখনও কখনও প্রাচীন মানুষজনের সভাগৃহ হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

প্রধান বা রাজার বাড়িতে আগে থাকত পূর্বপুরুষদের ব্যবহৃত সুন্দর পোশাক,শিরস্ত্রাণ, মুখোশ, ধাতুর ভারী ব্রেসলেট,নানা উজ্জ্বল রঙের রত্ন আর পুঁতিতে সাজানো সিংহাসন,তাঁদের শিকার করা পশুর শিং,চামড়া,হাতির দাঁত,সুন্দর টেরাকোটা সামগ্রী, কারুকার্য করা পাথর বা কাঠের তৈরি বসবার টুল ইত্যাদি। যাঁর বাড়িতে এতসব দামী আর ঐতিহ্যময় জিনিসের সংগ্রহ তাঁর আভিজাত্য তত বেশি, তিনি কত বড় বংশের বংশধর, সেটাই প্রমাণ করে এসব সংগ্রহ। এখনও পূর্বতন রাজপরিবারের বংশধররা সেগুলি যত্ন করে রাখেন।

এঁদের সমাজে মেয়েপুরুষ উভয়েই কাজ করেন। মেয়েরা প্রধাণত ঘরের কাজ আর ক্ষেতখামারের কাজ করেন, আর পুরুষেরা জমি পরিষ্কার করেন, চাষের জায়গাটি ঘেরা দিয়ে সুরক্ষিত করেন, উৎপন্ন জিনিস বাজারে বিক্রি করেন। এছাড়া অনেকেই পরিবহন ব্যবসায় যুক্ত। ট্যাক্সি, ট্রাক ইত্যাদি চালিয়ে ভালো উপার্জন করেন।

ঔপনিবেশিকদের সময়ে আর তার আগে এঁরা প্রধানত পশুপালন, গবাদি পশুর চাষ আর ভাড়াটে যোদ্ধার কাজ করতেন। এঁরা খুবই উদ্যমী, আর ব্যবসায়ের ঝুঁকি নিতে পিছপা হন না। এঁরা নিপুণ হস্তশিল্পী। এঁদের কুটিরশিল্পের মধ্যে দেখবার মত হাতির দাঁতের কাজ, পাথরের উপর খোদাই করে তৈরি গৃহসজ্জার নানা উপকরণ, মুখোশ, বসার টুল, মাথার টুপি। এছাড়া বিখাত এঁদের কাঠখোদাইর কাজ, যা এঁরা নিজেদের প্রাচীন দিনের কুটির তৈরির সময় দরজা, ঘরের খুঁটি, ফ্রেম ইত্যাদিতে ব্যবহার করতেন।

কথা হল এঁরা কোথা থেকে এসেছিলেন এই সাভানা গ্রাসল্যান্ডে, আর কেনই বা এসেছিলেন? বিভিন্ন মানুষের লেখা থেকে জানা যায় যে, এঁদের আদি বাসভুমি ছিল মিশর। কোনও সামাজিক বা প্রাকৃতিক কারণে এঁরা একাদশ শতাব্দি থেকে চতুর্দশ শতাব্দির মধ্যে মিশর ছেড়ে দেশান্তরী হন। দক্ষিণ- পশ্চিম মুখে চলতে চলতে এসে উত্তর ক্যামেরুণের নিরালা অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন।

এরপরে আবার এঁদের দেশান্তরী হতে হয় সপ্তদশ শতাব্দিতে। তখন বিদেশি বণিকেরা এসে গেছে আফ্রিকার সম্পদের সন্ধানে। 'আটলান্টিক সমুদ্রের পথে দাস ব্যবসায়' তখন শুরু হয়ে গেছে। সরল,সাদাসিধে,আদিম মানুষদের ধরে নিয়ে গিয়ে নিজেদের দেশে বিক্রি করার লাভজনক ব্যবসায়ের প্রতিযোগিতায় নেমেছে তখন ইউরোপ ও আমেরিকার বহু দেশ। ক্রীতদাস হওয়ার হাত থেকে বাঁচতে, আর ইসলামীকরণের হাত থেকে বাঁচার জন্য বামিলেকি মানুষরা উত্তর ক্যামেরুন ছেড়ে আরও দক্ষিণ দিকে আর পশ্চিম দিকে পালাতে লাগলো। শেষে থিতু হল তাদের বর্তমান বাসস্থানে ।

তবুও নিস্তার নেই। ১৮৮৪ সালে প্রথমে এল জার্মানরা, দখল নিল ক্যামেরুনের, অবশ্য এলাকা শাসনের ব্যাপারে প্রথমে বিজিত মানুষদের কিছু সুযোগ সুবিধা দিয়েছিল তারা। এরপরে আসে ফরাসিরা।

বেশ কিছুকাল এসব সহ্য করবার পর দুই বিদেশী শক্তির আধিপত্যের লড়াইয়ে ক্লান্ত মানুষজন তৈরি করল রাজনৈতিক দল। যারা ক্যামেরুনের স্বাধীনতার লড়াই শুরু করলো। ১৯৫৫ সালে ফরাসিরা এই রাজনৈতিক দলকে বেআইনি ঘোষণা করলে, শুরু হল জনযুদ্ধ। স্বাধীনতাকামী জনতার বিরুদ্ধে প্রবল আক্রমণ চলল। বিশেষত পশ্চিমাঞ্চলে, যেখানে বাস ছিল অধিকাংশ বর্ধিষ্ণু বামিলেকি ব্যবসায়ীদের, যারা তখন বিদেশের সঙ্গেও ব্যবসা করে প্রভূত অর্থ উপার্জন করছে। আর এরাই উৎসাহ আর অর্থ যোগাতো বিদ্রোহীদের, আশ্রয় দিতো তাদের।

এসময় প্রচুর বামিলেকি মানুষ এই নরমেধ যজ্ঞের আহুতি হন। কিন্তু ঝুঁকি নিতে ভয় নেই যাঁদের তারা আবার মাথা তুলে দাঁড়ালেন। পরবর্তীকালের ছেলেমেয়েরা শিক্ষার সন্ধানে বিদেশে পাড়ি দিতে লাগলো। আর ক্যামেরুনের বামিলেকি ব্যবসায়িরা আজও দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করছেন। এঁদের মধ্যে আছেন শিল্পী, সুদক্ষ পেশাদার মানুষ, চাষী,মৃৎশিল্পী প্রমুখ উদ্যমী বামিলেকি জনগণ।

একনজরে কিছু তথ্য

- অবস্থান—আটলান্টিকের পুর্বতীর ঘেঁষে আফ্রিকার পশ্চিম উপকুলে ক্যামেরুনের ঘাসজমিতে।
- ভাষা—বামিলেকি নিজস্ব ভাষা, এছাড়া ঔপনিবেশিকদের আগমনের পর থেকে ইংরেজি একটি প্রধান ভাষা, আর ফ্রেঞ্চও ব্যবহৃত হয়।
- উৎপন্ন ফসল ও গাছপালা— বাদাম, ভুট্টা,মকাই,কোকোইয়াম ইত্যাদি। এসবই এদের প্রধান খাদ্য।সাভানা ঘাস ছাড়াও পশ্চিমের উচ্চভূমি ঘন জঙ্গলে ভরা।আর আছে প্রচুর ‘রাফিয়া’পাম গাছ, যার পাতা এদের কুটির ছাইতে ব্যবহৃত হত।
- জনসংখ্যা—বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় তিনলক্ষ পঞ্চাশ হাজারের বেশি। পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় ৭৫% মানুষ গ্রামীণ কৃষিজীবি। বাকি মানুষ শহরবাসী, এদের বাস প্রধানত চারটি শহরের মধ্যে প্রধান শহর ‘বাফুসসাম’এ।
- সংস্কৃতি—আনন্দ উৎসব এঁরা পছন্দ করেন। আমাদের দেশের মুখেভাত, পইতে ইত্যাদির মত, খৃস্টানদের ব্যাপটাইজেশনের মত অনুষ্ঠান হয় ওঁদেরও। ছোট ছোট ছেলেদের নিয়ে বিচিত্র উলকিতে দেহ সাজিয়ে নাচতে নাচতে তারা দল বেঁধে এঁদের দেবস্থানে যান। এক একটি উপজাতি দলের এই গণ অনুষ্ঠানে সকলেই একসঙ্গে আমোদ আহ্লাদ,খাওয়া দাওয়া করে। মেয়ে পুরুষ উভয়েই নাচগানে অংশ নেয়। এছাড়া এদের অন্যান্য সব অনুষ্ঠান হয় রাজপরিবারের যে কোনও অনুষ্ঠান উপলক্ষে।সেদিন এরা বিভিন্ন ধরনের মুখোশ ও টুপি, নানা পশুর আদলে তৈরি শিরস্ত্রাণ পড়ে।
- জলবায়ু—এই অঞ্চলে দুটি প্রধান ঋতুর প্রভাব। প্রায় নয়মাসব্যাপী দীর্ঘ বর্ষাকাল। এইসময় পশ্চিমী মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে এখানে বৃষ্টিপাত হয়। প্রতি বছরের গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ১০০০ মিলিমিটার থেকে ২০০০ মিলিমিটারের মধ্যে থাকে।
- ধর্ম- প্রধানত এদের নিজস্ব ধর্মের লোক ছাড়াও, এখন এখানে বেশীর ভাগ মানুষই খৃস্টান, আর কিছু ধর্মান্তরিত মুসলিমও আছে।

হটু বিদ্যালঙ্কার

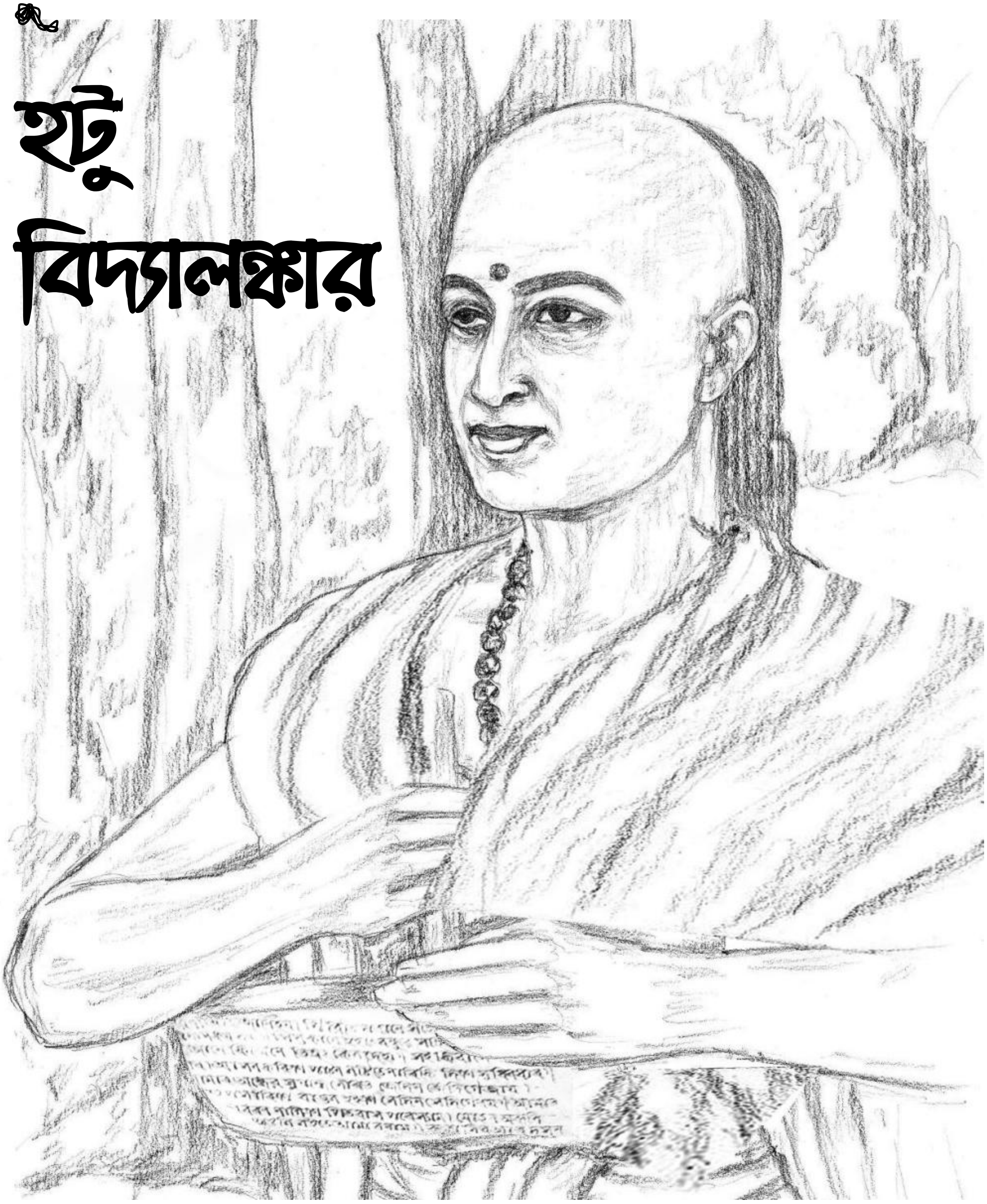

উমা ভট্টাচার্য

গত সংখ্যায় বলেছিলাম হটী বিদ্যালংকারের কথা। এবার শোনো হটু বিদ্যালঙ্কারের কাহিনি।

হটী বিদ্যালঙ্কার ছিলেন ব্রাহ্মণকন্যা। তাঁর বাবা নিজে ছিলেন টোলের পন্ডিত। আর, শিক্ষার সেই অন্ধকারময় সময়ে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য জাতির মধ্যেও যে বিদুষী মহিলা ছিলেন তার প্রমাণ ছিলেন 'হটু বিদ্যালঙ্কার।'

ছোটবেলায় বাবা নাম রেখেছিলেন রূপমঞ্জরী, কিন্তু অনেকগুলি সন্তান মারা যাওয়ার পরে জন্মানো মেয়েসন্তান বলে হেলা করে মা ঠাকুমারা কাছে এলেই বলতেন হট,মানে যা সরে যা। সেই থেকে পাড়াঘরে ডাকনাম হয়ে গেল 'হটু'। পরে অবশ্য তিনি এই নামেই পরিচিত হন, সমকালীন বহু সংবাদপত্রে এই নামেই তাঁর সম্বন্ধে লেখা বেরোত।

পরম বিষ্ণুভক্ত নারায়ণ দাস,আর তাঁর স্ত্রী সুধাময়ী থাকতেন বর্ধমানের এক পল্লীগ্রাম কলাইঝুটি'তে। বাংলা ১১৮১ সালে(ইং ১৭৭৬ কি ১৭৭৭ খ্রিঃ)সেখানেই রূপমঞ্জরীর জন্ম হয়। কিন্তু ছেলেবেলাতেই মাকে হারান তিনি। বার্ধক্যের অবলম্বন কোন পুত্র নেই, একমাত্র মা- মরা মেয়েকেই নারায়ণ দাস বাবা- মা দুজনের স্নেহ দিয়েই মানুষ করতে লাগলেন। তাঁর বিষয়কর্ম বিশেষ কিছু ছিলনা। কিছু শাস্ত্র পড়েছিলেন তিনি।

সংসারের একমাত্র বন্ধন মেয়েকে তিনি লেখাপড়া শেখাতে লাগলেন। হটুর পড়াশোনাতে খুব আগ্রহ ছিল, বাবা যা শেখাতেন তাই টপাটপ্ শিখে ফেলতেন। প্রখর বুদ্ধি আর মেধা ছিল তাঁর। বাবা তাঁকে বিয়ে না দিয়ে পড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। হটু খুব খুশি।

পন্ডিত সমাজের কঠোর নিয়মকানুনের ভয় না পেয়ে নারায়ণ দাস তাঁকে গুরুগৃহে রেখে পড়ানোর চিন্তা করলেন। কারণ মেয়েদের জন্য তখনও কোনও টোল ছিলনা বা ছেলেদের সঙ্গে একসাথে বসে পড়ার রেওয়াজ ছিলনা। নারায়ণ দাস তাঁকে নিকটবর্তী আর এক গ্রামে এক ব্রাহ্মণ ব্যাকরণের পন্ডিতের কাছে নিয়ে গেলেন। সেখানে রেখে মেয়েকে পড়ানোর আবেদন করলেন। ব্রাহ্মণ সংস্কারমুক্ত ছিলেন, তিনি সাগ্রহে হটুকে নিজের মেয়ের মত তাঁর বাড়িতে রাখলেন,আর যত্ন করে শিক্ষা দিতে লাগলেন। টোলের ছাত্রদের সঙ্গে একত্রে বসেই হটু গুরুর কাছে পাঠ নিতেন। ছেলেদের সঙ্গে পাঠ নেওয়ার ফলে তাঁর চরিত্রে খানিকটা পুরুষালি ভাব চলে আসে। তিনি ছাত্রদের মত করে মাথার চুল কেটে ফেললেন, শিখা রাখলেন, ছেলেদের মত ধুতি চাদর, মেরজাই ও উড়নি ব্যবহার করতেন, উপবীতও ধারণ করেছিলেন। পায়ে দিতেন পন্ডিতদের মত খড়ম। আজীবন কুমারী থেকে শিক্ষা লাভ করেছিলেন ও অধ্যাপনা করে গিয়েছেন নিজের প্রতিষ্ঠিত টোলে।

ব্যাকরণ, সাহিত্য পাঠ শেষ হবার পর, তিনি নবন্যায়(লজিক),সাহিত্য,অলঙ্কার,ও বৈদ্যক শাস্ত্র(আয়ুর্বেদ শাস্ত্র) অধ্যয়ন করার জন্য দ্বারস্থ হলেন সরগ্রাম নিবাসী আচার্য গোকুলানন্দের কাছে। সংস্কারমুক্ত মনের মানুষ আচার্য তাঁকে সযত্নে আর সব বিষয়ের সাথে সাথে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার জন্য চরক, শুশ্রুতও পড়ালেন।

আগেই তাঁর পিতার মৃত্যু হয়েছিল, তখন কিছুদিনের জন্য বাড়িতে গিয়ে পিতার শ্রাদ্ধশান্তি করে আবার গুরুগৃহে ফিরে আসেন। এবার গোকুলানন্দের কাছে অধ্যয়ন শেষ করে 'বিদ্যালঙ্কার' উপাধি পেলেন। তারপর তিনি গয়া গেলেন পিতামাতার পিন্ডদান করতে। অসমসাহসী আর পণ্ডিত পুরুষবেশী শিখাধারী 'হটু' পন্ডিতকে সকলে সমীহ করে চলত। রাশভারী প্রকৃতির এই রমণীর ধারেকাছে কেউ ঘেঁষতে সাহস করতনা। কিছুদিন কাশীতে গিয়ে বাস করেন ও দন্ডীদের কাছেও নানাবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অধ্যাপকেরাও তাঁকে সাগ্রহে পাঠ দিতেন তাঁর আগ্রহ,নিষ্ঠা আর চরিত্রের দৃঢ়তা দেখে।

দেশে ফিরে তিনি নিজের টোল খোলেন। সেখানে পুরুষ বেশেই তিনি ছাত্রদের পড়াতেন। শুধু অধ্যাপনাতেই তিনি তৃপ্ত হতে পারলেন না। অব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহন করে তিনি দেখেছিলেন সাধারণ মানুষদের খাদ্যাভাব,আর সুচিকিৎসার অভাব। টোল চালাবার সাথে সাথে তিনি জনসেবার কাজও করতে লাগলেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে তিনি অসাধারণ জ্ঞান ও সুখ্যাতি লাভ করেছিলেন। তার ফলে অনেক ছাত্র তাঁর কাছে ব্যকরণের সাথে চরক, নিদান প্রভৃতি অধ্যয়ন করতে আসতেন।

অনেক খ্যাতনামা কবিরাজও বিনা দ্বিধায় চিকিৎসা সম্বন্ধে তাঁর কাছে উপদেশ নিতে আসতেন। নারীর বেশভূষা মনের দৃঢ়তা নষ্ট করে, এই ধারণা থেকেই তিনি আজীবন কেশহীন, শিখাধারী,আর পুরুষবেশে কাটিয়ে গেছেন। সমাজের অনেক উপকার করে গেছেন ছাত্রদের অনেককে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা দিয়ে।

১২৮২ সালে প্রায় একশ বছর বয়সে নিষ্ঠাবান অধ্যাপকের মৃত্যু হয়।তাঁর পালিত এক বালক রাধারমণ দাস তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর গৃহেই বাস করতো। বাংলাদেশ যখন মেয়েদের শিক্ষাদান নিয়ে , আরও নানা সমাজের ক্ষতিকারক কুসংস্কার নিয়ে দেশের মানুষকে জর্জরিত করে রেখেছিল সেই সময়েই 'হটু বিদ্যালঙ্কার' সমাজপতিদের বিরুদ্ধে জলন্ত প্রতিবাদরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন,ও সসম্মানে নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে গেছেন চিরকুমারী এই অগ্নিশিখা।

এখন সময় এসেছে তাঁর মত নারীর জীবনকথা পাঠ করার। সমসাময়িক পন্ডিতদের কোনও লেখায় তাঁর নাম পাওয়া যায়নি, কিন্তু ইংরেজ পন্ডিতেরা তাঁর কথা(সমকালীন আরও বিদূষীদের কথা) লিখে গেছেন স্কুল বুক সোসাইটির "স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক"পুস্তিকায়,আর নানা সংবাদপত্রে। আর পাওয়া গেছে 'সখা' নামে (১৮৯০সালের)একটি সাময়িক পত্রিকায়।

'সেই মেয়েরা' বিভাগে তাঁদের কথা সকলকে জানিয়ে তাঁদের প্রতি সামান্য শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম।

ফেলে আসা কলকাতা

সুজয় রায়

প্রতাপচন্দ্র এরপর স্থির করলেন যে অবশিষ্ট আড়াইশো কপি বই ইউরোপ, আমেরিকার বিদগ্ধ সমাজকে বিতরণ করা হবে। আরো আড়াইশো কপি সরক্ষিত রাখবেন। এ ব্যতীত আরো আড়াইশো কপি বিক্রি করা হবে। এদেশে বিক্রি অরবার জন্য পঞ্চাশ টাকা, বিদেশে বিক্রি করবার মূল্য হবে পঁয়ষট্টি টাকা। যে ক্রেতা এই মূল্য দিতে পারবেন না তাঁর ক্রয়ক্ষমতা অনুযায়ী পনেরো অথবা পঁচিশ টাকা দাম ধরা হবে। কাউকে নিরাশ করা হবে না।

ফলে খুব উৎসাহ আর সাড়া পাওয়া গেল। যাঁরা প্রতাপকে অভিনন্দন জানালেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মহারানি ভিক্টোরিয়া, গ্ল্যাডস্টোন, ম্যাক্সমুলার, ম্যাথ্যু আর্নল্ড, শিলভা লেভি, হান্টার প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। লন্ডন থেকে দা টাইমস পত্রিকা, নিউ ইয়র্ক টাইমস, ডেলি টেলিগ্রাফ ইত্যাদিরা প্রশংসাসূচক আলোচনা প্রকাশ করল। ভারতবর্ষে অভিনন্দন জানালেন বিদ্যাসাগর মশাই, ডক্টর শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধায়, কৃষ্ণদাস পাল, মতিলাল ঘোষ, রমেশচন্দ্র দত্ত ইত্যাদিরা। দা স্টেটসম্যান পত্রিকাসহ দেশের অন্যান্য সংবাদপত্রও অভিনন্দন জানালেন। প্রতাপচন্দ্র এক কিংবদন্তি নাম হয়ে উঠলেন।

এর পরে প্রতি মাসে মহাভারতের এক খন্ড করে ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করা হল। প্রতিমাসে অর্থের জন্য আবেদনপত্র নিয়ে প্রতাপের দূতেরা বাংলার প্রতি জেলাতে, সারা ভারতে ঘুরে টাকা সংগ্রহ করতে লাগল। এতদিন, এতটা উদ্যোগ করে বই প্রকাশ করা হয়নি এই শহরে। টাকা আসে, বই বের হয়।

এই কাজ বারো বছর ধরে চলল। মহাভারতের চব্বিশ খন্ড বেরিয়ে গেল। এর পরে পন্ডিত দুর্গাচরণ মারা গেলেন।প্রতাপের একমাত্র কন্যা বিধবা হয়ে ঘরে ফিরে এলো। অনেক পরিবর্তন ঘটে গেল। প্রতাপ দ্বিতীয়বার বিয়ে করলেন।প্রতাপচন্দ্র তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সম্মান পেলেন। কিন্তু এবার প্রতাপ অসুস্থ হয়ে পড়লেন।একটা বছর ধরে তিনি বিছানাতে শুয়ে। অবশেষে ১৮৮৫ সালে জানুয়ারি মাসে সকলকে ছেড়ে চিরবিদায় নিলেন। মারা যাওয়ার আগে তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী সুন্দরীবালা স্বামীকে কথা দিলেন, মহাভারতের শততম খন্ড প্রকাশ পর্যন্ত সচেষ্ট হবেন।

স্ত্রী কথা রেখেছিলেন। ক্রমে বই- এর একশো খন্ড বাজারে এলো। এই বাকি খন্ডগুলি সুন্দরীবালা নামে প্রকাশ হয়। একশোতম খন্ড অবশেষে ছেপে বের হয়েছিল। ভারতপ্রেমিক স্যার এডুইন আর্নল্ড সেদিন প্রতাপ ও তাঁর স্ত্রীর এই সার্থক কর্মকান্ডকে “ডেড ম্যান্স্ ভিকট্রি” এই নামে অভিনন্দন জানালেন। এমন পাঠকবৎসল আর উদ্যোগি প্রকাশক আজও বিরল।

বিদেশিরা ১৮৯০ সালে দুজন ভারতীয় পুরুষ—স্বামী বিবেকানন্দ ও প্রতাপচন্দ্রকে শ্রদ্ধা করেছিল।

ক্রমশ

ঋকবাবুর রান্নাখেলা

এই সংখ্যায়ঃ-- ফ্রিটাটা

তনুশ্রী মুস্তাফি

জয়ঢাকের কিচেন

"আমার হাতে এটা কী বলো তো ঋক?"

"একটা ডিম, আবার কী?"

"ঠিক করে দেখে বলো সোনা। আর কিছুও তো হতে পারে!"

"আর কী হবে? মাম্মা তুমি কী বলছ? ডিম মানে ডিমই, ডিম আবার অন্য কিছু কী করে হবে?"

"আর আমি যদি দেখাই যে এটা অন্য কিছু তাহলে?"

"তাহলে তুমি যা বলবে তাই করব।"

পরবর্তী দৃশ্য কম্পুটারের সামনে। পুত্র কোলে মাতা খানিক গুগল খুঁজে দেখতেই বেরিয়ে এলো হলুদ হলুদ নরম নরম তুলোর বলের মত কিছু মুরগি ছানার ছবি। কিছু এই সবে ডিম ফুটে উঁকি মারছে আর কিছু বেশ সুন্দর পোজ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

"কী রে, এগুলো কিসের ছবি?"

"এগুলো তো মুরগির ছানা। তাতে কী?"

"তা এগুলো এলো কোথা থেকে? ডিম থেকেই তো নাকি! ছিল ডিম, হয়ে গেল পাখি। কেমন ম্যাজিক? যেটুকু চোখের সামনে আছে শুধু সেটুকুই দেখছিস কেন? একটু ভেবে দেখ তো ছোট্ট এইটুকু একটা বীজ থেকে কেমন বড় বড় গাছ হয়। অন্য কিছুই বা কেন? তুইও তো একদিন এইটুকু ছোট্ট, একটা ডিমের থেকেও ছোট, আমার পেটের ভেতর আরামে গুটিসুটি পাকিয়ে থাকতিস আর আজ দেখ একটা উড়ন্ত বাঁদর তৈরি হয়েছিস।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে। বুঝেছি। আমার কার্টুন হয়ে যাচ্ছে। যাই।"

কোল থেকে লাফাতে যেতেই খপাত করে ধরেছি ঘাড়টা, "দাঁড়া, পালাচ্ছিস কোথায়? কী শর্ত ছিলো? এখন মোটেই টিভি নয়, চলো আমার সঙ্গে।"

ছেলে তো নয় যেন সাপের ছানা ধরেছি। গা মোচড়াতে মোচড়াতে চললেন ঋকবাবু। রোববারের সকালটা মায়ের হাতে পড়ে এভাবে নষ্ট হবে সে কি আর প্রাণে সয়? কিন্তু রান্নাঘরে পা দিয়েই একগাল হাসি বাবুর।

"মা, আজ রান্না করব আমি? কী রান্না করব? আজ কিন্তু আমি একদম একা করব, তুমি একদম হাত দেবে না।"

"আরে, রান্না তো তুইই করবি। আমি হচ্ছি গিয়ে তোর সাহায্যকারী। বড় বড় হোটেলের শেফদের যেমন থাকে। আজ কী বানাবো বলতো? ফ্রিটাটা আর সাথে পালংশাক ভাজা। দাঁড়া, আমি কাটাকুটিগুলো সেরে ফেলি আর তুই ততক্ষণে পালংশাকটা ভালো করে ধুয়ে ফেল দেখি। একটুও ধুলোবালি থাকে না যেন, তাহলেই জীবাণুদের আক্রমন শুরু আর ঋকের কষ্টও।"

বন্ধুরা, ঋক যতক্ষণে তৈরি হচ্ছে ততক্ষণে তোমাদের একটু বলে দি ফ্রিটাটা হচ্ছে স্পেন দেশের খাবার। পছন্দমত সবজি আর মাংসের পুর ভরা মোটা অমলেট **বলতে পারো। এটা বানাতে লাগবে,**

ডিম- ৪

দুধ- ৪ চামচ

কুরনো চিজ - আধ কাপ

নুন আর গোলমরিচ গুঁড়ো - স্বাদমত

পেঁয়াজ, গোল গোল স্লাইস করে কাটা - বড় সাইজের দুটো

রসুন, কুচি করে কাটা - দু কোয়া

মাশরুম, অর্ধেক করে কাটা- দু কাপ

বেকন, কুচি করে নেওয়া - আধ কাপ (বদলে সসেজ বা রান্না করা মুরগির টুকরো হলেও চলবে)

আলু, পাতলা গোল স্লাইস করা - বড় সাইজের চারটে

টমেটো, গোল স্লাইস করা - দুটো

পালংশাক ভাজার জন্য নেবে একগোছা পালংশাক আর ৬ কোয়া রসুন, দুটোই কিন্তু কুচি করে নিও।

খানিক বাদে ঋক তৈরি হয়ে নিতে রান্না শুরু হল।

১। প্রথমে একটা বড় প্যান নিয়ে তাতে দু চামচ তেল আর এক চামচ মাখন দিয়ে সেটা গরম করে নিল ঋক। এবারে আলুগুলোকে লাল করে ভেজে নিল। তারপর এক এক করে বেকন, মাশরুম, পেয়াজ আর টমেটো আলাদা করে ভেজে তুলে রাখল ঋক।

২। এবারে প্যানে আর এক চামচ মাখন দিয়ে তাতে প্রথমে কুচোনো রসুনগুলো ভেজে নিল ঋক। তারপর প্যানের মধ্যে প্রথমে ভাজা আলুগুলো সাজিয়ে একটা স্তর তৈরি করলো। এর উপরে দিল এক এক করে মাশরুম, বেকন, পেঁয়াজ আর টমেটো। খানিকক্ষণ প্যান ঢাকা দিয়ে কম আঁচে বসিয়ে রাখা হলো।

৩। ইতিমধ্যে একটা বড় পাত্র নিয়ে তাতে ঋক একটা কাঁটা চামচ দিয়ে ফেটিয়ে নিল ডিম, দুধ, চিজ, নুন আর মরিচ। এটা অনেকক্ষণ ধরে ফেটাতে হয়। তাতে হাতে একটু ব্যথা করে বটে কিন্তু হাতের মাসলগুলো বেশ জোরালো হয় আর ফ্রিটাটাটাও বেশ ফোলা ফোলা আর নরম হয় খেতে।

৪। এবারে প্যানের ঢাকনাটা খুলে ওই ডিমের মিশ্রনটা ঢেলে দিতে হবে সবজির উপরে। তারপর উপর থেকে প্যানটা ঢাকা দিয়ে দিল। অন্তত মিনিট দশেক কম আঁচে ঢাকা দিয়ে রান্না করতে হবে। তবে মাঝে মধ্যে ঋকের মত ঢাকা তুলে দেখে নিও পুড়ে যাচ্ছে কিনা। হয়ে গেলে আঁচ বন্ধ করে ছুরি দিয়ে চারটে বা ছটা স্লাইস কেটে রেখো। একদম পিতজার স্লাইসের মত দেখতে হবে।

৫। পাশে অন্য একটা প্যানে এক চামচ মাখন দিয়ে রসুনগুলো লাল করে ভেজে নিয়ে তাতে পালংশাক আর এক চিমটি নুন দিয়ে ঢাকা দিয়ে দাও। খানিক বাদে ঢাকা খুললে দেখবে প্যান ভর্তি জলের মাঝে পালংশাকগুলি সেদ্ধ হয়ে গেছে। আর কিছুক্ষণ আঁচে রেখে জল শুকোলে নামিয়ে নিয়ো।

এটা খুব ভালো, পুষ্টিকর জলখাবার বা দুপুরের বা রাতের খাবারও হতে পারে। আমরা তো রোববারের সকালের জলখাবার খেয়েছি এই দিয়ে আবার সোমবার ঋক স্কুলের টিফিনেও নিয়ে গেছিল। খেতে কেমন হয়েছিল? সঙ্গের ছবি দেখে বুঝে নাও দেখি।

ছবিঃ লেখক

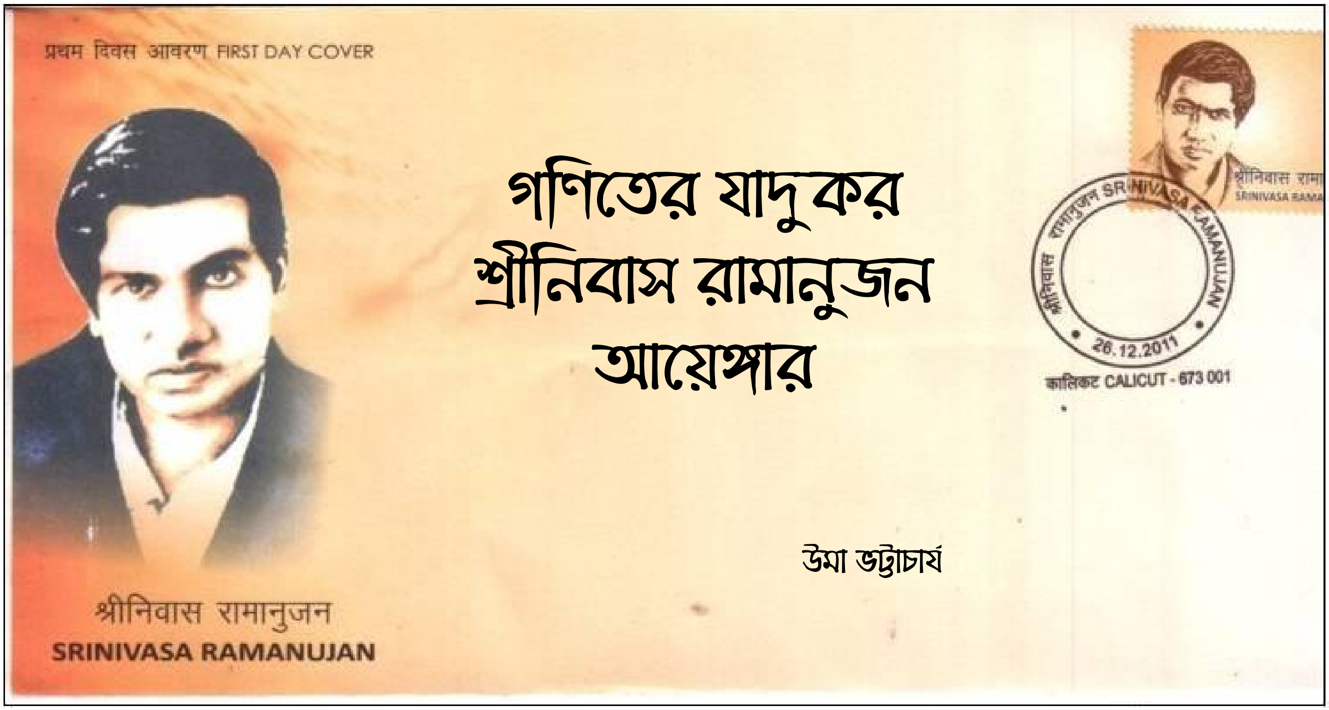

গণিতের যাদুকর শ্রীনিবাস রামানুজন আয়েঙ্গার

উমা ভট্টাচার্য

শ্রীনিবাস রামানুজন ছিলেন ভারতবর্ষের এক বিরল প্রতিভাসম্পন্ন স্বল্পায়ু গণিতবিদ। গণিতের ছাত্ররা নিশ্চয়ই জানে এই অসামান্য মানুষটির কথা। বিশ্ববিখ্যাত অঙ্কবিদেরা তাঁকে বলেছেন ম্যাথমেটিশিয়ান নয়, ম্যাথম্যাজিশিয়ান- ‘অঙ্কের যাদুকর’।

যখন ভারতের মাটিতে তাঁর প্রতিভা প্রকাশের কোনও রাস্তা পাচ্ছেনা, উৎসাহ পাচ্ছেনা, সুযোগ-সহযোগিতা পাচ্ছেনা, এমনকি মাদ্রাজের কোনও কলেজেও তাঁর ঠাঁই হচ্ছেনা (গণিত ছাড়া আর সব বিষয়ে ফেল করার জন্য)। সেই সময়ে তাঁকে যোগ্য মর্যাদা দিয়ে নিজের দেশে নিয়ে গেলেন, গবেষণা করার সুযোগ করে দিলেন আর বিশ্বের গণিতবিদদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান দিয়ে পাদপ্রদীপের আলোয় আনলেন ইংরেজ গণিতবিদ জি এইচ হার্ডি।

১৯১৪ সাল থেকে রামানুজনের গবেষণার মেন্টর হওয়ার সাথে সাথেই তিনি এই ক্ষণজন্মা প্রতিভাটিকে চিনে নিয়েছিলেন আর তাঁর প্রতিভা বিকশিত ও প্রকাশিত হবার সকল সুযোগ করে দিয়েছিলেন আর সঠিকপথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

কেম্ব্রিজের এই গণিতজ্ঞ অধ্যাপককে একবার একটি সাক্ষাৎকারের সময় পল এরডোস নামে একজন প্রশ্ন করেছিলেন যে, “গণিতজ্ঞ হিসাবে গণিতের জগতে আপনার শ্রেষ্ট অবদান কী?” তৎক্ষণাৎ বিনাদ্বিধায় অধ্যাপক হার্ডির উত্তর ছিল শ্রীনিবাস রামানুজন আয়েঙ্গারকে আবিষ্কার করাই গণিতের জগতে তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান।

মাদ্রাজের অখ্যাত এক গ্রামের ছেলে ছিলেন শ্রীনিবাস রামানুজন। তাঁর ছিল আলোকসামান্য গণিতপ্রতিভা। তিনি কোনও শিক্ষক বা উপদেষ্টা ছাড়াই গণিতের কঠিনতম বহু সূত্র আবিষ্কার ও সমাধান করেছিলেন, নিজের সহজাত প্রতিভায়।

তাঁকে প্রথমে চিনতেই পারেনি তাঁর দেশমাতৃকার শিক্ষিত সন্তানেরা,করেনি কোনরকম সাহায্য। অভাবের সংসারে বইপত্রও পাননি কোনও উচ্চমানের, যে ছেলেটি কলেজে ঢুকে একমাত্র অংক ছাড়া আর সব বিষয়েই ফেল করেছে তিনবার , গ্রাজুয়েট হতে পারেনি, সে যে এত বড় প্রতিভাবান তা বোঝা সত্যিই সম্ভব ছিলনা তাঁর পরিচিত মানুষজন আর শিক্ষকদের। পরীক্ষায় গণিতের এক একটি প্রশ্নের

সমাধান করে আসতেন তিন চারটি পদ্ধতিতে। সে'সব বোঝার ক্ষমতা বা দায় ছিলেনা পরীক্ষকদের। নিজের রাজ্যের কলেজগুলিতে তাঁর আবিষ্কৃত গণিত সূত্রগুলি বোঝার মত মানুষ এদেশে খুবই কম ছিল, আর ছিল প্রাতিষ্ঠানিক কিছু নিয়মকানুনের বাধা।

রামানুজনের পৈতৃক বাড়ি ছিল মাদ্রাজের কুম্ভকোনম শহরে। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের ২২ শে ডিসেম্বর জন্ম হয়েছিল মামার বাড়িতর, চেন্নাইএর ২৫০ মাইল দূরে কাবেরী নদীর তীরে ইড়োর শহরে। রামানুজনের পিতা শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার ছিলেন দক্ষিণ ভারতীয় বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ । অভাবের সংসারে এল নতুন শিশু, দক্ষিণভারতীয় ধর্ম সংস্কারক রামানুজনের নামে ছেলের নাম রাখলেন,রামানুজন—শ্রীনিবাস রামানুজন আয়েঙ্গার।

তাঁর বাবা কাজ করতেন স্থানীয় এক কাপড়ের দোকানে। হিসাবরক্ষকের কাজ। আর মা ভজন গাইতেন স্থানীয় দেবালয়ে। দাপুটে মা চিরকালই ছিলেন রামানুজনের উপর খুবই কর্তৃত্বকামী, কাউকে এমনকি পুত্রবধু জানকিকেও ঘেঁষতে দিতেন না ছেলের কাছে। ছেলেকে নিয়ে গর্বিত ছিলেন মা।

সাত বছর বয়সে রামানুজনকে ভর্তি করা হয়েছিল কুম্ভকোনমের কাঙ্গিয়াম প্রাইমারি স্কুলে। নীচু ক্লাসে থাকতেই তাঁর গণিতের অসামান্য দক্ষতা সহপাঠী আর শিক্ষকদের কাছে ছিল বিস্ময়ের বস্তু। পাটিগণিত, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি প্রভৃতি সকল শাখাতেই ছিল বালক রামানুজনের স্বজ্ঞা,সহজাত জ্ঞান,ও আগ্রহ। নানা জটিল প্রশ্ন করতেন শিক্ষককে গণিতের ক্লাসে, যেগুলি ছিল একেবারে নতুন আর জটিল। একটু বড় হলে শিক্ষক মহাশয় গণিতের বিভিন্ন জটিল প্রশ্নের সমাধান করতে তাঁকেই বোর্ডে ডাকতেন,যা অনায়াসেই সমাধান করতেন তিনি। তাঁর সহপাঠীরাও তাঁর কাছে টিউশন নিতে আসতো। শৈশব থেকেই তাঁর স্বাস্থ্য ভালো ছিলনা,কিন্তু তাঁর গণিতের নানা পরীক্ষা- নিরীক্ষায় কোনও বাধা সৃষ্টি করেনি। গণিতে শূন্য সংখ্যাটি নিয়ে ছিল তাঁর নানা ভাবনা। যে বিষয়ে নানা সময়ে নানা প্রশ্ন করে সহপাঠী আর শিক্ষকদের বিব্রত করে তুলতেন নিজের অজান্তেই।

১৮৯৭ সালে দশ বছর বয়সে তিনি তাঞ্জোর জেলা প্রাইমারি পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করে হাফ- ফ্রি কনসেশন পেলেন ,যার ফলে তাঁর কুম্ভকোনম টাউন হাই স্কুলে পড়ার সুযোগ পেলেন। ১৯০৪ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া পর্যন্ত তিনি এই কনসেশন পেয়েছিলেন,যার ফলে স্কুলস্তর পর্যন্ত পড়াশুনা করতে তাঁর আর্থিক অসুবিধা হয়নি। স্কুলের সিনিয়র গণিত শিক্ষক তাঁকে একটি স্কুল রুটিন তৈরি করতে দেন। স্কুলে ১৫০০ ছাত্র আর ৩০জনের মত শিক্ষক ছিলেন ,রামানুজন তাঁদের জন্য একটি সরল রুটিন তৈরি করে দেন অনায়াসে।

কাজটা সহজ নয়। বেশ কিছু শ্রেণী , বেশ কিছু শিক্ষক এবং বেশ কিছু বিষয়। এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে প্রত্যেক শিক্ষক সমান সংখ্যক ক্লাশ পান, প্রত্যেক বিষয়ে জন্য সমানসংখ্যক ক্লাশ হয় এবং প্রত্যেকটা শ্রেণী প্রত্যেকটা বিষয়ে সমান সংখ্যক ক্লাশ পায়। সেইসঙ্গে আবার একই শিক্ষক যাতে পরপর অনেকগুলো ক্লাশ না পান কিংবা অনেক পরে পরে ক্লাশ না পান সেটাও খেয়াল রাখা প্রয়োজন। সব মিলিয়ে সে এক জটীল অংকের খেলা। অংকের ভাষায় বললে বলা যাবে এটি অনেকগুলো চলরাশিকে একত্রে নিয়ে সুষম বন্টনের সমস্যা। আধুনিক গণিতের অপারেশনাল রিসার্চ নামের শাখার কিছু বিশেষ ধারাতে এই কাজগুলো করা হয়। সেসব কিচ্ছু শিক্ষা না পেয়েও সমস্যাটার সুষ্ঠু সমাধানে পৌঁছে গিয়েছিলেন এই ছাত্রটি। এমনই ছিল তাঁর সংখ্যা নিয়ে কাজ করার দক্ষতা। এই কাজের পুরস্কার হিসাবে তিনি লোনির ট্রিগোনোমেট্রি বইটি পুরস্কার পেয়েছিলেন। স্কুলে অনেকবার তিনি গণিতে অসামান্য দক্ষতার জন্য পুরষ্কৃত হয়েছিলেন।

অভাবের সংসারের আর্থিক সুসারের জন্য রামানুজনের মা তাঁর বাড়িতে কয়েকজন কলেজ ছাত্রকে রেখেছিলেন পেয়িং বোর্ডার রেখেছিলেন। এই ছাত্ররা গণিতের এই বিস্ময় বালকের প্রতিভার পরিচয় পেয়ে এই কলেজ ছাত্ররা তাঁকে গণিতের সব শাখার সঙ্গেই প্রাথমিক পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর পরবর্তী জীবনে যা পথ দেখিয়েছিল তাঁকে। স্কুলের শেষ বছরে (১৯০৩) এই বন্ধুরাই তাঁকে দিয়েছিলেন পিওর

ম্যাথমেটিকসের ওপর লেখা জি এস কার - এর লেখা প্রসিদ্ধ বইটি। এই বইটি তাঁর গাণিতিক প্রতিভার বিকাশকে শতগুণ বাড়িয়ে দিল। তাঁর কাছে আর কোনও সহায়ক বই না থাকায় এই বইয়ে প্রদত্ত সুত্রগুলির যে সমাধান তিনি করেছিলেন সেগুলির প্রত্যেকটিই ছিল এক একটি গবেষণাপত্র। এই নেশাই তাঁর প্রথাগত শিক্ষায় সাফল্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। স্নাতক ডিগ্রি তিনি অর্জন করতে পারেননি। সেকথা একটুখানি আগেই লিখেছি।

নিরুপায় রামানুজন নিজের কাজগুলি কতটা ঠিক, আর তিনি এভাবে গণিতের গবেষণা করার সুযোগ কোথায় পাবেন, ভাবতে ভাবতে ঠিক করলেন ,তিনি বিলেতের গণিতশাস্ত্রের পণ্ডিতদের কাছে তাঁর আবিষ্কৃত সূত্রগুলি পাঠাবেন। কিন্তু সব কাজের জন্যই টাকার দরকার। কলেজে ১৯০৪ সালে প্রথমবারের পরীক্ষায় ফেল করাতে সিনিয়ার এফ এ ক্লাসে প্রমোশন পেলেন না। তাঁর বৃত্তিও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এক বছর পড়া হলনা খাদ্যাভাবে শারীরিক অসুস্থতার জন্য। পরের দুবছরেও একই রেজাল্ট। হতাশ হয়ে অর্থের জন্য তখন একটি কাজ খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু কাজও মেলেনা। খাদ্যের অভাবে শরীর মন দুইই অচল, কিন্তু স্লেটে আর রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আনা কাগজের টুকরোতে চলে গবেষণার কাজ । কিন্তু সেগুলির প্রকাশের ব্যবস্থা হচ্ছেনা মন অশান্তিতে ভরে আছে।

কাজের খোঁজ করতে ডিসেম্বর মাসে দেখা করলেন বাল্যবন্ধু ,সি ভি রাজাগোপালাচারীর কাছে। রাজাগোপালাচারী সহপাঠীর গণিতের প্রতিভার কথা জানতেন, তাই একটা কেরাণির চাকরি করে দিতে মন চাইলনা। বন্ধুর মুখে শুনলেন যে তাঁর আবিষ্কৃত সূত্রগুলি কেউ বোঝেনা, তিনি বোম্বাই শহরের বিখ্যাত গণিতজ্ঞ শ্যালধানাকে চিঠি দিয়েছেন, ইন্ডিয়ান ম্যাথমেটিক্যাল সোসাইটিকেও চিঠি দিয়েছেন,কোনও উত্তর পাননি। রাজাগপালাচারী তাঁকে নিয়ে গেলেন এক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ও গণিতজ্ঞ আর দেওয়ান বাহাদুর রামচন্দ্র রাওয়ের কাছে,যিনি ছিলেন নেলোরের জেলা জজ। তিনি নিজের উপার্জন থেকে একটা মাসোহারার ব্যবস্থা করে দিলেন।

এদিকে বিনা শ্রমে টাকা নিতে বাঁধল রামানুজনের। কাগজ কিনতে পারছেন না তাই স্লেটে লিখে আর মুছে কাজ চলছে। ১৯১১ সালের শেষ দিকে প্রথমে ২০ টাকা মাইনের একটা চাকরি পেলেন মাদ্রাজেই । এরপর ১৯১২ সালের প্রথমে মাদ্রাজ পোর্ট ট্রাস্টের অফিসে মাসে ৩০ টাকা মাইনের একটি চাকরি পেলেন। কাগজ কেনার টাকা হবে আর গবেষণাও চালাতে পারবেন বলে মনে বেশ আনন্দ। এই সময় অফিসে তাঁর ওপরওয়ালাদের একজন ছিলেন স্যার ফ্রান্সিস স্প্রিং, আর একজন ছিলেন নারায়ণ আইয়ার। তাঁরা রামানুজনের গণিত প্রতিভার কথা জানতেন আর তাই সর্বদা তাঁকে গবেষণার কাজে উৎসাহ দিতেন। অফিসের কাজের সময়টুকু ছাড়া দিনের প্রায় বেশির ভাগ সময়ই কাটত তাঁর গবেষণার কাজে। ক্রমে স্যার ফ্রান্সিস আর নারায়ানা আইয়ারের সাহায্যে ঠিকঠাক একটি চিঠি লিখে পাঠালেন বিলেতের দুই পন্ডিত গণিতজ্ঞ এইচ এফ বেকার আর এ ডব্লিউ হবসনের কাছে। চিঠিতে নিজের কাজের কিছু নমুনাও পাঠালেন । কিন্তু এবারেও কোনও উত্তর এলনা।

১৯০৭ থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত সময়ে তিনি একজন শুভানুধ্যায়ীর খোঁজ করছিলেন যে তাঁর কাজের মূল্য দিতে পারবে। একজন গণিতজ্ঞের জীবনে ১৮ থেকে ২৫ বছর পর্যন্ত সময়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অধ্যাপক হার্ডি পরে আক্ষেপ করে লিখে গেছেন,এই ৫টি বছর চরম দুঃখ আর দুর্ভাগ্যের মধ্যে দিয়ে মাস্তুলহীন জাহাজের মত চলেছিল রামানুজনের জীবন। এই প্রতিভার পরিচিতি মেলেনি, মূল্যায়ন হয়নি , দিশাহীনভাবে কেটে গেছে ,অজানা ভবিষ্যতের দিকে।

এই সময় রামানুজমের কিছু আবিষ্কৃত ফর্মুলা অধ্যাপক শেশু আইয়ারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি ইংলণ্ডের রয়েল সোসাইটির ফেলো এবং কেম্ব্রিজের গণিতবিদ অধ্যাপক হার্ডির সঙ্গে তাঁকে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেন। রামানুজন লিখলেন সেই ঐতিহাসিক চিঠি। এই চিঠিই তাঁর জীবনের গবেষণার সুযোগ ,স্বার্থকতা আর স্বীকৃতির পথ খুলে দিল। ব্রিটিশ উপনিবেশ ভারতের মাদ্রাজের এক সামান্য অফিসের করণিকের লেখা চিঠিটি ১৯১৩ সালের ১৬ই জানুয়ারিই পৌঁছুল অধ্যাপক হার্ডির হাতে। ঐতিহাসিক সেই চিঠি পড়ে হার্ডি পেলেন তাঁর অধ্যাপক জীবনের অমূল্য রত্নটির সন্ধান যা নাকি হার্ডির কাছ থেকে গণিত জগতের পাওয়া শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার শ্রীনিবাস রামানুজন- দি ইন্ডিয়ান ম্যাথম্যাজিসিয়ান ।

চিঠিতে রামানুজনের ১২০টি উপপাদ্যের বর্ণনা ছিল। যেগুলি পড়ে হার্ডি বিস্মিত হলেন এই ভেবে এ কি সামান্য একজন কেরাণির কাজ। রামানুজন কী কী বই পাঠ করেছেন, কাদের কাছে পাঠ নিয়েছেন জানতে উৎসুক হলেন তিনি। এর কারণ রামানুজনের পাঠানো সেই উপপাদ্যের তালিকায় যেসব গুরুত্বপূর্ণ আর কঠিন সমস্যা ছিল সেরকম কোনও সমস্যা তিনি আগে কারো কাজে পাননি এবং কয়েকটি তিনি নিজেও সমাধান করতে পারেননি, আর পরে তা স্বীকার করেন।

হার্ডি মনস্থির করে ফেললেন যে এই সম্পদকে অবশ্যই নিয়ে আসতে হবে কেম্ব্রিজে,এবং প্রয়োজনীয় প্রথানুগ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, আর পাশ্চাত্যের উচ্চস্তরের গণিতজ্ঞদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিতে হবে, আর গণিত জগৎ পাবে এক অসামান্য গণিতজ্ঞকে। “লন্ডনের ট্রিনিটি কলেজের শিক্ষকেরা ভারতীয় গণিতবিদ রামানুজনকে কেম্ব্রিজে আনতে চান” এই মর্মে লেখা হার্ডির চিঠি পৌঁছুল লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিসের সেক্রেটারির হাতে, সেখান থেকে মাদ্রাজের ইন্ডিয়ান স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি মিঃ আর্থার ডেভিসের কাছে । তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়কে জানালেন, শুরু হল রামানুজনকে লন্ডনে পাঠানোর প্রক্রিয়া। ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ও বাধ্য হলো হার্ডির সঙ্গে যোগাযোগ করতে। অবশেষে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় সর্বোচ্চ ডিগ্রি না থাকলেও রামানুজনের বিলেতে গবেষণার জন্য মাসে ৭৫ টাকা করে দু’বছরের জন্য একটি স্পেশাল স্কলারশিপ দেবার ব্যবস্থা করল। আর মাদ্রাজ পোর্ট ট্রাস্ট তাঁকে দু’বছরের বেতনহীন ছুটি অনুমোদন করলো। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় ‘সর্বপ্রথম রিসার্চ স্কলার’ হিসাবে বৃত্তি দিল রামানুজনকে, যাঁকে তাঁরা গ্রাজুয়েট ডিগ্রি তো দূরের কথা, তাঁর গণিত প্রতিভার কোন মুল্যই দেয়নি এতদিন। প্রতিভার স্বীকৃতি আর কাজ করার সুযোগ লাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে সমাজের এককোনে প্রান্তিক আর ব্রাত্য হয়ে, সামান্য কেরাণি হয়ে বেঁচে ছিলেন যে রামানুজন, তিনি পেশাদার গণিতজ্ঞ হিসাবে জীবনের এক নতুন অধ্যায় শুরু করতে চললেন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে,অধ্যাপক হার্ডির ছত্রছায়ায়।

কিন্তু বাদ সাধল সনাতন হিন্দুদের জাতিগত কুসংস্কার। মা কোমলাতাম্মা কিছুতেই বিলেত যেতে দেবেন না। সে’সব মেটাবার পর এক সপ্তাহের মধ্যেই মাদ্রাজ বিশ্ব বিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট ১০,০০০ টাকা মঞ্জুর করল, রামানুজনের মাসিক স্কলারশিপ বেড়ে হল বছরে ২৫০ পাউন্ড, পাথেয় আর পোশাক বাবদ দেওয়া হল ১০০ পাউণ্ড।

১৯১৪ সালের ১৭ই মার্চ রামানুজন জাহাজ থেকে নামলেন লন্ডনের মাটিতে। হার্ডি ২০ পাউন্ড খরচ করে তাঁকে ভর্তি করে দিলেন কলেজে আর বছরে ৪০ পাউন্ড করে আর একটি স্কলারশিপের ব্যবস্থা করলেন। হার্ডি তাঁকে আধুনিক প্রথাসিদ্ধ গণিতবিদে পরিবর্তিত করতে চেষ্টা করেননি। রামানুজনের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল তাঁর জানা প্রাচীন পদ্ধতিতে কাজ করার, আর যেসব উপপাদ্য আবিষ্কার করেছিলেন সেগুলি সমাধান করে প্রমান করার দায়িত্বও ছিল তাঁর। সেকাজে তিনি সফলও হলেন।

১৯১৪ সালের জুন মাসের মধ্যেই তিনি কিছু নিবন্ধ লিখে ফেলেছিলেন। লন্ডন ম্যাথমেটিক্যাল সোসাইটির এক সভায় স্যার হার্ডি রামানুজনের নোটবুকে লেখা ও সমাধান করা গণিতের কিছু সমস্যার ফলাফল উপস্থিত করলেন। সকল সদস্যই বিস্মিত হয়েছিলেন এই ভারতীয় ছাত্রের কাজ দেখে। দেড় বছর বাদে হার্ডি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারকে এক পত্রে জানালেন যে , রামানুজন আধুনিক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ, তাঁর নিজের জীবনে এইরকম একজন প্রতিভাধর দেখেননি।

ট্রিনিটি কলেজে. একদিন অঙ্কের ক্লাসে অধ্যাপক বেরি কিছু গাণিতিক সমস্যা লিখছিলেন বোর্ডে। হঠাৎ রামানুজনকে খুব উত্তেজিত দেখে অধ্যাপক বেরি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কিছু বলবেন কি! সঙ্গে সঙ্গে রামানুজন আসন ছেড়ে উঠে গেলেন, আর সবাইকে অবাক করে দিয়ে সমস্যাগুলোর উত্তর লিখে দিলেন বোর্ডে, যদিও তখনও সেগুলি তখনও ক্লাসে সমাধান করানো হয়নি। গবেষণা আর প্রথাগত শিক্ষা ভালোভাবেই চলেছিল কেম্ব্রিজে তাঁর পাঁচ বছরের অবস্থান কালে।

১৯১৪ থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে গণিতের বিভিন্ন নুতন বিষয়ের উপর ২১ টি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছিলেন। এর মধ্যে মাত্র পাঁচটি ছিল হার্ডির সঙ্গে ,বাকিগুলি তাঁর একার। দুবছর

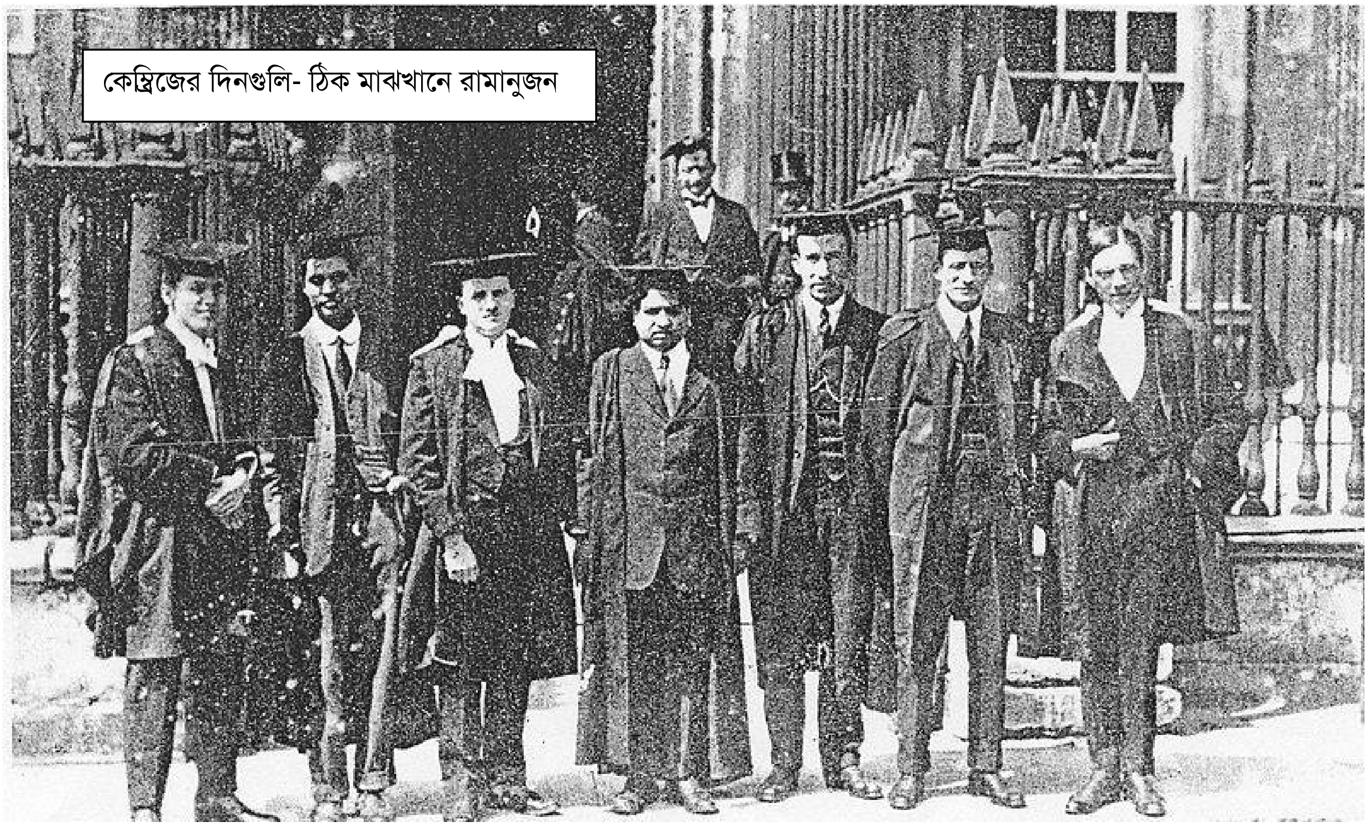
কেম্ব্রিজের দিনগুলি- ঠিক মাঝখানে রামানুজন

পর হার্ডির অনুরোধে ও ভারতে মিঃ ফ্রান্সিস স্প্রিং- এর চেষ্টায় মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় ১৯১৫ সালের ডিসেম্বরে স্কলারশিপের মেয়াদ বাড়িয়ে দেয় ১৯১৯ সাল পর্যন্ত। ‘হাইলি কম্পোজিট নাম্বার’ নিয়ে তাঁর সুদীর্ঘ গবেষণাপত্রটি প্রকাশের পরে ১৯১৬ সালে রামানুজনকে বি এ ডিগ্রি দেয় কেম্ব্রিজ থেকে। তাঁর লন্ডন বাসের মেয়াদও বাড়িয়ে দেওয়া হল। হার্ডির উদ্যোগেই তাঁর গবেষণার সুযোগ হয়। ১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারি ‘রয়েল সোসাইটির ফেলো’ নির্বাচিত হলেন রামানুজন । সে সময় রামানুজন অসুস্থ ছিলেন , তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছিল।

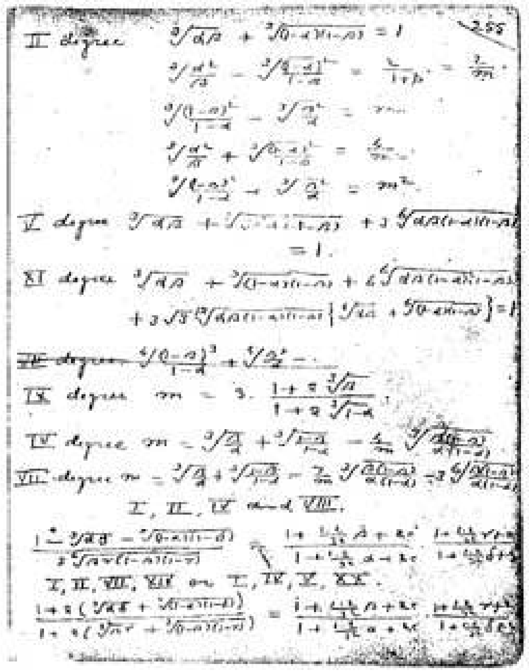

এরপর অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ায় রামানুজনকে দেশে ফিরে আসতে হয়। আসলে বৈষ্ণব পরিবারের সন্তান রামানুজন নিজে রান্না করে খেতেন , তাঁর খাদ্যদ্রব্য চালের গুঁড়ো, ও অন্যান্য জিনিস আসতো মাদ্রাজ থেকে জাহাজে করে। যুদ্ধের বাজারে সেই রসদ লন্ডনে পৌঁছুতো না সময়মত। এছাড়া তিনি ছিলেন নিরামিষাশী, ফলে ঠান্ডার দেশে প্রোটিনের অভাব আর পরিমাণমত খাবারের অভাবে ধীরে ধীরে অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন। রাতে রাতে তাঁর জ্বর হতে শুরু করল,ওজন কমে যেতে লাগল। জীবনে বীতশ্রদ্ধ হতে লাগলেন তিনি। বাধ্য হয়ে তাঁকে দেশে ফেরানোর ব্যবস্থা করতে হল। হার্ডি তাঁকে দেশে ফিরিয়ে দিলেন এই আশায় যে ভারতীয় আবহাওয়ায় আর বাড়ির খাওয়া দাওয়ায় তিনি ভালো হয়ে উঠবেন। তাঁকে মাদ্রাজে নিয়ে আসা হল ১৯২০ সালের জানুয়ারি মাসে।

কিন্তু লাভ হলো না কোন। ডাক্তারদের সব চেষ্টা, পরিবারের সেবা শুশ্রূষা সব ব্যর্থ করে ১৯২০ সালের ২৬শে এপ্রিল মাত্র ৩২ বছর বয়সে এই প্রতিভার জীবনদীপ নিবে গেল। পৃথিবী হারালো এক বিরাট মাপের গণিতজ্ঞকে।

<u>সিনেমা</u>

প্যারানর্মান

মহাশ্বেতা

নর্মান তার বয়সী অন্যান্য ছেলে মেয়েদের থেকে একেবারেই আলাদা। অন্যরা যখন আনন্দ করতে ব্যস্ত, সে তখন ভূতপ্রেত নিয়ে চিন্তা করে। তার ঘরে সব কিছু, তার টুথব্রাশ থেকে আরম্ভ করে তার অ্যালার্ম ঘড়িটা অবধি সব কিছুই ভূত প্রেত বিষয়ক কিছু। কিন্তু তার একটা গোপন কথা আছে, সে সত্যিকারের ভূত দেখতে পায়। তার ঠাকুমার ভূতের সাথে রীতিমত সিনেমা দেখে আলোচনা করে সে। অথচ বাবা, মা, দিদি সবাই তাকে পাগল মনে করে। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল যখন তার মায়ের এক পাগল কাকা (যার সাথে ওর কথা বলা মানা) হঠাৎ করে তার সাথে আলাপ করতে চায়। সে তাকে একটা কী যেন বলতে গিয়েও বলার সুযোগ পায় না।

এদিকে এমনি ভূত দেখার সঙ্গে সঙ্গে নর্মান অদ্ভুত কিছু দৃশ্যও দেখে ফেলছে হঠাৎ হঠাৎ। স্কুলের নাটক করতে করতেই আশপাশের সব কিছু হঠাৎ বদলে একটা অন্ধকার জঙ্গল হয়ে গেল, তাতে কারা যেন তাকে তাড়া করছে, আর একটা গাছের হঠাৎ চোখ মুখ গজিয়ে মুখে কথা ফুটে উঠল। আর চিৎকার চ্যাঁচামেচি করে উঠতেই দেখে আবার সে নাটকের স্টেজে ফিরে এসেছে আর সবাই ফ্যালফ্যাল করে তার পাগলামি দেখছে। ক্রমে সে জানতে পারল তাদের শহরের এক ডাইনির দেওয়া এক প্রাচীন অভিশাপের কথা। একটা নির্দিষ্ট রাতে সেই ডাইনির ফাঁসীর হুকুম যে

সাতজন দিয়েছিল তাদের কবর থেকে জেগে ওঠার কথা, এটাই ছিল সেই ডাইনির অভিশাপ। আর এটাও জানতে পারল সে যে এই অভিশাপ একমাত্র রুখতে পারবে সে- ই।

বেশ গা- ছমছমে না? এর পরে আছে নর্মানের রোমাঞ্চে ভরপুর কান্ডকারখানা, আর গল্পের একদম শেষে একটা চমক। সেসব জানতে গেলে দেখে নাও এই সিনেমাটা। স্টপ মোশন অ্যানিমেশনের অসাধারণ কাজ আছে এতে। আর আছে রসিকতা! একেক সময় হাসতে হাসতে চোখে জল এসে যায়। কিন্তু এই কৌতুকের মোড়কের তলায় রয়েছে একটা খুব মানবিক ও নাড়া দেওয়া বার্তা – অন্যের ভিন্নতার প্রতি সহনশীলতার গুরুত্ব।

সিনেমাটা দেখে কেমন লাগল জানিও কিন্তু জয়ঢাককে!

<u>কিছু তথ্য</u>

সিনেমার নামঃ প্যারানর্মান

নির্দেশকঃ ক্রিস বাটলার ও স্যাম ফেল

শালঃ ২০১২

রেটিংঃ বাবা মায়ের সঙ্গে দেখাই কাম্য

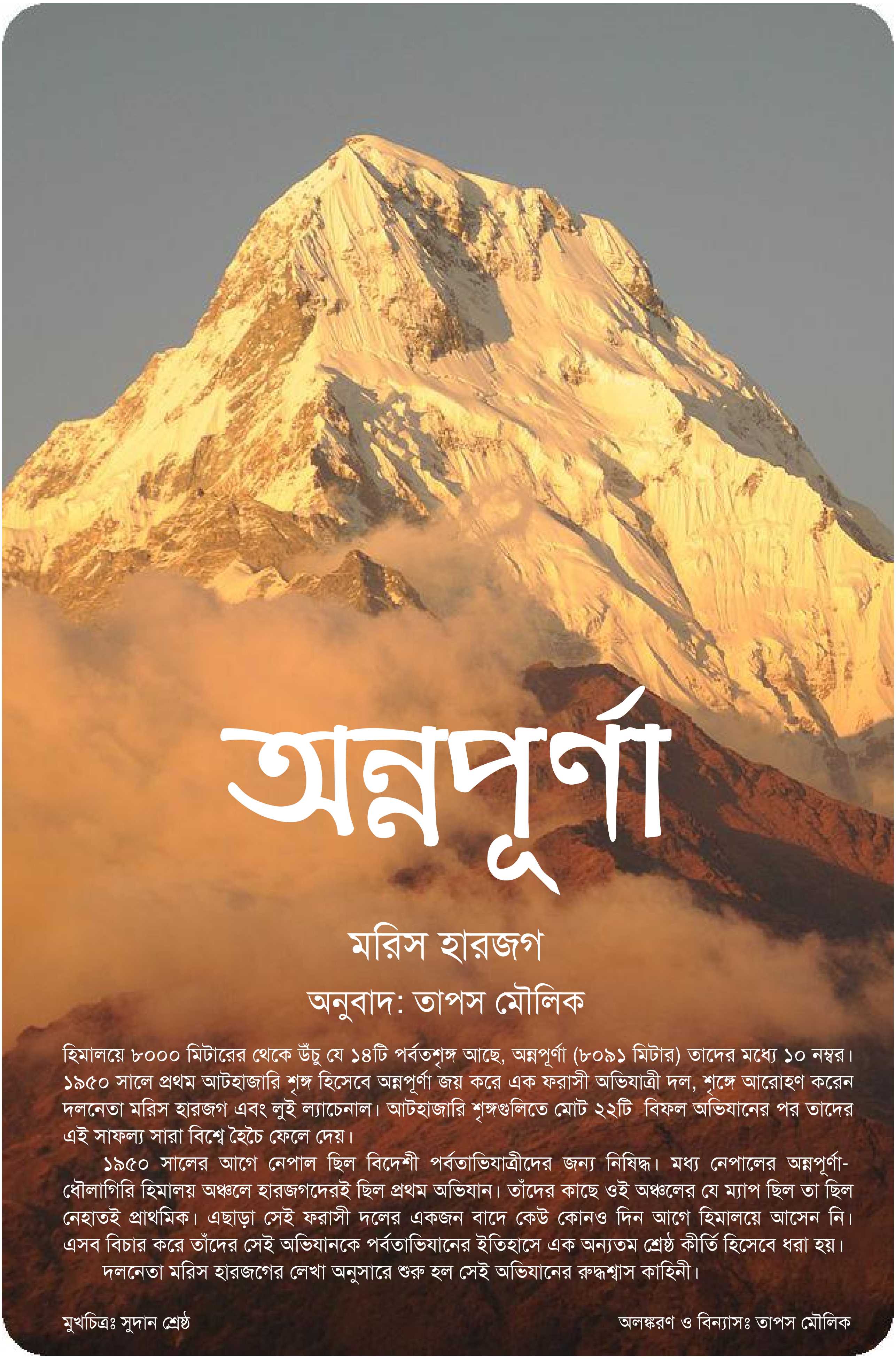

অন্নপূর্ণা

মরিস হারজগ

অনুবাদ: তাপস মৌলিক

হিমালয়ে ৮০০০ মিটারের থেকে উঁচু যে ১৪টি পর্বতশৃঙ্গ আছে, অন্নপূর্ণা (৮০৯১ মিটার) তাদের মধ্যে ১০ নম্বর। ১৯৫০ সালে প্রথম আটহাজারি শৃঙ্গ হিসেবে অন্নপূর্ণা জয় করে এক ফরাসী অভিযাত্রী দল, শৃঙ্গে আরোহণ করেন দলনেতা মরিস হারজগ এবং লুই ল্যাচেনাল। আটহাজারি শৃঙ্গগুলিতে মোট ২২টি বিফল অভিযানের পর তাদের এই সাফল্য সারা বিশ্বে হৈচৈ ফেলে দেয়।

১৯৫০ সালের আগে নেপাল ছিল বিদেশী পর্বতাভিযাত্রীদের জন্য নিষিদ্ধ। মধ্য নেপালের অন্নপূর্ণা-ধৌলাগিরি হিমালয় অঞ্চলে হারজগদেরই ছিল প্রথম অভিযান। তাঁদের কাছে ওই অঞ্চলের যে ম্যাপ ছিল তা ছিল নেহাতই প্রাথমিক। এছাড়া সেই ফরাসী দলের একজন বাদে কেউ কোনও দিন আগে হিমালয়ে আসেন নি। এসব বিচার করে তাঁদের সেই অভিযানকে পর্বতাভিযানের ইতিহাসে এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি হিসেবে ধরা হয়।

দলনেতা মরিস হারজগের লেখা অনুসারে শুরু হল সেই অভিযানের রুদ্ধশ্বাস কাহিনী।

মুখচিত্রঃ সুদান শ্রেষ্ঠ

অলঙ্করণ ও বিন্যাসঃ তাপস মৌলিক

ভূমিকা

এই লেখার পুরোটাই প্যারিসের নিউলির হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে ডিকটেশন দিয়ে লেখা, যেখানে আমি এখনও, যাকে বলে, খারাপ সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি।

আমি আমার স্মৃতি থেকে লিখেছি। তবে এই বর্ণনা যে তথ্যনির্ভর করতে পেরেছি তার মূলে আছে অভিযানের লগ বই। মারসেল আইজ্যাক এত সুন্দরভাবে এই লগ বই লিখে রেখেছে যে সেটা একটা মূল্যবান দলিল হয়ে আছে। কোনও কোনও সময় তো একেবারে ঘটনার সাথে সাথে লগ বই লেখা চলেছে। এ ছাড়াও কাজে এসেছে লুই ল্যাচেনালের ব্যক্তিগত ডায়রি। অভিযানের বাকি সদস্যদের দেওয়া খুঁটিনাটি তথ্যও খুবই কাজে লেগেছে। কাজেই বলা যায় এ বই আমাদের পুরো দলেরই লেখা।

বইয়ের গদ্য, যা কথ্য ভাষায় লেখা, সম্পাদনা করে দিয়েছে আমার ভাই গেরার্ড হারজগ। আমার পর্বতাভিযাত্রী জীবনের প্রথম অধ্যায়ের সঙ্গে আমার ভাই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে, আর ছেলেবেলার সঙ্গে তো বটেই। ভাইয়ের ওপর তাই আমি ভরসা করতে পেরেছি। আর যে ভাবে গেরার্ড আমায় উৎসাহ দিয়েছে, তা না পেলে সন্দেহ আছে এ বই লেখা কোনও দিন শেষ হত কি না।

রবার্ট বয়ার আমাদের অভিযানের জন্য অনেক কিছু করেছেন। তাঁর নাম অভিযানের বর্ণনায় নেই, কিন্তু তাঁর বন্ধুত্ব আমার কঠিনতম সময়ে আমায় উৎসাহ জুগিয়ে এসেছে।

এই প্রথম আমি বই লিখলাম। কোনও দিন বুঝিনি বই লেখা কী সাংঘাতিক কাজ! কোনও কোনও সময় তো মনে হয়েছে আর পারছি না। কিন্তু কাজটা আমি হাতে নিয়েছি, কারণ যে ভয়ানক অভিযান থেকে অলৌকিকভাবে আমরা বেঁচে ফিরেছি, তার কথা সবার হয়ে অন্তত: আমায় লিখে রাখতেই হবে।

এর পরের পাতাগুলোয় লেখা রইল প্রকৃতির নিষ্ঠুরতম রূপের সঙ্গে বেঁচে থাকার লড়াইয়ে মত্ত কিছু মানুষের যন্ত্রণা, আশা আর আনন্দের কথা।

কর্তব্যের খাতিরে আমি সাদামাটা এবং সৎভাবে যা ঘটেছে তাই লিখে গেছি। আর যতটুকু ক্ষমতায় কুলোয়, চেষ্টা করেছি অভিযানের মনস্তাত্ত্বিক দিকটা তুলে ধরার – যে অদ্ভুত একটা নেশা, একটা ঘোরের মধ্যে সমস্ত ব্যাপারগুলো ঘটে যাচ্ছিল সেটাকে ধরার।

অভিযানের ন'জন সদস্যের এ বই উপভোগ করার যথেষ্ট কারণ আছে। আমরা একসঙ্গে কষ্ট করেছি, কষ্ট পেয়েছি, আবার আনন্দকেও জেনেছি একসঙ্গে। আমার একটাই ইচ্ছে – আমরা ন'জন, যারা মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিলাম একসাথে, বাকি জীবনটাও যেন সেরকম একসাথে থাকতে পারি।

আমাদের ক্ষমতার সীমানা পেরিয়ে, সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে, জীবনের শেষ সীমারেখাকে ছুঁয়ে এসে, মনে হচ্ছে আমরা সত্যি জীবনের অসাধারণত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছি। মৃত্যুর সবচেয়ে কাছে গিয়ে মনে হয়েছে আমি বুঝতে পেরেছি আমার বেঁচে থাকার মানে, যা আগে কোনও দিন সেভাবে বুঝিনি। বুঝেছি সাহসী হওয়ার চেয়ে সৎ হওয়া ঢের ভাল। আমার সারা দেহে সেই প্রলয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা চিহ্ন রেখে গেছে। আমি বেঁচে ফিরেছি এবং অর্জন করেছি আমার স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতা আমার কোনও দিন হারাবে না। এ এক অদ্ভুত পরিপূর্ণতা যা আমার চোখের সামনে এক সম্পূর্ণ নতুন পৃথিবী, এক অসাধারণ জীবন খুলে দিয়েছে।

এ বই শুধু আমাদের অভিযানের বর্ণনা নয়। আমরা সাক্ষী। এমন কিছু ঘটনার আমরা সাক্ষী যা আপাতদৃষ্টিতে নিরর্থক, কিন্তু কারও কারও কাছে যা জীবনের সারমর্ম। আর কী লিখব ....

হসপিটাল আমেরিকান ডে প্যারিস

জুন ১৯৫১

১

প্রস্তুতিপর্ব

যাবার দিন এগিয়ে আসছে। এখনও বহু কাজ বাকি। ফ্রেঞ্চ আলপাইন ক্লাবের সমস্ত সদস্য চূড়ান্ত ব্যস্ত। ক্লাবের অফিসে গভীর রাত অবধি বাতি জ্বলতে দেখা যাচ্ছে। উত্তেজনার পারদ ক্রমশ: চড়ছে। হিমালয়ান কমিটি প্রায় প্রতিদিন সন্ধেবেলাই মিটিং- এ বসছে। কাঁটায় কাঁটায় রাত নটায় সবাই আসে। এঁদের ওপরই এখন অভিযানের সমস্ত কিছু নির্ভর করছে। গোপন সব মিটিং- এ গুরুতর সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। হিমালয়ান কমিটির কাজ বাজেট তৈরি, আপৎকালীন ব্যবস্থাপনা, অভিযানে কী পরিমাণ ঝুঁকি নেওয়া হচ্ছে তা দেখা এবং সর্বোপরি অভিযানের সদস্য বাছাই।

ক'দিন হল অভিযানের সদস্যদের নাম ঘোষণা হয়েছে। সাংঘাতিক একটা দল আমি হাতে পাচ্ছি। দলের সবচেয়ে কমবয়সী সদস্য লম্বা, সৌম্যদর্শন জ্যঁ কোজি। বয়স সাতাশ। ইকোল পলিটেকনিকের এককালের মেধাবী ছাত্র, এখন অ্যারোনটিকাল ইঞ্জিনিয়ার। বেশিদিন হয়নি কোজি বিয়ে করেছে, কিন্তু বৌ লিজাকে ছেড়ে হিমালয়ে যেতে তার কোনও দ্বিধা নেই। শান্তশিষ্ট ছেলে কোজির চোখদুটো বেশ স্বপ্নালু। দেখলে মনে হয় সবসময় সে মনে মনে ইলেক্ট্রনিক্সের কোনও গুরুতর সমস্যার সমাধানে ব্যস্ত।

পর্বতাভিযানে কোজির বরাবরের সঙ্গী মার্সেল শ্যাজ- ও আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে। শ্যাজ ওর বন্ধুর চেয়ে দু'বছরের বড়, চেহারাতেও একটু বড়সড়। বেশ তৈরি ছেলে, বাবার রমরমা পোশাকের ব্যবসার ম্যানেজার। শ্যাজের পছন্দ হল নিখুঁত ব্যবস্থাপনা, ডিসিপ্লিন। বিয়ে করেনি, আর পাহাড়ে চড়া ওর নেশা। তাই ছুটির দিনগুলো পাহাড়ে কাটাতে ওকে আর কে আটকায়! ও যদিও প্যারিসে থাকে, আল্পস থেকে কিছুটা দূরেই, তবু কোনও উইকএন্ডেই ওকে ঘরে পাওয়া যায় না।

লুই ল্যাচেনাল প্রথমে ছিল অপেশাদার পর্বতাভিযাত্রী। পাহাড়ে চড়তে ভাল লাগত তাই চড়ত। ক'বছর আগে ও ন্যাশনাল স্কুল অব স্কিইং অ্যান্ড মাউন্টেনিয়ারিং- এ প্রশিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছে। শ্যাময় (Chamonix) - এর লোকেদের কাছে ও বিদেশী, কেননা শ্যাময় উপত্যকার লোক ও নয়। ওর বাড়ি অ্যানেসিতে। পাহাড়ের গর্বে গর্বিত শ্যাময়ের লোকেদের কাছে যা সহজে গ্রহণযোগ্য নয়। তা সত্ত্বেও গাসটন রেবুফত এবং লায়োনেল টেরের সঙ্গে ল্যাচেনাল শ্যাময়ের গাইডের দলে ঢুকতে সক্ষম হয়েছিল, যে গাইডের দল পর্বতাভিযানে তাঁদের দক্ষতার জন্য পৃথিবীবিখ্যাত। ল্যাচেনাল মাঝারি উচ্চতার লোক, উজ্জ্বল দৃষ্টি, কথাবার্তায় খুব খোলামেলা। যে কোনও লোকের সঙ্গে খুব সহজে ভাব জমাতে পারে। তবে সবকিছুই একটু বাড়িয়ে বলা ওর স্বভাব। আর কোনও ব্যাপারে ওর পরামর্শ শুনতে গেলে লোকে বিপদে পড়তে বাধ্য। খুব সৎ লোক, নিজের ভুল স্বীকারেও কখনও দ্বিধা নেই। যখনি সময় পেত, ল্যাচেনাল আর টেরে বেরিয়ে পড়ত আল্পসের কুখ্যাত সব পাহাড়গুলোর উদ্দেশে।

লায়োনেল টেরেও শ্যাময়ের গাইডের কাজ করত, যদিও সেও গ্রেনোবল- এর লোক, শ্যাময়ের নয়। টেরে আর ল্যাচেনালের জুটি ছিল বিখ্যাত, লোকে বলত 'জোড়া ইঞ্জিন'। ওর বন্ধুর মত টেরেরও স্বভাব সবকিছু বাড়িয়ে বলা। আর সবসময় দু'জনে প্রতিযোগিতা চলত কে বেশি বাড়িয়ে বলবে। টেরে অবশ্য হার মানার পাত্রই নয়। ডাক্তার বাবার ছেলে টেরে আসলে খুব কালচার্ড, কিন্তু নিজের রোখাচোখা, কাঠখোট্টা ইমেজটা ধরে রাখতেই ও পছন্দ করত। শুধুমাত্র পাহাড়ের প্রতি ভালবাসাই ওকে পর্বতাভিযানে এনেছিল, গাইড হয়েই ও খুশি। যুদ্ধের সময় টেরে একটা ফার্মহাউস করেছিল। বন্ধুরা অনেকেই যেত সেখানে, কিন্তু শর্ত ছিল পাহাড় আর কঠোর পরিশ্রমের ভক্ত হতে হবে। গতবছর টেরে কানাডায় গেছিল স্কিইং- এর নতুন ফ্রেঞ্চ পদ্ধতি শেখাতে। ফিরে আসার পর দেখি ওর অতিরঞ্জনে নতুন তেজ এসেছে। ওখান থেকে চিঠিতে লিখল, 'জেটপ্লেনের মত স্কিইং

করছি'। আপাতত: টেরে ফের কানাডায়। যাবার এক সপ্তাহ আগে আসবে এখানে। ততদিন অবধি চিঠিপত্রেই যা যোগাযোগ।

গাসটন রেবুফতের জন্মসূত্র পর্বতাভিযাত্রীর পক্ষে খুব সুবিধের নয়, আর গাইডের পক্ষে তো আরও খারাপ। ওর জন্ম সমুদ্রের ধারে! ওর গাইড বন্ধুদের ব্যাপারটা হজম করতে বহুদিন লেগেছিল। অথচ এখন রেবুফতকে পাহাড়ের পোকা বললেও কেউ ভুরু তুলবে না। আমাদের দলে সবচেয়ে লম্বা

মরিস হারজগ

লুই ল্যাচেনাল

লায়োনেল টেরে

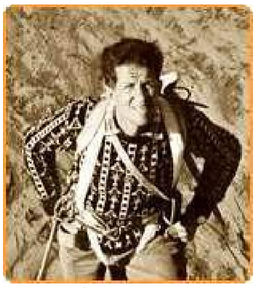
গাসটন রেবুফত

রেবুফত, অন্যদের চেয়ে প্রায় একমাথা উঁচু। আল্পসের প্রায় সমস্ত বিখ্যাত শিখরেই ওর পা পড়েছে। বিরামহীনভাবে এক শিখর থেকে আরেক শিখরে ও ছুটে বেড়ায়। শ্যাময়ের পর্বতাভিযানের সিজনে ওর বৌ আর মেয়ে ওর দেখাই পায় না। আপাতত: রেবুফত ইতালিতে এক লেকচার ট্যুরে ব্যস্ত, তবে ওকে বলেছি এক্ষুনি ফিরে আসতে।

এই পাঁচজন আর আমি, এই হল আমাদের 'অ্যাসল্ট পার্টি', অর্থাৎ যারা পর্বতের শৃঙ্গজয়ের চেষ্টা করবে। এর চেয়ে ভাল দল ফ্রান্সে আর পাওয়া যাবে না। গোপনেও কেউ এই সদস্য নির্বাচনের সমালোচনা করে নি। সারা ফ্রান্সের পর্বতাভিযাত্রীদের থেকে যদি ভোট নেওয়া হত তাহলেও এই ক'জনই নির্বাচিত হত।

আমাদের ক্যামেরাম্যানের নির্বাচন নিয়েও কোনও সংশয় ছিল না। মার্সেল আইজ্যাক আমাদের তুরুপের তাস। আইজ্যাক হিমালয়ে আগেই অভিযান করেছে, ১৯৩৬ সালে। এ ছাড়াও আরও অনেক অভিযানে ও অংশগ্রহণ করেছে। ও এসে পৌঁছলেই আমি ওর মূল্যবান অভিজ্ঞতার সঙ্গ পাব, কিন্তু এখন ও গ্রীনল্যান্ডে। গ্রীনল্যান্ড থেকে যাবে আমেরিকায় ওয়ার্ল্ড স্কি চ্যাম্পিয়নশিপের ছবি তুলতে। আমাদের ভারতের উদ্দেশে রওনা হবার মাত্র কয়েকদিন আগে ও আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে। আইজ্যাকের অনেক কাজ। অভিযানের ছবি তোলা ছাড়াও ফোটোগ্রাফির সঙ্গে জড়িত সমস্ত কিছুই ওর দায়িত্বে। আমাদের সকলেরই একটা করে ক্যামেরা থাকছে, কিন্তু ক্যামেরার রক্ষণাবেক্ষণ, ফিল্মের যত্নআত্তি, সবই ওর ব্যাপার। আমাদের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষার তথ্যসংগ্রহ এবং রেকর্ড রাখা আইজ্যাকের আরেক দায়িত্ব। আইজ্যাক মানুষটা বুদ্ধিমান, উদ্যোগী এবং প্রাণোচ্ছল। পর্বতাভিযাত্রীদের কাছে বিয়েটা সবসময়ই একটা ঝুঁকি। আইজ্যাক এই চিরন্তন সমস্যার সমাধান করেছে আরেক পর্বতাভিযাত্রীকে বিয়ে করে।

জ্যাক অডটকে আমাদের মেডিকাল অফিসার হিসেবে পেলে খুব ভাল হত। সার্জন হিসেবে ওর এতই নামডাক যে ও সঙ্গে গেলে দু'একবার হাত পা ভাঙতে আমাদের কারও আপত্তি নেই। কিন্তু জ্যাক একদম চোখ অবধি কাজে ডুবে আছে আর সবাইকে রীতিমত ধমকে রেখেছে কেউ যেন হাসপাতালে ফোন- টোন করে ওকে বিরক্ত না করে। ওর সাংঘাতিক সাংঘাতিক অপারেশনগুলোর গল্প যখন আমাদের শোনাত, আমি মাঝে মাঝেই থাকতে না পেরে ওকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করতাম, 'বলছ কী? এর পরেও লোকটা মরল না? অবিশ্বাস্য!' সার্জারি সম্বন্ধে আমার নানা প্রশ্ন শুনে জ্যাক বেদম হাসত। খুব বেশি সার্জন নেই যারা পাহাড়েও চড়েন। তার ওপর আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানি জ্যাককে সঙ্গী হিসেবে পাওয়ার মূল্য কতটা। তাই আবার একদিন ধরলাম ওকে, "কি জ্যাক, মন ঠিক করলে?"

"এই মুহূর্তে আমি ভীষণ ব্যস্ত। তোমায় কাল বলব।"

কাল কাল করে পুরো একসপ্তাহ কেটে গেল। টেনশনে আমার আর মিঃ ডেভিসের তখন নাজেহাল অবস্থা। শেষ পর্যন্ত যাবার দু'দিন আগে জ্যাকের মুখ থেকে দীর্ঘপ্রতীক্ষিত 'হ্যাঁ' আদায় করতে আমরা সক্ষম হলাম। জ্যাকের কাজ হবে আমাদের সবাইকে সুস্থ- সবল রাখা আর দুর্ঘটনা বিপদ- আপদের মোকাবিলা। আরেকটা কাজ, দলের প্রত্যেক সদস্যের শারীরিক অবস্থা এবং উচ্চতার সঙ্গে কে কীভাবে মানিয়ে নিতে পারছে সে সম্বন্ধে নিয়মিত আমাকে ওয়াকিবহাল রাখা। এ ছাড়া, স্থানীয় লোকজনের ওপর ওর ডাক্তারীবিদ্যা ফলাবার প্রচুর সুযোগ জ্যাক পাবে।

মুশকিল হল লিয়াজঁ অফিসার নিয়ে। আমাদের সবারই ইচ্ছে লিয়াজঁ অফিসার যেন একজন ফ্রেঞ্চ হন, যাতে কথাবার্তায় বোঝাপড়ায় কোনও অসুবিধে না হয়। কিন্তু শুধু ফ্রেঞ্চ হলেই তো চলবে না, তাকে আরও অনেক কিছু জানতে হবে। ভাষার মধ্যে ইংরেজি ছাড়াও তাকে হিন্দি এবং নেপালের প্রধান দুটি স্থানীয় ভাষা, গুরখালি আর তিব্বতি, জানতে হবে। অভিযানের মালপত্রসমেত আমাদের যাতায়াতের সমস্ত ব্যবস্থা তাকে করতে হবে। সে জন্য নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুর এবং আমাদের যাত্রাপথের আরও বিভিন্ন জায়গার সরকারি আমলাদের সঙ্গে ভাল কূটনৈতিক সম্পর্ক থাকাটাও খুব জরুরী। শেষপর্যন্ত দিল্লীর ফরাসি দূতাবাসেই এমন একজনকে পাওয়া গেল, যে একেবারে 'উপযুক্ত পাত্র'। ফ্রান্সিস ডে নোয়েল। তার ওপর ফ্রান্সিস পাহাড়ে চড়তেও ওস্তাদ, পাহাড়ই ওর নেশা।

আমাদের দলের একমাত্র নোয়েলকেই আমি আগে থেকে চিনতাম না। তবে ওর বাবা- মা আর বোনের কাছে শুনে শুনে ওর সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার আগেই বন্ধুত্ব হয়ে গেল। শক্তপোক্ত চেহারার একজন আত্মবিশ্বাসী যুবক। স্থানীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে নোয়েলের যথেষ্ট জানাশোনা। ভারত এবং নেপালে আমাদের রাষ্ট্রদূত মঁসিয়ে ড্যানিয়েল লেভির সঙ্গে নোয়েল ক'দিন আগেই কাঠমান্ডু ঘুরে এসেছে। সেই সফরে নোয়েলরা অনেক আলোচনার পর মধ্য নেপালের অভ্যন্তরে অনুসন্ধান চালানোর দুর্লভ অনুমতি জোগাড় করে এনেছে। ভারতে প্রফেসর রাহুল অভিযানের জন্য শেরপা নিয়োগ করার ব্যাপারে দার্জিলিং- এ নোয়েলকে সাহায্য করবেন।

এই ন'জন নিয়ে আমাদের দল। নিজস্বতায় উজ্জ্বল ন'জন প্রখর ব্যক্তিত্ব। এতদিন ধরে আমরা 'হিমালয়' 'হিমালয়' করছি যে এখন আর কারও তর সইছে না। অভিযানের উত্তেজনা যে কী সংক্রামক! তবে একটা কথা বলে রাখি, এই অভিযানে কিন্তু কারও ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি হবার কোনও ব্যাপার নেই। কারণ প্রথম থেকেই আমরা সবাই ভালমতোই জানি যে এই অভিযানের সমস্ত সূত্র থেকে প্রাপ্য যাবতীয় আয় পরবর্তী অভিযানের জন্য তহবিল তৈরিতে কাজে লাগবে। অনিশ্চিত অভিযানের প্রতি অমোঘ টানই বোধহয় এই ন'জন বিচিত্র প্রেক্ষাপট ও ব্যক্তিত্বের মানুষের মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র।

রওনা হবার আগের কয়েকদিন আমি আর শ্যাজ ছোটাছুটি করে অভিযানের সমস্ত সরঞ্জাম যোগাড় করলাম। আর ইনজেকশন নিতে নিতে আমাদের হাত ব্যথা হয়ে গেল। পীতজ্বর, কলেরা, বসন্ত - আরও কত কি টিকা!

২৮শে মার্চ সন্ধেবেলা হিমালয়ান কমিটি অভিযানের সদস্যদের নিয়ে শেষ মিটিং- এ বসল। কমিটির প্রেসিডেন্ট এবং অভিযানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক লুসিয়ান ডেভিস সংক্ষেপে এখন অবধি হিমালয়ের বিভিন্ন অভিযানের সাফল্য- ব্যর্থতার একটা খতিয়ান দিলেন। আর বললেন অভিযাত্রীদের কাছে কমিটির কী প্রত্যাশা-

'১৮০০ মাইল জুড়ে বিস্তৃত হিমালয় পর্বতমালায় ৭০০০ মিটারের (২৩০০০ ফিট) চেয়ে উঁচু ২০০ পর্বতশৃঙ্গ আছে। আর ৮০০০ মিটারের (২৬০০০ ফিট) চেয়ে উঁচু পর্বতশৃঙ্গ আছে ১৪টি। এই অভাবনীয় বিশালত্বের জন্যই হিমালয়কে 'তৃতীয় মেরু' বলা হয়। ৮০০০ মিটারের চেয়ে উঁচু কোনও শৃঙ্গজয়ের উদ্দেশ্যে এখন অবধি বিভিন্ন দেশ থেকে বাইশটা অভিযান হয়েছে। কেউ সফল হয় নি।

প্রস্তুতিঃ গোছগাছ ও সরঞ্জাম পরীক্ষাঃ বাঁদিক থেকে ল্যাচেনাল, হারজগ ও কোজি। ছবিঃ STF/ AFP

'আপনাদের এই অভিযানের লক্ষ্য মধ্য নেপালের ধৌলাগিরি (৮১৬৭ মিটার, ২৬৭৯৫ ফিট) কিংবা অন্নপূর্ণা (৮০৭৫ মিটার, ২৬৪৯৩ ফিট)। যদি দেখা যায় দুটোর কোনোটাই সম্ভব নয়, তাতে বিন্দুমাত্র লজ্জার কারণ নেই। তখন সান্ত্বনা হিসেবে অপেক্ষাকৃত নিচু এবং সুগম কোনও শৃঙ্গ জয় করার চেষ্টা করতে হবে। ছ'টন সরঞ্জাম এবং রসদ নিয়ে আপনাদের ভারত সীমান্ত পেরিয়ে ঢুকতে হবে মধ্য নেপালে। মধ্য নেপালের এসব জায়গা বিদেশীদের জন্য এতকাল নিষিদ্ধ ছিল। তিন সপ্তাহ ধরে পার্বত্য দুর্গম পথে ট্রেক করে অভিযান পৌঁছবে তুকুচায়। তুকুচাকে মধ্য নেপালের শ্যাময় ভ্যালি বলা যেতে পারে। ভৌগোলিক দিক থেকে তুকুচার অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর একদিকে ধৌলাগিরি, অন্যদিকে অন্নপূর্ণা। এতকাল অবধি হিমালয়ে যত শৃঙ্গাভিযান হয়েছে সেগুলো হয়েছে পরিচিত এলাকায়, যে এলাকা সম্বন্ধে আমাদের ভৌগোলিক জ্ঞান আছে। কিন্তু মুশকিল হল, ধৌলাগিরি আর অন্নপূর্ণা, এই দুই আটহাজারি শৃঙ্গ সম্বন্ধে আমাদের কাছে তেমন কোনও তথ্যই নেই। কোন রুট দিয়ে গেলে এদের কাছে পৌঁছনো যাবে তাও আমরা জানি না। আমাদের কাছে ওই এলাকার যে ম্যাপ আছে তা নেহাতই প্রাথমিক, আর একটা উচ্চতার ওপরে ওই ম্যাপ কোনও কাজেই আসবে না। তাই তুকুচায় মূল শিবির স্থাপন করার পরেই অভিযানের প্রথম লক্ষ্য হবে ওই দুই পর্বতশৃঙ্গ ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ভৌগোলিক অনুসন্ধান শুরু করা। ওই এলাকার ভূগোল এবং পরিবেশ সম্পর্কে ভালভাবে পরিচিত হবার পরেই আপনারা কোনও শৃঙ্গ জয়ের পরিকল্পনা করতে পারবেন এবং সেই অনুযায়ী এগিয়ে যেতে পারবেন।'

ডেভিস আরও বললেন, এর ওপরেও ওই এলাকায় আমাদের দলকে সমস্তরকম বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান অবশ্যই চালাতে হবে; ভৌগোলিক, ভূতাত্ত্বিক, আবহাওয়া ও জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত, শারীরবৃত্তীয়, নৃতাত্ত্বিক ইত্যাদি ইত্যাদি যতরকম সম্ভব।

কাজটা দুরূহ সন্দেহ নেই। তবে আমার সহযাত্রীদের ওপর আমার সম্পূর্ণ আস্থা ছিল। আমরা সেরা দলই বাছাই করেছিলাম, আর দলের সদস্যরা পরস্পরকে শ্রদ্ধা করত। আমাদের রসদ এবং সরঞ্জাম আমাদের আত্মবিশ্বাস আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। ফ্রান্সের কারখানায় মাত্র কয়েকমাসের মধ্যে তৈরি আমাদের সরঞ্জাম ছিল হালকা কিন্তু যথেষ্ট শক্তপোক্ত।

এরপর সেই শুকনো, কাঠখোট্টা অফিসের আবহাওয়াটা হঠাৎ কেমন ঠাণ্ডা আর গুরুগম্ভীর হয়ে এল। ডেভিসের আর বলার কিছু ছিল না। হলজোড়া অস্বস্তিকর নীরবতা যেন আমাদের বলছে, 'বেশ,

আর কেন, এবারে বেরিয়ে পড়ো।' এমন একটা অভিযানে আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে যার সম্বন্ধে আমাদের মনে কোনও পরিষ্কার ছবি নেই, কেবল অভিজ্ঞ পর্বতাভিযাত্রী হিসেবে মোটামুটি একটা ধারণা আছে মাত্র। টেবিলের ওপারের স্যুট- টাই পরিহিত, গম্ভীর, ভারিক্কি মানুষগুলো হঠাৎ যেন দূরের মানুষ হয়ে গেছে, এরপর যা করার আমাদের নিজেদেরই করতে হবে।

হঠাৎ মিঃ লুসিয়ান ডেভিস উঠে দাঁড়ালেন। আর পরিষ্কার কাটা কাটা উচ্চারণে বলতে শুরু করলেন, "বন্ধুরা, এবারে ১৯৩৬ সালের অভিযাত্রীদলের মতো তোমাদেরও সবাইকে একটা শপথ নিতে হবে - আমি শপথ করিতেছি যে অভিযানের যাবতীয় ব্যাপারে এবং অভিযানের সময়কালের ভিতর যে কোনও পরিস্থিতিতে আমি অভিযানের দলনেতার সিদ্ধান্ত মান্য করিয়া চলিব।"

পর্বতাভিযাত্রীরা এসব আনুষ্ঠানিকতার খুব একটা ধার ধারে না। আমার সহযাত্রীরা সবাই উঠে কিছুক্ষণ অপ্রস্তুতভাবে দাঁড়িয়ে রইল, কী করতে হবে কেউ ঠিক বুঝতে পারছে না। ডেভিস কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বললেন, "কী হল! আরম্ভ করো। ঠিক আছে আইজ্যাক, তুমি সবচেয়ে সিনিয়র, তুমিই শুরু করো।" এই বলে উনি মার্সেল আইজ্যাকের দিকে ফিরলেন। ১৯৩৬ সালের অভিযানের নেতা হেনরি সেগোন এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিলেন। তিনিও হঠাৎ আগ বাড়িয়ে বলে উঠলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ আইজ্যাক, শুরু করো।" আইজ্যাক শুরু করল, তারপর টেরে, কিন্তু গুনগুন করে কী যে বলল কিছুই বোঝা গেল না।

একে একে সবারই শপথ নেওয়া হয়ে গেল। সবাই বিশেষ করে সংকটের মুহূর্তে দলনেতাকে মেনে চলার অঙ্গীকার করল। মোটামুটি ওরা ওদের জীবনটাকেই আমার হাতে সঁপে দিল, জেনেবুঝে। আমারও হয়তো কিছু বলা উচিৎ ছিল, কিন্তু কিছুই বলতে পারলাম না। আমার তখন বিহ্বল অবস্থা। এতগুলো লোকের সম্পূর্ণ আস্থা আমার ওপর আছে জেনে আমার মনের যে ভাবটা হল তা ভাষায় প্রকাশ করা মুশকিল। এবার আমার দায়িত্ব এঁদের এই আস্থাকে মূল্য দেওয়া, আমাদের এই বোঝাপড়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। অবশ্য, কমিটি যেমন আমাকে দায়িত্ব দিয়েছিল, সেই দায়িত্ব পালন করার জন্য আমায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতাও দিয়েছিল।

অনুষ্ঠানের প্রায় শেষদিকে একটা ব্যাপারে আমার খুব দুঃখ হচ্ছিল। পিয়ের অ্যালেন, ফ্রান্সের পর্বতাভিযাত্রী মহলের প্রবাদপুরুষ, আমাদের জন্য এতকিছু করলেন, কিন্তু অভিযানে নিজে আসতে পারলেন না। যুদ্ধের সময় ওনার শরীর ভেঙে গেছে, এত লম্বা অভিযানের ধকল আর নিতে পারবে না। আমি অন্তত: জানি হিমালয় ওনার কাছে কতটা, আর তাই আজকের রাতটা ওনার কাছে কতটা হৃদয়বিদারক। ওনার মুখ দেখে কিন্তু কিছু বোঝার উপায় ছিল না। হেসে হেসে আমাদের বিদায় জানালেন, যেন আমাদের যাওয়া হচ্ছে এতেই উনি খুশি। সুদূর এশিয়ার তুষারপর্বতে আমাদের এঁদের কথাও মনে রাখা উচিৎ যাঁরা তাদের ব্যক্তিগত স্বপ্নটাও আমাদের হাতে সঁপে দিয়েছিলেন।

২

হিমালয়

প্লেনটা টেক অফ করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অডট ঘুমিয়ে পড়ল। বেচারি খুব ক্লান্ত। দিল্লী অবধি পুরো রাস্তা সে টানা ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিল। শুধু মাঝে মাঝে একটা চোখ খুলে আইজ্যাককে বলছিল, "আমার ইঁদুরছানাটা ঠিক আছে তো? দেখো যেন পালিয়ে না যায়।" অডটের এই ইঁদুরছানাটি আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে ভারতের ডাক্তারদের কাছে একটি উপহার বা আশীর্বাদ হিসেবে। এই প্রজাতির ইঁদুর ভারতে আর পাওয়া যায় না, অথচ এক জাতের ম্যালেরিয়ার গবেষণার জন্য এটি খুব জরুরি।

অবশেষে ভারত পৌঁছলাম। ভারতবর্ষ! প্লেনটা মাটি ছোঁয়ার আগে একটা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিলাম, আর যেন চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম – ওই সেই প্রাচীন শহর

মহেঞ্জোদারো, ওই তো আর্যরা আসছে দলে দলে, ওই এক তপোবনে এক বিশাল অশ্বত্থগাছের ছায়ায় ধ্যানগম্ভীর ঋষির কলমে লেখা হচ্ছে আর্য সভ্যতার তুঙ্গস্পর্শী নিদর্শন বেদ।

আমাদের রাষ্ট্রদূত মঁসিয়ে ড্যানিয়েল লেভি আর দূতাবাসের অন্যান্য কর্মীরা পালাম বিমানবন্দরে আমাদের স্বাগত জানাতে এসেছেন। ভারতের কাস্টমসের লোকজন এর আগে আর কোনও অভিযানকে এরকম মালপত্র, খাবারদাবার সমেত গোটা একটা প্লেন ভাড়া করে ভারতে এসে পৌঁছতে দেখেনি। কাস্টমস অফিসারটি গম্ভীরভাবে জানালেন, "আপনাদের মালপত্রের একটা সম্পূর্ণ তালিকা আমার দরকার, ইংরেজিতে। তাতে প্রতিটি জিনিসের ওজন, দাম এবং মাপ আমার চাই।"

"কিন্তু আমাদের সঙ্গে যা জিনিসপত্র, তাতে আইটেমের সংখ্যা তো ৫০,০০০- এরও বেশি।"

আমাদের কথায় কর্ণপাত না করে অফিসারটি জানালেন, "আপনারা যাচ্ছেন নেপালে। ভারতের মধ্য দিয়ে যাওয়া- আসার জন্য আপনাদের ট্রানজিট ভিসা দেওয়া হবে। কিন্তু ফেরার সময় লিস্ট মিলিয়ে প্রতিটি জিনিস আপনাদের আবার কাস্টমসের সামনে দাখিল করতে হবে।"

সেরেছে! নেপালে তবে খাব কী আমরা? আর দু'একটা টেন্ট কিম্বা আইসঅ্যাক্স যদি ফেলে আসতে হয় বা হারিয়ে যায়? ব্যাপার তো গুরুতর! আমাদের অসুবিধের কথা বুঝেই বোধহয় স্মিত হেসে কাস্টমস অফিসারটি একটি নতুন প্রস্তাব দিলেন, "আপনারা আরেকটা কাজও করতে পারেন। আপনাদের সমস্ত মালপত্র এখানে ক্লোক রুমে রেখে চলে যান। ফেরার সময় আবার নিয়ে নেবেন। কোনও রকম কোনও ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করবেন না।"

আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় লাউঞ্জে পায়চারি করছিলাম। দেখি আইজ্যাক এক কোণে চুপটি করে বসে কী করছে। বলল ওর মাথায় নাকি চট করে রাগ উঠে যায়, আর রাগলে কী করে বসবে সে নিজেই জানে না। তাই ঝুঁকি না নিয়ে এই কোণে এসে বসে আছে, আর বসে বসে সেই কাস্টমস অফিসারের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তার একটা স্কেচ আঁকছে। কোজি সেটা দেখে বলল, "মুখটা দ্যাখো। একদম পারফেক্ট জ্যামিতিক ফিগার। তবে ইকোয়েশনে প্রকাশ করা একটু শক্ত।"

আমি আরেকবার আমাদের ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করার জন্য অফিসারটির কাছে এলাম। উনি আমার দিকে চেয়ে হেসে বললেন, "ঠিক আছে, শুনুন ... (ভাবলাম, যাক, শেষ পর্যন্ত ঝামেলাটা তাহলে মিটতে চলেছে), এক্ষেত্রে আপনাদের এরোপ্লেনটিকেও আমাদের কাছে জমা রাখতে হবে।"

আমি মুখ ফিরিয়ে দেখলাম আমাদের পাইলটটি মূর্ছা গেল কিনা!

ভারতবর্ষে সব সমস্যারই সমাধান সম্ভব, তবে যদি তোমার কোনও তাড়া না থাকে। শেষপর্যন্ত দু'দিন ধরে টানা আলোচনা আর দর কষাকষির পর আমরা কাস্টমসের ছাড়পত্র পেলাম। আমাদের সমস্ত মালপত্র পুরনো দিল্লী স্টেশনে নিয়ে আসা হল। অবশ্য যত সহজে বলছি ব্যাপারটা তত সহজ হয়নি। কাজটা করতে হল রাত্রে, গ্যাসবাতির টিমটিমে আলোয় পুরনো দিল্লীর নোংরা, ঘিঞ্জি, সরু রাস্তা দিয়ে। চারদিকে ভিড়, আবর্জনা, দুর্গন্ধ - জায়গাটা একটা নরকবিশেষ। সাইকেল রিক্সাগুলো মনে হচ্ছিল যে কোনও সময় ঘাড়ের ওপর উঠে পড়বে।

রেবুফত আর টেরে মালপত্রের সঙ্গে ট্রেনে রওনা হল। আমরা বাকিরা লখনউ- এর প্লেন ধরলাম। সিটে বসেছি কি বসিনি, জাঁদরেল গোঁফ এবং চাপদাড়িওলা দৈত্যাকৃতি তিনজন শিখ প্লেনের ভেতর ঢুকে এলেন। তাঁদের মাথায় বিশাল পাগড়ি, গভীর কালো চোখ, রাজকীয় চেহারা। ওঁদের পাশে আমাদের হাফপ্যান্ট পরা বাচ্চা ছেলের মতো দেখাচ্ছিল। অডট আমার কানে কানে বলল, "এঁরা পাইলট।" অবাক হয়ে গেলাম প্লেন চালানোয় ওঁদের দক্ষতা দেখে। অল্পক্ষণেই মসৃণভাবে দিল্লী থেকে লখনউ পৌঁছে গেলাম।

লখনউয়ে দেখা হল আং থারকে আর আং দাওয়ার সঙ্গে। আং থারকে শেরপাদের সর্দার, আর আং দাওয়া শেরপাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট। বাকি শেরপাদের দেখা পেলাম নৌতনওয়া পৌঁছে। নেপালে ঢোকার আগে এ রাস্তায় ভারতের শেষ গ্রাম এবং ন্যারোগেজ রেললাইনের প্রান্তিক স্টেশন

হল নৌতনওয়া। শেরপাদের বেঁটেখাটো, শক্তপোক্ত, পেশীবহুল মোঙ্গলয়েড চেহারা দেখে খুব ভাল লাগল; সমতলের ভারতীয়দের মত রোগাভোগা নয়। এঁদের বিশ্বস্ততা, কর্তব্যনিষ্ঠা আর নিঃস্বার্থ মনোভাব প্রবাদপ্রতিম। হিমালয় পর্বতাভিযানে শেরপারা প্রায় অপরিহার্য অঙ্গ। আমাদের সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যে এঁরাও আমাদের মতোই দলের একেকজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এঁদের থাকাখাওয়ার ব্যবস্থা আর পাহাড়ে চড়ার উপকরণ যেন আমাদের মতোই হয়। এঁদের নিরাপত্তার কথাও সর্বদাই মাথায় রাখতে হবে।

শেরপা সর্দার আং থারকে দেখলাম খুবই উদ্যমী লোক, সঙ্গীদের ও কুলিদের ওপর তার কর্তৃত্ব সংশয়াতীত। আং থারকে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী আর খুব ধার্মিক মানুষ, তাই অন্যদের ওপর ওর নৈতিক প্রভাবও যথেষ্ট। অন্য শেরপারা হল দাওয়া থোন্ডুপ, আং শেরিং (পানসি নামে পরিচিত), সরকি, ফু থারকে, আয়লা, আং দাওয়া এবং আজীবা। প্রত্যেকেই যথেষ্ট অভিজ্ঞ, আর এই অভিযানে নিজেদের ক্ষমতা প্রমাণ করার প্রচুর সুযোগ ওরা পাবে।

প্রখর রৌদ্রের মধ্যে নৌতনওয়া এসে পৌঁছলাম। অভিযানের দেড় টন খাবারদাবার নোয়েলের ব্যবস্থাপনায় আগেই এখানে পৌঁছেছিল। আমাদের সঙ্গে এল বাকি সাড়ে চার টন মাল। অবশেষে ৫ই এপ্রিল ভারত সীমান্ত পেরিয়ে আমরা নেপালে ঢুকলাম। নেপালের গড় উচ্চতা তিব্বত ছাড়া অন্য যে কোনও দেশের থেকে বেশি। বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু চৌদ্দটি পর্বতশৃঙ্গের মধ্যে আটটিই নেপালে। হিমালয়ের কোল জুড়ে পুব-পশ্চিমে প্রায় ৪০০ মাইল আর উত্তর-দক্ষিণে ১২০ মাইল বিস্তৃত এই দেশে ৭০ লাখ লোকের বাস। এর দক্ষিণাংশে, অর্থাৎ ভারতের দিকে, হিমালয়ের পাদদেশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে গভীর ক্রান্তীয় অরণ্য তরাই। এ এক আশ্চর্য এলাকা, কখনো ভ্যাপসা গরমে চারদিক জ্বলেপুড়ে যায়, আবার কখনো মৌসুমি বৃষ্টিতে বন্যায় ভেসে যায়।

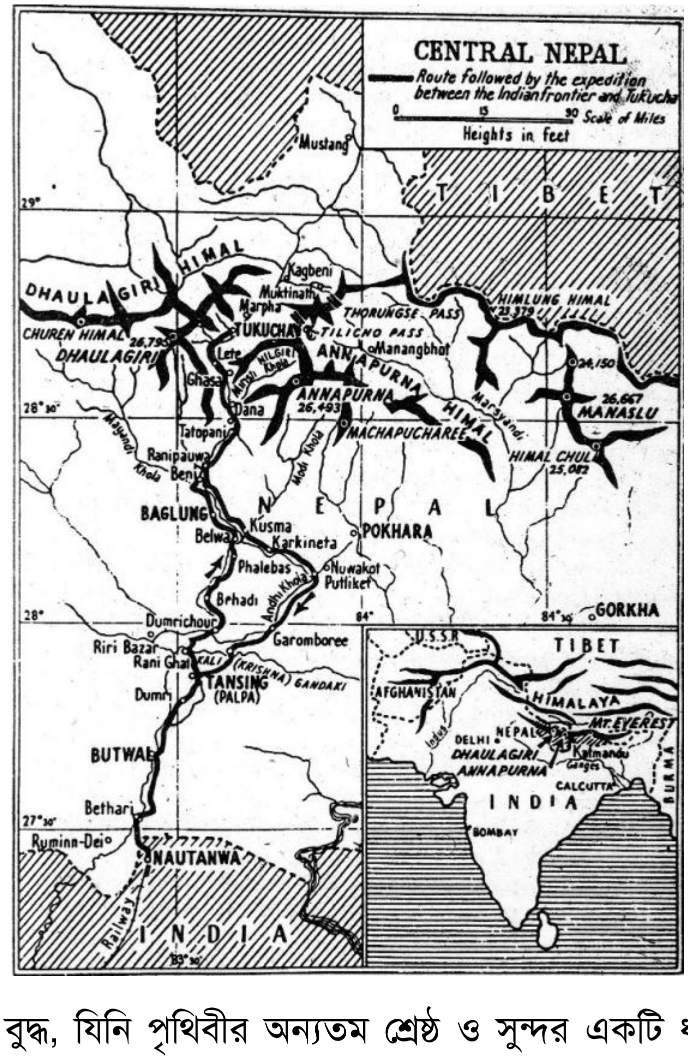

উত্তর নেপালের অধিবাসীরা বেশির ভাগই বৌদ্ধ, দক্ষিণ-নেপালে অধিকাংশ হিন্দু। তবে সবাই সাদা চামড়ার বিদেশীদের খুব সন্দেহের চোখে দেখে। দীর্ঘকাল ধরে নেপাল ইউরোপীয়দের কাছে নিষিদ্ধ ছিল। মধ্য নেপালে আমরাই প্রথম পর্বতাভিযানের অনুমতি পেয়েছি। উত্তরে হিমালয় এবং দক্ষিণে তরাইয়ের গভীর জঙ্গল নেপালকে আগলে রেখেছে, আর এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য তাকে সমৃদ্ধ করেছে। হিমালয়ের অতন্দ্র প্রহরায় নেপাল তাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে যুগ যুগ ধরে রক্ষা করে চলেছে। নেপালিরা বেশ ঋজু ব্যক্তিত্বের অধিকারী ও সাহসী।

ধুলোভরা পাথুরে রাস্তা ধরে জিপে চড়ে রওনা দিলাম। ছ'মাইল দূরে পড়ল কপিলাবস্তু, এখন যার নাম রুমিন-দেই। রুডিয়ার্ড কিপলিং-এর প্রিয় শিবালিক পর্বতমালার পাদদেশে একটি ছোট্ট সাধারণ জনপদ। আড়াই হাজার বছরেরও আগে এখানেই জন্মেছিলেন সেই মহাপুরুষ গৌতম বুদ্ধ, যিনি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর একটি ধর্মের পত্তন করে গেছিলেন। আমাদের চোখের

সামনে যে দেশ এখন বিছিয়ে আছে, সেখানেই তিনি তাঁর প্রথম জীবন কাটান। আমরা যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, হয়তো এ রাস্তা দিয়ে তিনিও একদিন হেঁটে গেছেন।

বাটওয়াল- এ পৌঁছে আমাদের টাকাকড়ি বদলে নেপালি মুদ্রা করে নিতে হল। এসব পাহাড়ি এলাকায়, বিশেষ করে আরও দুর্গম অঞ্চলে, নেপালিদের টাকার নোটে কোনও আস্থা নেই, তারা শুধু রৌপ্যমুদ্রা বোঝে। বাটওয়াল- এ গাঙ্গেয় উপত্যকার শেষ, হিমালয়ের চড়াই শুরু। পাশেই কালী গন্ডকি নদী, যেটা ভারতে গিয়ে গঙ্গায় মিশেছে। এই নদী অনুসরণ করেই আমাদের তুকুচা অবধি যেতে হবে। এখন থেকে পায়ে হাঁটা বা ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হওয়া ছাড়া গতি নেই। আমাদের দলকে ভেঙে একটা ছোট দল করা হল যারা মূল দলের আগে আগে যাবে। এই 'অ্যাডভান্স পার্টি'- র দায়িত্বে রইল ল্যাচেনাল আর টেরে। তাদের জন্য দুটো হাড্ডিসার ঘোড়া এসেছে। খুব মন দিয়ে তারা দেখি ঘোড়া দুটোকে পরীক্ষা করছে। এদিকে আগুন ঝরানো সূর্যের নিচে মূল দলের প্রস্তুতি চলছে তো চলছেই। মালপত্র ভাগ ভাগ করে এক মণ (৮০ পাউন্ড) ওজনের একেকটা বোঝা তৈরি করা হল, তারপর তা বিলি হল দু'শো কুলির মধ্যে।

"বড়া সাহিব, ছত্রী লিজিয়ে।"

দেখি সৌম্যদর্শন একজন নেপালি আমার দিকে একটি ছাতা বাড়িয়ে ধরে আছে। এভাবেই আলাপ হল জি বি রাণার সঙ্গে, যে অচিরেই একজন প্রকৃত বন্ধু হয়ে উঠেছিল। আমরা ওকে শুধু জিবি নামেই ডাকতাম। বহু বছর জিবি ইংরেজদের গোর্খা ব্যাটেলিয়নে কাজ করেছে। ওকে এখানে পাঠিয়েছেন নেপালের মহারাজা। অভিযান যেখানে যেখানে যাবে জিবিও সঙ্গে যাবে, যাতে আমাদের কোনও অসুবিধে না হয়।

হঠাৎ ঘোড়ার খুরের খটাখট খটাখট আওয়াজ শুনে চমকে উঠে দেখি লায়োনেল আর টেরের দুই ঘোড়া নদীখাতের দিক থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে আমাদের দিকে ছুটে আসছে। তাদের মুখ দিয়ে ফেনা উঠছে, জিন পরানো নেই। উদভ্রান্তের মতো দৌড়ে এসে ওরা আস্তাবলে ঢুকে পড়ল। ভাবলাম 'জোড়া ইঞ্জিন'- এর হলটা কী? ওরা তো দিব্যি ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে গেছিল! পরে ল্যাচেনাল গম্ভীরভাবে ব্যাখ্যা করেছিল যে যারা প্রকৃত পর্বতারোহী তাদের কাছে এসব কৃত্রিম যানবাহন খুবই বিড়ম্বনার ব্যাপার! পা থাকতে ঘোড়া কিসের?

তানসিং- এ অভিযাত্রীদল। ১১ই এপ্রিল ১৯৫০; বাঁদিক থেকে ডানদিকেঃ দাঁড়িয়ে ল্যাচেনাল, কোজি, শ্যাজ, অডট, টেরে, হারজগ, নোয়েল, আং শেরিং, সরকি, আজীবা, আয়লা এবং দাওয়া থোন্ডুপ; বসে রেবুফত, আইজ্যাক, ফু থারকে, আং থারকে এবং আং দাওয়া। ছবিঃ মার্সেল আইজ্যাক।

প্রথম দিনের হাঁটার শেষে সন্ধেবেলা জিবি আমাদের এক পুরনো জরাজীর্ণ রেস্ট হাউসে নিয়ে এল। বলল, “এটা নেপালের মহারাজার একটি রেস্ট হাউস।” সম্ভ্রমের সঙ্গে বললাম, “তাই নাকি? আমরা খুবই সম্মানিত।” পরে জানলাম, নেপালে সবকিছুই নাকি মহারাজার ব্যক্তিগত সম্পত্তি; ঘরবাড়ি, জমিজমা, রাস্তাঘাট, গাছপালা সবই খাতায়- কলমে মহারাজার। যে দেশের যা নিয়ম!

১০ই এপ্রিল অভিযানের মূল দল জেলাসদর তানসিং- এ পৌঁছল। এখানে আমাদের তিনদিন থাকতে হবে, মালপত্র ফের গোছগাছ করতে হবে, নতুন কুলি নিয়োগ করতে হবে। তাঁবু ফেলা হল, স্থানীয় দর্শকদের ভিড় দূরে রাখতে চারদিক দড়ি দিয়ে ঘিরে ফেলা হল। আইজ্যাক বেচারা পেটের গণ্ডগোলে ভুগছে, তানসিং পৌঁছেই সে তাই তাঁবুর ভেতর ঢুকে পড়ল। আর আমরা চললাম গ্রামের পাশের পাহাড়টার চূড়ায় উঠতে, কেননা সেখান থেকে নাকি হিমালয়ের তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গগুলি দেখা যায়। যে চিরতুষারের দেশ এতদিন শুধু ছবিতে আর স্বপ্নে দেখেছি, আজ তা নিজের চোখে দেখব, ভাবতেই রোমাঞ্চ হচ্ছিল। আমরা প্রত্যেকেই হিমালয়ের ওপর প্রচুর বই পড়েছি; কারাকোরামে ১৯৩৬ সালের ফ্রেঞ্চ অভিযানে যাঁরা এসেছিলেন আমাদের সেই বন্ধুদের সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা করেছি; আমাদের একমাত্র সদস্য আইজ্যাক, যার আগে হিমালয়ে আসার অভিজ্ঞতা আছে, তাকে প্রশ্ন করে করে পাগল করে দিয়েছি; আর এসবের ফলে প্রত্যেকের মনেই যার যার নিজের মতো করে হিমালয়ের একটা ছবি তৈরি হয়ে গেছে। আজ চোখে দেখা ছবিটা তার সাথে মিলবে কি?

বাস্তবে যা দেখলাম তা কোনও দিন কল্পনাও করতে পারি নি। প্রথমে চোখে কুয়াশার পাতলা আস্তরণ ছাড়া কিছু ঠাহর হল না। তারপর ভাল করে তাকিয়ে দেখি, দূরে দিগন্তবিস্তৃত এক দৈত্যাকার তুষারপ্রাচীর কুয়াশার স্তর ভেদ করে অবিশ্বাস্য এক উচ্চতায় উঠে গেছে। মাইলের পর মাইল জুড়ে অগুন্তি তুষারশৃঙ্গ ধাপে ধাপে আট হাজার মিটার উঠে উত্তর দিকের দিগন্ত আগলে দাঁড়িয়ে আছে। বিস্ময়ে আমাদের প্রায় নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। এই হচ্ছে হিমালয়! প্রথম এই যে হিমালয় দেখলাম আজ, আমাদের কারও পক্ষেই জীবনে কোনও দিন এই দৃশ্য ভোলা সম্ভব হবে না। এখন যত তাড়াতাড়ি ওই তুষাররাজ্যে পৌঁছতে পারি ততই ভাল।

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

পূর্বপ্রকাশিতের পর

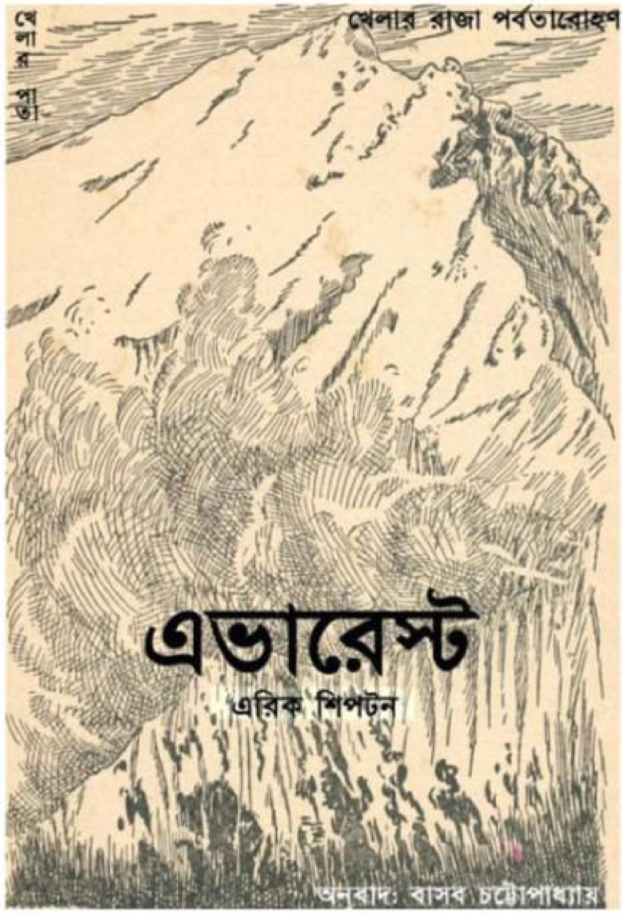

অন্যদিকে আমরা পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার ভয়াবহ অভিজ্ঞতার সাক্ষী হয়েছিলাম। কিন্তু তীব্র বাতাস এবং খারাপ আবহাওয়ায় তৃতীয় শিবিরের অবস্থা বিপজ্জনক ছিল। আমাদের পৌঁছনোর পনেরোদিনের মধ্যেই তার আরও অবনতি হতে থাকে।

সেই একই শেরপা ও সহ অভিযাত্রীদল মনে করিয়ে দিল এবারের সাথে ১৯২৪- এর সেই এভারেস্ট অভিযানের আবহাওয়ার আশ্চর্য সাদৃশ্যের কথা। কিন্তু এবছর আধুনিক এবং পর্যাপ্ত আরোহণের সাজ সরঞ্জাম সাথে থাকায় তীব্র বায়ুপ্রবাহ থেকে অভিযাত্রীরা নিজেদের রক্ষা করতে সমর্থ হলেন।

উত্তর মেরুতে অভিযাত্রী ওয়াটকিনসের ব্যবহৃত ডোম আকৃতির যে দ্বিস্তর তাঁবু অভিযাত্রীরা সঙ্গে নিয়েছিলেন সেটির নীচের অংশটা ১৫ ফুট ব্যসবিশিষ্ট। বাঁশের কাঠামো দিয়ে তৈরি এই তাঁবুর বাইরের ও ভিতরের আস্তরণের ভেতর ফাঁক রাখা হয় যাতে গরম বায়ুর একটি স্তর সেখানে জমা হয়। এই বৃহৎ তাঁবু খাড়া করা খুব কঠিন, কিন্তু নিখুঁত ভাবে এটি স্থাপন করতে পারলে ঐ উচ্চতায় দুর্গম পরিবেশে শিবির হয় সবচেয়ে আরামদায়ক।

বাতাসের তীব্রতার সাময়িক বিরতিতে যত দ্রুত সম্ভব আমরা পাহাড়ের ঢালে ফের কাজ আরম্ভ করলাম। ঢাল বরাবর ধাপ কেটে কেটে আগে যে পথ তৈরি করে গিয়েছিলাম, আবহাওয়া শান্ত হতে আমরা সে পথের কোন চিহ্ন খুঁজে পেলাম না।

দীর্ঘক্ষণের সুন্দর আবহাওয়ার সুযোগে আমরা ৩- এ শিবির স্থাপন করলাম। কিন্তু তীব্র বায়ুর প্রকোপে অরক্ষিত উত্তর চূড়ার খাড়া পাহাড়ের সন্নিকটে অবস্থিত এই শিবির ৩য় শিবিরের তুলয়ায় সাচ্ছন্দহীন এবং হিমশীতল। কঠিন বরফে ঢাকা জায়গাটাতে তাঁবু খাটানো অভিযাত্রীদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। এক রাতে শুরু হল প্রবল তুষার ঝড়। তীব্র হাওয়ায় তাঁবুর একটি প্রান্তের পেরেক ভেঙে গেল।

প্রাথমিক উত্তেজনা সামলে আমরা ফের সামনে এগোতে থাকলাম। ধীর গতিতে দিনের পর দিন অগ্রসর হতে হতে অবশেষে পর্বতসমষ্টির উঁচু দুই শিখরের মধ্যবর্তী নীচু স্থানে পৌঁছে গেলাম। কঠিন বরফাচ্ছন্ন খাড়াই দেওয়াল বেয়ে অর্ধেক পথই আরোহণে

আমাদের নেতৃত্ব দিলেন অভিযাত্রী স্মাইথ। অনায়াসে দড়ির মই স্থাপন করে ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হতে থাকলাম।

অবশেষে ১৫ মে পাহাড়ের গায়ে ধাপ কেটে দড়ি স্থাপন করে (fix rope) পথ তৈরি হল। গিরিসংকটের চূড়ার থেকে ২০০ ফুট নীচে ২০ ফুট চওড়া একটি স্থানে চতুর্থ শিবির স্থাপন করলাম। পাহাড়ের গা থেকে বেরিয়ে আসা এই সংকীর্ণ পাথরটি বিশাল হিমদরীর (crevasse) নীচের ওষ্ঠের একটি অংশ। উপরের ঝুলে থাকা ওষ্ঠাংশটি ৪০ ফুট উঁচু। শিবির ভালোভাবেই স্থাপিত হল বটে, আরামদায়কও হল, কিন্তু তা সত্ত্বেও উপরের ঝুলন্ত বরফের প্রশস্ত অংশটি থেকে তুষারধ্বসের বিপজ্জনক সম্ভাবনা থেকেই গেল।

পরবর্তী চারদিন প্রবল তুষার ঝড়ে আমরা অগ্রসর হতে পারলাম না। স্লিপিং ব্যাগে শুয়ে কর্মহীন দিন কাটতে লাগল। নীচের শিবিরে থাকা সহঅভিযাত্রীদের সাথে আমাদের সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ১৯ তারিখ বায়ুর প্রকোপ কমতেই আমি এবং স্মাইথ নর্থ কলের ২০০ ফুটের ভয়াবহ খাড়াই দেওয়াল বেয়ে আরোহণ শুরু করলাম। গিরিসংকটের সংকীর্ণ চূড়ায় যখন পৌঁছোলাম, আমরা মুখোমুখি হলাম পশ্চিমের এক ভয়ঙ্কর নৈসর্গিক সৌন্দর্যের। তুষারঝড়ে অবসন্ন ধূসর মেঘে আচ্ছন্ন দৈত্যের মত সারি সারি অসংখ্য শৃঙ্গ। ঝড়ের পর সন্ধ্যা নামতেই নীলাভ কুয়াশাচ্ছন্ন শৃঙ্গগুলি থেকে উজ্জ্বল লাল আলো বিচ্ছুরিত হতে থাকল।

আমরা আবহাওয়ার সতর্কতা পেলাম –বর্ষার আর বেশি দেরি নেই। শীঘ্র বৃষ্টি শুরু হতে চলেছে অন্যান্য ভারতের সমতল ভূমিতে। এই জরুরি বার্তা আসার সাথে সাথে

আমরা বুঝতে পারলাম দ্রুত অভিযান শেষ করতে না পারলে এবারও আমাদের পরাজয় আসন্ন।

১৯ মে'র আবহাওয়া পঞ্চম শিবির স্থাপনের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার পক্ষে অনুকূল ছিল। কিন্তু তীব্র ঝোড়ো হাওয়ার দংশন আমাদের অভিযানে বাধা হয়ে দাঁড়াল। ২২ শে মে বন্ধ হল হিমশীতল হাওয়ার দাপট। এই ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করেই বারনি, বাউস্টেড, ওয়েগার এবং ওয়েন হ্যারিস সহ আটজন শেরপা পঞ্চম শিবির স্থাপন করলেন। সিদ্ধান্ত নেওয়া হল সম্ভব হলে যত উচ্চতাই হোক পরবর্তী দিন ষষ্ঠ শিবির স্থাপন করা হবে। ঠিক হল ষষ্ঠ শিবির থেকে প্রথম পদক্ষেপ নেবেন অভিযাত্রী ওয়েগা এবং ওয়েন হ্যারিস। ওঁদের অনুসরণ করে অগ্রসর হতে থাকব স্মাইথ এবং আমি।

২৩ তারিখ পরিকল্পনানুযায়ী আমরা চতুর্থ শিবির গুটিয়ে অগ্রসর হতে থাকলাম। নর্থ কলে পৌঁছেই বাতাসের ভয়ংকরতা আমাদের আরোহণ স্তব্ধ করে দিল। বিকেল ৪টের সময় অবশেষে পঞ্চম শিবিরে পৌঁছে দেখলাম পুরো দলই ঐ শিবিরে উপস্থিত। বায়ুর দাপট কমে যাওয়া সত্ত্বেও ভয়ংকরতার চিহ্ন থেকে গেছিল পঞ্চম শিবিরে। ফলে উচ্চতর শিবিরের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া অসম্ভব হয়ে উঠল। পঞ্চম শিবিরে আমাদের দুজনের থাকার মত পরিসর না থাকায় ফের আমাদের নীচের শিবিরে ফিরে যেতে প্রস্তাব দেওয়া হল। সিদ্ধান্ত হল ওয়েন এবং হ্যারিসের পরিবর্তে অভিযান এগিয়ে নিয়ে যাব আমি এবং স্মাইথ ।

ছবিঃ মূল গ্রন্থ থেকে

ওয়ান টু থ্রি ক্লিক

লেখা ও ছবিঃ শম্পা গুহ মজুমদার

আমরা যখন তোমাদের মত ছোটো ছিলাম,তখন ক্যামেরা আমাদের কাছে একটা বিস্ময়ের বস্তু ছিল। ভালো ক্যামেরা ও ছবি তোলার হবি তখন বিলাসিতা হিসেবে দেখা হতো। ফিল্মে কেমন ফটো উঠবে তা প্রিন্ট না করালে বোঝা যেত না। তাই সবটাই চলত আন্দাজে। তখনকার দিনের ফটোগ্রাফারদের দক্ষতা ছিল প্রশ্নাতীত। সাদাকালো ছবিতে প্রকৃতি, ফুল, মানুষ অপূর্ব সুন্দরভাবে ওঁরা ফুটিয়ে তুলতেন। তোমরা যদি পারো তাহলে আনসেল ইস্টন অ্যাডামস (Ansel Easton Adams) এর সাদাকালো ছবি দেখে নিতে পারো।

আজকের দিনে সবার হাতেই ক্যামেরা। বাড়িতে অনেকেরই কমপিউটারও আছে। তাইতে যেকোন ছবিকে মনের মত করে গড়ে নেয়াও সহজ ব্যাপার। কিন্তু এখনও সত্যিকার ভালো ছবি কিন্তু আগের মতই কম এবং তার মূল্যও আলাদা।

এই ভালো ছবি তোলবার জন্যে সবচেয়ে প্রথমেই যেটা দরকার সেটা কিন্তু ভালো ক্যামেরা নয়, ঠিকঠাক করে দেখা বা ভিশ্যুয়ালাইজেশান। ক্যামেরার গুণমান বা লেন্সের শক্তির ব্যাপার আসে তার পর। ব্যাপারখানা একটু বুঝিয়ে বলা যাক।

ধরো একটা খুব সুন্দর দৃশ্য—সমুদ্র, একটা নৌকা, একটা নারকেল গাছ। সেখানে আবার ধরো একই মানের ভালো ভালো ক্যামেরা নিয়ে কয়েকজন ছবি তুলছেন। সামনের চিত্রটা স্থির। তাহলে প্রত্যেকটা ফটোই তো একইরকমের ওঠবার কথা। কিন্তু তা হয় কি? কারো ছবি হয় সাদামাটা, কারোটা হয় ঝাঁ চকচকে আর কারোটা এমন একটা কিছু হয়ে যায় যে দেখামাত্র মনটা বলে ওঠে, “বাঃ।”
এই যে ছবিটা দেখে বাঃ বলে উঠলে বা অনেক দিন পরেও তার কথা তোমার চোখে লেগে রইল, এইটেই আসল। ও ছবিটা যিনি তুলেছেন তিনি একই দৃশ্যকে দেখেছেন, কিন্তু এমন একটা ভাবে তা দেখেছেন ও ক্যামেরায় ধরেছেন যা আর কেউ পারে নি। অংকের হিসেবে একে ধরা যাবে না।

ইন্টারনেট ঘেঁটে ক্যামেরার কলকব্জা শেখা যাবে, ফটোশপ- এর কারিকুরিও শিখে ফেলা যাবে চটপট, কিন্তু এই একটা জিনিস, দেখতে শেখা, একে কিন্তু বই পড়ে পুরোপুরি শেখা যাবে না। অভিজ্ঞতা আর দেখবার চোখ তৈরি করা- সেই হল একে আয়ত্ত্ব করবার জন্য একমাত্র রাস্তা।

প্রশ্ন হল, একটাই দৃশ্যকে কীভাবে একটু অন্যরকমভাবে দেখা ও ক্যামেরাবন্দি করা যায়? ওপরের বলা দৃশ্যটার কথাই ধরো, সেখানে কোনদিক থেকে আলো আসবে, তোলবার সময় কেন্দ্রীয় বিষয় কোনটা হবে—নৌকা, নাকি গাছটা, নাকি সমুদ্র সেইটে মাথার মধ্যে আসবে ছবি তুলতে তুলতেই।

তবে হ্যাঁ কিছু গোড়ার জিনিস তো আছেই। যেমন ধরো, সূর্য যখন আমাদের কান বরাবর উচ্চতায় থাকে, অর্থাৎ সকাল নটা অবধি আর বিকেল চারটের পর, প্রাকৃতিক আলোয় ছবি তোলবার সবচেয়ে ভালো সময়। কিন্তু রাস্তায় নেমে ফটো তুলতে গেলে যেকোন সময়েই শাটারটা টিপতে হতে পারে। তখন আবার নিজের মত করে সেট করে নিতে হবে সবকিছু।

ফের ফিরে আসি সেই সমুদ্রের গল্পে। একটু অন্যরকম করে ছবিটা দেখবার জন্যে মাটিতে বসে ক্যামেরা ফোকাস করা যায়, শুয়ে পড়ে বা মাটিতে ক্যামেরা রেখে শুট করা যায়। প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই ছবিতে অনেক তফাৎ হয়ে যাবে।
অবস্থা, আলো আর বিষয়কে বুঝে নিয়ে কোন ক্ষেত্রে কোনটা করলে সবচেয়ে ভালো ফল মিলবে সেটা নিজেকেই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ঠিক করতে হবে। সেক্ষেত্রে সবচেয়ে দরকারী বিষয় হবে তুমি ঠিক কেমন ছবিটা মনের মধ্যে দেখছ শাটার টেপার আগে সেটাকে ঠিকঠাক বুঝে ফেলা আর তারপর লেন্সের মধ্যে দিয়ে নানান অবস্থানে সেটাকে দেখবার চেষ্টা করা ও মনের মত ছবিটা দেখতে পেলে তবেই শাটারটা টিপে দেয়া। ব্যস!
এ ব্যাপারটা অর্জন করতে হলে কিন্তু বন্ধুবান্ধবরা কী ছবি তুলছে না তুলছে সেটা দেখবার চেয়েও জরুরি হল বিখ্যাত ফটোগ্রাফারদের কাজ দেখা।

ফের একবার সমুদ্রের ছবির সেই গল্পটা। এবারে বিষয় নির্বাচন। তোমার ছবির কেন্দ্রীয় বিষয় কোনটা হবে? সমুদ্র না নারকেল গাছ না নৌকা? প্রথমেই সেটা ঠিক করে নিতে হবে। ভাবতে হবে গাছটাকে ডানদিকে রাখবে না বাঁদিকে, নৌকোটা ক্যামেরার একদম সামনে থাকবে নাকি দূরে দেখা যাবে, এইসব নানা বিকল্প ভেবে ভেবে ছবিটা কেমন হতে পারে সেটা বারবার মাথার মধ্যে ভেবে দেখো, তারপর যে বিকল্পটা মনের চোখে তোমার সবচেয়ে ভালো লাগছে সেইমত করে সাজিয়ে নাও তোমার ছবিকে। শাটার টিপতে হবে তার পরে। আর সেজন্য প্রথমেই যে বিরাট বড়োসড়ো একখানা ক্যামেরা চাই তাই বা কে বলল?
পরের পাতায় সমুদ্র গাছ আর নৌকোর নানা ভাবে তোলা ছবির কয়েকটা উদাহরণ রইলঃ

মাটিতে বসে ক্যামেরা তাক করা হয়েছে

এবারে ক্যামেরা তাক করা হয়েছে ওপর থেকে

প্রধান চরিত্র গাছ

প্রধান চরিত্র নৌকা।
ক্যামেরা মাটিতে

<u>এবারে আসি ছবি তোলবার কিছু সমস্যার কথায়</u>

সমস্যা একঃ তোমার ক্যামেরা নেই।

ঠিক আছে। তাতেও চলবে। দিদি, দাদা, মা, বাবা, কারো মোবাইলটার ক্যামেরা দিয়েই শুরু করো না! মোটামুটি পাঁচ মেগাপিক্সেলের মোবাইল ক্যামেরা হলেই কাজ চলে যাবে।

সমস্যা দুইঃ পড়ার চাপ।

পরীক্ষার জন্যে কাছেদূরে কোথাও বেরোতে পারছো না। তাহলে ছবি তুলবে কী করে?

তাতেও অসুবিধে নেই। তোমার বাড়িতের ছড়িয়ে আছে ছবির হাজারো সাবজেক্ট। এই যেমন একখানা। খাবার টেবিলে পাবে একে। খোলা জানালা দিয়ে পর্দার গায়ে যদি রোদ এসে পড়ে তাহলে তো কথাই নেই।

তাছাড়া, একটু খেয়াল করে দেখবে তুমি যেখানেই থাকো না কেন, প্রত্যেক বাড়িতেই হয়তো টবে কিছু গাছ আছে। বাড়ির বাইরে রোজকার রাস্তাটার পাশেপাশেও কিছু কিছু গাছ থাকবেই। বারান্দায়, জানালায় আর কিছু না হোক একটা কাক বা চড়াইও তো এসে বসে কখনো সখনো। বর্ষায় ভেজা কাক কিন্তু খুব আর্টিস্টিক ছবি হয়।
টবের আগাছাতেও যখন বৃষ্টির ফোঁটা দোল খায় বা কংক্রিটের জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে অস্তগামী সূর্যের লাল আভা এসে টুকি দেয়, শ্রীহীন সামনের বাড়ির দেয়ালের অশ্বত্থ কচিপাতার কি অপূর্ব রূপ, তারপর ধরো কখনো সখনো চিড়িয়াখানায় গেলে কতো অফুরন্ত ছবির বিষয়।

সমস্যা তিনঃ আমার প্রকৃতির ছবি তুলতে ভালো লাগে না।

বেশ কথা। তাহলে নানান মুডের মজার মজার মানুষ? রাতের আলো? রাস্তাঘাটের হইচই? বাড়িতে যে মাসী আসেন কাজ করতে তাঁকেই অনুরোধ করো না! খুশি হয়ে পোজ দিয়ে দেবেন

দেখো ছবি তোলবার জন্যে। ওঁদের পরিশ্রান্ত মুখে, কাজ করা খেটে খাওয়া দাগ পড়া হাতে অনেক গল্প থাকে। ছবিতে তাকে যদি ধরতে পারো তাহলে তার জুড়ি মিলবে না।

স্টিল লাইফের ছবি ভালোবাসো বুঝি? তাহলে তো কথাই নেই। পড়ার টেবিল ছেড়ে উঠতেই হবে না। ছবি পেয়ে যাবে ওখানেই। রঙিন পেনসিলের বান্ডিলের ছবি তুলে দেখেছো? কিংবা রঙের কৌটো? এই দেখো। সে যে কি সুন্দর কি বলব!
আসলে তোমার চারদিকে নাগালের মধ্যেই ছবি তোলবার অজস্র বিষয়। যেটা তোমার ভালো লাগে তাকেই চেপে ধরো না ! প্রথমে মন ক্যামেরায় চেয়ে দেখো ঠিক কেমন ছবিটা দেখতে পাচ্ছো, তারপর হাতের কাছে মোবাইল ফোনটা পেলে তাই সই, তাতেই বন্দি করে ফেলো সে ছবিকে।

ক্লিক

আমি এখন যেখানটাতে থাকি সেখানে অনেক পাখি আর অনেকরকমের গাছপালা। ঘরে বসেবসেই আমি ময়ূরদের নানান কান্ডকারখানা দেখতে পাই। দেখতে দেখতেই জানতে পেরে যাই তাদের বিষয়ে অনেক অজানা খবর। হাতে তুলে নিই ক্যামেরা।

আজকে লেখা শেষ করব তেমন ময়ূরদের দুএকখানা ছবি দিয়ে। পরের সংখ্যায় ছবি তোলা কায়দাকানুন নিয়ে আরো গল্প হবে। সঙ্গে থাকবে ছবি তোলবার মজার গল্প , এই “ক্লিক” সেকশনে। একটু ধৈর্য ধরো শুধু।

দোয়েল

কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সাদা কিংবা ধূসর বর্ণের সঙ্গে কালো বর্ণের পালকে ঢাকা থাকে এই পাখির। আকারে ছোট, কিন্তু লেজ লম্বা হয়। জনবসতিতে ছাড়াও উন্মুক্ত বনাঞ্চলেও দেখতে পাওয়া যায়। পোকামাকড় খেয়েই বেঁচে থাকে। সুরেলা কন্ঠস্বরের জন্য এই পাখির সুনাম আছে। আমাদের প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের জাতীয় পাখি হল এই দোয়েল পাখি।

ছবি--লেখক